প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশকিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

16তম পুনর্মুদ্রণ : জুন, 2019

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : ঐচ্ছিক ইতিহাস **সাম্মানিক স্তর**

পাঠক্রম : E H I : পর্যায় : 25 - 28

পর্যায় : 25

	রচনা	**সম্পাদনা**
একক - 1-4	অধ্যাপক শ্রীকুমার আচার্য	অধ্যাপক সমর মল্লিক

পর্যায় : 26

	রচনা	**সম্পাদনা**
একক - 1-4	অধ্যাপক অলক ঘোষ	অধ্যাপক রাধামাধব সাহা

পর্যায় : 27

	রচনা	**সম্পাদনা**
একক - 1-4	অধ্যাপক রঞ্জিত সেন	অধ্যাপক শ্রীকুমার আচার্য

পর্যায় : 28

	রচনা	**সম্পাদনা**
একক - 1-2	অধ্যাপক রাধামাধব সাহা	অধ্যাপক রঞ্জিত সেন
একক - 3-4	অধ্যাপক রঞ্জিত সেন	অধ্যাপক রঞ্জিত সেন

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

E H I – 7

(স্নাতক পাঠক্রম)

পর্যায়
25

একক 1	ফরাসি বিপ্লব কী ও কেন	7-16
একক 2	ফরাসি বিপ্লব ঃ ঘটনা পরম্পরা	17-33
একক 3	নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অভ্যুত্থান পর্ব (১৭৯৫-১৮০৭)	34-45
একক 4	নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পতন পর্ব (১৮০৭-১৮১৪)	46-54

পর্যায়
26

একক 1	ভিয়েনা সম্মেলন, ইউরোপীয় শক্তি সমবায় ও মেটারনিক ব্যবস্থা	55-72
একক 2	১৮৩০ ও ১৮৪৮-এর বিপ্লব	73-82
একক 3	দ্বিতীয় সাম্রাজ্য ও তৃতীয় নেপোলিয়ান, প্যারি কমিউন	83-100
একক 4	বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রের গঠন—ইতালি ও জার্মানি; পুরনো অস্ট্রিয় ও অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যের ভাঙ্গান	101-114

পর্যায়
27

একক	1	শিল্প-বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের উদ্ভব	117-144
একক	2	সমাজতন্ত্র	145-173
একক	3	রাশিয়াতে সংস্কার কার্য	174-197
একক	4	রাশিয়াতে ১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের বিপ্লব	1982-221

পর্যায়
28

একক	**1**	উপনিবেশবাদ ও উপনিবেশ বিস্তার	225-236
একক	**2**	বলকান জাতীয়তাবাদ	237-251
একক	**3**	নতুন কূটনীতি	252-271
একক	**4**	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ	272-296

একক ১ □ ফরাসি বিপ্লব কী ও কেন

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ ফরাসি বিপ্লব কী ও কেন

১.২.১ ফরাসি বিপ্লব — আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

১.২.২ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

১.২.৩ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ফরাসি বিপ্লব

১.২.৪ পুরাতন রাজনৈতিক ব্যবস্থা

১.২.৫ অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তি দর্শন ও ফরাসি বিপ্লব

১.২.৬ বারোঁদ্রা মন্তেস্কুই (১৬৮৯-১৭৫৫)

১.৩ সারাংশ

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে যে বিষয়গুলির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল :

- ফরাসি বিপ্লব কী পশ্চিমি বা আটলান্টিক বিপ্লব?
- ফরাসি বিপ্লবের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
- অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তি দর্শন ও ফরাসি বিপ্লব
- ফরাসি বিপ্লবের কারণাবলী

১.১ প্রস্তাবনা

ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) শুধু ফ্রান্সের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী আজ সমগ্র মানবজাতির উত্তরাধিকার হিসাবে গণ্য। এই যুগান্তকারী বিপ্লবের বীজ সন্ধান করতে হবে অষ্টাদশ শতকের ফরাসি আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পট-পরিবর্তনের মধ্যে। ক্ষয়িষ্ণু রাজতন্ত্র ও অভিজাত সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এটি এক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। বিপ্লবের নেতৃত্বে বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে থাকলেও হাতেনাতে লড়াই করেছিল, শ্রমিক ও কৃষক।

অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্স ছিল এক সমৃদ্ধ দেশ। কৃষির উন্নতির দরুন জনসংখ্যা চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যেও যথেষ্ট উন্নতি ছিল। রেশম, বস্ত্র, শর্করা, খনি ও অন্যান্য শিল্প গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এই অর্থনৈতিক রমরমার ভিত্তি ছিল ভঙ্গুর। বিপ্লবের আগে এক দশক ধরে অর্থনৈতিক সংকট তীব্র রূপ ধারণ করেছিল। দু-তিন বছর ফসল ভালো হয়নি। ১৭৮৭ খ্রি. অজন্মার সঙ্গে মড়ক দেখা দিয়েছিল। দেশের ৮৫ শতাংশ মানুষ গ্রামাঞ্চলে বাস করত। তার মধ্যে ৬৬ শতাংশ ছিল কৃষক। জমির মালিকানা ও সামন্ততান্ত্রিক অধিকার নিয়ে বিরোধ ছিল কৃষকশ্রেণীর প্রধান সমস্যা। চাষি-গৃহস্থ, ভাগ-চাষি ও দিন মজুরদের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য ছিল।

প্রাক্‌বিপ্লবী যুগের শ্রমিক শহরের সাঁ-কুলোৎ শ্রেণি ঠিক সর্বহারা ছিল না। এদের এক চতুর্থাংশ ছিল ক্ষুদ্র সম্পত্তির মালিক। তাদের বড়ো সমস্যা ছিল মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে মজুরি বৃদ্ধির বাধা। উচ্চতর শ্রেণির কাছে 'ছোট লোক' (Menu peuple) বলে পরিচিত। বাজার থেকে খাদ্য উধাও হবার ফলে তাদের উত্তেজনার পারদমাত্রা ঊর্ধ্বগামী হয়েছিল। আসলে, সব অসন্তোষ সব অশান্তির মূলে — ক্ষুধা — সর্বব্যাপী ক্ষুধা। দেশের অর্থনৈতিক সংকট যখন চরমে তখনি ১৭৮৯ খ্রি. ৫ মে স্টেটস জেনারেল আহ্বান করেন ফরাসিরাজ ষোড়শ লুই।

অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তি আন্দোলন (Enlightenment) বহু মনীষীর দীর্ঘ সাধনার ফলশ্রুতি। মন্তেস্কু, ভলটেয়ার ও রুশো প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা প্রসারিত করেছেন মানুষের মনের আকাশ—মানুষের ভেতরের অন্ধকারকে আলোকিত করেছেন, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোয়। এদের বৈপ্লবিক বাণী শোনার পর তৃতীয় এস্টেটের মানুষ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

আসলে যে অর্থনৈতিক সংকট পুরনো জমানার স্তর-বিভক্ত সমাজের মূলভিত্তি চূর্ণ করে সর্বত্র উথাল-পাতাল কাণ্ড বাধিয়েছিল, তা দার্শনিকদের চিন্তাধারা থেকে সরাসরি সৃষ্ট হয়নি। অবশ্য এটা স্বীকার করতে হবে যে, বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারা পুরাতন ব্যবস্থার নেতৃস্থানীয় প্রথম ও দ্বিতীয় এস্টেটের আত্মবিশ্বাস টলিয়ে দিয়েছিল ও তৃতীয় এস্টেটকে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত করে বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করেছিল।

১.২ ফরাসী বিপ্লব কী ও কেন

ফরাসি ঐতিহাসিক আলেকসি দ্য তকভিল (Alexis de Tocqueville) তাঁর গ্রন্থ The Old Regime and the French Revolution-এ মন্তব্য করেছেন, ফরাসি বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন ও উদারনৈতিক ব্যবস্থার পত্তন। অর্থাৎ বিপ্লব একাধারে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ধ্বংস করে ও আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এই বিপ্লবের তাৎপর্য নির্ণয় করতে হলে সাম্প্রতিক গবেষকদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচয় দরকার। সাম্প্রতিক কালে গবেষক জ্যকস্

গোদসো ও মার্কিন ঐতিহাসিক রবার্ট পামার এই বিপ্লবকে এক দীর্ঘস্থায়ী ইউরোপীয় বিপ্লবের ফরাসি অধ্যায় রূপে বর্ণনা করেছেন। এই সব গবেষকদের মতে, ফরাসি বিপ্লব মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ যাকে পশ্চিমি বিপ্লব বা আটলান্টিক বিপ্লব অভীধায় চিহ্নিত করা যায়। বিশিষ্ট ফরাসি জননায়ক বারনেভ (Bernave)-এর দৃষ্টিতে ফরাসি বিপ্লবের প্রথম পর্বেই দেশ-কাল-উত্তীর্ণ চরিত্র ধরা পড়েছিল। এই বিপ্লব ইউরোপীয় বিপ্লবেরই শেষ পরিণতি, সমগ্র ইউরোপের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পট-পরিবর্তনের মধ্যেই বিপ্লবের বীজ সন্ধান করতে হবে।

১.২.১ ফরাসী বিপ্লব — আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

অষ্টাদশ শতকে প্রাক্-বিপ্লবী ফরাসি সমাজ তিনটি স্তর (Estate)-এ বিভক্ত ছিল। যাজকদের বলা হত প্রথম এস্টেট, অভিজাতদের দ্বিতীয় এস্টেট এবং বাদবাকি জনসাধারণকে তৃতীয় এস্টেট-এর অন্তর্ভুক্ত করা হত। ফরাসি সমাজের স্তর বিন্যাসের মূলে ছিল সামন্ত প্রথা জনিত আইনগত অধিকারের তারতম্য। ফরাসি সমাজের প্রথম দুটি এস্টেট সমগ্র জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ হলেও অর্থ সম্পদ ও পদমর্যাদার দিক দিয়ে এরা জাতি ও জীবনে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এই যাজক ও অভিজাত শ্রেণি ছিল ফরাসি সমাজে সুযোগ ও সুবিধাভোগী ও অপরদিকে তৃতীয় এস্টেট ছিল ফ্রান্সের জনসাধারণের অন্যান্য শ্রেণি যারা সকল প্রকার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত।

প্রথম এস্টেটের মধ্যে ধনী ও প্রভাবশালী বিশপ ও আর্চবিশপের সঙ্গে অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত সাধারণ গ্রাম্য প্যারিসের (Parish) যাজক শ্রেণিও ছিল। সেইজন্য এস্টেট কথাটির সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে হলে এদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চেয়ে আইনগত অধিকারের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। রাজতন্ত্রের সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও জনগণের ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনার ওপর এদের কর্তৃত্ব ছিল নিরঙ্কুশ। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই নিরঙ্কুশ প্রভাবের নেপথ্যে ছিল দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য বিজড়িত যুক্তি তর্কের ঊর্ধ্বে কর্তৃত্বের স্বীকৃতি। চার্চের ধর্মীয় কর্তৃত্ব ছিল রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ক্ষমতার পরিপূরক তথা স্বৈরাচারী শাসনের ভিত্তি রূপ। এছাড়া চার্চ রাষ্ট্রের আর্থিক সহযোগিতা দানের বিনিময়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে সমর্থন যোগাত। সর্বশেষে যাজক তথা ফরাসি চার্চ সমকালীন চিন্তাধারার নতুন প্রসারকে রোধ করার ফলে দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীদের অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সমাজে যাজক সম্প্রদায়ই ছিল সর্বাধিক প্রভাবশালী ও বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত। সে কারণেই চার্চ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণভাবে উৎখাত হয়।

ফরাসি সমাজে দ্বিতীয় এস্টেট, অভিজাত শ্রেণির সংখ্যা ছিল প্রায় লক্ষাধিক। সমগ্র ফ্রান্সে এক পঞ্চমাংশ জমি ছিল এদের মালিকানাভুক্ত। এদের রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা ছিল অসংখ্য। তারা সকল প্রকার কর থেকে অব্যাহতি পেত। অন্যদিকে সকল প্রকার সরকারি পদগুলি ছিল এদের একচেটিয়া। তবে অভিজাত শ্রেণির মধ্যে অন্তর্বিরোধ ছিল যথেষ্ট। অভিজাত শ্রেণির মধ্যে সর্বোচ্চ ছিল অসিধারী গোষ্ঠী। ফরাসি সনাতন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এদের নীচে ছিল পোশাকি অভিজাত গোষ্ঠী। যারা সরকারি পদ অতীত কালে কিনে তার সঙ্গে পেয়েছিলেন বিশেষ অভিজাত পোশাক পরার অধিকার। অসিধারী ও পোশাকি অভিজাতদের মধ্যেও বিরোধ ছিল। বিরোধ ছিল দরবারী অভিজাত ও প্রাদেশিক অভিজাতদের মধ্যেও। বনেদি ও নতুন সরকারি চাকুরে অভিজাতদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ ছাড়াও নৈতিক অধঃপতন ও দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল অহেতুক বিলাস ব্যসন, আড্ডা ও জুয়া খেলার প্রভাবে। শিক্ষিত জনমত পরগাছারূপী অভিজাত শ্রেণির কঠোর সমালোচনা করত। কৃষক শ্রেণিও সামন্ত প্রথাকে প্রত্যাখ্যান করে।

ফরাসি সমাজের সর্বনিম্নেই ছিল বিশেষ অধিকার বঞ্চিত সাধারণ মানুষ। এদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ। এরা দুটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং কৃষক শ্রেণি। মোটামুটিভাবে কুটির শিল্পী ও শ্রমজীবী সম্প্রদায় (সাঁকুলোৎ শ্রেণি) ছিল এই কৃষক শ্রেণি ভুক্ত। ফরাসি সমাজে সবচেয়ে বেশি আলোকপ্রাপ্ত ও সচেতন শ্রেণি ছিল বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণি। অষ্টাদশ শতকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আয়ের দুটি প্রধান উৎস ছিল— ব্যাবসা বাণিজ্য এবং বিভিন্ন ধরনের স্বাধীন পেশা। ধনিক, বণিক, ব্যাংক মালিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, সরকারি কর্মচারী, কারিগর এবং দোকানদার প্রভৃতি নানা জীবিকার লোক মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল। চতুর্দশ লুই-এর আমল থেকে ফরাসি মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রভাবশালী হয়ে উঠতে থাকে। রাজপথ নির্মাণ ও খাল খননের ফলে ফ্রান্সে ব্যাবসা বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি হয়। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় সরকারি রসদ সরবরাহ করে এরা প্রচুর অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করে। দূরবর্তী উপনিবেশের সঙ্গে বাণিজ্যের মাধ্যমেও এরা ধনী হয়। প্রাক্ বিপ্লবী ফরাসি সমাজেও কৃষি-বহির্ভূত অর্থনৈতিক বিনিয়োগে এদের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। শিল্পপতি থেকে শুরু করে স্বাধীন কারিগর সকলেই ছিল বুর্জোয়া শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই অন্তর্ভুক্ত বুদ্ধিজীবীরাই তৃতীয় এস্টেটের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। জ্ঞানদীপ্ত যুগের আলোকপ্রাপ্ত ও সনাতন সংস্কার মুক্ত মধ্যবিত্তরাই ছিল ধর্মীয় উৎপীড়ন ও নির্যাতনের কঠোর সমালোচক। বাক্-স্বাধীনতা হরণ ও জনগণের কণ্ঠরোধ করার জন্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে এরাই সোচ্চার হয়। স্বভাবতই এদের কাছ থেকে বিপ্লবী নেতৃত্ব এসেছিল। ফরাসি বিপ্লবের প্রথম পর্ব (১৭৮৯-৯৫) প্রধানত বুর্জোয়াদের স্বার্থে পরিচালিত হয়েছিল।

১.২.২ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ফ্রান্সের জটিল অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃত ছবি তুলে ধরা কঠিন। তবে ফ্রান্সের পরিস্থিতি যে বেশ মারাত্মক হয়ে উঠেছিল এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। শুধু ফ্রান্সের রাজকোষই নিঃশেষ হয়ে যায়নি, ফরাসি আর্থনীতিক পরিস্থিতি হয়ে উঠেছিল অবসন্ন ও দুর্বিষহ। সমকালীন ফরাসি অর্থমন্ত্রী নেকারের গ্রন্থ ''আর্থনীতিক পর্যালোচনা'' থেকে জানা যায় যে, ফরাসি জনগণ সরকারকে মোট ৫৮৫ মিলিয়ন লিভর কর দিত। প্রাক্ বিপ্লবী কর ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণির জনগণের উপর সমানুপাতিক কর বণ্টনের ব্যবস্থা ছিল না। সেই সময় প্রায়ই যুক্তি হিসাবে উল্লেখ করা হত যে, রক্ত দিয়ে অভিজাত সম্প্রদায় রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দায় শোধ করে থাকে, অর্থ দিয়ে নয়। ফরাসি কর ব্যবস্থা প্রধানত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যক্ষ করের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাপিতাসিওঁ (Capitation) ছিল ফরাসি জনগণের ওপর নির্দিষ্ট মাথা পিছু কর যাকে আধুনিক কালে আয়কর হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়। ফরাসি জনসাধারণকে ২২টি শ্রেণিতে বিভক্ত করে এ কর আদায় করা হত। ভ্যাঁতিয়েম (Vingtiem) ছিল ব্যক্তিগত স্থাবর সম্পত্তির ওপর বিশ শতাংশ হারে কর। পরে অবশ্য এই কর দশ থেকে এগারো ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

অভিজাত শ্রেণি তাদের ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে ও আইনের সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে বহু ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ কর ফাঁকি দিত। কৃষক, শ্রমজীবী ও জনসাধারণ প্রত্যক্ষ করের হাত থেকে রেহাই পেত না। ফলে কৃষকদের আয়ের পাঁচ ভাগের চারভাগ নিঃশেষিত হত। স্বভাবতই প্রত্যক্ষ কর দেওয়ার ব্যাপারে কৃষকদের মনোভাব ছিল নিছক নেতিবাচক।

প্রধান পরোক্ষ কর লবণ কর, আবগারি কর, নগর শুল্ক ও আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক প্রভৃতি করগুলি ছিল অসংগত ও জবরদস্তিমূলক। লবণ করের জন্য ক্রেতাকে লবণের মূল্য দামের চাইতে ৫০-৬০ ভাগ বেশি দামে লবণ ক্রয় করতে হত। আবগারি কর শুধুমাত্র মাদক দ্রব্য নয়, বিদেশ থেকে আমদানি করা সকল পণ্যের উপরই ধার্য করা হত। এক নগর থেকে অন্য নগর অথবা এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে পণ্য পরিবহণের সময় শুল্ক ধার্য করা হত। অন্যান্য পরোক্ষ করের

মধ্যে তামাকের একচেটিয়া ব্যাবসা, ডাক টিকিট, যানবাহন ও উত্তরাধিকার স্বত্বের উপর কর আদায় করতেন এক শ্রেণির বেসরকারি ইজারাদার।

প্রাক্ বিপ্লবী কর ব্যবস্থা ছিল নির্যাতন মূলক। এই ব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণি এই সকল কর থেকে অব্যাহতি পেলেও সাধারণ অসহায় মানুষের ওপর করের বোঝা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেত। এই কর প্রথা বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি করে সরকারের আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতির পথকে রুদ্ধ করত। ফলে ফরাসি সরকার দীর্ঘদিন ধরে এক বিপুল পরিমাণ জাতীয় ঋণের মাধ্যমে সরকারি আয়ের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করত। ঋণের বোঝা হ্রাস করার জন্য ফরাসি সরকার পদ, উপাধি, সম্মান ও পৌর অধিকারও বিক্রয় করে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করতেন। ফরাসি রাজ চতুর্দশ লুই সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি রূপায়ণের জন্য যে বহু যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন তা থেকেই ফ্রান্সের আর্থিক ঘাটতি শুরু হয় যা পরবর্তীকালে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছিল। তবে শান্তির সময়ও রাজকোষের অভাবের মূল কারণ ছিল অভিজাত শ্রেণির তদানীন্তন কর ব্যবস্থায় বিশেষ সুবিধাভোগ।

১.২.৩ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ফরাসি বিপ্লব

ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে ফরাসি রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচার ও একনায়কতন্ত্র সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা যায়। ফরাসি রাজতন্ত্র সপ্তদশ শতকে এক নিরংকুশ স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হয়। বুঁর্বো রাজারা ছিলেন একাধারে প্রশাসন আইন ও বিচার বিভাগের নিয়ামক। ফরাসি যাজক, অভিজাত ও সাধারণ মানুষের যে প্রতিনিধি সভা এস্টেট জেনারেল (Estates General) ফ্রান্সে গড়ে উঠেছিল তার কোনো অধিবেশন ১৬১৪ সালের পরে অনুষ্ঠিত হয়নি। উনিশ শতকের জননায়ক লা মার্টিন মন্তব্য করেছেন, ''জাতির দৃষ্টিতে রাজা ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর এবং তাঁকে মেনে চলাই ছিল ধর্ম''। রাজার বিরুদ্ধে কোনোরূপ রাজনৈতিক সমালোচনা সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্ন অথবা মানুষের জন্মগত অধিকারের দাবি স্বীকৃত ছিল না। তবে প্রাক্-বিপ্লবী ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারী ঐতিহ্য ছাড়াও প্রশাসন যন্ত্রের বিশৃঙ্খলা সর্বত্রই লক্ষিত হয়। তাছাড়া ফ্রান্সের আমলাতন্ত্র, শুল্ক ব্যবস্থা ও মুদ্রা ব্যবস্থা ও ওজন মাপার মানদণ্ডের মধ্যে স্থানীয় বৈচিত্র ছিল।

প্রাক্ বিপ্লব ফরাসি প্রশাসনের আর-একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সার্বজনীন আইনবিধির অভাব। ফ্রান্সের তখন প্রায় চারশো রকমের আইন প্রচলিত ছিল। ফলে ফ্রান্সে এক স্থানের আইন, অন্যত্র স্বীকৃতি পেত না। বিচার ব্যবস্থাও ছিল অত্যন্ত জটিল ও মন্থর। দণ্ডবিধিও ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অমানুষিক। বিচারকরা উত্তরাধিকরা সূত্রে তাদের পদে নিযুক্ত হতেন। ফ্রান্সের সবচেয়ে উচ্চ আদালত ছিল প্যারিসের পার্লেমেন্ট (Parlement) ফলে প্রাক্ বিপ্লবী ফ্রান্সের সামাজিক বৈষম্য ও শ্রেণিভেদ প্রথার প্রতিফলন প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যেও লক্ষ্য করা যেত। ফরাসি সম্রাট চতুর্দশ লুই যে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন তা দুর্নীতিপরায়ণ, দায়িত্বজ্ঞানহীন। পঞ্চদশ লুই-এর আমলে রাজ সিংহাসন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেও তিনি তাঁর পুরাতন ঐতিহ্য ও সনাতন বিধি ব্যবস্থার কোনোরূপ পরিবর্তন করতে উদ্যোগী হননি। ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চদশ লুই-এর পৌত্র ষোড়শ লুই যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তার সদিচ্ছা ও উদারতা সত্ত্বেও স্বাভাবিক প্রশাসনিক দক্ষতা ও দৃঢ়তার অভাব ফরাসি প্রশাসনের সামগ্রিক উন্নতি বিধানে বাধা সৃষ্টি করে। তাঁর শাসন কালে প্রথম সাত বছর তুর্গো, নেকার ও ক্যালোন প্রভৃতি কয়েকজন মন্ত্রী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যে বিভিন্ন ধরনের সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন তা রাজার আন্তরিকতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। রাজার সংস্কার কর্মসূচির ব্যর্থতা রাজতন্ত্র ও রাষ্ট্রের অন্যান্য শ্রেণির জনগণের মধ্যেকার সম্পর্ক দুর্বল করে ও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে যার ফলে ফরাসি বিপ্লবের পথ সুগম হয়।

১.২.৪ পুরাতন রাজনৈতিক ব্যবস্থা

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের চরম বিকাশ ঘটেছিল। তবে এযুগের বহু রাজা একাধারে স্বৈরাচারী অপর দিকে জ্ঞানদীপ্ত জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। তাদের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ছিল জনগণের জন্য, কিন্তু সরকার পরিচালনায় জনগণের স্থান ছিল না। এই তথাকথিত জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসনযন্ত্রের মধ্যমণি ছিলেন ফরাসী রাজা ও তাঁর নিযুক্ত চারজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী—যাঁরা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, বৈদেশিক নীতি, সমরদপ্তর ও নৌবহরের দেখাশোনা করতেন। ফ্রান্সের বিচার ব্যবস্থাও ছিল ত্রুটিপূর্ণ। সমগ্র ফ্রান্সে অসংখ্য আইনবিধি প্রচলিত ছিল। স্বৈরতান্ত্রিক রাজার নির্দেশে প্রদেশ শাসনের কর্ণধার ছিলেন ইনটেনডেন্ট (Intendant) তবে স্বৈরতন্ত্রের অনাচার ও দুর্নীতির প্রধান ক্ষেত্র ছিল রাজস্ব ব্যবস্থা, যাকে কেন্দ্র করে যাজক ও অভিজাত শ্রেণি কর থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভ করে। ফলে সামগ্রিক চাপটি তৃতীয় এস্টেটের উপর পড়েছিল।

পুরাতন ব্যবস্থার অধীনে ফ্রান্সের আর্থ-রাজনৈতিক বিধি ব্যবস্থার জটিলতা ও অন্তঃসারশূন্যতা স্বাভাবিকভাবেই অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে এক গভীর অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে। যার অনিবার্য ফলশ্রুতি হল বিপ্লবের প্রাক্‌কালে এক ব্যাপক অগ্নিগর্ভ অবস্থা। এই অবস্থার জন্য রাজার ভূমিকার উপর আলোকপাত করা দরকার। অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে ফ্রান্সের রাজা সরকারি আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা রাখতে পারছিলেন না। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৬৩০,০০০,০০০ লিভর। এর মধ্যে সরকারি ঋণ বাবদ সুদের অংক ছিল ৩১৮,০০০,০০০ লিভর। ফ্রান্সের অস্বাভাবিক ব্যয় বৃদ্ধির প্রথম কারণ অহেতুক ও অনাবশ্যক যুদ্ধের বিপুল ব্যয়। ১৭৪০-৪৮ সালে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৭৫৬-১৭৬৩)। এ দুটি যুদ্ধে ফ্রান্সের বিপুল অর্থব্যয় তার রাজনৈতিক দেউলিয়ার পথ খুলে দেয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রশাসনের ব্যয় বৃদ্ধি ও সর্বোপরি রাজতন্ত্রের অনর্থক বিলাস ব্যসন। অর্থনৈতিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করলে কর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের যে প্রস্তাব তুর্গো, নেকার, ক্যালোন ও ব্রিঁয়া দিয়েছিলেন তা প্রথম দুই এস্টেটের তীব্র বিরোধিতার ফলে অচল অবস্থার সৃষ্টি করে। ষোড়শ লুই ১৭৮৯ সালের ৫ মে এস্টেট জেনারেল অধিবেশন আহ্বান করতে বাধ্য হন। রাজা এস্টেট জেনারেল আহ্বান করে রাজতন্ত্রকে রক্ষার যে সুযোগ গ্রহণ করেন তা অভিজাত শ্রেণির হঠকারিতার ফলে সমাজ পুনর্গঠন তথা আমূল বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে।

আর্থ সামাজিক সংকট, স্বৈরতান্ত্রিক রাজশাসনে নেতৃত্বের দুর্বলতা, মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অভিজাত শ্রেণির যেকোনো পরিবর্তনের বিরুদ্ধে অন্ধ প্রতিরোধ, স্বাভাবিকভাবেই ফ্রান্সে বিপ্লবের পথ সুগম করেছিল। বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সম্ভাবনা বিভিন্ন ইউরোপের দেশগুলিতে দেখা দিলেও ফ্রান্সের শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণি, সুসংগঠিত কৃষক সম্প্রদায় ও প্যারিস মহানগরীর বিক্ষুব্ধ সাঁকুলোৎ গোষ্ঠী ও সর্বশেষে ফরাসি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি তুলে ধরলে ফ্রান্সেই প্রথম সার্থকভাবে বিপ্লবের পথ প্রস্তুত হয়।

১.২.৫ অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তি দর্শন ও ফরাসি বিপ্লব

প্রাক বিপ্লবী ফ্রান্সে জনসাধারণের দুঃখ কষ্টের সীমা ছিল না। কিন্তু নিছক দুঃখ কষ্টই তাদের বিপ্লবের পথে উদ্বুদ্ধ করেনি। বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সের চিন্তাজগতে একটা বিপ্লব ঘটেছিল যদিও চিন্তাজগতে বিপ্লব হবার ফলেই বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল একথা বলা ঠিক হবে না। আধুনিক কালে প্রতিটি বিপ্লবের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এসব বিপ্লবের পূর্বে জ্ঞান ও চিন্তাধারার ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিল। একটা আন্দোলন প্রকৃত বিপ্লবের রূপগ্রহণ করার পূর্বে এমন আদর্শ বা মতবাদের সমর্থন প্রয়োজন, যাতে শুধুমাত্র কর্মসূচির কথা বলা হবে না। সন্ধান মিলবে এক সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নেরও।

১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে ফরাসি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর ভূমিকা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বেশ বিতর্ক রয়েছে। মুনিয়ে (Mounier) নামক জনৈক ঐতিহাসিকের নেতৃত্বে একটি গোষ্ঠীর লেখকরা মনে করেন যে, সনাতন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার উদ্দেশে বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর অবদান তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। তাঁরা অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। রাজনৈতিক সংস্কারের দাবিও তারা করেছিলেন, ধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদগার ও জড়বাদী নীতির সপক্ষে প্রচারকার্য চালিয়ে ছিলেন। অপর লেখক গোষ্ঠীর ধারণা হল বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর সক্রিয় ভূমিকাই বিপ্লবের প্রকৃত কারণ। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ একথা কখনও স্বীকার করা যায় না যে, বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীই একমাত্র এই বিপ্লব ঘটিয়েছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে উদ্ভূত এই বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণা মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণিরই অসন্তোষ ও আশা আকাঙ্ক্ষার বুদ্ধিভিত্তিক প্রকাশমাত্র।

অষ্টাদশ শতকে ফরাসি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী মূলত প্রচার করেছিলেন যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় মনের সমাজও কয়েকটি সহজ ও মৌলিক প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এই নিয়মগুলি যুক্তির দ্বারা গ্রাহ্য। ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ যুক্তিকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "Idealised bourgeois intelligence" (আদর্শাশ্রিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৌদ্ধিক প্রকাশ) সংক্ষেপে মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে উদ্ভূত এই বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী তাদের লেখনীর মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণিরই অভাব অভিযোগ ও আশা আকাঙ্ক্ষার বুদ্ধিভিত্তিক প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর এই মানসিক বিপ্লব ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলনের অংশমাত্র। বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী পাণ্ডিত্য ও শানিত ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মাধ্যমে চার্চ, রাজতন্ত্র ও অভিজাত শ্রেণির বিশেষ অধিকারের তীব্র সমালোচনা করতেন। কিন্তু তাদের এই সমালোচনা ছিল অগভীর ও কল্পনাপ্রসূত। ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তাছাড়া অতীত সম্পর্কে এদের জ্ঞান ও ধারণা ছিল সীমিত। ইংল্যান্ডের সংবিধান ও আর্থিক সংগঠন বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীকে মুগ্ধ করেছিল। যদিও এ সম্পর্কে তাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল নিতান্তই পরিমিত। সুতরাং বলা যেতে পারে, শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতাকে নির্মমভাবে উদ্‌ঘাটিত করে তারা ফরাসি রাজনীতি ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মূলভিত্তিকে কম্পিত করেছিলেন।

১.২.৬ বারোঁ দ্য মন্তেস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫)

মন্তেস্ক্যু ছিলেন অষ্টাদশ শতকের ফরাসি বুদ্ধিজীবী ত্রয়ী মন্তেস্ক্যু, ভলতেয়ার ও রুশোর অন্যতম। তিনি উদারনৈতিক মতবাদের প্রবক্তা হিসাবে একদিকে নিউটন অপরদিকে জন লকের অনুগামী ছিলেন। তাঁর আলোচনার পদ্ধতি ছিল, বিশ্লেষণধর্মী, সেইরূপ জ্ঞানগর্ভ ও মৌলিক। পারস্যের পত্রমালা (১৭২১) Persian Letters নামক গ্রন্থে তিনি পরিহাস ছলে ফরাসি রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সূক্ষ্ম কটাক্ষপাত করেছিলেন। তবে তাঁর অমরগ্রন্থ 'আইনের মর্মকথা' (The Spirit of Laws) অষ্টাদশ শতকের ফরাসি চিন্তা আলোড়নের একটি ফসল। এই গ্রন্থে তিনি ফরাসি জাতির সম্মুখে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ও প্রজার ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক অধিকারের নতুন আদর্শ উপস্থাপিত করেছিলেন। রাষ্ট্র ক্ষমতার পৃথকীকরণের নীতি ফরাসি বিপ্লবের সময় সাংবিধানিক রাজতন্ত্র সংক্রান্ত তর্ক বিতর্ককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। মন্তেস্ক্যুর উদারনৈতিক মতবাদ পরবর্তী রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করলেও বিপ্লব ছিল তার কল্পনার ঊর্ধ্বে। বিশেষ অধিকার-এর বিরুদ্ধে তাঁকে তেমন কিছু বলতে শোনা যায়নি। চার্চের নিরংকুশ অধিকারের বিপক্ষে তিনি কোনো সমালোচনা করেননি। এমনকি অভিজাত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সপক্ষে তিনি যুক্তি খাড়া করেন, তাঁর মতেও এ ক্ষমতা রাজার স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা খর্ব করার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে।

ভলতেয়ার (১৬৪৪-১৭৭৮) : উদারনৈতিক রাজনৈতিক মতবাদের একজন পুরোধা। নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ঐতিহাসিক প্রভৃতি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ভলতেয়ার সনাতনী ব্যবস্থার কঠোর সমালোচক ছিলেন। বিশেষ করে

অভিজাত ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরাও বিপ্লব সমর্থন করেননি। বরং তাঁদের ভাবধারা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী শাসকদের সমর্থন করতে তারা সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। দ্বিতীয়ত, দার্শনিকদের চিন্তাধারা বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী কৃষক ও শহরের দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণির প্রায় অজ্ঞাত ছিল। তৃতীয়ত, অভিজাত শ্রেণি উচ্চ রাজকর্মচারী আইনজীবী ব্যবসায়ী শ্রেণি প্রধানত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর রচনা পাঠ করতে। তথাপি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে বুদ্ধিজীবীদের একটা সক্রিয় ভূমিকা ছিল কেন না তারাই অনুপ্রাণিত করেছেন একদল বিপ্লবী নেতাকে, উদ্বুদ্ধ করেছেন এদের বিপ্লবের পথে, সঞ্চার করেছেন এদের মধ্যে কিছু চরম নীতি ও উগ্র আদর্শ। কেটলবী যথার্থই বলেচেন, ''সংসদ বিহীন ফ্রান্সে এসব দার্শনিকবৃন্দই সর্বোচ্চ নেতা।'' বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটাননি। কিন্তু তাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই বুর্জোয়া শ্রেণি অভিজাতদের বিরুদ্ধে তাদের প্রভাব কার্যকরী করতে উৎসাহী হয়েছিল। সর্বোপরি নিরক্ষরতা ও কঠোর নিয়ন্তা সত্ত্বেও বিভিন্ন থিয়েটার, রঙ্গালয়, লোকসংগীত প্রচারপত্র ও পত্র পত্রিকার মাধ্যমে ফরাসি জনগণকে উদ্দীপ্ত করেছিল।

১৯ জানুয়ারি ১৭১৭ খ্রিঃ হেঁরেজারেস নাম্নী নটী এক রমণী পেশাদার ভিখারিণীর মতো জীর্ণ ছিন্ন পোশাক পরে নৃত্যের মাধ্যমে দেশব্যাপী দৈন্য অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও বিপর্যয়ের চিত্র তুলে ধরেন। অষ্টাদশ শতকের পান্থশালা ও কাফেগুলিও জনগণের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আলাপ আলোচনার ক্ষেত্র হিসাবে জাতির বৈপ্লবিক উন্মেষের সাহায্য করেছিল। ফরাসি সাঁলোর পৃষ্ঠপোষক রূপে মাদান দ্যুফাঁ, দেপিনে, সুশ্যান প্রভৃতি বহু মনীষীর আপ্যায়নের মাধ্যমে রুশোর নূতন ভাবধারা প্রচারে সাহায্য করেছিল। সেইজন্য বলা যেতে পারে মার্কস ছাড়া লেনিনকে কল্পনা করা যেমন অর্থহীন রুশোকে বাদ দিয়ে রোবসপীয়রের কথা তথা ফরাসি বিপ্লবের আলোচনা করা সম্ভব নয়।

১.৩ সারাংশ

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আলেকসি দ্য তকভিল ফরাসি বিপ্লবকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন ও সার্বজনীন উদারনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা বলে মন্তব্য করেছেন। ষোড়শ শতকের ডাচ বিপ্লব ও সপ্তদশ শতকের ইংরেজ বিপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লবের জয়যাত্রাকে এগিয়ে দিলেও অষ্টাদশ শতকের ফরাসি বিপ্লব আধুনিক বুর্জোয়া বিপ্লবের যুগান্তকারী পরিবর্তনের প্রতীক।

এই বিপ্লবের পূর্বে, ফরাসি সমাজ তিনটি এস্টেটে বিভক্ত ছিল—যাজকদের বলা হত প্রথম এস্টেট। অভিজাতদের দ্বিতীয় এস্টেট এবং বাদবাকি জনসাধারণকে তৃতীয় এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত করা হত। ফরাসি সমাজে যাজক ও অভিজাত শ্রেণি ছিল সুবিধাভোগী শ্রেণি। অপরদিকে তৃতীয় এস্টেট ছিল ফ্রান্সের জনসাধারণের অন্যান্য শ্রেণি যারা সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত মানুষ। মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিক (সাঁকুলোৎ) শ্রেণি তৃতীয় এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত হলেও, আলোকপ্রাপ্ত ও উদ্যোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণি ফরাসি সমাজে অপরিসীম গুরুত্ব অর্জন করে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে এরাই স্বাভাবিকভাবে তৃতীয় এস্টেটের নেতৃত্ব দেয়। ফরাসি বিপ্লবের প্রথম পর্বে (১৭৮৯-৯৫ খ্রিঃ) প্রধানত বুর্জোয়াদের স্বার্থেই বিপ্লব চালিত হয়েছিল।

পুরাতন ব্যবস্থায় সমানুপাতিক কর বণ্টনের ব্যবস্থা ছিল না। প্রত্যক্ষ কর ক্যাপিতাসিঁও ও ভ্যাঁতিয়েম স্থাবর সম্পত্তির উপর কর। অভিজাত ও যাজক শ্রেণি তাদের প্রভাব খাটিয়ে বহু ক্ষেত্রেই কর ফাঁকি দিত। অপর দিকে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণি কোনোভাবেই প্রত্যক্ষ করের হাত থেকে রেহাই পেত না। এছাড়া পরোক্ষ কর—লবণ কর। আবগারি কর, নগর ও আন্তঃ প্রাদেশিক শুল্ক ছিল অযৌক্তিক ও জবরদস্তিমূলক। ডাকটিকিট, যানবাহন ও উত্তরাধিকার স্বত্বের উপরও কর আদায় করা হত ইজারাদারের মাধ্যমে। ফলে কর ব্যবস্থার শ্রেণিগত বৈষম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় সাম্রাজ্যবাদী নীতির রূপায়ণের জন্য রাজা চতুর্দশ লুইয়ের আমল থেকে।

যাজক শ্রেণির বিরুদ্ধে তীব্র শানিত সমালোচনা সমগ্র ইউরোপে তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ভলতেয়ারের চিন্তাধারার সবচেয়ে বড়ো লক্ষবস্তু ছিল গোঁড়া ধর্মযাজক শ্রেণি, যাদেরকে তিনি মনে করতেন ভণ্ড ও প্রতারক, যাদের সমস্ত বাণী ছিল মিথ্যা বেসাতিমাত্র। তাঁর মতে সব ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ মানুষেরই সৃষ্টি। তিনি সর্বসাধারণের প্রচলিত খ্রিস্টান ধর্মকে আঘাত করে এবং সার্ফ প্রথা ও সামন্ততান্ত্রিক বিশেষ অধিকারের বিরোধিতা করেন। তিনি গণতন্ত্রী না হলেও অন্তত প্রজাহিতৈষী রাজতন্ত্রের জয়গান উচ্চারিত করতেন।

জ্যাঁ জাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) : ফরাসি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর মধ্যমণি রুশো ছিলেন একজন প্রকৃত বিপ্লবী যাঁর আত্মচরিত ও সামাজিক চুক্তি' সম্পর্কিত গ্রন্থ বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছিল। ফরাসি বিপ্লবের চরমপন্থী মতাদর্শের প্রবক্তা জ্যাকোবিন দলের নিকট রুশোর সামাজিক চুক্তি ছিল এক পরম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। অন্যান্য বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর আবেদন যেখানে শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে সীমায়িত ছিল, সেখানে রুশোর আবেদন ছিল জনসাধারণের কাছে। তিনি এমন এক গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রবক্তা, যে গণতন্ত্রের মাধ্যমে জনগণের সত্যকার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। রুশোর মতবাদের মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের মধ্যে সাম্যের বিধান করা, মানুষের স্বাধীন সত্তা জিইয়ে রাখা। এককথায় রুশোর মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির মূল আধার হল জনগণের সমষ্টিগত ইচ্ছা। অর্থাৎ সমষ্টিগত ইচ্ছাই হল রাষ্ট্রের প্রধান এবং শেষ বিচার আদালত।

ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসে রুশোর প্রভাব ছিল সর্বব্যাপী। বিপ্লবের ত্রয়ী নীতি সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা রুশোর চিন্তাধারা থেকে নেওয়া। ১৭৯৩-৯৪ সালে জ্যাকোবিন দল রুশোর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এই জন্যই বলা হয় রুশো শৃঙ্খল মুক্ত করেছেন অগণিত ভাবপ্রবণ ব্যাঘ্র" অন্যদিকে ভলতেয়ার মাত্র ''সজ্জিত করেছেন যুক্তিপ্রবণ অশ্ব" অর্থাৎ বিপ্লবীদের মধ্যে রুশো সৃষ্টি করেছিলেন অসাধারণ প্রাণচাঞ্চল্য এবং সংস্কারকদের জন্য ভলতেয়ার যুগিয়েছেন যুক্তি ও জ্ঞানউন্মেষ জনিত চেতনা। সমকালীন ফরাসি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর মধ্যে মহাকোষ (Encyclopaedia) সংকলক দিদেরো এবং দ্য এলেমবার্ট ২৮ খণ্ডে জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল তথ্য যুক্তির নিরিখে সংকলন করেছিলেন। ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে ফিজিওক্র্যাট নামে এক অর্থনীতিবিদ গোষ্ঠী শিল্প ও বাণিজ্যে তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই গোষ্ঠীর প্রধান প্রবক্তা ছিলেন কুয়েসনে (১৬৯৪-১৭৭৪ খ্রিঃ)। ফিজিওক্র্যাট গোষ্ঠীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আর্থিক অভিমত হল—কৃষিকার্য ও ব্যাবসা বাণিজ্য রাষ্ট্রের সকল নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে অর্থনৈতিক বিধি ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে হবে।

দার্শনিকরা চিত্রিত করে যান এক কল্পনার সুখজগৎ। আর ফিজিওক্র্যাট দল খুঁটিয়ে বলে দেন বাস্তব জগতে কি করা যাবে এবং কি করা উচিত। বস্তুত, বিপ্লব কালের সব স্থায়ী পরিবর্তনের মূলে ছিল ফিজিওক্র্যাটদের প্রস্তাবিত নীতি ও মতবাদ। প্রাক্ বিপ্লবী চিন্তাধারার মধ্যে বিপ্লবের পথে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রভাবও উল্লেখ করা যায়। এদের মধ্যে আবেমাবলী (১৭০৯-১৭৮৫), মরেলী, জ্যাঁ মেসলিয়ে (১৬৬৪-১৭৩৩) সাম্যবাদী আদর্শের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। মেসলিয়ে মানবজাতির মুক্তিকল্পে জনগণকে উৎপীড়ক শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার আবেদন করেছিলেন। মরেলী সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ ও আর্থসামাজিক পুনর্গঠনের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তুলে ধরেছিলেন। মাবলী প্রাকৃতিক সাম্যের আদর্শে রাজনৈতিক, আইনগত ও অর্থনৈতিক সাম্যের যে আলোচনা করেছিলেন তা ব্যবুফের সাম্যবাদের পথ প্রদর্শক রূপে চিহ্নিত করা যায়।

ফরাসি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী প্রাক্ বিপ্লবী ব্যবস্থাকে তাদের কঠোর সমালোচনার মাধ্যমে ধ্বংস করলেও বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবে তারা এই ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন সৌধ রচনা করতে ব্যর্থ হন। ১৭৮৯ খ্রিঃ যে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার সঙ্গে দার্শনিকদের ভাবধারার যোগসূত্র কিছুটা ক্ষীণ ও পরোক্ষ। অনির্দিষ্টভাবে পরিবর্তনের পক্ষপাতী হলেও রুশো ব্যতীত

প্রাক্ বিপ্লবী ফরাসি রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারী ঐতিহ্য ছাড়াও প্রশাসন ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা প্রতিফলিত হয়েছে — আমলাতন্ত্র, শুল্ক ব্যবস্থা, মুদ্রা ব্যবস্থা এবং ওজন মাপার অভাবনীয় বৈচিত্রে। প্রাক-বিপ্লবী ফরাসী প্রশাসনের আর—এক উল্লেখযোগ্য দিক হল সর্বজনীন আইনবিধির অভাব। বিচার ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত জটিল ও দণ্ডবিধি ছিল অমানুষিক। চতুর্দশ লুই ও পঞ্চদশ লুইয়ের আমলে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা ছিল দুর্নীতিপরায়ণ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে ষোড়শ লুইয়ের রাজত্বকালে তুর্গো, ক্যালোন ব্রিঁয়া নেকার প্রভৃতি প্রশাসন সংস্কার রূপায়ণে ব্যর্থতা ফরাসি বিপ্লবের পথ সুগম করে।

পুরাতন ব্যবস্থার অধীনে ফ্রান্সের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থার জটিলতা ও অন্তঃসারশূন্যতা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপর্বে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তবে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী জনসাধারণের সামনে এক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি তুলে ধরে যা বিপ্লবে পরিণতি লাভ করে।

ব্যারোঁ দ্য মন্তেস্কুই-র (১৬৮৯-১৭৫৫) অমর গ্রন্থ আইনের মর্মকথা সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ও প্রজার ন্যায়—সঙ্গত রাজনৈতিক অধিকারের নতুন আদর্শ উপস্থাপিত করে। অভিজাত শ্রেণির বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও চার্চের নিরঙ্কুশ অধিকারের বিরুদ্ধে তিনি কোনো সমালোচনা করেননি।

ভলতেয়ার (১৬৪৪-১৭৭৮) সনাতনী ব্যবস্থার কঠোর সমালোচক ছিলেন। বিশেষত অভিজাত ও যাজক শ্রেণির বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র সমালোচনা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল।

জ্যা জাক রুশোর (১৭১২-১৭৭৮) মতবাদের মূল লক্ষ্য মানুষের মধ্যে সাম্যের বিধান করা ও মানুষের স্বাধীন সত্তা জিইয়ে রাখা।

মহাকোষ সংকলন ডেনিস দিদেরো, দ্য এলেমবার্ট ও ফিজিওক্র্যাট গোষ্ঠী মারলী, মরেলী ও মেসলিয়ে সনাতনী ব্যবস্থার বিভিন্নভাবে সমালোচনা করেন। বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী বিপ্লব না ঘটালেও, তাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই বুর্জোয়া শ্রেণি জনগণকে উদ্দীপ্ত করেছিল।

একক ২ □ ফরাসি বিপ্লব : ঘটনা পরম্পরা (১৭৮৯-৯৯)

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য
২.১ প্রস্তাবনা
২.২ ফরাসি বিপ্লব : ঘটনা পরম্পরা
২.৩ ফরাসি বিপ্লবের প্রস্তুতি : অভিজাত বিদ্রোহ (১৭৮৭-৮৯)
২.৪ বুর্জোয়া বিপ্লব (মে-জুন ১৭৮৯)
২.৫ জনগণের বিপ্লব (জুলাই-অক্টোবর ৮৯)
২.৬ সংবিধান সভার কার্যাবলী (আগস্ট ১৭৮৯—সেপ্টেম্বর ১৭৯১)
২.৭ রাজতন্ত্রের পতন—(আইনসভা ১ অক্টোবর ১৭৯১—২০ সেপ্টেম্বর ১৭৯২)
২.৮ বিপ্লব ও যুদ্ধ
২.৯ জাতীয় কনভেনশন : সন্ত্রাসের রাজত্ব ১৭৯২-১৭৯৫
২.১০ সন্ত্রাসের শাসন পটভূমি ও তাৎপর্য
২.১১ সন্ত্রাস শাসনের ইতিবাচক ভূমিকা
২.১২ সারাংশ
২.১৩ অনুশীলনী
২.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককে বিপ্লবী দশকের ঘটনাপ্রবাহকে—অভিজাত বিদ্রোহ (১৭৮৭-৮৮), বুর্জোয়া বিপ্লব (১৭৮৯), জনগণের বিপ্লব (১৭৮৯), সংবিধান সভা (১৭৮৯-৯১), রাজতন্ত্রের পতন (১৭৯২), ইউরোপীয় যুদ্ধ ও বিপ্লবের প্রসার (১৭৯২-৯৩), জাতীয় কনভেনশন ও সন্ত্রাসের শাসন (১৭৯২-৯৪), ডাইরেকটারি শাসন (১৭৯৫-৯৯) পর পর তুলে ধরা হয়েছে।

২.১ প্রস্তাবনা

ফরাসি বিপ্লবের মতো যুগান্তকারী ঘটনার সূচনা ও সমাপ্তি সম্পর্কে বিতর্কের অন্ত নেই। ফরাসি রাজ ষোড়শ লুইয়ের স্টেটস জেনারেল আহ্বানে (৫মে, ১৭৮৯খ্রিঃ) ফরাসি বিপ্লবের সূচনা। বিপ্লবের সমাপ্তি সম্পর্কে কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন নেপোলিয়নের উত্থান (১৭৯৯); আবার অনেকে মনে করেন ১৮১৫ সালে নেপোলিয়নের পতনে। কারণ তাঁর রাজত্বকালে সমগ্র ইউরোপে বিপ্লবের সম্প্রসারণ ঘটে।

অধ্যাপক রুদে অভিজাত বিদ্রোহকে 'বিপ্লব' না বলে বিপ্লবের পূর্বাভাস বলে মনে করেন। অভিজাত শ্রেণি পুরাতন ব্যবস্থার কোনো মৌলিক পরিবর্তন চায়নি। বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ— তৃতীয় এস্টেটের সদস্যরা ১৭৮৯-এর ১৭ জুন

এস্টেট জেনারেলকে জাতীয় সভা (National Assembly) বলে ঘোষণা করল। বাস্তিল কারাদুর্গের পতনকে কেন্দ্র করে ১৭৮৯-র ১৪ জুলাই যে স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান ঘটে তাকে গণবিপ্লবের প্রতীক বলা যায়। মানবাধিকার ঘোষণাপত্র (১৭৮৯, ২৬ আগস্ট) ''পুরাতন ব্যবস্থার মৃত্যু দলিল''।

পুরাতন ব্যবস্থার অবসানের জন্য জাতীয় সভা যে শপথ নিয়েছিল তার ফলশ্রুতি সংবিধান সভা। সংবিধান সভার কার্যাবলীর মধ্যে বুর্জোয়া শ্রেণিসুলভ স্বার্থরক্ষার কর্মসূচি উনিশ শতকের সমগ্র ফরাসি রাজনৈতিক ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত হয়। আইন সভা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে (১৭৯২, ২০ এপ্রিল) যুদ্ধ ঘোষণা করলে বিপ্লব ও ইউরোপীয় যুদ্ধ সমান্তরাল গতিতে চলতে থাকে। অবশেষে ১৭৯২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর রাজতন্ত্রের পতন হয়।

জাতীয় কনভেনশন ফ্রান্সকে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করে (১৭৯২ খ্রিঃ)। ১৭৯৩ খ্রিঃ সদ্যোজাত ফরাসি সাধারণতন্ত্রের এক চরম সংকট মুহূর্তে ফ্রান্সের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে এক বিশাল ইউরোপীয় শক্তিজোটের মোকাবিলার জন্য এক জরুরি ব্যবস্থা হিসাবে জননিরাপত্তা পরিষদ নিরঙ্কুশ স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা গ্রহণ করে। কনভেনশনের প্রথম পর্যায়ে জিরন্ডিষ্ট গোষ্ঠীর প্রাধান্য থাকলেও, ১৭৯৩-৯৪ সালে জ্যাকবিন দল প্যারিসের বিপ্লবী জনতার সঙ্গে যৌথ নেতৃত্ব স্থাপন, সন্ত্রাস শাসনের মূল ভিত্তি। সন্ত্রাসের শাসন কারও কাছে জ্যাকবিন বিপ্লবী আদর্শের উদ্দীপনাময় স্ফুরণ। আবার কারও কাছে ''ঘৃণ্য বিভীষিকা'' যখন অকারণে রক্তের সমুদ্র বয়ে গিয়েছিল।

থার্মিডর অভ্যুত্থানে (১৭৯৪, ৩১ আগস্ট) মধ্যবিত্ত শ্রেণির সঙ্গে প্যারিসের বিপ্লবী জনতার ক্ষণস্থায়ী রাজনৈতিক বোঝাপড়ার অবসান হয় ও ধনী মধ্যবিত্ত শ্রেণি আবার ক্ষমতা দখল করে। ডিরেকটারি শাসন (১৭৯৫-৯৯) একদিকে সন্ত্রাস শাসনের ভয়াবহতা ও অপরদিকে নেপোলিয়নের চমকপ্রদ উত্থানের মধ্যবর্তী পাঁচ বছরের ইতিহাস কিছুটা অবহেলিত বস্তুত বিপ্লবের গতি ফ্রান্সে মন্দীভূত হলেও ডিরেকটারি শাসন ক্রমশ ক্রমশ ইউরোপীয় বিপ্লবের সূচনা করেছিল।

২.২ ফরাসী বিপ্লব : ঘটনা পরম্পরা (১৭৮৯-৯৯)

ফরাসি বিপ্লবের সূচনা সাধারণভাবে বলা হয় ১৭৮৯ সালের ৫ মে, স্টেটস জেনারেল অধিবেশন আহ্বান। কিন্তু এই বিপ্লবের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক আছে। কারো মতে, রোবসপিয়ারের মৃত্যু বা নেপোলিয়নের উত্থানে বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটেছিল। আবার অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, নেপোলিয়নের উত্থান বিপ্লবের সমাপ্তি নয়। ইউরোপে বিপ্লবের সম্প্রসারণ। তবে ফরাসি বিপ্লবের মতো যুগান্তকারী ঘটনার কখন শুরু আর কখন শেষ সে সম্পর্কে তর্কবিতর্ক অর্থহীন। কারণ ১৭৮৯ সালে যে বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল তার জের চলেছিল ১৮৩০ ও ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে। তবে প্রধানত ১৭৮৯ থেকে ১৮১৫ পর্যন্ত বৈপ্লবিক আন্দোলনকেই ফরাসি বিপ্লব অভীধায় চিহ্নিত করা হয়। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসনের মতে, চারটি নাটকীয় শব্দের মাধ্যমে এই সময়ের ঘটনাবলীকে বিধৃত করা যেতে পারে যথা — বিপ্লব, যুদ্ধ, একনায়কতন্ত্র ও সাম্রাজ্য। আমরা এই অধ্যায়ে ১৭৮৯-১৭৯৯ সাল পর্যন্ত সময়ের ঘটনাবলীকে উপস্থাপনা করব।

২.৩ ফরাসী বিপ্লবের প্রস্তুতি : অভিজাত বিদ্রোহ (১৭৮৭-৮৯)

১৮৮৭ সালে শেষ দিকে ফ্রান্সে পর্যটনরত আর্থার ইয়ং মন্তব্য করেছিলেন যে, ফ্রান্স এক বিপ্লবের মুখে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সেই বিপ্লব কিরূপ নেবে তা তিনি বুঝতে পারেননি। শ্যাতোব্রিয়াঁ (Chateaubriand) পরে লিখেছিলেন—প্যাট্রিসিয়ানরা

যে বিপ্লব আরম্ভ করে, প্লিবিয়ানদের দ্বারা তা সম্পূর্ণ হয়। আধুনিক ঐতিহাসিক লেফেভর বলেছেন, ফরাসি বিপ্লবের সূচনা ও প্রথম পর্বে অভিজাত শ্রেণি নেতৃত্ব দিয়েছিল। রাজতন্ত্রের সঙ্গে অভিজাতবর্গের বিরোধ অবশ্য নতুন নয়। ফরাসি রাজ চতুর্দশ লুইয়ের মৃত্যুর পর থেকে অভিজাত শ্রেণি সরকারি কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করত ও সরকারের যে সব প্রশাসনিক ব্যবস্থা মনঃপূত হত না তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাত। সপ্তবর্ষের যুদ্ধের পর পঞ্চদশ লুইয়ের রাজত্বকালে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য যে প্রশাসনিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল তার চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসাবে ষোড়শ লুইয়ের রাজত্বকালে নেকার (Neeker), ক্যালোন (Calonne) ও পরে ব্রিয়াঁ (Brienne) অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচিকে যেভাবে রূপায়ণের চেষ্টা করেছিলেন তাকে বৈপ্লবিক আখ্যা দিলে নিতান্ত ভুল হয় না। ১৭৮৭-১৭৮৮ সালে রাজতন্ত্র ও অভিজাত গোষ্ঠীর মাধ্যমে তিক্ত সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল। তার প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন ফরাসি রাজস্বমন্ত্রী ক্যালোন যিনি ফ্রান্সের ক্রমবর্ধমান আর্থিক সংকট মোকাবিলা করার জন্য এক দূর প্রসারী অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি রূপায়িত করতে সচেষ্ট হন। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাক বিপ্লবী ফরাসি প্রশাসন ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতির স্থায়ী সমাধানের জন্য অভিজাত গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক সুযোগ সুবিধার অবসান ও দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য আঞ্চলিক শুল্কের বাধা দূর করে আমদানি রফতানি বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা তথা অভ্যন্তরীণ শিল্প গড়ে তোলবার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। শুধু বাণিজ্য শিল্পের স্বয়ম্ভরতা নয়, কৃষক শ্রেণির দুর্গতি মোচনের জন্য তিনি কৃষকদের উপর অত্যাচার মূলক তিনটি প্রধান কর—লবণকর, বেগারখাটা এবং বিশেষ করে সরকার আরোপিত প্রধান কর তেই (Taille) সংশোধন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। প্রত্যক্ষ কর 'তেই'-এর একদশমাংশ হ্রাস করে লবণ কর ও বেগারখাটা সম্পূর্ণ রদ করে তিনি কৃষক শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তবে তাঁর প্রধান অর্থনৈতিক কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল অভিজাত গোষ্ঠীর বিশেষ সুযোগ সুবিধা হ্রাস করা। অবশ্য তিনি অভিজাত শ্রেণির ব্যক্তিগত মাথাপিছু কর অথবা বেগারখাটা এবং ধর্ম সংক্রান্ত করের (Tithe) আওতা থেকে অভিজাত শ্রেণিকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন।

ক্যালোনের অর্থনৈতিক কর্মসূচির প্রতি জনসাধারণের সমর্থন আদায়ের জন্য ষোড়শ লুই ১৭৮৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি ভার্সাই নগরীতে দেশের বিশিষ্ট প্রতিনিধিবর্গের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে আহূত ১৪৪ জন সদস্যের মধ্যে ১১৪ জন ছিলেন অভিজাত উচ্চ রাজকর্মচারী ও ধর্মযাজক ও মাত্র ৩০ জন ছিলেন তৃতীয় এস্টেট-এর প্রতিনিধি। ক্যালোনের প্রস্তাবিত সংস্কার কর্মসূচির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রাজতন্ত্রের ক্ষমতাবৃদ্ধি, পুরাতন ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করা ও ফরাসি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান ঘাটতি দূর করা।

লুই-এর অর্থনৈতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে অভিজাত শ্রেণি বুঝতে পেরেছিল যে ক্যালোনের রাজস্ব সংক্রান্ত আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা তাদের দীর্ঘদিনের আর্থ-সামাজিক সুযোগ সুবিধাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করবে।

ক্যালোনের উত্তরাধিকারী অর্থমন্ত্রী ব্রিয়াঁ ক্যালোনের প্রস্তাবিত সংস্কার সূচিকে ১৭৮৭, ৯ মে আংশিক সংশোধন করে প্রতিনিধি সভায় পুনরায় পেশ করেন। কিন্তু প্রতিনিধি সভা নির্দেশ দেয় যে প্রস্তাবিত সংস্কার যেহেতু দীর্ঘদিনের স্বীকৃত অভিজাত যাজক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক বিশেষ সুযোগ সুবিধাকে খণ্ডিত করতে উদ্যোগী হয়েছে। সেজন্য ফ্রান্সের প্রধান বিচারালয় প্যারিসের পার্লেমেন্ট অথবা সমগ্র ফ্রান্সের এস্টেট জেনারেলের অনুমোদন একান্ত কাম্য। ষোড়শ লুই ব্রিয়াঁর পরামর্শে ২৫মে, ১৭৮৭ সালে বিশিষ্ট অভিজাতবর্গের মহাসম্মেলন স্থগিত রাখেন যার মূল তাৎপর্য হল— ষোড়শ লুই অভিজাত শ্রেণির সমর্থন পুষ্ট প্যারিসের পার্লেমেন্টের অনুমোদন ছাড়া প্রস্তাবিত সংস্কার কর্মসূচী রূপায়ণে ব্যর্থ হলেন। অভিজাত শ্রেণির মদতপুষ্ট প্যারিস পার্লেমেন্ট (২৮ জুন, ১৭৮৭) ঘোষণা করল যে, এস্টেট জেনারেলের অনুমোদন ছাড়া নতুন কর প্রবর্তনের কর্মসূচি রূপায়ণ করা আইনসিদ্ধ নয়। অর্থমন্ত্রী ব্রিয়াঁর পরামর্শে রাজা ষোড়শ লুই

বিশেষ জরুরি ক্ষমতা প্রয়োগ করে (Lit-De-Justice) প্রস্তাবিত কর্মসূচিকে আইনসিদ্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্যারিসের পার্লেমেন্ট তাদের সেই প্রস্তাবকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে। ক্রুদ্ধ ষোড়শ লুইয়ের সরকার তখন ১৫ আগস্ট পার্লেমেন্টকে প্যারিস মহানগরী থেকে উত্তর ফ্রান্সের ত্রোয়া শহরে (Troyes) নির্বাসিত করে। কিন্তু প্রাদেশিক বিচারালয়গুলি প্যারিসের পার্লেমেন্টকে সমর্থন করল, বিশেষ করে বোর্দো, তুলোঁ প্রভৃতি প্রাদেশিক পার্লেমেন্টগুলি এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে এবং ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজাত শ্রেণির শক্তিপুষ্ট প্রতিনিধি সভাগুলি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে আঞ্চলিকতাকে নানাভাবে মদত যুগিয়েছিল। ১৭৮৮ মে-জুন মাসে ডাফনী প্রদেশে পার্লামেন্টকে কেন্দ্র করে অভ্যুত্থান ঘটে যদিও এই প্রাদেশিক অভ্যুত্থানগুলিতে রক্তাক্ত ঘটনার পরিচয় খুব ব্যাপক রূপ লাভ করেনি। কিন্তু এই সকল অঞ্চলে কেন্দ্রীয় প্রশাসন বিপর্যস্ত হয়েছিল। এদিকে ব্রিয়াঁর পদে স্থলাভিষিক্ত হলেন নতুন অর্থমন্ত্রী নেকার। সমগ্র দেশের রাজনৈতিক বিক্ষোভ, প্রশাসনের বিপর্যয় তথা আর্থিক সংকটকে মোকাবিলা করার জন্য নেকার শেষ পর্যন্ত ৫ জুলাই ১৭৮৮ সালে এস্টেট জেনারেল আহ্বান করতে বাধ্য হন। এবং ১৭৮৯ সালে ১ মে ভার্সাই শহরে এর প্রথম অধিবেশন আহূত হয়।

১৭৮৭-৮৮ খ্রিঃ অভিজাত শ্রেণির কাছে রাজার এই পরাজয়কে লেফেভার বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক রুদে এই ঘটনাকে 'বিপ্লব' না বলে বিদ্রোহ অর্থাৎ বিপ্লবের পূর্বাভাস বলে মনে করেন। কারণ বিপ্লব কথাটির মধ্যে পুরাতন ব্যবস্থার যে মৌলিক পরিবর্তন বোঝায় অভিজাতদের বিরোধিতার মধ্যে সেই ধরনের কোনো ব্যাপক পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া না। তারা পুরাতন ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন চায়নি। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল রক্ষণশীল। তাদের গোষ্ঠীস্বার্থ ও বিশেষ সুযোগ সুবিধা বজায় রাখার জন্যই সংগ্রাম করেছিল। সংকীর্ণ শ্রেণিস্বার্থ রক্ষা মূল উদ্দেশ্য হলেও তারা তাদের সংগ্রামকে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হিসাবে দার্শনিক রুশোর গ্রন্থ ও আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের বিজয়কে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমন্বিত করে এক বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণায় মহিমান্বিত করেছিল।

২.৪ বুর্জোয়া বিপ্লব (মে-জুন ১৭৮৯)

১৭৮৯ সালের ৫মে আহূত এস্টেটস জেনারেল-এর মোট সদস্য ছিল ১২১৪ জন তার মধ্যে তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ৬১২ জন। মধ্যবিত্ত প্রতিনিধিদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলেই এবং সভা পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিক রীতি অনুসরণের ফলে এস্টেট জেনারেল প্রতিনিধি সভায় রূপান্তরতি হয়। অধিবেশন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় এস্টেট-এর বিপ্লবী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, ১৬১৪ সালের পর ১৭৫ বছর বাদে ১৭৮৯ সালে অধিবেশনের সূচনা হয়। প্রচলিত প্রথা ও বৈষম্যমূলক আদব-কায়দা বিশেষ করে পোশাক-আশাক সম্পর্কে পুরানো রীতির বিরুদ্ধে তৃতীয় এস্টেট প্রতিবাদ জানায়। ইতিমধ্যে জনগণের কাছ থেকে অভিযোগ পত্র (Cahier) আহ্বান করা হয়। যাজক ও অভিজাত শ্রেণি তাদের চিরাচরিত বিশেষ সুযোগ সুবিধা সংরক্ষণ দাবি করলেও তারা নীতিগতভাবে কর ব্যবস্থার বৈষম্য বিলোপ, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের ভূমিকা, বিশেষত মন্ত্রীদের যথেচ্ছাচার ও অভ্যন্তরীণ শুল্ক ব্যবস্থার বৈষম্যের বিরোধিতা করেছিল। তবে তৃতীয় এস্টেটের অভিযোগ পত্রে দাবি দাওয়া ছিল অনেক বেশি ব্যাপক। তারা বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ব্যাবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা, স্বৈরতন্ত্রের অপব্যবহার ছাড়াও সাম্যের আদর্শ তুলে ধরেছিল। তারা অভিজাত শ্রেণির বিশেষ সুযোগ-সুবিধার এবং সামন্ততান্ত্রিক অন্যায় ও অযৌক্তিক অধিকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। অবশ্য এদের অভিযোগ পত্রে কৃষকদের জমির উপর অধিকার সম্পর্কে কোনো দাবি করা হয়নি। শহরের দুঃস্থ সাঁকুলোৎ শ্রেণির অভাব-অভিযোগের কথাও তুলে ধরা হয়নি। তবে তা সত্ত্বেও পুরাতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক কর্মসূচি

রূপায়ণে তৃতীয় এস্টেটের সদস্যরা ১৭ জুন নিজেদের জাতীয় সভা (National Assembly) বলে ঘোষণা করল। এই ঘটনার তিনটি দূর প্রসারী তাৎপর্য লক্ষ করা যায়। প্রথমত, ফরাসি বিপ্লবের নেতৃত্ব মূলত তাদেরই হাতে, দ্বিতীয়ত, এই ঘোষণা প্রচলিত আইন রীতি বিরোধী, তৃতীয়ত এই ঘোষণার অর্থ হল রাজার স্বৈরাচারী ক্ষমতার বিকল্প হিসাবে জাতীয় সার্বভৌমিক ক্ষমতার দাবিদার হিসাবে জাতীয় সভার নজির বিহীন বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ। অবশ্য তারা অভিজাত শ্রেণি ও যাজক সম্প্রদায়ের কিছু উদারচেতা সদস্যদের সমর্থন আশা করেছিল যাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন, কঁদরসে (Condarcet), ট্যালির‍্যাঁ (Tallyraud), সিয়েস (Sieyes) ও মিরাব্যো (Mirabeau)। এই জাতীয় সভার প্রথম ও প্রধান কর্মসূচি বিপ্লবী ফ্রান্সের এক লিখিত সংবিধান রচনা যার জন্য এই সভা ফ্রান্সের ইতিহাসে সংবিধান সভা নামে পরিচিত হয়। পুরাতন ব্যবস্থায় পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই সভা যে নবযুগের সূচনা করেছিল তার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ২৬ আগস্ট ১৭৮৯ ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার সম্বলিত এক ঘোষণা পত্র রচিত হয়। সংবিধান সভা নিম্নলিখিত অধিকারগুলি ঘোষণা করেছিল। সাম্য-স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। মানবাধিকার—মুক্তি, সম্পত্তি, নিরাপত্তা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হচ্ছে মানবাধিকার। জনগণের সার্বভৌমত্ব— 'সব সার্বভৌম অধিকার মূলত জাতির হাতে ন্যস্ত।' আইনের প্রকৃতি — 'সমষ্টিগত ইচ্ছাই আইন'..... আইনের চোখে সকলেই সমান।' আইনের প্রাধান্য বিনা কারণে এবং আইনসিদ্ধ নিয়ম ব্যতিরেকে কাউকে দোষী সাব্যস্ত, আটক বা বন্দি করা যাবে না। ব্যক্তি মালিকানা অলঙ্ঘনীয় ও পবিত্র অধিকার।

এই মানব অধিকার ঘোষণা পত্রে সরকারি ক্ষমতা বিভাজন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা মৌলিক অধিকার বলে অঙ্গীকার করা হয়। ফরাসি ঐতিহাসিক অলাড় (Aulard) মন্তব্য করেছেন যে, এই ঘোষণাপত্র ফরাসি পুরাতন ব্যবস্থার মৃত্যু দলিল। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রুদে যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, মানব অধিকার সংক্রান্ত সার্বজনীন আদর্শের মহিমাকীর্তন করা হলেও ইহা মূলত বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণের দলিল।

২.৫ জনগণের বিপ্লব (জুলাই-অক্টোবর ১৭৮৯)

বুর্জোয়া শ্রেণির দাবি মেনে নিয়ে জাতীয় মহাসভা গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হলেও রাজা ও অভিজাত শ্রেণি পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে প্রস্তুত ছিলেন না। সমগ্র দেশ বিশেষ করে প্যারিসের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি—খাদ্য উৎপাদন হ্রাস, মূল্যবৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বেকারি ও সরকারের বৈষম্যমূলক কর নীতি ফ্রান্সের নিম্নবর্গীয় মানুষের মনে ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষের সঞ্চার করেছিল। এই সময় ১১ ষোড়শ লুই নেকারকে পদচ্যুত করেন এবং তাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেন। তিনি যে ইন্ধন যোগালেন তা ফরাসি বিপ্লবে জনগণের ক্ষোভকে এক নতুন মাত্রা দিল। তারা আশংকা করল এর ফলে জাতীয় সভা ভেঙে দেওয়া হতে পারে। ১২ জুলাই যখন তারা এই সংবাদ শুনল তখনই এক তীব্র গণবিস্ফোরণের আভাস পাওয়া গিয়েছিল। বিকেলের দিকে প্যারিসের বিপ্লবী জনতা সমবেত হয় প্যালেস রয়ালের উদ্যানে, এখানে কামিই দেমুল্যা (Camille desmoulins) জনতাকে সশস্ত্র হতে আহ্বান জানান। কিছুক্ষণের মধ্যে বিক্ষুব্ধ জনতা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ মিছিল বের করল। কিন্তু প্যারিসের সামরিক কমান্ডার বেঁজ্যাভাল (Besenvel) রাজধানী থেকে কিছু দূরে সৈন্যবাহিনীকে সমাবেশ করলেন। ফলে বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে প্যারিস নগরীর কর্তৃত্ব চলে গেল। সেই পটভূমিতে প্যারিসের বিক্ষুব্ধ জনতা বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করল। ঐতিহাসিক গুডউইনের মতে, বাস্তিল দুর্গের পতনকে অতিরঞ্জিত করে উনিশ শতকের ঐতিহাসিকরা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের প্রতীক হিসাবে যে বর্ণনা করে তা সঠিক না হলেও আক্রমণকারীদের মধ্যে নিকটবর্তী ফবার্গসেন্ট অ্যান্টনির খেটে খাওয়া কারিগর ছিল। বিপ্লবের

ইতিহাসে বাস্তিল দুর্গের পতন একটি স্মরণীয় ঘটনা যা বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে প্যারিসের জনগণের রাজনৈতিক বোঝাপড়া নিষ্পন্ন করেছিল। ১৪ জুলাই ছিল প্যারিসের জনগণের বিজয়ের প্রতীক যারা রাজনৈতিক আশা উদ্দীপনা বুর্জোয়া শ্রেণি নিয়ন্ত্রিত জাতীয় সভা অনেকটা অর্জন করেছিল। এক কথায় বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে তৃতীয় এস্টেটের অন্যান্য শরিকের জঙ্গী মনোভাব সংবিধান সভার পুনর্গঠনমূলক কর্মসূচিকে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

বিপ্লবের সূচনা থেকে ১৭৯১ সালের ২ এপ্রিল মিরাবোর-মৃত্যু পর্যন্ত ছিলেন ফরাসি বিপ্লবের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রবক্তা, বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ হিসাবে ২৩ জুন এস্টেটস জেনারেলের অধিবেশনকে জাতীয় মহাসভায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেরাবোর জীবনের সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি এই যে, তিনি না পেরেছিলেন তৃতীয় এস্টেটের পূর্ণ আনুগত্য অর্জন করতে, না পেরেছিলেন রাজতন্ত্রে আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে। সংবিধান সভায় রাজতন্ত্রের স্বার্থ সংরক্ষণের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রাজতন্ত্রকে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। মৃত্যুর আগে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ফরাসি বিপ্লবের বিস্ফোরক উত্তেজনার প্রেক্ষিতে সাময়িকভাবে ষোড়শ লুইকে সংযত করলেও উগ্র বামপন্থী দাবি দাওয়ার ফলে আদর্শগত সংঘাত সম্পূর্ণভাবে এড়ানো সম্ভব ছিল না। এই সংঘাতের ফলে ইউরোপীয় যুদ্ধ শুরু হয় ও রাজতন্ত্রের অনিবার্য পতনকে ত্বরান্বিত করে এবং ফ্রান্সের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

২.৬ সংবিধান সভার কার্যাবলী (আগস্ট ১৭৮৯—সেপ্টেম্বর ১৭৯১)

পুরাতন ব্যবস্থার অবসান ও তার বিকল্প হিসাবে নতুন সংবিধান রচনার যে প্রতিজ্ঞা ও শপথ ১৭৮৯ সালে জুন মাসে টেনিস খেলার মাঠে তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধিরা করেছিলেন তার রূপায়ণ সম্ভব হয় ৩০ সেপ্টেম্বর ১৭৯১। সংবিধান সভার কার্যাবলীর বিশ্লেষণের পূর্বে এই সভার গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার। প্রথমত, সংবিধান সভার সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি—পেশায় আইনজীবী, ব্যবসায়ী ও প্রাক্তন সরকারি কর্মচারীরাই এই সভার মূল চালিকাশক্তি। তবে তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ৫০ জন অভিজাত, ৪০ জন বিশপ ও ২০০ জন নিম্নবর্গীয় যাজক এই সভার কাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সংবিধান সভার সদস্যদের মধ্যে অনেকেই সমকালীন বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর আদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তবে তারা ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয়। তারা মূলত শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার দিকে নজর দিতে গিয়ে দার্শনিকদের ভাবধারার বাস্তব রূপায়ণ করতে সক্ষম হননি।

সংবিধান সভার প্রাথমিক কর্মসূচি ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার সম্বলিত ঘোষণাপত্র। সংবিধান সভার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে স্বৈরাচারী বুরবোঁ রাজতন্ত্রের ঐশ্বরিক ক্ষমতার নীতিকে খর্ব করে রাজার নিরঙ্কুশ প্রশাসনিক ক্ষমতা লুপ্ত করে। অতঃপর ফ্রান্সের রাজার উপাধি হয়, ''ফরাসি জাতির রাজা''। রাজার যচ্ছেচ্ছ অর্থব্যয়ের ক্ষমতা সংকুচিত করে নিজস্ব ব্যয় নির্বাহের জন্য ২৫ মিলিয়ন লিভর তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। জনগণের অনুমতি ছাড়া তিনি কর ধার্য করতে পারবেন না। এছাড়া রাজার ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ আইন সভার উপর অর্পণ করা হয়। কারণ কোনো আইন পর পর তিনবার অনুমোদিত হলে রাজার সম্মতি ছাড়াই আইনে পরিণত হবে। এছাড়া বিচার ব্যবস্থা ও প্রাদেশিক কর্মচারীর উপরও রাজার নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করা হয়। আইন সভা, রাজকীয় প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যে যে ক্ষমতার বিভাজন করা হয়েছিল তা কার্যত রাজার প্রশাসনিক ক্ষমতাকে পঙ্গু করে। দেশে সার্বভৌম অধিকার আইন সভার উপর বর্তায়। ফলে বিপ্লবের পরবর্তী যুগে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থার উপর রাজার নিয়ন্ত্রণের অভাবে দেশে ব্যাপক প্রশাসনিক

নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এছাড়া সংবিধানের প্রধান ত্রুটি হল ফ্রান্সের নাগরিকদের সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ভোটের অধিকার লাভ করে সক্রিয় নাগরিক যারা করদানে সক্ষম ছিল। নিষ্ক্রিয় নাগরিক অথবা দরিদ্রের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। আইন সভার ৭৪৫ জন সদস্য নির্বাচিত হতেন সক্রিয় নাগরিকদের প্রাথমিক পর্যায়ে ভোটের মাধ্যমে। ৫০ হাজার নির্বাচক চূড়ান্তভাবে আইন সভার সদস্যদের নির্বাচিত করতেন ফলে সংবিধান সভার প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার মুষ্টিমেয় নাগরিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং সংবিধানের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সুষ্ঠু বোঝাপোড়ার অভাব ছিল।

ফ্রান্সে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সমগ্র দেশকে ৮৩টি ডিপার্টমেন্ট বা ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। ১৭৮৭ সালে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠন যেভাবে রূপায়িত হয়েছিল তার উপর ভিত্তি করেই এ্যাবেসিয়েস ৮৩টি ডিপার্টমেন্ট কয়েকটি জেলা ও তার পরবর্তী ধাপে গ্রাম ও কম্যুন-এ বিভক্ত করেন। পুরাতন ইনটেন্ডডেন্ট প্রথা ও প্রাদেশিক সভা লোপ করা হয়। এর স্থলে প্রদেশ জেলা ও গ্রাম অথবা ক্যান্টন প্রতি স্তরে নির্বাচিত শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া একটি নির্বাচিত শাসন পরিষদেরও ব্যবস্থা করা হয়।

সংবিধান সভা প্রাক্ বিপ্লবী বিচারব্যবস্থা সংস্কারের জন্য ৯ অক্টোবর অপরাধীদের অত্যাচার ও সর্বশেষে তার প্রাণদণ্ড দেওয়ার শাস্তিও লোপ করা হয়। ১৭৮৯ সালে ১ ডিসেম্বর বিচার ব্যবস্থার পুনর্গঠনের সব চেয়ে মৌলিক পদক্ষেপ আইন ও প্রশাসনের এক্তিয়ার থেকে মুক্ত করে বিচারালয়কে স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ সরকারি দপ্তরে পরিণত করা হয়। নির্বাচনের মাধ্যমে বিচারকদের নিয়োগ করা হয় এবং বিচারালয় সরকারি দপ্তরে পরিণত হয়।

অর্থনৈতিক কর্মসূচি রূপায়ণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্র সম্পূর্ণভাবে লোপ করা হয়েছিল। সংবিধান সভা পূর্বতন সিদ্ধান্তকে আইনগত স্বীকৃতি দিয়ে ভূমিদাস প্রথা, বেগারপ্রথা, সামন্ত কর, বর্গাপ্রথা, ধর্মকর অভিজাতদের বিশেষ অধিকার ও বৈষম্যমূলক আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্কপ্রথার অবসান করে। পুরাতন ব্যবস্থার সার্বিক ধ্বংসসাধন ও নতুন গণতান্ত্রিক রাজস্ব নীতির প্রণয়নে সংবিধান সভার ইতিবাচক ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পুরাতন ব্যবস্থার ধ্বংস সাধনের ফলে প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসম্পদ সংগ্রহে নতুন কর ধার্য করার প্রয়োজন দেখা দেয়। দেশের অর্থনৈতিক সংকট দূর করার জন্য বৈষম্যমূলক কর ব্যবস্থা বিলোপ করে ক্যাথলিক চার্চের বিপুল ভূসম্পদের জাতীয়করণের মাধ্যমে ১৭৭৯ সালের নভেম্বর মাসে অ্যাসাইনা (Assignat) নামক এক প্রতীকী মুদ্রা চালু করা হয়। বৈপ্লবিক পরিস্থিতির উত্থান পতনের জন্য দ্রুত কাগজের নোট ছাড়া হয়। অপরিমিত নোট ছাপানোর ফলে যে অ্যাসাইনা তার মূল্য হারায় এবং দেশে এক মারাত্মক মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। বুর্জোয়া শ্রেণির অবাধ ব্যাবসা-বাণিজ্যের জন্য ক্ষতিকর অভ্যন্তরীণ শুল্ক বিলোপ করে। ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার প্রত্যাহার করে। সংবিধান সভা শ্রমিক শ্রেণির ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার লাশে পালিয়ার (Le chapclier) আইন বিধির দ্বারা হরণ করে। সংবিধান সভা মধ্যবিত্ত শ্রেণির একচেটিয়া অধিকার রক্ষায় যতটা উদ্যোগী ছিল শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ততটা ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

সর্বশেষে সংবিধান সভা ফ্রান্সের ধর্ম বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য Civil Constitution of the Clergy— নামে এক আইন পাশ করে। ফরাসি জাতীয় গীর্জার নাম ছিল গ্যালিকান চার্চ। ক্যাথলিক রোমান চার্চের অঙ্গ হিসাবে এটি রোমের পোপের নিয়ন্ত্রণ অধীন ছিল। বিশপরাও পোপের নির্দেশে নিযুক্ত হত। কিন্তু নতুন আইন পোপের নিয়ন্ত্রণ একেবারে লোপ করে একে জাতীয়করণ করা হয়। পোপের ক্ষমতা খণ্ডিত করে ধর্মযাজকদের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত করার ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে সংবিধান সভা ফ্রান্সের গ্যালিকান চার্চকে সম্পূর্ণভাবে সরকারি বিভাগে রূপান্তরিত করে।

সংবিধান সভা পুরাতন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে রাজার স্বৈরাশাসনের ক্ষমতা খর্ব করে, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সামাজিক সাম্য প্রবর্তন করে ফরাসি বিপ্লবের যুগান্তকারি পরিবর্তনের ইতিহাসে এই সংস্কার কর্মসূচি গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। অবশ্য রক্ষণশীল ঐতিহাসিক মাঁদেলার মতে, সংবিধান সভা ফ্রান্সের মৌলিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে ধ্বংশ করে এবং প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার সূচনা করে। ফলে ফ্রান্সের স্থিতিশীলতাকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সম্ভবত তার অতিরঞ্জিত মন্তব্যের মধ্যে কিছুটা সারবত্তা স্বীকার করে নিয়ে বলা যায় যে, রাজার প্রশাসনিক ক্ষমতা খর্ব করে সংবিধন সভা যে প্রশাসন প্রবর্তন করেছিল তা প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। লেফেভরের মতে, ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে মধ্যবিত্ত শ্রেণি যে, বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের পথ প্রস্তুত করেছিল তা জ্যাকোবিন তথা নেপোলিয়নের প্রশাসনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ১৭৮৯-৯১ সংবিধান সভার কার্যাবলীর মধ্যে বুর্জোয়া শ্রেণিসুলভ যে কর্মসূচির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। ঊনবিংশ শতকের বৈপ্লবিক উত্থান-পতনের পথ অতিক্রম করে ফরাসি ঐতিহ্যের স্থায়ী রূপে পর্যবসিত হয়েছিল।

২.৭ রাজতন্ত্রের পতন—(আইনসভা ১ অক্টোবর ১৭৯১-২০ সেপ্টেম্বর ১৭৯২)

ষোড়শ লুই ঘোষণা করেছিলেন যে, ১৭৯১ সালের সংবিধান অনুমোদন বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটিয়েছে। তিনি জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার জন্য আবেদন করেছিলেন। আইন সভার অধিকাংশ সদস্য বিপ্লবের দিন সমাপ্তির আশায় বেশ বিহ্বল ছিলেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই এই আশা দুরাশায় পরিণত হল। সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের অবসান ঘটেছিল এবং ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল। রাজা শুধু সিংহাসনই হারাননি, তাকে শেষ পর্যন্ত গিলোটিনে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

১৭৯১ সালের ১ অক্টোবর আইন সভার প্রথম অধিবেশনেই এর দুর্বলতার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। প্রথমত, সংবিধান সভায় অভিজ্ঞ সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে আইন সভায় অংশ গ্রহণ করবেন না। ফলে আইনসভার মনোনীত সদস্যদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অভাবে সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজার ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয়ত, আইনসভায় নির্বাচন এক সংখ্যালঘু নাগরিকদের ভোটে সম্পন্ন হওয়ায় একে জাতীয় সভার মর্যাদা দিতে অনেকে কুণ্ঠিত ছিলেন। আইন সভার মোট ৭৪৫ জন সদস্যের মধ্যে ২৬৪ জন ছিলেন ফিউল্যান্ট (Feuillant) দলভুক্ত। এই দলের প্রভাবশালী নেতা বার্ণেভ (Barnev), ল্যামেথ (Lemeth) ডুপোর্ট (Duport) ও বেইলি (Bailly) ইত্যাদি সংবিধান সভার সদস্য হওয়ায় আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাননি। আইন সভার আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীর অধিকাংশ সদস্যই জিরন্ড (Girond) নামক প্রদেশের অধিবাসী হিসেবে এরা জিরন্ডিস্ট নামে পরিচিত ছিল। এই গোষ্ঠীটির অত্যন্ত প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় নেতা ব্রিসো (Brissot) নাম অনুসারে তাদের বলা হত ব্রিসোপন্থী। এদের সঙ্গে ধনী বুর্জোয়াদের অর্থাৎ ব্যাংকার, জাহাজের মালিক ও বড়ো ব্যাবসাদারদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আইন সভায় ব্রিসোর অনুগামীরা যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন এবং এদের সংখ্যা ছিল ৩৪৫ জন সদস্য। তবে বামপন্থীদের মধ্যে যারা সবচেয়ে চরমপন্থী ছিলেন তারা আইনসভার উপরের আসনগুলিতে বসতেন বলে পরিহাস ছলে তাদেরকে 'মাউন্টেন' আখ্যা দেওয়া হত। আইন সভার এদের সংখা ছিল ২৩৬ জন। জ্যাকোবিন ও কডেলিয়ার্স ক্লাবে নিম্নবর্গীয় বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করতেন বলে এরা পরবর্তীকালে জ্যাকোবিন নামে পরিচিত হন।

১৭৯২ খ্রিঃ-র ২০ জুন দক্ষিণপন্থী ফিউল্যান্ট ও বামপন্থী জিরোন্ডিস্ট জ্যাকোবিনদের মধ্যে কতকগুলি রাজনৈতিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বিরোধ ঘনীভূত হয়। দেশত্যাগী অভিজাত শ্রেণি ও যাজক গোষ্ঠীর ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে অপ-প্রচারের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানের নীতি ষোড়শ লুই ভেটো প্রয়োগ করে বানচাল করে দেন। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া ও

প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য ব্রিসোপন্থীদের উদ্যোগ জ্যাকোবিনদের আপত্তি সত্ত্বেও কার্যকর করা হয়। কিন্তু যুদ্ধে ফ্রান্সের প্রাথমিক বিপর্যয়ের পিছনে রাজারানী গোপনে সাহায্য করেছিলেন বলে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হল। ২০ জুন, ১৭৮৯ সালে ৮০০০ মানুষের উচ্ছৃঙ্খল এক জনতা ষোড়শ লুইয়ের তুইলারি রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করল। জিরোন্ডিস্ট দল রাজতন্ত্রের বিলোপ চায়নি। কিন্তু সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যর্থ হল। অবশেষে ১৭৯২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর রাজতন্ত্রের পতন ঘটল এবং সেই সঙ্গে আইন সভার সমাপ্তি হল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ষোড়শ লুই ২১ জুন ১৭৯১ সালের ফরাসী সীমান্তে ভ্যারেনের নিকট দেশত্যাগের চেষ্টায় পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রের মৃত্যু হয়। বছরখানেক পরে প্যারিসে এর সমাধি দেওয়া হয়। এতদিন পর্যন্ত অভিজাত শ্রেণি ফ্রান্সের ভিতর ও বাইরে থেকে ফরাসি বিপ্লব ধ্বংস করার যে চক্রান্ত করছিল, রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের ফলে তা ব্যর্থ হয়ে গেল। প্রসঙ্গত, আইনসভায় অন্যতম বৃহৎ দল হিসাবে জিরোন্ডিস্ট গোষ্ঠীর জনপ্রিয়তা হ্রাসের প্রধান কারণ হল, এই দলের নেতা ফ্রান্সের সাকুঁলোৎদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের অভাব-অভিযোগ দূর করার ক্ষেত্রে ঔদাসীন্য দেখিয়েছিল, এর ফলেই বিরোধী জ্যাকোবিন গোষ্ঠীর প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

২.৮ বিপ্লব ও যুদ্ধ

ফরাসি বিপ্লবের সূচনায় ইউরোপ সম্পর্কে বিপ্লবীরা নিস্পৃহ ছিল। সুতরাং বিপ্লবী ফ্রান্সের সঙ্গে ইউরোপের সংঘর্ষের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু বিপ্লবের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ১৭৯২ সালে ২০ এপ্রিল আইনসভা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে বিপ্লব ও যুদ্ধ সমান্তরাল গতিতে চলতে থাকে। এই ইউরোপীয় যুদ্ধ বিপ্লবের এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বিপ্লবকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিল। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন ইঙ্গিত করেছেন যে, বৈপ্লবিক ভাবধারার দুরন্ত প্রভাব ইউরোপীয় রাজতন্ত্রের পক্ষে অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ, স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ ও জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা ও অধিকারের ঘোষণা স্বভাবতই পুরাতন ব্যবস্থার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে পড়েছিল। তবে বিপ্লবকালীন ইউরোপীয় যুদ্ধের উৎস ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির জটিল আবর্তের মধ্যেই সন্ধান করতে হবে। রাজা ও রানীর রাজপ্রাসাদ থেকে পলায়নের চেষ্টা ব্যর্থ হলে ইউরোপীয় রাজন্যবর্গকে ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য ফরাসি রানী মেরী অ্যানটয়োনেট আহ্বান জানিয়েছিল। দেশত্যাগী অভিজাত গোষ্ঠীর বিপ্লব বিরোধী কার্যকলাপের জন্যই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। রানীর হঠকারিতা বা দেশত্যাগীদের ষড়যন্ত্র ছাড়াও জিরোন্ডিস্টদের যুদ্ধংদেহী মনোভাব ও ইউরোপে বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের কর্মসূচি যুদ্ধের মানসিক বাতাবরণ প্রস্তুত করেছিল। জ্যাকোবিন নেতা রোবস্পিয়ার ইউরোপীয় যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন।

বিপ্লবী ফ্রান্সের সঙ্গে ইউরোপের কেন যুদ্ধ বেধেছিল তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বিপ্লবীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ভাবাবেগকে গুরুত্ব দিয়েছেন আবার কেউ বা দায়ী করেছেন ইউরোপের রাজন্যবর্গকে বিপ্লবভীতি ও আশঙ্কাকে। সোরেল, সাইবেল ও জরেস প্রভৃতি ঐতিহাসিক জিরোন্ডিস্টদের ভাবাবেগ ও যুদ্ধংদেহী মনোভাবকেই দায়ী করেছেন। অপরদিকে ক্ল্যাপহাম, হানস, প্লাগাউ প্রমুখ ঐতিহাসিক অস্ট্রিয়া প্রাশিয়ার কূটনৈতিক হস্তক্ষেপকেই বিশেষ জোর দিয়েছেন। তবে যুদ্ধের প্রাথমিক পর্ব ফ্রান্সের পক্ষে শুভ হয়নি। যুদ্ধে প্রথমপর্বে ফ্রান্সের পরাজয় রাজতন্ত্র ও জিরোন্ডিস্ট গোষ্ঠীর পক্ষে পতন অনিবার্য করে তোলে। ইতিমধ্যে ফ্রান্স ভামির যুদ্ধে জয়লাভ করে ও স্যভয় নীস অধিকার করে এবং বেলজিয়াম অভিযানে অগ্রসর হয়। ফ্রান্সের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ ক্রমশ আগ্রাসী যুদ্ধের রূপ নিতে থাকে। বিপ্লব ও যুদ্ধের সংমিশ্রণ এই ইউরোপীয় যুদ্ধকে নতুন ও পুরাতন ব্যবস্থায় আদর্শগত সংঘাত হিসাবে এক নতুন

মাত্রা দান করে। যার অনিবার্য ফল হল জাতীয় কনভেনশন এক চরম সন্ধিক্ষণে, একাধারে বিপ্লব ও ইউরোপীয় যুদ্ধের সমস্যায় লিপ্ত হয়।

২.৯ জাতীয় কনভেনশন : সন্ত্রাসের রাজত্ব (১৭৯২-৯৫)

১৭৯২ খ্রিঃ রাজতন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে প্রথম প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে দ্বিতীয় ফরাসি বিপ্লব বলে আখ্যা দিলেও এক্ষেত্রে জনগণের স্বতঃস্ফূর্তি উৎসাহের অভাব ও দেশ ও বিদেশে প্রতিবিপ্লবী শক্তির আবির্ভাব পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছিল। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় কনভেনশন গণভোটের ভিত্তিতে নির্বাচনের অঙ্গীকার করলেও গণভোট চালু করা হয়নি। ১৭৯৩ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত সাঁক্যুলোৎ শ্রেণির ভোটাধিকার ছিল না। জ্যাকোবিনরা অবশ্য আংশিকভাবে তাদের স্বার্থ দেখলেও তাদের স্বার্থ কখনই রক্ষিত হত না। সুতরাং জাতীয় কনভেনশনকে প্রকৃত পক্ষে ফরাসি জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না।

জাতীয় কনভেনশন প্রথমে ফ্রান্সকে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে। গণভোট ও জনগণের সার্বভৌম অধিকারকে স্বীকৃতি জানালেও জাতীয় কনভেনশন বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থকে খর্ব করতে সচেষ্ট হয়নি। জাতীয় কনভেনশন নতুন সংবিধানে জীবন ও সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকৃতি দিলে বুর্জোয়া শ্রেণি তুষ্ট হয়। ঐতিহাসিক লেফেডার এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, বিপ্লবের ফলে সম্পত্তি নয় কেবল বিশেষ অধিকার ধ্বংস হয়। জাতীয় কনভেনশন দ্বিতীয় বিপ্লবী সংবিধান ১৭৯৩ খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে রচিত হলেও ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ সংকট ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে প্রথম কোয়ালিশনের নেতৃত্বে ফ্রান্স অভিযান এই দ্বিবিধ সংকটের বিরুদ্ধে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিপ্লবী সংবিধানকে মুলতুবি রাখা হয়। ফ্রান্সের এই চরম সংকট মুহূর্তে জিরোন্ডিস্ট দলের দুর্বল নীতি ও ফ্রান্সের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে তাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও অন্যান্য সমস্যার ফলে ধীরে ধীরে ১৭৯৩ সালের জুলাই মাসে জ্যাকোবিন দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় কনভেনশনে জ্যাকোবিনরা ছিল সংখ্যালঘু। প্রাথমিক পর্বে জিরোন্ডিসস্টিদের প্রভাব ছিল অনেক বেশি ও নরমপন্থীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে তারা সরকারি শাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রণে আনবার চেষ্টা করে। কিন্তু জিরান্ডিস্টদের প্রভাব প্যারিস মহানগরীর দরিদ্র সাঁকুলোৎ গোষ্ঠীর ওপর প্রায় ছিল না বললেই হয়। এই সাঁকুল্যোৎ গোষ্ঠী প্যারিসের রাজনৈতিক ঘাটির মূল শক্তি কেন্দ্র সেকশনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করত। ফলে জিরোন্ডিস্ট মন্ত্রীসভা বৈদেশিক ক্ষেত্রে ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ প্রসার করার জন্য ইউরোপীয় যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ১৭৯৩ সালের মে মাস থেকে আগস্ট মাসে জিরোন্ডিস্ট রাজনৈতিক দলের প্ররোচনায় ফ্রান্সে ৮৩টি ডিপার্টমেন্টের মধ্যে ৬০টি ডিপার্টমেন্টে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য এক প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান গড়ে ওঠে। গোঁড়া ক্যাথলিক যাজকেরা পোপের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য এই প্রতিবিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেয়। এই সময় ফ্রান্সের ব্রিটানী প্রদেশের লা-ভেন্ডিতে রাজতন্ত্র ও ক্যাথলিক ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য এক শক্তিশালী কৃষক অভ্যুত্থানের সূচনা হয়। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া যৌথ অভিযানে ও পরবর্তীকালে প্রথম ইউরোপীয় কোয়ালিশনের আক্রমণে ফান্সের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

জাতীয় কনভেনশনে জ্যাকোবিন নেতারা এই দারুণ সংকটে এক আপৎকালীন শাসন ব্যবস্থা হিসাবে দেশের বিপ্লবী সংবিধানকে মুলতুবি রেখে জননিরাপত্তা সমিতি (Committee of Public Safety) নামক ১২ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি সংস্থার হাতে ফ্রান্সের প্রধান প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করে। সন্ত্রাসের শাসনের চরম সংকটকালে ১৭৯৩-৯৪ সালে এই সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী পরিষদের ১২ জন সদস্যের নামের তালিকা দেওয়া হল:

(১) হিরোয়া দ্য সেসেয়া (Herault de Sechelles)
(২) বার্ট্রান্ড ব্যারার (Bertrand Barere)
(৩) রবার্ট লিন্ডে (Robert Lindet)
(৪) প্রায়র অব মার্নে (Prieur of the Marne)
(৫) প্রায়র অব কোতে দ্য'র (Prieur of the Cote d' or)
(৬) জ্যাবো সাঁ আঁদ্রে (Jeanbon Saint-Andre)
(৭) ল্যাজরে কার্ণো (Collot d' Herbois)
(৮) কোলেৎ দ্যারবোয়া (Collot d' Herbois)
(৯) বিলুৎ ভ্যারেনে (Billaud Varene)
(১০) জার্জে কুঁতো (Georges Couthon)
(১১) লুই আতোযান সাঁ জুস্ত (Louis Antonie Saint Just)
(১২) ম্যাকসিমিলিয়ান রোবসপিয়ার (Mamilien Robspierre)

এই সমিতির সদস্যরা প্রতি মাসে জাতীয় কনভেনশনের দ্বারা নির্বাচিত হত। কিন্তু কার্যত একই সদস্যরা এই সমিতির সদস্য থাকত জননিরাপত্তা সমিতি মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ করত, সেনাপতিদের নিয়োগ করত, বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করত। ফ্রান্সের এই সংকট মুহূর্তে সাধারণ নিরাপত্তা সমিতি (Committee of General Security) নামে আরেকটি সমিতির হাতে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা, আইনশৃঙ্খলা স্থাপন, পুলিশ বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ এই সমিতি পালন করে। এই সমিতির পরিপূরক হিসাবে রাজনৈতিক অপরাধ বিচারের জন্য প্যারিসে বিপ্লবী বিচারালয় (Revolutionary Tribunal) প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্যাকোবিন শাসনের সর্বশেষ স্তম্ভ ছিল ফ্রান্সে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত সহস্রাধিক স্থানীয় জ্যাকোবিন ক্লাব। এরা ছিল সন্ত্রাসের প্রাণকেন্দ্র। এই জ্যাকোবিন ক্লাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল প্যারিসের বিপ্লবী পৌর শাসনযন্ত্র যা প্যারিস কমিউন নামে পরিচিত ছিল।

২.১০ সন্ত্রাসের শাসন পটভূমি ও তাৎপর্য

ফরাসি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের চিরাচরিত রীতি অনুসারে মিশেলে থেকে তেইন পর্যন্ত সব ঐতিহাসিক বিপ্লবী জনতা ও তাদের বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতাকে নানাভাবে তুলে ধরেছেন। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে ঐতিহাসিকেরা সমকালীন সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে তা ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক তেইন অনেকটা একই দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন। তিনি বিপ্লবী জনতাকে মদ্যপ মানুষের সঙ্গে তুলনা করেছেন যার বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে বাস্তর পরিস্থিতি অস্পষ্ট এবং এইরূপ দৃষ্টি বিভ্রমের ফলে সে শেষ পর্যন্ত অশান্ত এবং সকল নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কিন্তু বিশিষ্ট ঐতিহাসিক লেফেডার আমাদের দৃষ্টিকে অনেকটা বাস্তব পরিস্থিতির কাছাকাছি এনে বিপ্লবী জনতাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তার অভিমতে বিপ্লবী জনতার একটি ধারা আকস্মিক ভাবে গড়ে ওঠে। অপরটি কিছুটা সংগঠিত যা সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে না। অন্তত বাজার, চার্চ অথবা প্রাসাদের চারিদিকে যে জনতা গোষ্ঠীকে দেখা যায় তাকে অর্ধ-সংগঠিত বললে অত্যুক্তি হবে না। এক কথায় লেফেডার সংগঠিত ও অসংগঠিত দুই ধরনের বিপ্লবী জনতার কথা বলেছেন। বাস্তিল পতনের সময় ১৪ জুলাই অথবা ১০ আগস্টের যে সংঘবদ্ধ বিপ্লবী জনতার ভূমিকা লক্ষ করা যায় তাকে নিছক তাৎক্ষণিক বা স্বতঃস্ফূর্ত বলা যায় না। ঐতিহাসিক রুদে

এদের সক্রিয় কর্মতৎপরতাকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। এদের সামাজিক সংস্থানকে নির্ধারণ করেছেন এবং এদের রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা কিভাবে তাদের বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতাকে উদ্দীপ্ত করেছিল তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতাকে প্রাথমিকভাবে শহুরে ও গ্রামীণ এই দুই অভিধায় পৃথক করা যায়। প্যারিস মহানগরীর গণ অভ্যুত্থানের বিভিন্ন ধারার বিশদ ব্যাখ্যা লেফেডার, রুদে ও অন্যান্য গবেষকদের রচনায় পাওয়া যায়। গ্রামীণ পরিবেশে এই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আণুবীক্ষণিক বিশ্লেষণ ততটা সহজলভ্য নয়। শহরে বৈপ্লবিক তৎপরতায় নেপথ্যে যে ভয় ও সন্ত্রাসের পরিবেশ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল গ্রামীণ পরিবেশে বৈপ্লবিক জনতা, আরও কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল যা শেষ পর্যন্ত 'মহা আতঙ্ক' নামে (Grande Peur) পরিচিতি লাভ করে। সন্ত্রাসের শাসন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের ধারণা ছিল যে, বৈপ্লবিক জনতায় অভিজাত যাজক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হিংসাশ্রয়ী মনোভাব অতিরঞ্জিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

বিপ্লবী জনতার সাধারণ সমর্থক হিসাবে যাদের সর্বাগ্রে নাম উচ্চারণ করা যায় তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণ গোষ্ঠী যথা বেকার, গৃহহীন নানা ধরনের প্রান্তিক অপরাধী গোষ্ঠী ছাড়াও মূলত দোকানদার, ছোটোখাটো কারিগর এবং অন্যান্য কায়িক শ্রমজীবী গোষ্ঠীকেই উল্লেখ করা যেতে পারে। পরবর্তী কালে যাদের সাঁক্যুলেৎ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তারা ১৭৯২ সালের পর যে সব রক্তাক্ত বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের পূর্বসূরি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। সংগঠিত বিপ্লবী জনতার সমর্থক হিসাবে কর্ডেলিয়ারস্ ক্লাব, জ্যাকোবিন ক্লাব এবং ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত পরিষদ প্রভৃতি রাজনৈতিক সংস্থার সহিত জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী (The National Guard) এই সকল বিপ্লবী গোষ্ঠীর প্রধান বুনিয়াদ ছিল। তবে প্যারিস মহানগরীর মধ্যে যে অসংখ্য ছোটো ছোটো পৌর বিভাগ ছিল (Section) গণ অভ্যুত্থান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এদের সক্রিয় উদ্যোগ যথেষ্ট ছিল। বৈপ্লবিক জনমত গঠনের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশিষ্ট সাংবাদিক ও জননেতা মারা-র (Marat) প্রভাবও যথেষ্ট ছিল। বাস্তিলের পতন উপলক্ষে যে বৈপ্লবিক উৎসবের স্বতঃস্ফূর্ত আয়োজন করা হয়েছিল তার সঙ্গে বিশিষ্ট দার্শনিক ভলটেয়ার, জননেতা মিরাব্যুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এক ধরনের গণ উন্মাদনা গুরুত্ব লাভ করেছিল। বৈপ্লবিক বাতাবরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই সকল বৈপ্লবিক আচার-অনুষ্ঠান, পোশাক-আশাক, প্রতিবাদী শোভাযাত্রা, জনমত সংগঠনে বিশেষ সাহায্য করেছিল, সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, সন্ত্রাসের সাসন যে রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অভাব জনিত এক অনিশ্চিত পরিস্থিতি ও রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের আদর্শগত টানাপোড়েনের ফলে যে প্রচণ্ড রাজনৈতিক উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছিল তাকে দ্বিতীয় বিপ্লব আখ্যা না দিলেও বৈপ্লবিক উদ্দীপনার চরম পরিণতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায়।

২.১১ সন্ত্রাসের শাসনের ইতিবাচক ভূমিকা

সন্ত্রাসের শাসনে লাখ লাখ মানুষ নিহত হয়েছিল, রক্তের সমুদ্র বয়ে গিয়েছিল, এই প্রচলিত ধারণা সম্পূর্ণ তথ্যভিত্তিক নয়। যতদূর জানা যায় প্রায় ৩০,০০০ মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, আরও প্রায় ২০,০০০ বন্দি অবস্থায় মারা গিয়েছিল। ঐতিহাসিক নর্মান হ্যাম্পসন হিসেব করেছেন, তৎকালীন ফরাসি জনসংখ্যার অনুপাতে ১,০০,০০০ মানুষের মধ্যে ২৪ জন এভাবে প্রাণ দিয়েছিল, অবশ্য বিপ্লবী যুদ্ধে যারা প্রাণ দিয়েছিল তাদের কথা ধরা হয়নি। যে কোনো সাধারণ বিপ্লবী যুদ্ধের তুলনায় হতাহতের এই সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়। এসব সত্ত্বেও সন্ত্রাস শাসনের স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রমে বৈদেশিক যুদ্ধ ও অভ্যন্তরীণ সংকট সত্ত্বেও ফ্রান্সের ইতিহাসে বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। তাদের প্রথম সাফল্য জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস। দ্বিতীয়ত, 'এক ও অবিভাজ্য প্রজাতন্ত্র' হিসাবে ফ্রান্সের সর্বত্র ফরাসি ভাষাকে জাতীয় শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত করার নির্দেশ জারি করে। তৃতীয়ত, একটি জাতীয় আইন বিধি সংকলনের

কাজে হাত দেয়, যার মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্র-কন্যা সকলেরই সমান অধিকার স্বীকৃত হয়। পুরুষের সঙ্গে নারীদেরও সমান সম্পত্তির অধিকার প্রদান করা হয়। ফরাসি উপনিবেশে নিগ্রোদের দাসপ্রথা রহিত করা হয়, ঋণের জন্য বন্দি করার নিয়ম বিলোপ করা হয়। এইভাবে সনাতনী আইন ব্যবস্থায় এক মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়। চতুর্থত, অর্থনৈতিক সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবে মেট্রিক পদ্ধতিতে ওজন মাপা প্রথার প্রবর্তন বিশ্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করে। পঞ্চমত, যাজকদের উপর রাষ্ট্রদ্রোহিতার নিষেধ বহাল রাখলেও ধর্মীয় সহনশীলতার নিশ্চয়তা দান করা হয়। ষষ্ঠত, বিরাট জমিদারিগুলি ভেঙে দিয়ে কৃষকদের মধ্যে সহজ শর্তে জমি বণ্টন করা হয়। সপ্তমত, সামাজিক সাম্যের প্রতিবিধান ও ব্যক্তি মানুষের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য বিপ্লবকে সর্বস্তরে প্রবর্তন করা হয়। সর্বশেষে ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে প্রচলিত আজানুলম্বিত পোশাকের পরিবর্তে মেহনতী মানুষের পোশাক পরিচ্ছদ জাতীয় পোশাক হিসাবে স্বীকৃত হয়। বিপ্লবের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ জনিত যে অবৈধ স্বৈরাচারী শাসনের ব্যাপক প্রভাব দেখা গিয়েছিল তাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। নেপোলিয়ানের স্বৈরশাসনের প্রথম পূর্বাভাস সন্ত্রাসের রাজত্বের মধ্যে অস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়।

২.১২ সারাংশ

ফরাসি বিপ্লব : ঘটনা পরম্পরা (১৭৮৯-১৭৯৯)

ফরাসি বিপ্লবের মতো যুগান্তকারী ঘটনার সূচনা ও সমাপিত সম্পর্কে বিতর্কের অন্ত নেই। অধ্যাপক রুদে অভিজাত বিদ্রোহকে 'বিপ্লব' না বলে বিপ্লবের পূর্বাভাস বলে মনে করেন। কারণ বিপ্লব কথাটির মধ্যে পুরাতন ব্যবস্থার যে মৌলিক পরিবর্তন বোঝায় অভিজাতদের বিরোধিতার মধ্যে সেই ধরনের কোনো ব্যাপক পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তাদের গোষ্ঠীস্বার্থ ও বিশেষ সুযোগ সুবিধা বজায় রাখার জন্যই সংগ্রাম করেছিল।

বিপ্লবের ইতিহাসে বাস্তিল দুর্গের পতন একটি স্মরণীয় ঘটনা যা বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে প্যারিসের জনগণের রাজনৈতিক বোঝাপড়া নিষ্পন্ন করেছিল। ১৭৮৯-এর ১৪ জুলাই ছিল প্যারিসের জনগণের বিজয় প্রতীক।

পুরাতন ব্যবস্থার অবসানের জন্য (১৭ জুন) জাতীয় সভা যে শপথ নিয়েছিল তার ফলশ্রুতি সংবিধান সভা। সংবিধান সভার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে স্বৈরাচারী বুরবো রাজতন্ত্রের ঐশ্বরিক ক্ষমতাকে খর্ব করে। রাজার উপাধি হয় 'ফরাসি জাতির রাজা'। রাজার আইন রচনার ক্ষমতা আইন সভার উপর অর্পণ করা হয়। এছাড়া বিচার ব্যবস্থা ও প্রাদেশিক প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ রাজার হাত থেকে আইন সভার উপর বর্তায়। দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা আইন সভার উপর অর্পণ করা হয়। নাগরিকদের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় দুই ভাগে ভাগ করে—আইন সভার প্রকৃত অধিকার মুষ্টিমেয় ধনিক নাগরিক বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমায়িত থাকে। সামন্ত্রতন্ত্রের অবলুপ্তি করে ভূমিদাস প্রথা, বেগার প্রথা, সামন্ত কর, বর্গা প্রথা, ধর্ম কর, অভিজাতদের বিশেষ সুযোগ সুবিধার ও বৈষম্যমূলক আন্তঃপ্রাদেশিক কর ব্যবস্থার বিলোপ করে।

ফরাসি চার্চ ব্যবস্থার জাতীয়করণ করা হয়। প্রশাসনিক ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সংবিধান সভা ফ্রান্সের মৌলিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করে। ফ্রান্সের স্থিতিশীলতা খণ্ডিত করে। ১৭৮৯-৯১ সালের সংবিধান সভার কার্যাবলীর মধ্যে পুরাতন ব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণির স্থলে বুর্জোয়া শ্রেণির প্রশ্নাতীত প্রাধান্যের সূচনা হয়।

ফরাসি রাজ ষোড়শ লুই ১৭৯১ সালে ঘোষণা করেছিলেন যে, সংবিধান সভার অনুমোদন বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটিয়েছে। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই রাজা শুধু সিংহাসন হারাননি, তাকে শেষ পর্যন্ত গিলোটিনে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

ষোড়শ লুই ২১ জুন, ১৭৯১ সালে ফরাসি সীমান্তে ভ্যারেনের নিকট ছদ্মবেশে দেশত্যাগের চেষ্টায় ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রের পতন হয়। আইন সভায় জিরোন্ডিস্ট দলের তুলনায় জ্যাকোবিন দলের জনপ্রিয়তার কারণ প্যারিসের নিম্নমধ্যবিত্ত সাঁকুল্যোৎ শ্রেণির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বিপ্লবের অগ্রগতির সহিত ১৭৯২, ২০ এপ্রিল আইন সভা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইতিমধ্যে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ, স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ ও জনগণের সার্বভৌম অধিকারের ঘোষণা ইউরোপীয় রাজ্যনবর্গের নিকট বিপজ্জনক হয়ে পড়েছিল। জিরোন্ডিস্ট দলের যুদ্ধং দেহী মনোভাব, রানী আন্তোনিয়তের হঠকারিতা ও দেশত্যাগী অভিজাত গোষ্ঠীর বিপ্লব বিরোধী কার্যকলাপ ইউরোপীয় যুদ্ধের মানসিক বাতাবরণ সৃষ্টি করে।

জাতীয় কনভেনশন একাধারে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিপ্লবের চরম অগ্নিপরীক্ষা ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে ইউরোপীয় যুদ্ধের সমস্যার সম্মুখীন হয়।

সন্ত্রাসের রাজত্ব (১৭৯২-৯৪) জাতীয় কনভেনশন প্রথমে ফ্রান্সকে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ সংকট ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে প্রথম কোয়ালিশনের নেতৃত্বের ফ্রান্স অভিযান এই দ্বিবিধ সংকটের বিরুদ্ধে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন বিপ্লবী সংবিধানকে মুলতুবি রাখা হয়। ফ্রান্সের এই চরম সংকট মুহূর্তে জিরোন্ডিস্ট দলের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও অন্যান্য সমস্যার ফলে ১৭৯৩ সালের জুলাই মাসে জ্যাকোবিন দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯৩ সালের মে মাস থেকে আগস্ট মাসে জিরোন্ডিস্ট দলের প্ররোচনায় ফ্রান্সের ৮৩ ডিপার্টমেন্টের মধ্যে ৬০ টি ডিপার্টমেন্টে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য এক প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান গড়ে ওঠে। গোঁড়া ক্যাথলিক যাজকেরা এই প্রতিবিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেয়। ব্রিটানীর লো-ভেন্ডিতে রাজতন্ত্র ও ক্যাথলিক ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য এক শক্তিশালী কৃষক আন্দোলনের সূচনা হয়। ইতিমধ্যে প্রথম কোয়ালিশনের আক্রমণে ফ্রান্সের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ১৭৯৩-৯৪ সালে সন্ত্রাসের শাসনের চরম সংকট মুহূর্তে এক সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী পরিষদের ১২ জন সদস্যের জননিরাপত্তা সমিতি ও সাধারণ নিরাপত্তা সমিতির যৌথ নেতৃত্বে দেশের এই অভূতপূর্ব সংকট মোকাবিলার জন্য সচেষ্ট হয়। এদের পরিপূরক হিসাবে প্যারিসে বিপ্লবী বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলের সহস্রাধিক জ্যাকোবিন ক্লাব ছিল সন্ত্রাস শাসনের প্রাণ কেন্দ্র। প্যারিস কমিউন জ্যাকোবিন ক্লাবের সঙ্গে জড়িত ছিল।

সন্ত্রাসের শাসনের লাখ লাখ মানুষ নিহত হয়েছিল, রক্তের সমুদ্র বয়ে গিয়েছিল। এই প্রচলিত ধারণা তথ্য ভিত্তিক নয়। ৩০,০০০ মানুষ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ও ২০,০০০ বন্দি অবস্থায় মারা গিয়েছিল। যে কোনো একটা যুদ্ধের তুলনায় এই হতাহতের সংখ্যা খুব বেশি নয়। এসব সত্ত্বেও সন্ত্রাসের শাসনের কিছু ইতিবাচক ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম, জাতীয় শিক্ষার পুনর্বিন্যাস—ফরাসি ভাষাকে জাতীয় শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে নির্দেশ দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, জাতীয় আইন বিধি রচনার নির্দেশ—সম্পত্তিতে পুরুষ ও নারীদের সমানাধিকার ঘোষিত হয়। নিগ্রোদের উপনিবেশে দাসপ্রথা ও ঋণের জন্য দাসত্ব নিষিদ্ধ হয়। সনাতনী আইন ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন করা হয়। তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মেট্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন। চতুর্থত, ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতির নিশ্চয়তা দান করা হয়। পঞ্চমত, বিরাট জমিদারদের জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ষষ্ঠত, সামাজিক সাম্য ও ব্যক্তি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর ব্যবস্থা হয়।

নেপোলিয়ানের স্বৈর শাসনের পূর্বাভাস সন্ত্রাসের রাজত্বের মধ্যে অস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। ফরাসি বিপ্লবের দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রেক্ষিতে সন্ত্রাস ও বিপ্লব প্রায় সমার্থক।

ডিরেকটরি শাসন (১৭৯৫-৯৯) জাতীয় কনভেনশনের পর ডিরেকটরি শাসন শুরু হয়। ১৭৯৫ সালের সংবিধান যা বিপ্লবের ইতিহাস 'তৃতীয় বৎসরের সংবিধান' নামে পরিচিত। ইহার বৈশিষ্ট্য সর্বজনীন ভোটের অধিকার হয়। সম্পত্তির

ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ ভোটের ভিত্তিতে ৫০০ জন সদস্য বিশিষ্ট গণপরিষদ ও ২৫০ জন সদস্য সংবলিত উচ্চতর পরিষদ নির্বাচিত হবে। তবে প্রশাসনের কর্ণধার হবে ৫ ডাইরেকটার এদের শাসন ডিরেকটরি শাসন নামে পরিচিতি লাভ করে।

বুর্জোয়া শ্রেণির একটি ভগ্নাংশের উপর নির্ভরশীল ও তীব্র অর্থনৈতিক সমস্যার মুখে দাঁড়িয়ে ডিরেকটরি শাসন শান্তিতে রাজত্ব করতে পারেনি। গরিব জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিল না। তবে সাম্যবাদী ব্যাবুফের বামপন্থী আন্দোলন নয়। ডিরেকটরির বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল দক্ষিণপন্থী রাজতন্ত্রীরা। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা সফল হয়নি। ফ্রান্সের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে তরুণ সেনানায়ক নেপোলিয়ান বোনাপার্টের একনায়কতন্ত্র স্থাপনের পথ উন্মুক্ত হয়। ডেভিড টমসনের মতে, দুর্নীতিপরায়ণ ডিরেকটরদের জন্য বিপ্লবের অপমৃত্যু ঘটেছিল। ফ্রান্সে বিপ্লবের গতি মন্দীভূত হলেও ডিরেকটরি শাসন ইউরোপীয় বিপ্লবের সূচনা করেছিল।

বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের দিনের তালিকা

ফরাসি বিপ্লবের ঝটিকা সংকুল গণমুখী আদর্শের রূপায়ণে এই সকল স্বতঃস্ফূর্ত বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ভূমিকা ১৭৮৯-১৭৯৫ সালের উত্তাল রক্তাক্ত দিনগুলির মধ্যে ধারাবাহিকভাবে লক্ষ করা যায়। এই রকম কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জুর্নে (Journee) হল—

১৭৮৯-এর ২৩ এপ্রিল—র‍্যভেঈওঁ স্যাঁ মার্গরিৎ মহল্লার এক কারখানার মালিকের অসতর্ক উক্তি—'এক সময় ১৫ স্যু দিলেও চলত, আর এখন ২৪ স্যু-তেও কারিগর পাওয়া যায় না—'ফরাসি বিপ্লবের প্রথম গণ অভ্যুত্থানের সূচনা করল।

১৭৮৯' ১৪ জুলাই বাস্তিল কারাদুর্গের পতনের গুরুত্ব রাজনৈতিকভাবে নগণ্য হলেও এর নৈতিক ফলাফল দূরপ্রসারী। রাজা ষোড়শ লুই সমস্ত শুনে মন্তব্য করেন—এ যে বিদ্রোহ'। সংবাদদাতার তাৎক্ষণিক উত্তর—'না, এর নাম বিপ্লব'।

১৭৯১	ফেব্রুয়ারি	ভাঁসেন অভিযান
১৭৯১	জুলাই	শঁ দ্য মারের শোভাযাত্রা
১৭৯২	জুন	তুইলরি অভিযান
১৭৯২	১০ আগস্ট	রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ
১৭৯২	২-৪ সেপ্টেম্বর	'সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড'। প্যারী শহরের নয়টি কারাগারের প্রায় ১৪০০ বন্দিকে ডিউক অব ব্রান্সউইকের গুপ্তচর সন্দেহে হত্যা করা হয়। বিপ্লব আর নৃশংসতা অনেক সময় সমার্থক।
১৭৯৩	৩১ মে-২ জুন	জিরন্দিন সদস্যদের বিতাড়ন
১৭৯৩	৪-৫ সেপ্টেম্বর	জ্যাকবিন অভ্যুত্থান ও সন্ত্রাস সৃষ্টি
১৭৯৪	২৭ জুলাই	রোবসপিয়ারের পতন
১৭৯৫	এপ্রিল ও মে	সংবিধান ও খাদ্যের দাবিতে দাঙ্গা

এই সকল তাৎক্ষণিক অভ্যুত্থানের সাফল্যের খতিয়ানের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এদের গণমুখী বৈপ্লবিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে যা সন্ত্রাসের দিনের পটভূমি রচনা করে।

বিপ্লবী বর্ষপঞ্জী (Revolutionary Calendar) :

সন্ত্রাসের শাসনকালীন বিপ্লবী বর্ষপঞ্জী গ্রহণের কারণ ছিল সনাতন ঐতিহ্য ও আদর্শমুক্ত নতুন বিপ্লবী যাত্রার প্রতিজ্ঞা। ২১ সেপ্টেম্বর ১৭৯২ সালে রাজতন্ত্র অবসানের পরের দিন থেকে বিপ্লবী বর্ষপঞ্জী চালু হয়। এতে বছরকে ৩০ দিনের বারো মাসে ভাগ করা হয়। সাত দিনের সপ্তাহ বাতিল করে প্রতি মাসকে দশ দিনের দেকাদ-এ (Decade) নামকরণ করা হয়। বছরের অতিরিক্ত পাঁচদিন। ১৭-২১ সেপ্টেম্বর সাঁকলোতিদ নামে চিহ্নিত করা হয়। নতুন বর্ষপঞ্জীর মাসগুলো এরূপ—

ভ্যদেমিয়র	(Vendemiare)	সেপ্টেম্বর/অকটোবর	দ্রাক্ষা ফলের রস
ব্রুমের	(Brumaire)	অকটোবর/নভেম্বর	কুয়াসার মাস
ফ্রিমের	(Frimaire)	নভেম্বর/ডিসেম্বর	তুষারের মাস
নিভজ	(Nivose)	ডিসেম্বর/জানুয়ারি	হিমানীর মাস
প্লুভিয়স	(Pluviose)	জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি	বাদলের মাস
ভঁতজ	(Ventose)	ফেব্রুয়ারি/মার্চ	হাওয়ার মাস
জারমিনাল	(Germinal)	মার্চ/এপ্রিল	মুকুলের মাস
ফ্লোরেয়াল	(Floreal)	এপ্রিল/মে	ফুলের মাস
প্রেরিয়াল	(Prairal)	মে/জুন	প্রান্তরের মাস
মেসিদর	(Messidor)	জুন/জুলাই	ফসল কাটার মাস
ত্যরমিদর	(Thermidor)	জুলাই/আগস্ট	উত্তাপের মাস
ফ্রুক্তিদর	(Fructidor)	আগস্ট/সেপ্টেম্বর	ফলের মাস

২.১৩ অনুশীলনী

১। ফ্রান্সের পুরাতন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন। কী অর্থে ১৭৮০-র দশকে ফ্রান্স এক বৈপ্লবিক সংকটের সম্মুখীন হল?

২। ফরাসি বিপ্লবের উন্মেষে দার্শনিক গোষ্ঠীর ভূমিকা নির্দেশ করুন।

৩। ফ্রান্সে অভিজাততান্ত্রিক বিদ্রোহের কারণ ব্যাখ্যা কর এবং এর গুরুত্ব নির্ণয় করুন।

৪। ফরাসি বিপ্লবকে কোন অর্থে বুর্জোয়া বিপ্লব বলা যায়?

৫। সংবিধান সভা (১৭৮৯-৯১) ফ্রান্সে কী ধরনের ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করেছিল? এই ব্যবস্থাগুলির সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করুন।

৬। ফ্রান্সের সন্ত্রাসের শাসনের পটভূমি ও তাৎপর্য কী ছিল? তুমি কী সন্ত্রাসের শাসনের রাজত্বকে সমর্থন করুন?

৭। ডিরেকটরি শাসনের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্দেশ করুন।

৮। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

(ক) আটলান্টিক বিপ্লব কী (খ) ফ্রান্সের কর ব্যবস্থার ত্রুটি নির্দেশ করুন। (গ) ফ্রান্সের পুরাতন ব্যবস্থার প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণ কী? (ঘ) বাস্তিল কারাদুর্গের পতনের কারণ ও তাৎপর্য কী? (ঙ) ব্যক্তি ও নাগরিকের ঘোষণা পত্রের

আদর্শ কী? (চ) জন-নিরাপত্তা সমিতি কী? (ছ) জিরোন্ডিস্ট ও জ্যাকোবিন দলের সামাজিক ও আদর্শগত ব্যবধান কী? (জ) সন্ত্রাস শাসনের ইতিবাচক ভূমিকা কী? (ঝ) রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সন্ত্রাস কী? (ঞ) 'মহাআতঙ্ক' সন্ত্রাস শাসনের কোন পরিবেশে উদ্ভূত হয়েছিল?

২.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

ফরাসী বিপ্লবের পাঠ নির্দেশিকার প্রধান বাধা—গবেষণা গ্রন্থাদির অতি প্রাচুর্য—সেই জন্য কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থের উল্লেখ করা হল।

1 A Goodwin : The French Revolution
2. Georges Lefebvre : The Coming of the French Revolution. (Translated by R. R. Palmer)
3. Georges Rude : The Revolutionary Europe (Fontana European history series)
4. Francis Furet : Revolutionary Europe (1770-1880)
5. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী—ফরাসী বিপ্লব (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, জুলাই ১৯৭৯)
6. আবুল কালাম—ফরাসী বিপ্লবের পটভূমি ও ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস (বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৪)

একক ১ □ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অভ্যুত্থান (১৭৯৫-১৮০৭)

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য
৩.১ প্রস্তাবনা
৩.২ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অভ্যুত্থান পর্ব (১৭৯৫-৯৯)
৩.৩ ফরাসি আধুনিক রাষ্ট্রের জন্ম ও নেপোলিয়ান
৩.৪ নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য ও ইউরোপের পুনর্গঠন
৩.৫ নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের স্বরূপ ও তাৎপর্য
৩.৬ ফরাসি শাসনের যৌক্তিকতা
৩.৭ ডিরেক্টরি শাসন
৩.৮ সারাংশ

৩.০ উদ্দেশ্য

এই একক পড়বার পর আপনি জানতে পারবেন :

- ফ্রান্সের বিপ্লবী নায়ক নেপোলিয়ানের উত্থান ও বৈপ্লবিক সংস্কার
- নেপোলিয়ান ও আধুনিক ফরাসি রাষ্ট্রের জন্ম
- নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য ও ইউরোপীয় পুনর্গঠন

৩.১ প্রস্তাবনা

ফরাসি বিপ্লবের দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পটভূমিতে নেপোলিয়ান প্রায় দুই দশক ধরে বিপ্লবী নায়ক হিসাবে শুধু ফ্রান্স নয় সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের এক বিশাল অঞ্চলের একচ্ছত্র নায়ক ছিলেন।

ডিরেক্টরি শাসনের ধ্বংসস্তূপের উপর প্রথম কনসাল বৈপ্লবিক ভাবধারার উত্তরাধিকারী হিসাবে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার উদার বাণীকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ নেপোলিয়ানের শাসনে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসারিত হয়ে ইউরোপীয় বিপ্লবে পরিণত হয়েছিল।

ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমানা রক্ষা করার নীতি রূপায়ণ করতে গিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। নেপোলিয়ান ১৮০৫-১৮০৭ সালের মধ্যে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়াকে পরাজিত করে টিলসিটের সন্ধির পর ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছোন। তিনি ইতালি, জার্মানি সহ ইউরোপে তাঁর সাম্রাজ্যের মাধ্যমে বিপ্লবকে সম্প্রসারিত করেছিলেন। নেপোলিয়ান ছিলেন ইউরোপে ফরাসি বিপ্লবের প্রতীক।

৩.২ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অভ্যুত্থান পর্ব (১৭৯৫-৯৯)

ফরাসি বিপ্লবের দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পটভূমিতে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট প্রায় দুই দশক ধরে বিপ্লবের অন্যতম অগ্রণী নায়ক হিসাবে শুধু ফ্রান্সের ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে নয় সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের এক বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগেও একচ্ছত্র নায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ফরাসি বিপ্লবের এক সংকট মুহূর্তে ফরাসি জনগণের কাছে তার সম্মোহনী আবেদন কিছুটা চমকিত করে। কারণ এই অর্ধ ইটালীয়ান-কার্সিকান ব্যক্তি ফরাসি জনগণের এক অসাধারণ জনপ্রিয় নেতা হিসাবে চিহ্নিত হন। তাঁর জন্ম ১৭৬৯ খ্রিঃ কার্সিকা দ্বীপের এক প্রান্তিক অভিজাত পরিবারে। তিনি অভিজাত পরিবারে জন্মের সুযোগ গ্রহণ করে ফরাসি সরকারের দাক্ষিণ্যে রাজকীয় সামরিক বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ পান। ১৭৭৯-৮৪ সালে ব্রিঁয়া-র (Brienne) সামরিক বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ পেলেও তাঁর প্রথম জীবনচরিতকার স্তাঁধাল মন্তব্য করেছেন যে, তিনি পাঠ্যসূচির মধ্যে সমকালীন বুদ্ধিজীবী, হিউম, মন্টেস্কুর উদারনৈতিক চিন্তাধারার কোনো স্পর্শ পাননি। ভালোভাবে ফরাসি ভাষা আয়ত্ত করলেও সামরিক পাঠক্রমের চূড়ান্ত পরীক্ষায় তিনি কোনে অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় দেননি। ১৭৮৫ খ্রিঃ সামরিক বিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে তিনি স্থায়ীভাবে কর্সিকা থেকে ফ্রান্সে আশ্রয় নেন। ১৭৯৩ সালের জুন মাসে জ্যাকোবিন দলের অবিসংবাদী নেতা রোবস্পিয়ারের প্রিয়পাত্র হিসাবে ফরাসি গোলন্দাজ বাহিনীর এই অজানা সেনানায়ক বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে যান। ১৭৯৫ সালের থার্মিডরের অভ্যুত্থানের পর এক অভিজাত মহিলা যোশেফাইনেকে বিবাহ করে ডিরেকটরি প্রশাসনের মধ্যমণি ব্যারাসের সহযোগিতায় নেপোলিয়ান বিখ্যাত ইটালী অভিযানের সেনানায়ক হিসাবে ১৭৯৬ সালের ১০ মে লোদির যুদ্ধে অস্ট্রিয়া সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করেন ও মিলান নগরীতে ১৭৯৬ সালের মে মাসে ফরাসি সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে ডিরেকটরি শাসনের ফলে ফ্রান্স অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত হয়ে নেপোলিয়ানের ইটালী অভিযানের সামরিক গৌরবের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ডিরেকটরি প্রশাসনের অন্যতম প্রবক্তা কার্ণো নেপোলিয়ানের উপর নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ণ রাখতে ব্যর্থ হন। নেপোলিয়ানের অসাধারণ জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ নানাবিধ সংকট ও প্রশাসনিক দুর্নীতি স্বাভাবিকভাবেই নেপোলিয়ানের রাজনৈতিক উত্থানকে ত্বরান্বিত করেছিল।

১৭৯৫ সালের নেপোলিয়ানের ইটালী অভিযানের প্রাক্কালে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এক অগ্নিগর্ভ সংকটে পরিণত হয়। অবাধ মূল্যস্ফীতি একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের দুঃখ ও অভাবকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল, চোর, ডাকাত ও ভবঘুরের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল অন্যদিকে দুর্নীতিপরায়ণ কিছু বুর্জোয়ার হাতে প্রচুর অর্থসম্পদ জমেছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থী রাজতন্ত্রী ও উগ্রবামপন্থী আন্দোলনের চাপে ডিরেকটরি শাসনের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। নেপোলিয়ান সেই সুযোগ গ্রহণ করে ১৭৯৯ সালে প্রথম কনসাল ও ১৮০৪ সালে সরাসরি সম্রাট পদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

নেপোলিয়ান ১৭৯৯-১৮০৪ পর্যন্ত কনসাল হিসাবে এবং ১৮০৪-১৮১৫ সাল পর্যন্ত সম্রাট হিসাবে ফ্রান্স শাসন করেছিলেন। ফরাসি বিপ্লবের প্রেক্ষিতে শাসক হিসাবে নেপোলিয়ানের ভূমিকা ইঙ্গিত করে ইংরেজ ঐতিহাসিক ফিসার মন্তব্য করেছেন, ''নেপোলিয়ানের সামরিক বিজয় ক্ষণস্থায়ী হলেও তাঁর প্রশাসনিক সংস্কার গ্রানাইট প্রস্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।'' অসামরিক শাসনের জন্য প্রয়োজনীয় বহু গুণের অধিকারী ছিলেন নেপোলিয়ান—কল্পনা, উদ্ভাবনা শক্তি, প্রশাসনের সকল ব্যাপারে যত্ন ও নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা ফরাসি বিপ্লবোত্তর প্রশাসনিক শূন্যতাকে দক্ষতার সঙ্গে পূরুণ করে ছিলেন। পুরাতন ব্যবস্থার সকল বাধা-বিপত্তি দূর করে কনসালেট প্রশাসনে তিনি ফ্রান্সের সর্বত্র এক

অসাধারণ আশা ও উদ্দীপনার বাতাবরণ সৃষ্টি করেন। যার ফলশ্রুতি কেন্দ্র ও স্থানীয় প্রশাসনে ফরাসি জনগণের বাস্তব পরিস্থিতির উন্নতি বিধানে লক্ষ করা যায়। সাধারণ আইন ব্যবস্থার বাইরে কোনো সুবিধাভোগী নাগরিকদের কোনো প্রাদেশিক আইনসভা, কোনো গোষ্ঠীতে প্রতিষ্ঠান অটুট থাকল না। প্রতি ডিপার্টমেন্টে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের প্রবক্তা হিসাবে প্রিফেক্ট অথবা পৌরসভার মেয়র সরাসরি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসকের নির্দেশ দ্বিধাহীনভাবে পালন করতেন। ডিরেকটরি শাসনের ধ্বংসস্তূপের উপর প্রথম কনসাল হিসাবে নেপোলিয়ান নিজেকে বৈপ্লবিক ভাবধারার উত্তরাধিকারী হিসাবে উপস্থিত করেন। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের উদার বাণীকে কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জনার মাধ্যমে তাকে স্থায়ীরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি স্বৈরাচারী শাসক ও আধুনিক উদারনৈতিক প্রশাসনের এক বিচিত্র সংমিশ্রণে তাঁর প্রশাসন ফরাসি বিপ্লবের মৌল আদর্শের সমন্বয় ও সমীকরণের এক অনন্য সংযোজন। তার প্রশাসনিক চিন্তা-ভাবনা ও বিধি ব্যবস্থার মধ্যে আদর্শগত স্ববিরোধিতা ও অসঙ্গতির ফলে বিপ্লবের প্রবক্তা হিসাবে তাঁর উজ্জ্বল ভাবমূর্তি কখনও কখনও ম্লান হয়ে গিয়েছে। তবে তা সত্ত্বেও বলা যেতে পারে, ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ নেপোলিয়ানের শাসনে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে গিয়ে ইউরোপীয় বিপ্লবে পরিণত হয়েছিল। ফ্রান্সে বিপ্লবের স্রোত মন্দীভূত হলেও ইউরোপে তার ঢেউ স্পর্শ করেছিল। জ্যাকোবিন দল যা করতে পারেনি নেপোলিয়ান তার সূচনা করেছিলেন।

৩.৩ ফরাসি আধুনিক রাষ্ট্রের জন্ম ও নেপোলিয়ান

নেপোলিয়ানের শাসনের প্রথম পর্ব কনসাল হিসাবে নেপোলিয়ান ফ্রান্সের পুরাতন কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটিয়ে এক নতুন জাতীয় রাষ্ট্রের পরিকাঠামো রচনা করেন। ষোড়শ শতক থেকে ফ্রান্সের কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র ব্যবস্থা ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে বিশিষ্ট ফরাসি রাজা চতুর্দশ লুইয়ের আমলে সমগ্র ইউরোপের কেন্দ্রীভূত স্বৈরতন্ত্রের আদর্শ হিসাবে নিজেকে উপস্থাপিত করেছিলেন। ফরাসি বিপ্লব ফ্রান্সের কেন্দ্রীভূত স্বৈরতন্ত্রের আর্থ-সামাজিক বুনিয়াদ সামন্ত প্রথা ও তাদের নিয়ন্ত্রিত প্রশাসন ব্যবস্থাকে ভেঙে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের পুনর্গঠিত করে নেপোলিয়ান অত্যন্ত সযত্নে প্রশাসনিক পরিকাঠামো আইন পরিষদ, বিচার ব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র, অর্থ ব্যবস্থা, শিক্ষা, আইন বিধি এমন কি চার্চ ব্যবস্থাকেও আমূল পরিবর্তন করেন। এই নবগঠিত ফরাসি জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল গণ সমর্থন যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব শুধু ফ্রান্স নয় ইউরোপের অন্যান্য দেশেও অনুকরণ সৃষ্টি করেছিল।

ফরাসি বিপ্লবের প্রথম সংকেত হিসাবে ১৭৮৯ সালে মে মাস হইতে আগস্ট মাসের মধ্যে কৃষক বিদ্রোহের চাপে সামন্ত প্রবু তাদের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার জন্য কৃষক শ্রেণির উপর যে ভয়াবহ শোষণ অক্ষুণ্ণ রেখেছিল তার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ রাজতন্ত্রের তরফে দুঃস্থ কৃষক শ্রেণির সমর্থন লাভ একান্ত কাম্য ছিল।

কারণ তাদের সহজাত সমর্থন ছাড়া প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। বুরবোঁ রাজারা সামন্ত প্রভুদের রাজনৈতিক ক্ষমতা খণ্ডিত করলেও তাদের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা অক্ষত রেখেছিলেন। রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের অন্যতম সহযোগী যন্ত্র হিসাবে (১৬১০-১৬৪৪) মধ্যে টেইল ১৭ মিলিয়ন থেকে ৪৪ মিলিয়ন লিভরে বর্ধিত হয়েছিল সামগ্রিকভাবে করের ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, রাজকীয় শাসন কাঠামোর ক্রমবর্ধমান আয়তন জনপ্রতিনিধি মূলক বিধি ব্যবস্থাগুলিকে খর্ব করেছিল ব্রিটেন, বার্গান্ডি, প্রভাঁস এবং ল্যাঙডকের প্রাদেশিক জনসভাগুলি প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরণের ঘোরতর বাধা দিচ্ছিল। সপ্তদশ শতকে কেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে বিকেন্দ্রীকরণের ঝোঁক এমন এক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল যা রাজকীয় স্বৈরতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ খণ্ডিত করেছিল। প্রাক্ বিপ্লবী আমলে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার এক দ্বিমুখী

নীতি গ্রহণ করেছিল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষক শ্রেণির উদ্বৃত্ত সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সামন্ততান্ত্রিক শাসকশ্রেণির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক ফ্রাঁসোয়া ফুরের অভিমতে তৎকালীন ফরাসী রাষ্ট্র কৃষক শ্রেণির সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে সামন্ত প্রভুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিল। রাষ্ট্র কেন্দ্রীভূত শাসন পরিকাঠামোর মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সম্পদ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এনেছিল তাঁদের অভিজাত শিরোপা প্রদান করে অথবা উচ্চ প্রশাসনিক পদ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে দান করে। সামন্ত প্রথার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ফরাসি জাতীয় সভা ১৭৮৯ সালে ৪ আগস্ট এক অভূতপূর্ব সান্ধ্য অধিবেশনে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে। সাংবিধানিক ক্ষেত্রে ১৭৮৯-৯১ সালে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ১৭৯২-৯৪ সালে গণতান্ত্রিক সাধারণ তন্ত্র, ১৭৯৫-৯৯ সালে ডিরেকটরি শাসন, কনসাল শাসন এবং নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য যা ১৭৯৯-১৮১৫ সালে নেপোলিয়ানের ব্যক্তিগত সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হয়। পুরাতন ব্যবস্থার আংশিক পরিবর্তন জাতীয় মহাসভা ও জ্যাকোবিন সাধারণতন্ত্রের সময়ে গ্রহণ করা হলেও নেপোলিয়ানের কনসাল শাসন কালে কেন্দ্রীভূত প্রশাসনের দ্রুত রূপায়ণ অবধারিত হয়ে উঠেছিল।

পুরাতন ব্যবস্থা ধ্বংস সাধনের জন্য প্রাক্-বিপ্লবী প্রশাসনিক পরিকাঠামো প্রাদেশিক স্থানীয় ও গ্রামীণ ব্যবস্থার দ্রুত পুনর্বিন্যাস একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। নেপোলিয়ানের প্রশাসনিক সংস্কারের মৌল বুনিয়াদ ছিল ১৭৯০ সালে জাতীয় মহাসভা রচিত প্রাদেশিক ও স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামোর নব রূপায়ণের উপর ভিত্তি করে।

নেপোলিয়ান কনসাল ও পরবর্তী সম্রাট হিসাবে যে প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলেছিলেন তার মূল ভিত্তি ছিল পূর্বতন ৮৩টি উপ-প্রদেশ (Department)। এই সকল প্রশাসনিক এককের কর্মচারীরা ছিলেন নির্বাচিত নয়, তাঁরই প্রতিনিধি। ফ্রান্সের রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে এদের উদ্যোগ ছিল অনেক বেশি সুপরিকল্পিত। কেন্দ্রীয় কোষাগারে রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে জন্ম, আভিজাত্য ও বিশেষ সুযোগ সুবিধাকে কোনো গুরুত্ব আরোপ করা হত না। রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে শ্রেণিগত ব্যবধান বিপ্লবের সময়ে লোপ পেলেও তা কার্যকরীভাবে নেপোলিয়ানের শাসনে রূপায়িত হয়েছিল।

জাতীয় মহাসভা ১৭৯১ সালে একটি সর্বজনীন বে-সামরিক আইন বিধি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। ১৭৯২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণ চার্চের এক্তিয়ারের বহির্ভূত করা হয় এবং নতুন বিবাহ বিচ্ছেদ আইন রূপায়ণের চেষ্টা হয়। নেপোলিয়ানের আইন বিধি সংগ্রহ (Code Nepoleon) (১৮০৪-১৮০৬) দেওয়ানি আইন বিধি প্রক্রিয়া ও ফৌজদারির আইন বিধি প্রক্রিয়া একাধারে রোমান ও প্রচলিত লৌকিক বিধির সমন্বয় সাধন করে। ওই আইন বিধি ১৯ শতকের চিন্তা-ভাবনার ফসল এবং এর মধ্যে সমকালীন সমাজ বিপ্লবের স্ফুরণ লক্ষ করা যায়। এর বৈপ্লবিক প্রভাব আর্থ-সামাজিক বিধি ব্যবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, যার প্রভাব শুধু ফ্রান্স নয় প্রতিবেশী বেলজিয়াম, হল্যান্ড, লুকসেমবার্গ ও সুইজারল্যান্ডেও লক্ষ করা যায়। নেপোলিয়ানের আইন বিধির লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, বিচার ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করা ও আঞ্চলিক আইন বিধির বৈচিত্র্য লোপ করে জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি করা, আইনগত সমতা, ধর্মের স্বাধীনতা ও শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্রের পত্তন করা। নেপোলিয়ান মেট্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও বৈপ্লবিক কালপঞ্জী শেষ পর্যন্ত বাতিল করেন (১৮০৬)।

নেপোলিয়ানের আইন সংস্কার প্রাক্ বিপ্লবী ফ্রান্সের প্রচলিত তিনশো প্রকারের আইন বিধির জটিলতা সংশোধন করে। এর ফলে দক্ষিণ ফ্রান্সে প্রচলিত রোমান আইন ও উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত আঞ্চলিক আইন বিধির বিরোধ কিছুটা হ্রাস পায়। পারিবারিক ক্ষেত্রে পিতার কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে এবং বিবাহ বিচ্ছেদের কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে নেপোলিয়ান তাঁর রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ফরাসি কনভেনশনের ঘোষিত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অধিকারের

সমতা রূপায়ণ না করে তিনি স্ত্রীকে স্বামীর নিয়ন্ত্রণে থাকার পোষকতা করেন। রাষ্ট্রের স্নায়ুকেন্দ্র হিসাবে প্রশাসনে নেপোলিয়ানের অন্যতম প্রেরণা সংস্কার হল প্রশাসনের কেন্দ্রীয়করণ নীতির পোষকতা করা। তিনি বুরবোঁ রাজাদের স্বৈরতান্ত্রিক প্রশাসনিক ঐতিহ্যকে অচেতনভাবে গ্রহণ করেছিলেন। অপরদিকে সমকালীন গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের মৌল ধারণা গণসার্বভৌমত্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেননি। তিনি বার বার ঘোষণা করেছিলেন যে, তার শক্তির উৎস আংশিকভাবে অতীত এবং আংশিকভাবে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা। তাঁর এই বৈপরীত্যের ছাপ ক্যাথলিক চার্চ পুনর্গঠনে লক্ষ করা যায়।

আজন্ম করসিকা, ইটালি ও ফ্রান্সের ক্যাথলিক ধ্যান-ধারণায় লালিত হওয়ায় নেপোলিয়ান অষ্টাদশ শতকের Enlightenment আন্দোলনের মধ্যমণি ভলটেয়ারের প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। জনগণের উপর ধর্মীয় প্রভাব সম্পূর্ণ উৎখাত না করে নেপোলিয়ান ক্যাথলিক চার্চকে ফরাসি সমাজ নিয়ন্ত্রণের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। চার্চের প্রধান ভূমিকা ছিল আইন অনুমোদিত প্রশাসনের প্রতি আস্থা ও আনুগত্য। চার্চের ঘোষিত নীতি ও শৃঙ্খলাকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতেন। ফলে ১৮০০ সালে ক্যাথলিক চার্চের কর্ণধার পোপের সঙ্গে এক বোঝাপড়া করেন যা ইতিহাসে ১৮০১ সালের Concordat বা বোঝাপড়া নামে পরিচিত। এই চুক্তির মাধ্যমে ক্যাথলিক চার্চও পোপ ফরাসি সাধারণতন্ত্রকে স্বীকৃতি জানায়। ফলে ইউরোপের রাজন্যবর্গের সঙ্গে ক্যাথলিক চার্চ ও পোপের রাজনৈতিক বোঝাপড়া কঠিন হয়। এর আর একটি পরোক্ষ ফল হল দেশত্যাগী রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী অভিজাত শ্রেণির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের প্রতিবাদ তুলে ধরা। তবে ক্যাথলিক ধর্ম কেবলমাত্র ফরাসি জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ধর্ম হিসাবে চিহ্নিত হল। ১৮০১ সালের ধর্মীয় আপস আধুনিক ফরাসি রাষ্ট্রের অন্যতম বুনিয়াদ হিসাবে গণ্য করা হয়।

প্রাক্-বিপ্লবী ফ্রান্সের সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা আদৌ সন্তোষজনক ছিল না। দীর্ঘদিনের সামরিক ও বেসামরিক অভ্যুত্থান শিক্ষার জগতে এক ব্যাপক সংকট সৃষ্টি করেছিল। ১৭৯০ সালে পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হলে বিপ্লবীরা এক নতুন শিক্ষার পরিকাঠামো গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। নেপোলিয়ানের সময় প্যারিস, সাসবুর্গ সেঁস্পেলিয়ার প্রভৃতি নগরে মেডিকেল বিদ্যালয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগের শিক্ষা কেন্দ্র (ইকোল পলিটেকনিক) বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ইকোল নরমালিস, নব প্রতিষ্ঠিত কলা ও বিজ্ঞানের জন্য পৃথক জাতীয় শিক্ষা কেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পূরণ না করলেও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার উচ্চতর শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে।

ডিরেকটরি শাসনকালে ফরাসি সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে কোনো বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি কিছুটা উন্নতমানের হলেও ছাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের আদর্শ ছিল নিতান্তই সঙ্কীর্ণ। নেপোলিয়ানের আমলে শিক্ষার পরিকাঠামোর গুণগত পরিবর্তন ঘটে। প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে স্থানীয় পৌর প্রশাসন ও অভিভাবকেরা যৌথভাবে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। মাধ্যমিক স্তরে এক ধরনের উচ্চবর্গীয় বিদ্যালয় Lycec প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়গুলি মূলত সামরিক বিদ্যালয় হিসাবে গঠিত হলেও সাহিত্য বিজ্ঞান সমানভাবে পাঠ্যসূচিতে স্থান পেয়েছিল। ১৮০৬ সালে প্যারিস মহানগরীতে এক রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় যা সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যের সকল বিভাগকে একটি সরকারি বিভাগ হিসাবে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। তিনি অর্থনৈতিক সম্পদের সদব্যবহারের জন্য গবেষণার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর শিক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল স্বাদেশিকতা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, নাগরিক ও দক্ষ প্রশাসক গড়ে তোলা। নেপোলিয়ানের শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে তার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষত নারীজাতির প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ পায়। তিনি নারীজাতির প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্ত্রী ও জননীর দায়িত্ব বহন করবে এই সঙ্কীর্ণ আদর্শের পোষকতা করতেন যার অর্থ হল গৃহের অভ্যন্তরেই নারীজাতির একমাত্র আশ্রয় স্থান।

৩.৪ নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য ও ইউরোপের পুনর্গঠন

১৮০৩ খ্রিঃ পর্যন্ত নেপোলিয়ান ফ্রান্সের 'প্রাকৃতিক সীমারেখা' অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হলেও ফরাসি জনসাধারণের কাছে সাম্রাজ্যবাদী ভাবমূর্তিকে প্রকট করে তোলেননি। নেপোলিয়ানের চরম শত্রু ইংল্যান্ডও মনে করেছিল যে, ইউরোপে শান্তি বজায় রাখতে আগ্রহী ছিলেন নেপোলিয়ান। তবে রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ না করলেও সামরিক গৌরব ও ক্ষমতার লোভ ছিল তার সহজাত। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন, 'শক্তি আমার রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রেরণা, শিল্পী যেমন তার শিল্প সৃষ্টিকে ভালোবাসে আমি সেইরূপ শক্তির উপাসনাকে আমার আরাধ্য দেবী হিসাবে দেখি'। তবে নিছক ক্ষমতার লোভই নেপোলিয়ানকে সাম্রাজ্য গঠনে অনুপ্রাণিত করেনি। ঐতিহাসিক সোরেল (Sorel) ইঙ্গিত করেছেন যে, বিপ্লব চলাকালীন ফ্রান্সে প্রাকৃতিক সীমানা সুরক্ষা করার নীতি রূপায়ণ করতে গিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, 'নেপোলিয়ানের বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য ছিল ইংল্যান্ডের পরাজয়। নেপোলিয়ানের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল ইংল্যান্ডের বিরোধিতা। নেপোলিয়ানের মূল লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সের স্বার্থ রক্ষা করা।' তবে এই সকল ধ্যানধারণা সত্ত্বেও ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যে সাময়িক যুদ্ধ বিরতি আমিয়ান্সের (Amiens) সন্ধির দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাহা দীর্ঘস্থায়ী হওয়া সম্ভব ছিল না। ১৮০৩ খ্রিঃ পর নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের নেতৃত্বে প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়া তৃতীয় কোয়ালিশন গড়ে তুলল। কিন্তু ১৮০৫-১৮০৭ সালের মধ্যে নেপোলিয়ান ইউরোপের শক্তিশালী রাজ্যগুলিকে একে একে পরাজিত করেছিলেন। নেপোলিয়ানের চমকপ্রদ বিজয়ের প্রথম পদক্ষেপ অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অস্টারলিজের যুদ্ধ (২ ডিসেম্বর, ১৮০৫)। জেনা ও অয়ারস্টাটের যুদ্ধে প্রাশিয়া পরাজিত হল। তারপর নেপোলিয়ান ১৮০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আইলাউ ও ফ্রিডল্যান্ডের যুদ্ধে রাশিয়াকে পরাস্ত করেন। রাশিয়ার জার আলেকজান্ডার তার মিত্র ইংল্যান্ড ও প্রাশিয়ার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে নেপোলিয়ানের সাথে টিলসিটের সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হলেন (জুলাই, ১৮০৭) এইভাবে নেপোলিয়ান ১৮০৫ থেকে ১৮০৭ সালের মধ্যে ইউরোপের তিনটি শক্তিশালী দেশকে পরাজিত করে এবং রাশিয়াকে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ করে তার ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে আরোহন করেন।

নেপোলিয়ানের আকস্মিক অভ্যুত্থান ইউরোপে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। তিনি সমগ্র ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রকে ইচ্ছামতো পরিবর্তন করে এবং বিভিন্ন দেশের রাজাদের সিংহাসনচ্যুত করে কার্যত এক নতুন ইউরোপের জন্ম দেন। নবগঠিত এই ইউরোপের মৌলিক ভিত্তি ছিল তার প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য। কারণ ফ্রান্সের অভ্যন্তরে ১৮০৪ সালের পর নেপোলিয়ান সাধারণতন্ত্রের কাঠামো ধ্বংস করে তার ব্যক্তিগত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যার নেপথ্যে ছিল তার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ইউরোপীয় যুদ্ধের সামরিক প্রয়োজন ও তার আরোপিত মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা। অবশ্য নেপোলিয়ান কোনো একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক ছক অনুসরণ করেননি। ইউরোপের যে দুটি অঞ্চলে নেপোলিয়ানের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল এবং আমূল রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল তা হল ইটালী ও জার্মানি। অসংখ্য ছোটো ও বড়ো রাষ্ট্রে তখন ইটালী ও জার্মানি বিভক্ত ছিল। দুটি দেশের উপরই অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। অস্ট্রিয়ার হ্যাপস্‌বার্গ বংশীয় রাজারা একই সঙ্গে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য ও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের রাজমুকুট পরতেন। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রাচীন ঐতিহ্য ক্রমশ এক ধূসর স্মৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। নেপোলিয়ান মধ্যযুগের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে অস্ট্রিয়ার ক্ষীণ যোগসূত্র ছিন্ন করে ইউরোপের রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের পথ প্রশস্ত করেন। অস্ট্রিয়ার পরাজয়ের ফলে ইটালীর রাজনৈতিক জগতে ব্যাপক পরিবর্তন-এর সূচনা হয়েছিল। সেই সময় ইটালী চারটি প্রধান রাজ্যখণ্ডে বিভক্ত ছিল—উত্তর ইটালীর পিডমন্ট ও লম্বার্ডি, নেপোলিয়ানের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন মধ্য

ইটালীর টাস্কানী, পার্মা, মডেনা, লুক্কা, বুর্বো শাসিত দক্ষিণ ইটালীর নেপলস ও সিসিলি এবং পোপের অধীন রোম রাজ্য।

জার্মানিতে নেপোলিয়ানের রাজনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ আরও চমকপ্রদ। নেপোলিয়ান জার্মান রাজনৈতিক জটিলতা সরলীকরণ করতে চেয়েছিলেন। এর জন্য তিনি ১৮০৬ সালের জুলাই মাসে রাইন কনফেডারেশন গঠন করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিতে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুগ্ম শক্তি খর্ব করা। রাইন সংযুক্ত রাজ্যের অন্যতম সদস্য হিসাবে ব্যাভেরিয়া, স্যাকসনী, উট্রেখবার্গ সহ আরও কয়েকটি জার্মান রাষ্ট্র অস্ট্রিয়ার কিছু কিছু অঞ্চল দখল করে শক্তিশালী হয়। এছাড়া হ্যানোভার, ব্রান্সউইক, হেসী-ক্যাসেল প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যাংশ নিয়ে ওয়েস্ট ফেলিয়া রাজ্য গঠন করা হল। প্রাশিয়া ও রাশিয়ার কিছু অংশ নিয়ে তিনি গঠন করলেন আরেকটি রাজ্য, যার নাম গ্রান্ডডাচি অব ওয়ারস। এর পরিচালনার ভার দেওয়া হল স্যাকসনীকে। জার্মানির রাজনৈতিক পুনর্গঠনের ফলে মোট জার্মান রাষ্ট্রের সংখ্যা ৩০০টি থেকে ৩৯টি রাষ্ট্রে হ্রাস পায়।

ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলেও পরিবর্তন ঘটেছিল। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হল্যান্ড রাজ্য ও সুইস কনফেডারেশন। নেপোলিয়ান ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যখণ্ড পরিবর্তন করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি সেই সব রাষ্ট্রে কর্ণধার হিসাবে পূর্বতন শাসকদের অপসারিত করে নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা অনুচরকে নিয়োগ করেন। এই নীতি অনুসরণ করেই তিনি তার ভাই লুইকে হল্যান্ডে, আর এক ভাই জেরোমকে ওয়েস্ট ফেলিয়ায়, নিজের সৎপুত্র ইউজিনকে লম্বার্ডিতে, আর এক ভাই যোসেফকে প্রথমে নেপলস ও পরে স্পেনের রাজা হিসাবে নিযুক্ত করেন। নেপোলিয়ান নিজেকে ইটালীর রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন।

৩.৫ নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের স্বরূপ ও তাৎপর্য

নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের সমগ্র ইউরোপে এক নবযুগের সূচনা করেছিল। অধ্যাপক ডেভিড টমসন যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'ইউরোপে কখনই তার পুরানো ব্যবস্থায় ফিরতে পারেনি। যদিও তার পতনের পর অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ব্যাপকভাবে পুরতন ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হয়। বস্তুত যেখানেই নেপোলিয়ানের সেনাবাহিনী প্রবেশ করেছিল, সেখানেই পুরাতন ব্যবস্থার পতন হয়েছিল।' নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য-এ আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ সামন্ততান্ত্রিক ভৌম ব্যবস্থার অবলুপ্তি। তার সাম্রাজ্যে চার্চের সর্বগ্রাসী প্রভাব হ্রাস, মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও কৃষকদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং কর ব্যবস্থাকে সুষম ও দক্ষ করা হয়। অবাধ বাণিজ্যের পথে অভ্যন্তরীণ শুল্কের বাধা অপসৃত হয়। গিল্ডগুলির বিশেষ সুযোগ সুবিধা তুলে দেওয়া হয়। প্রশাসন ও সমাজ ব্যবস্থায় যোগ্য ব্যক্তির সমাদর, বংশ কৌলিন্যের চেয়ে গুরুত্ব লাভ করে। ফলে সমগ্র ইউরোপে এক মুক্তির পরিবেশ তথা আধুনিক ধনতান্ত্রিক পরিবর্তনের পথ উন্মুক্ত হয়। সেই সঙ্গে বৈপ্লবিক ভাবধারা ও রোমান আইনের অপূর্ব সমন্বয়ের ফলশ্রুতি কোড নেপোলিয়ান ইউরোপের সর্বত্র গ্রহণীয় হয়। ফরাসি বিপ্লব যা করতে পারেনি, নেপোলিয়ান সেই অসম্পূর্ণ কর্মসূচিকে সার্থকতার রূপ দিতে পেরেছিলেন। নেপোলিয়ান তার সাম্রাজ্যের মাধ্যমে সমগ্র ইউরোপে বিপ্লবকে সম্প্রসারিত করেছিলেন। নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য ক্ষণস্থায়ী হলেও তিনি ছিলেন ইউরোপীয় বিপ্লবের প্রতীক। নিজের অজ্ঞাতসারে নেপোলিয়ান জাতীয়তাবাদ ও উদারনীতিবাদের জন্ম দিয়েছিলেন। যা ইটালী, জার্মানি, পোল্যান্ড তথা সমগ্র পূর্ব ইউরোপে এক নতুন স্বাদেশিক চেতনার সৃষ্টি করেছিল। জীবনের শেষ পর্বে জাতীয়তাবাদ ও উদারনীতিবাদের স্পর্শ থেকে বিচ্যুত হলেও ফরাসি বিপ্লবের উত্তরাধিকারী হিসাবে নেপোলিয়ান কিছুটা অপরিকল্পিত ও দ্বিধাগ্রস্তভাবে ইউরোপে বৈপ্লবিক মুক্তির অগ্রদূত ছিলেন।

৩.৬ ফরাসি শাসনের যৌক্তিকতা

ফরাসি বিপ্লবের ঐতিহাসিকরা সন্ত্রাস শাসনের উত্থান-পতন-বন্ধুর অতি নাটকীয়তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করেও, এর গুরুত্বকে একেবারে নস্যাৎ করতে পারেন না। এর যৌক্তিকতা মূল্যায়ন প্রসঙ্গে এর সঠিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ও তার ফলশ্রুতি সম্পর্কে আলোচনা না করে এর উপর আলোকপাত করা সম্ভব নয়।

ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসে ১৭৯৩ খ্রিঃ সদ্যোজাত ফরাসি সাধারণতন্ত্রের এক চরম সংকট মুহূর্তে যা দেশের অভ্যন্তরেও বৈদেশিক ক্ষেত্রে নিদারুণ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছিল। সমগ্র দেশে গৃহযুদ্ধের এক ভয়াল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল। প্যারিস কমিউনের নিরঙ্কুশ আধিপত্য ফ্রান্সের অন্যান্য প্রদেশকে বিক্ষুব্ধ করেছিল এবং লিয়ঁ মার্সেই, বোর্দো এবং নান্তেস প্রভৃতি বহু নগরী বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবের ধ্বজা উত্তোলন করেছিল। এই সকল নগরী মনে করত অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট থেকে প্যারিস অধিক ক্ষমতা ভোগ করতে পারে না। এছাড়া ধর্মীয় বিরোধ থেকেই গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। ফ্রান্সের ব্রিটানী অঞ্চলের স্বল্প পরিচিত লা-ভেন্ডিতে কৃষকশ্রেণী বিদ্রোহ করেছিল। লা-ভেন্ডিতে কৃষক অভ্যুত্থান একদিকে ক্যাথলিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অপরদিকে রাজতন্ত্রে পুনরুজ্জীবনের জন্য তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ফ্রান্সের বাইরে ফরাসি সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক বিশাল ইউরোপীয় শক্তি গোষ্ঠী জোট বেঁধে ছিল।

জাতীয় কনভেনশনের সদস্যবৃন্দ দেশের এই অভূতপূর্ব সংকটের মোকাবিলা করার জন্য এক আপৎকালীন একনায়কতন্ত্র পত্তনের মাধ্যমে দেশের ঐক্য সংহতি রক্ষা ও দেশের মাটি থেকে বৈদেশিক অভিযান হঠিয়ে দিতে সংকল্পবদ্ধ হয়। সমকালীন জনপ্রিয় নেতা মারা (Marat) মন্তব্য করেছিলেন যে, 'আমরা স্বাধীনতার জন্য এক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব যাহা রাজন্যবর্গের স্বৈরতন্ত্রকে ধ্বংস করবে।' সন্ত্রাস প্রশাসনের তিন ধরনের কর্মসূচি লক্ষ করা যায়। রাজতন্ত্র ও প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সন্ত্রাস, অর্থনৈতিক সন্ত্রাস, খাদ্যের মজুতদার ও মুদ্রার অসৎ কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে এবং খ্রিস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মীয় সন্ত্রাস।

ফরাসি বিপ্লবের দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রেক্ষিতে সন্ত্রাস ও বিপ্লব প্রায় সমার্থক। সন্ত্রাসের ইতিবাচক দিকগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এর মূল্যায়ন সঠিক নয়। দেশত্যাগী সামন্ত প্রভুদের জমি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন ও সামন্ততান্ত্রিক দায় দায়িত্ব থেকে মুক্তি দান করা হয়। মজুতদার ও মুনাফাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিপ্লবীরা মেহনতী মানুষদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছিল। অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনে অনেক কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। ব্যাবসা-বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি হয়েছিল। কারিগরী শিক্ষা, দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা, এমনকি উপনিবেশগুলিতে দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদ করা হয়েছিল। ওজন, মাপ ও মুদ্রায় দশমিক ব্যবস্থা চালু করেছিল। তবে খ্রিস্ট ধর্ম বিলোপের জন্য নতুন ধর্মমত এবং বৈপ্লবিক বর্ষপঞ্জী জনপ্রিয় হয়নি। সুতরাং সন্ত্রাসের শাসনের অমানবিক নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার সত্ত্বেও এর কিছু গঠনমূলক দিকও ছিল।

ফ্রান্সে সন্ত্রাস শাসনের নেপথ্যে রয়েছে বৈপ্লবিক ঘটনা ধারার অমোঘ গতি এবং সন্ত্রাস ব্যতিরেকে ফরাসি বিপ্লবকে রক্ষা করা যেত না। সন্ত্রাস বিপ্লবকে রক্ষা করে। সন্ত্রাস ফ্রান্সের ঐক্যকে রক্ষা করে প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে ধ্বংস করে ও ফ্রান্সে বৈদেশিক অভিযানকে প্রতিহত করে। তবে দেশের সংকট অতিক্রম হওয়ার পরেও বিপ্লবী নেতা রোবসপিয়ার ফ্রান্সে সন্ত্রাস অক্ষুণ্ণ রাখেন। কারণ তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ ছিল নৈতিক উৎকর্ষের রাজত্ব (Reign of Virtue) প্রতিষ্ঠা। ফ্রান্সের অধিকাংশ জনগণ তার হিংস্র, চরমপন্থী মনোভাবের জন্য বিপ্লব সম্পর্কে ক্লান্ত ও উদাসীন হয়ে পড়েছিল। ফলে বৈদেশিক অভিযানের আশঙ্কা হ্রাস পেল এবং অভ্যন্তরীণ সংকট লুপ্ত হল তখন সন্ত্রাসের যৌক্তিকতার শেষ হল।

বহু ঐতিহাসিক অহেতুক রক্তপাতের জন্য সন্ত্রাসের রাজত্বের কঠোর সমালোচনা করেন। কিন্তু সন্ত্রাসের হিংস্র মনোভাবের জন্য নিন্দা করলে সন্ত্রাসের ইতিবাচক দিকগুলিকে উপেক্ষা করা হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক সন্ত্রাসকে এক দুর্ভাগ্যপূর্ণ দুঃস্বপ্ন হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে, সন্ত্রাসের রক্তপাতের বিষয়টি অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু বিপ্লবের সংকট মুহূর্তে ফ্রান্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সন্ত্রাসের দ্বারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ইংরাজ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স 'এ টেল অব টু সিটিজ'-এ বিপ্লবকালীন প্যারিস নগরীর যে চিত্র উপস্থাপনা করেছেন তা আদৌ ইতিহাসসম্মত নয়।

সন্ত্রাসের শাসনে জাতীয় কনভেনশন বহু ইতিবাচক সংস্কার কর্মসূচি রূপায়ণ করেছিল। সরকারি সন্ত্রাস প্রধানত ১৭৯৩ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে বৈপ্লবিক বিচারালয়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছিল। এই বিচার অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাজতন্ত্রী ষড়যন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় বিদ্রোহের বিরুদ্ধে যা প্যারিস কমিউনের সাঁকুল্যোৎ গোষ্ঠীর সন্দেহ নিরশন ও জন নিরাপত্তা পরিষদের জঙ্গী শাসনের সাম্য ও বৈপ্লবিক আদর্শের সাফল্য ঘোষণা করা। সাঁকুল্যোৎ গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার ফলে বৈপ্লবিক সরকার সর্বোচ্চ আইন দ্বারা মূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অভিযোগকে গুরুত্ব দেয়।

সন্ত্রাস প্রয়োজনীয় হলেও সন্ত্রাসকালীন যে অহেতুক রক্তপাত ও ভয়াবহ উচ্ছৃঙ্খলতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার কোনো যৌক্তিকতা নেই। প্যারিস নগরীতে বৈপ্লবিক বিচারালয় মোট ২৬৩৯ জন ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল এবং বিপ্লবী পরিষদ ১৭,০০০ জন মানুষকে হত্যা করেছিল। এছাড়া নির্বিচারে প্রাণদণ্ডের বলি হিসাবে ৪০,০০০ আরও মানুষ সন্ত্রাসের শিকার হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকে আদৌ অপরাধী ছিল না। প্যারিসের বাইরে বিভিন্ন প্রদেশে নিরীহ মানুষের অকারণ রক্তপাত ঘটেছিল—যার উদ্যোক্তা ছিলেন কনভেনশনের প্রেরিত জননিরাপত্তা পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরা। ক্যারিয়ের নামে জনৈক জ্যাকবিন নেতার নির্দেশে লিঁয় শহরের বিদ্রোহীদের পাইকারিভাবে লয়ার নদীর জলে হত্যা করার ফলে মৃতদেহ পচে নদীর জল কলুষিত হয়।

সন্ত্রাসের শাসনের সবচেয়ে ভীতিপ্রদ বৈশিষ্ট্য হল, চরমপন্থী বিপ্লবী গোষ্ঠীর আদর্শগত বিরোধ তথা অন্তর্ঘাতের অনিবার্য পরিণতি বহু মানুষের অহেতুক প্রাণনাশ হয়। জিরেন্দিন নেতা দাঁতো, মাদাম, রোঁলা প্রমুখ বহু জননেতা সম্পূর্ণ অকারণে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। তাঁরা অন্যান্য বিপ্লবীদের থেকে স্বাদেশিক চেতনায় কম উদ্বুদ্ধ ছিলেন না অথবা বিপ্লবী আদর্শের বিরোধী ছিলেন না। তাদের একমাত্র অপরাধ তাঁরা ক্ষমতালোভী জ্যাকোবিন নেতাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুগামী ছিলেন না। সন্ত্রাস শ্রেণি যুদ্ধের হাতিয়ার ছিল না। ঐতিহাসিক লেফেভর ও কোবানের মতে, গিলোটিনে যারা প্রাণ দিয়েছিল তাদের শতকরা ৮৫ জনই তৃতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত যাজক ও অভিজাতদের মধ্যে যথাক্রমে ৬.৫ ও ৮.৫ শতাংশ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। ডেভিড টমসনের মতে, সন্ত্রাসে যারা প্রাণ দিয়েছিল তাদের শতকরা ৭০ জন ছিল কৃষক ও সাঁকুল্যোৎ গোষ্ঠীর মানুষ।

তবু সন্ত্রাসের শাসনের ভয়াবহতা নিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলাও অনুচিত। এর ফলে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়েছিল বলে মনে করার কারণ নেই। বাস্তিল দুর্গের পতনের সময় থেকেই ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ অশান্তি ও হিংসাশ্রয়ী ঘটনার সঙ্গে অনেকটা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। সুতরাং সন্ত্রাস তাদের কাছে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। তবে সন্ত্রাসের শাসন সম্ভব হয়েছিল। কারণ তার পূর্বেকার সকল পরিচিত সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও সন্ত্রাসের সপক্ষে বলা যেতে পারে যে, ইহা বিপ্লব ও সাধারণতন্ত্রকে রক্ষা করেছিল। সন্ত্রাস ১৭৯৪ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। তারপর ওই স্বৈরাচারী শাসন যখন রোবসপিয়ারের একক শাসনে রূপান্তরিত হয় তখন সন্ত্রাস শাসনের সকল যৌক্তিকতা নিঃশেষিত হয়েছিল।

৩.৭ ডিরেকটরি শাসন (১৭৯৫-১৭৯৯)

জাতীয় কনভেনশনের পর ফ্রান্সে ডিরেকটরি শাসন শুরু হয়। ১৭৯৫ সালে জাতীয় কনভেনশনের যে ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ অবশিষ্ট ছিল তারা ১৭৯৩ সালের জ্যাকোবিন সংবিধানের সর্বজনীন ভোটাধিকার দাবি অগ্রাহ্য করে সম্পত্তির ভিত্তিতে এক সীমাবদ্ধ বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্র গড়ে তোলে। ১৭৯৫ সালের সংবিধান বিপ্লবের ইতিহাসে তৃতীয় বৎসরের সংবিধান (The Constitution the year III) নামে পরিচিত। এই সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য হল সম্পত্তির ভিত্তিতে নাগরিকদের ভোটের অধিকার প্রদান করা। কিন্তু সর্বজনীন ভোটের অধিকার স্বীকৃত হল না। আইন পরিষদ দুটি কক্ষে বিভক্ত করা হয়। ৫০০ সদস্য বিশিষ্ট গণপরিষদ ও ২৫০ সদস্য বিশিষ্ট উচ্চতর বর্ষীয়ান পরিষদ। প্রশাসনের কর্ণধার হিসাবে ৫ জন ডাইরেকটরদের নামানুসারে এই শাসন 'ডিরেকটরি শাসন' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই ৫ জনের মধ্যে প্রতি বছর একজন অবসর নেবেন এবং আইন পরিষদ ৫ বছরের জন্য এদের নির্বাচিত করবে। এই নয়া সংবিধানে প্রশাসন ও আইন পরিষদের মধ্যে মতবিরোধ হলে সেই সংকট সমাধানের কোনো ব্যবস্থা সংবিধানে না থাকায় ১৭৯৯ সালে এই সংবিধান নস্যাৎ হয়ে যায়।

একদিকে সন্ত্রাসের শাসনের ভয়াবহতা ও অন্যদিকে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট-এর চমকপ্রদ উত্থানের মধ্যবর্তী এই ৫ বছরের ইতিহাসকে কিছুটা অবহেলা করে ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেন। এই পাঁচ বছরের ইতিহাস পুরোপুরি বিপ্লবের অঙ্গীভূত না পুরোপুরি নেপোলিয়ানের জীবনের ইতিহাস। একথা স্বীকার করতে হবে যে, বিপ্লবের গতি সম্পূর্ণ রুদ্ধ না হলেও এর পরবর্তী পর্বে নেপোলিয়ানের একনায়কতন্ত্র স্থাপনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছিল। ডিরেকটরি শাসন ছিল বুর্জোয়া গণতন্ত্র—এতে অভিজাত এবং সাধারণ মানুষের ক্ষমতা স্বীকৃত হয়নি সংবিধানের দুর্বলতার ফলে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছিল। আইনসভা ও ডিরেকটরির মধ্যে সুষ্ঠু বোঝাপড়ার অভাব, সম্ভাব্য, বিরোধের মোকাবিলার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ডেভিড টমসনের মতে, দুর্নীতিপরায়ণ ডিরেকটরদের জন্য বিপ্লবের অপমৃত্যু ঘটেছিল।

বুর্জোয়া শ্রেণির একটি ভগ্নাংশের উপর নির্ভরশীল ও তীব্র অর্থনৈতিক সমস্যার মুখে দাঁড়িয়ে ডিরেকটারি শাসন শান্তিতে রাজত্ব করতে পারেনি। দক্ষিণপন্থী রাজতন্ত্রীদের সঙ্গে বামপন্থী জ্যাকোবিনদের বিদ্রোহ সামাল দিতে তারা সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করতে বাধ্য হন। এই আমলে প্যারিসের জীবনযাত্রার মান কল্পনাতীত ভাবে বেড়ে যায়। ১৭৯০-এর তুলনায় ১৭৯৫-এর নভেম্বরে মূল্যমান পাঁচ হাজার গুণ বৃদ্ধি পায়। গরিব জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিল না। চরম বামপন্থী নেতা ব্যাবুফের উদ্যোগে সাম্যবাদী বা কমিউনিস্ট সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের এই ছিল সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা। ডেভিড টমসনের মতে, ব্যাবুফের আন্দোলন নিয়ে অনেকেই বাড়াবাড়ি করেছেন এবং তাঁর প্রাপ্য মর্যাদার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছেন।

তবে বামপন্থীরা নয়, ডিরেকটরির বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল দক্ষিণপন্থী রাজতন্ত্রীরা। ১৭৯৭ সালের আকস্মিক নির্বাচনে ২১৬টি আসনের মধ্যে পুরনো কনভেনশনের ১১ জন সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচিত সদস্যের অধিকাংশ ছিলেন রাজতন্ত্রী এবং আইন সভার দুই কক্ষেই রাজতন্ত্রী সভাপতি নির্বাচিত হয়। তবে কৃষকরা কখনই চায়নি, যে চার্চ তার পুরানো ভূসম্পত্তি ও সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা ফিরে পাক। বিপ্লবের ফলে যে সব মধ্যবিত্ত আরও বিত্তশালী হয়েছিল, তারাও রাজতন্ত্রীদের পুনর্বাসন চায়নি। ৫ জন ডিরেকটরদের মধ্যে তিনজন প্রজাতন্ত্রী। এর মধ্যে বারাস, রিউবেল (Rewbell) এবং লা র‍্যাভেলিয়ার লেপকস্ (La Reveilliere lepeaux) প্রজাতন্ত্রী ছিলেন। ১৭৯৭ সালের ৪ সেপ্টেম্বর প্রজাতন্ত্রীরা সেনানায়ক নেপোলিয়ান ও ফুচে এবং বারাসের উপর নির্ভর করে রাজতন্ত্রীদের ক্ষমতা ধ্বংস

করে দেয়। দু'জন রাজতন্ত্রী ডিরেকটরকে বন্দি করা হয় এবং আইন সভার ২১৪ জন সদস্যকে বিতাড়িত করা হয়। প্রজাতন্ত্রীদের জয় সাংবিধানিক পদ্ধতিতে হল না। অস্ত্রের উপর নির্ভর করেই রাজতন্ত্রীদের শায়েস্তা করা হল। ১৭৯৫ সালের সংবিধান ব্যর্থ প্রমাণিত হল।

১৭৯৭ সালের পর ডিরেকটরগণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্য নতুন মুদ্রা চালু করে, কর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করে। কৃষি উৎপাদন ভালো হওয়ায় সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। শিল্পের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফ্রান্সের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও শূন্যতার পরিপ্রেক্ষিতে তরুণ নায়ক নেপোলিয়ানের একনায়কতন্ত্র স্থাপনের পথ উন্মুক্ত হয়। এই প্রসঙ্গে ডিরেকটরি বৈদেশিক নীতি ছিল তাঁর অভ্যন্তরীণ নীতির পরিপূরক। অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক বিরোধিতা ও সাংবিধানিক নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে সেনানায়ক নেপোলিয়ানের ইতালি অভিযান ডিরেকটরির শাসনের জনপ্রিয়তা ফেরাবার শেষ চেষ্টা হিসাবে তুলে ধরা হয়। ১৭৯৬-৯৭ সালে নেপোলিয়ান ১২টি যুদ্ধে অংশ নিয়ে প্রতিটিতে জয়ী হন। সার্ডেনিয়া রাজ্যকে পরাজিত করে স্যাভয় ও নীস্ ফ্রান্সের দখলে আনেন। আরকোলা ও রিভোলির যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে ১৭৯৭ সালে ক্যাম্পোফর্মিও চুক্তি অনুসারে অস্ট্রিয়ান নেদারল্যান্ড, রাইন নদীর বাম তীরের অঞ্চল এবং উত্তর ইতালির সিজালপাইন (Cisallpine) প্রজাতন্ত্রের উপর ফ্রান্সের অধিকার অস্ট্রিয়া মেনে নেয়। নেপোলিয়ান এরপর পোপের রাজ্য আক্রমণ করে প্রচুর অর্থ পান। ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ান মিশর অভিমুখে অভিযান শুরু করেন। তিনি প্রথমে মাল্টা ও আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন। তারপর নেপোলিয়ানের ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়। ইংরাজ নৌ-সেনাপতি নেলসনের হাতে নীলদের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। তাঁর মিশর অভিযানের ফলে তুরস্ক, রাশিয়া ফ্রান্সের উপর চটে যায়। এই দুটি রাষ্ট্র নিকট-প্রাচ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও আপাতত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় শক্তি জোটে যোগ দেয়। ডিরেকটরির বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। প্রাথমিকভাবে কনভেনশন ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমানা অর্থাৎ আলপস, রাইন ও পিরেনীজ সুরক্ষিত করবার লক্ষ্য ত্যাগ করে চরম আগ্রাসী নীতি অনুসরণ-এর মধ্যেই ভবিষ্যৎ ইউরোপীয় যুদ্ধের বীজ লুকিয়ে ছিল। অবশ্য নেপোলিয়ানের ইতালি, ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, রাইনল্যান্ড ও স্যাভয়—যেখানেই ফরাসি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানেই ফরাসি আইন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। সামন্ততন্ত্র, সার্ফ প্রথার অবসান, চার্চের ভূ-সম্পত্তি পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে ফরাসি বিপ্লব ইউরোপীয় বিপ্লবে পরিণত হয়। সুতরাং ফ্রান্সে বিপ্লবের গতি মন্দীভূত হলেও ডিরেকটরি শাসন ক্রমশ ইউরোপীয় বিপ্লবের সূচনা করেছিল। অধ্যাপক কোবান (Cobban) যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'ডিরেকটরি শাসনের কাজকে অবমূল্যায়ন করে কন্সাল শাসনের কাজের অতি মূল্যায়ন করা হয়।'

৩.৮ সারাংশ ঃ নেপোলিয়ান বোনাপার্টের অভ্যুত্থান পর্ব (১৭৯৫-১৮০৭)

ফরাসি বিপ্লবের এক সংকট মুহূর্তে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট শুধু ফ্রান্স নয় পশ্চিম ইউরোপের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিপ্লবের একচ্ছত্র নায়ক হিসাবে দুই দশক ধরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৭৬৯ খ্রিঃ কর্সিকার এক প্রান্তিক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ও ফ্রান্সে বিপ্লবের প্রাক্কালে সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করেন এবং ১৭৯৩ সালের জুন মাসে ফরাসি গোলন্দাজ বাহিনীতে যোগদান করেন। ১৭৯৬ সালে ডিরেকটরি শাসনের মধ্যমণি ব্যারাসের অঙ্গুলি হেলনে এই অপরিচিত অর্ধ ইতালিয়ান-কর্সিকান সেনানায়ক ইতালি অভিযানের সর্বাধিনায়ক পদে নিযুক্ত হন। ডিরেকটরি প্রশাসনের অগ্নিগর্ভ অর্থনৈতিক সংকট দুর্নীতি স্বাভাবিকভাবেই নেপোলিয়ানের উত্থানকে ত্বরান্বিত করেছিল। অবাধ মূল্যবৃদ্ধি একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের দুঃখ ও অভাবকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল, অন্যদিকে দুর্নীতিপরায়ণ ধনিক

গোষ্ঠীর হাতে প্রচুর অর্থ সম্পদ জমেছিল। ফলে উগ্র দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী আন্দোলনের চাপে ডিরেকটরি শাসনের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছিল। নেপোলিয়ান সেই সুযোগে ১৭৯৯ সালে প্রথম কনসাল ও ১৮০৪ সালে সম্রাটপদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন : নেপোলিয়ান প্রথম কনসাল হিসাবে ফ্রান্সের প্রশাসনে সর্বত্র এক অসাধারণ আশা-উদ্দীপনার বাতাবরণ সৃষ্টি করেন। ডিরেকটরি শাসনের ধ্বংসস্তূপের উপর প্রথম কনসাল হিসাবে নেপোলিয়ান নিজেকে বৈপ্লবিক ভাবধারার উত্তরাধিকারী হিসাবে উপস্থাপিত করেন। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের উদার বাণীকে কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জনার মাধ্যমে তাকে স্থায়ীরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ নেপোলিয়ানের শাসনে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে গিয়ে ইউরোপীয় বিপ্লবে পরিণত হয়েছিল। জ্যাকোবিন দল যা করতে পারেনি নেপোলিয়ান তার সূচনা করেছিলেন।

প্রথম কনসাল হিসাবে নেপোলিয়ান ফ্রান্সের পুরাতন কেন্দ্রীভূত বুঁর্বো শাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠন করে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের পত্তন করেন। তিনি সযত্নে প্রশাসনিক পরিকাঠামো, আইন পরিষদ, বিচার ব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র, অর্থব্যবস্থা, শিক্ষা আইনবিধি এমনকি চার্চ ব্যবস্থাকেও আমূল পরিবর্তন করেন।

ইউরোপের পুনর্গঠন ও সাম্রাজ্য পরিকল্পনা

'শক্তি আমার রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রেরণা, শিল্পী যেমন তার শিল্পসৃষ্টিকে ভালোবাসে, আমি সেইরূপ শক্তির উপাসনাকে আমার আরাধ্য দেবী হিসাবে দেখি।' তবে নিছক ক্ষমতার লোভই নেপোলিয়ানকে সাম্রাজ্য গঠনে অনুপ্রাণিত করেনি। ঐতিহাসিক ফেরেল মন্তব্য করেছেন বিপ্লব চলাকালীন ফ্রান্সে প্রাকৃতিক সীমানা সুরক্ষা করার নীতি রূপায়ণ করতে গিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ১৮০৫-১৮০৭ সালের মধ্যে ইউরোপের অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়াকে পরাস্ত করে টিলসিটের সন্ধিতে ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে আরোহণ করেন।

নেপোলিয়ান সমগ্র ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রকে ইচ্ছামতো পরিবর্তন করে এবং বিভিন্ন দেশের রাজাদের সিংহাসনচ্যুত করে কার্যত এক নতুন ইউরোপের জন্ম দেন। নেপোলিয়ান ১৮০৬ সালে অস্ট্রিয়ার পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটিয়ে ইউরোপের রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের পথ প্রশস্ত করেন। অস্ট্রিয়ার প্রভাব খর্ব করে ইতালির চারটি খণ্ড রাজ্য— উত্তর ইতালির পিডমন্ট ও লম্বার্ডি। মধ্য ইতালির ট্রস্কানী, পার্মা, মডেনা, লুককা ও পোপের শাসিত রোম নগরী ও দক্ষিণ ইতালির নেপলস ও সিসিলি রাজ্যে নেপোলিয়ান জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষা দেন। জার্মানিতে নেপোলিয়ানের রাজনৈতিক সরলীকরণের কাজ আরও চমকপ্রদ। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের ধূসর অতীত অগ্রাহ্য করে নেপোলিয়ান রাইনের সংযুক্ত রাজ্য। ওয়েস্টফেলিয়া রাজ্য, গ্রান্ড ডাডি অব ওয়ারস প্রভৃতি নতুন জার্মান রাজ্য স্থাপন করে মোট জার্মান রাষ্ট্রের সংখ্যা ৩০০ থেকে ৩৯টি নাতিবৃহৎ রাজ্যে হ্রাস করেন। ইউরোপের পুরাতন রাজবংশের শাসকদের অপসারিত করে তার ভাই লুইকে হল্যান্ডে, আর এক ভাই যোশেফকে স্পেনের রাজা, সৎপুত্র ইউজিনকে লম্বার্ডিতে, ডাইজেরোমকে ওয়েস্টফেলিয়াতে নিযুক্ত করেন। নেপোলিয়ান নিজেকে ইতালির রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন।

একক ৪ □ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের পতন পর্ব (১৮০৭-১৮১৪)

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য
৪.১ প্রস্তাবনা
৪.২ নেপোলিয়ন—পতন পর্ব (১৮০৭-১৮১৫)
৪.৩ নেপোলিয়ান ও বৈপ্লবিক উত্তরাধিকার
৪.৪ সারাংশ
৪.৫ অনুশীলনী
৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

আপনি এই একক পড়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারবেন :

- নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের পতনের কারণ।
- জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পরস্পর বিরোধী—ভূমিকা আদর্শগত দ্বন্দ্ব।
- নেপোলিয়ান ও বৈপ্লবিক উত্তরাধিকার

৪.১ প্রস্তাবনা

নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য গঠনের কাজ শেষ হবার আগেই তার পতন সূচিত হয়েছিল। তাঁর সাম্রাজ্যের পতনের সাধারণ কারণ হল—স্পেনীয় ক্ষত, মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা ও মস্কো অভিযান। নেপোলিয়ানের ধারাবাহিক সাফল্যের একটি বড়ো কারণ হল সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত জন সমর্থন ছাড়া কোনো সাম্রাজ্যই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের দুর্বলতার আর একটি উৎস হল জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পরস্পর বিরোধী ভূমিকা।

ফরাসি বিপ্লবী নেপোলিয়ানকে বিপ্লবের পাদপ্রদীপে এনেছিল। ফরাসি বিপ্লব যা রূপায়িত করতে পারেনি, তিনি তা বাস্তবায়িত করতে পেরেছিলেন। তাঁর আবির্ভাব বিপ্লবের অবসান নয়, বিপ্লবের সম্প্রসারিত রূপ।

৪.২ নেপোলিয়ন-পতন পর্ব (১৮০৭-১৮১৫)

নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হবার আগেই তার পতন সূচিত হয়েছিল। ১৮১৫ সালে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজয়ের ফলে নেপোলিয়ানের রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তি ঘটে। তার পতনের তিনটি সাধারণ কারণ হল—স্পেনীয় ক্ষত, পোপের প্রতি অমর্যাদা সূচক আচরণ, ও মস্কো অভিযান—নেপোলিয়ান নিজে স্বীকার করে গেছেন। নিজেকে বিপ্লবের সন্তান হিসাবে গণ্য করলেও নেপোলিয়ান সাম্রাজ্য গঠনের ক্ষেত্রে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য বা শার্লামেনের সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁর মতো একজন বিচক্ষণ ও বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ বুঝতে পারেননি যে, সমগ্র ইউরোপের উপর ফ্রান্সের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ঊনবিংশ শতকে একান্তই অলীক স্বপ্ন।

নেপোলিয়ানের পতনের গভীরতর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ডেভিড টমসন বলেছেন যে, যে কর্মপন্থার মাধ্যমে তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্যে নিহিত ছিল তার পতনের মূল বীজ। নেপোলিয়ানের ধারাবাহিক সামরিক সাফল্য ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার একটি বড়ো কারণ হল সামরিক শক্তি। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থন ছাড়া কোনো সাম্রাজ্যই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। নেপোলিয়ানের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

নেপোলিয়ানের পতনের আরেকটি কারণ হল তার বহু ঘোষিত বৈপ্লবিক নীতির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সাম্রাজ্য গঠনের নীতির স্ববিরোধিতা। রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বে ইউরোপে বিপ্লবের মূর্ত প্রতীক হিসাবে তার যে উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ছিল তা পরবর্তীকালে মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা প্রবর্তনের ফলে ম্লান হয়।

নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের স্ববিরোধিতার আরেকটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হল জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পরস্পর বিরোধী ভূমিকা। ইউরোপে বিশেষত ইটালী ও জার্মানিতে অস্ট্রিয়ার শক্তি ধ্বংস করেও প্রাশিয়াকে পরাস্ত করে এবং উভয় দেশে কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে ও কোড নেপোলিয়ানের মাধ্যমে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার করে তিনি ওই সব অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু এই জাতীয়তাবাদের প্রসার তার সাম্রাজ্যবাদী নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। ফলে সাধারণ মানুষের জাগ্রত জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তার সাম্রাজ্যবাদী ধ্যানধারণার সংঘাত বাধল।

১৮০৮ সালে উপদ্বীপিয় যুদ্ধে ফরাসি সেনাবাহিনীর বিপর্যয় ফ্রান্সের শত্রুপক্ষ ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও রাশিয়াকে উৎসাহিত করে। অধ্যাপক রুঁদে মন্তব্য করেছেন যে, এই পরাজয়ই নেপোলিয়ানের চূড়ান্ত পতনের পথকে প্রশস্ত করেছে।

১৮০৮ সালের জুলাই মাসে নেপোলিয়ান তাঁর ভাই যোশেফকে স্পেনের রাজপদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু যোশেফের মাদ্রিদ পৌঁছানোর পূর্বেই স্পেনের গণঅভ্যুত্থানের সূচনা হয়। স্পেনের কৃষক শ্রেণির গেরিলা যুদ্ধের অসাধারণ প্রয়োগ, ব্রিটিশ নৌ-শক্তির সমর্থন ও রাজনৈতিক সহযোগিতা ফরাসি প্রশাসনিক কাঠামোকে উৎখাত করে। রাজা যোশেফ মাত্র এগারো দিন মাদ্রিদে অবস্থানের পর রাজধানী থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হন। সমগ্র স্পেনে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে জাতীয় অভ্যুত্থানের সূচনা হয়। বিশিষ্ট ইংরেজ বাগ্মী শেরিডন আইবেরিয়ান উপদ্বীপের অভ্যুত্থানকে এক বিক্ষুব্ধ জাতীয় অভ্যুত্থান হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তবে এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ গ্রহণীয় নয়। কারণ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অভিজাত ও যাজক শ্রেণি যারা চার্চের ভূসম্পত্তি জাতীয়করণের বিরোধী ছিল। স্পেনের কৃষক শ্রেণি ক্যাথলিক ধর্মানুরাগী ছিল। বুঁরবো রাজবংশ এই রক্ষণশীল কৃষক শ্রেণিকে রাজতন্ত্রের সকল রাজনৈতিক সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রভাবিত করেছিল। স্পেনের এই গণঅভ্যুত্থান ছিল যথার্থই জাতীয় অভ্যুত্থান কারণ তা ব্যাপক জনসমর্থন পুষ্ট ছিল।

আইবেরিয়ান উপদ্বীপের অভ্যুত্থানের সামরিক ঘটনাবলীকে সংক্ষেপে ইঙ্গিত করতে হলে ফরাসি সেনাপতি মা সেনা ও শুল্টের মধ্যে নেতৃত্বের বিরোধ, ইংরেজ সেনাপতি ওয়েলিংটনের ১৮১২ সালে স্যালাম্যাংকা ও ১৮১৩ সালে ভিট্টোরিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ নেপোলিয়ানের জয়ের স্বপ্নকে স্পেন ও পর্তুগাল ধুলিসাৎ করে। নেপোলিয়ান এতদিন পর্যন্ত অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া প্রভৃতি স্বৈরাচারী রাজন্যবর্গের ভাড়াটে সৈন্যদের বিরুদ্ধে অল্পায়াসে যুদ্ধে জয়লাভ করতেন। উপদ্বীপের যুদ্ধে তিনি প্রথম জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ সেনাদলের সম্মুখীন হন এবং মহাদেশীয় অবরোধ জনিত ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংঘাত এই জাতীয় প্রতিরোধ সংগ্রামকে আরও গণসমর্থন পুষ্ট করেছিল।

নেপোলিয়ান ইউরোপে তার সামরিক আধিপত্য বিস্তারের পর রাশিয়া, হল্যান্ড ও স্পেনের সহযোগিতায় সমগ্র ইউরোপীয় মহাদেশে ব্রিটিশ পণ্য অনুপ্রবেশের ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক প্রবল আঘাত হানা। তিনি মনে করেছিলেন যে, ইউরোপের বিস্তীর্ণ বাজার থেকে ব্রিটিশ শিল্প পণ্যকে বহিষ্কার করতে পারলে ব্রিটিশ অর্থনীতি দ্রুত ভেঙে পড়বে।

নেপোলিয়ান ১৮০৬ সালের ১৬ মে ব্রিটিশ অর্ডার ইন কাউন্সিলের ঘোষণা অনুসারে ব্রেস্ট বন্দর থেকে এলবা পর্যন্ত উত্তর সাগর ও ইংলিশ চ্যানেলের সকল বন্দরগুলির অবরোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারপর ১৮০৬ সালের ২১ নভেম্বর তিনি বিখ্যাত বার্লিন ডিক্রি ঘোষণা করে সমগ্র গ্রেট ব্রিটেনকে অর্থনৈতিকভাবে অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, সমুদ্র পথে ফরাসি জাহাজ ব্রিটিশ নাগরিক বা ব্রিটিশ শিল্পপণ্য গ্রেপ্তার বা বাজেয়াপ্ত করতে পারবে। বার্লিন ডিক্রির বিরুদ্ধে ১৮০৭ সালের ৭ জানুয়ারি এক অর্ডার ইন কাউন্সিলের মাধ্যমে ব্রিটেন সব নিরপেক্ষ দেশের ফ্রান্স অথবা তার মিত্র শক্তিবর্গের সঙ্গে বাণিজ্যিক অবৈধ বলে ঘোষণা করে। টিলসিটের সন্ধির পর ফ্রান্সের অনুগত মিত্র হিসাবে রাশিয়া ও প্রাশিয়া ইংল্যান্ডের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন করে। এরপর বাল্টিক সাগরের বাণিজ্যে ডেনমার্ক ব্রিটিশ বাণিজ্য তরীর প্রবেশের বিরোধিতা করলে ইংল্যান্ড ১৮০৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন বন্দরে পর পর তিনদিন বোমা ফেলে ডেনমার্কের বাণিজ্য তরীগুলিকে নিজ নিয়ন্ত্রণে আনে। ইঙ্গ-ফরাসি বাণিজ্য অবরোধ নীতি পূর্বেকার মার্কেন্টাইল যুগের বাণিজ্যিক অবরোধ নীতিরই অনুসরণ মাত্র।

নেপোলিয়ান ১৮০৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর মিলান ডিক্রির মাধ্যমে সমগ্র ইউরোপীয় মহাদেশে ব্রিটিশ শিল্প পণ্য অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেন যে, যে সকল নিরপেক্ষ বাণিজ্য তরী ইংরেজ শিল্প পণ্য অথবা ইংরেজ যুদ্ধ জাহাজের সঙ্গে সহযোগিতা করবে ফরাসি যুদ্ধ জাহাজ সেগুলিকে অবৈধ বলে বাজেয়াপ্ত করবে। মিলান ডিক্রির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, নিরপেক্ষ জাহাজের মাধ্যমে ইউরোপে শিল্প পণ্যের আমদানি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। এর ফলে ইউরোপে ব্রিটিশ শিল্প পণ্যের বৃহৎ বাজারকে ধ্বংস করা সম্ভব হবে।

মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থার সার্বিক রূপায়ণে প্রধান তিনটি অন্তরায় হল—(১) প্রশাসনিক ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, (২) চোরাচালান বাণিজ্যের প্রকোপ বৃদ্ধি, (৩) ইউরোপীয় মহাদেশে ইংরেজ বাণিজ্য বিস্তারের ব্যাপক লাইসেন্স প্রথা। নেপোলিয়ানের সেনাবাহিনী, বন্দর রক্ষী বাহিনী, সীমান্তরক্ষী বাহিনী, স্থানীয় প্রশাসন ও বাণিজ্য শুল্ক বিভাগের অধিকাংশ কর্মচারী দুর্নীতি পরায়ণ হওয়ায় অবরোধ ব্যবস্থা কার্যকরী করা সম্ভবপর ছিল না। দ্বিতীয়ত, চোরাচালান বাণিজ্যের এক বিরাট অংশ উত্তর-পশ্চিম জার্মানি ও হল্যান্ড রাজ্যের মাধ্যমে পরিচালিত হত। এছাড়া চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জ, সার্ডিনিয়া, সিসিলি ও মাল্টা থেকে চোরাচালান ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ত। উত্তর ইউরোপের হেলিগোল্যান্ড দ্বীপ, ব্রিমেন ও হ্যামবুর্গ বন্দর থেকে চোরাচালান বাণিজ্য উত্তর ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। নেপোলিয়ান এই অবৈধ চোরাচালান বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য ১৮১০ সালের অকটোবর মাসে ফন্তেনব্লো ডিক্রি অনুসারে ইউরোপে ব্রিটিশ পণ্যের অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন। নেপোলিয়ানের বলপূর্বক ব্রিটিশ পণ্যের ইউরোপে অনুপ্রবেশের নিষিদ্ধকরণের এই আদেশ ফরাসি সাম্রাজ্যের বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থকে ক্ষুন্ন করে।

১৮০৭-১৮১০ সাল পর্যন্ত অবরোধ ব্যবস্থা ইংরেজ রফতানি বাণিজ্যক আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করলেও দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নতুন বাজারের সন্ধান ইংরেজ অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতিকে অনেকটা পূরণ করেছিল। ১৮১০-এর পর ইংরেজ অর্থনীতি মুদ্রাসংকট ও বেকারি সমস্যার অভূতপূর্ব মাত্রা বৃদ্ধি ব্যাপক মন্দা সৃষ্টি করেছিল। এই সময়ে নেপোলিয়নের ফন্তেনব্লো ডিক্রি ও ট্রিয়ানন শুল্কনীতি ইংরেজ অর্থনৈতিক সংকটকে ঘনীভূত করেছিল।

নেপোলিয়ানের চোরাচালান বাণিজ্যের নিষিদ্ধিকরণ ইউরোপে ব্রিটিশ পণ্যের বাজারকে সঙ্কুচিত করলেও নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক বিক্ষোভ সুনিশ্চিতভাবে নেপোলিয়ানের চূড়ান্ত পর্যায়ে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন তুলে ধরে।

নেপোলিয়ানের মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। ১৮১০-১৮১১ সালে ফ্রান্সে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল তাতে শুধু বুর্জোয়া শ্রেণিই নয়, ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণিও নেপোলিয়ানের উপর সন্তুষ্ট ছিল না। শ্রমিক ছাঁটাই ও বেকার সমস্যা গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল। মূল হাউসে (Mulhouse) ৬০ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ৪০ হাজার এবং লিওঁতে (Lyon) ২৫ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ২০ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে গিয়েছিল। ফলে মহাদেশীয় প্রথা জারি করে ইংল্যান্ডকে জব্দ করতে গিয়ে তিনি নিজেই জব্দ হয়ে যান। ইতিমধ্যে উপদ্বীপের যুদ্ধে নেপোলিয়ানের প্রথম সামরিক বিপর্যয় ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র অস্ট্রিয়ার হ্যাবসবুর্গ সাম্রাজ্যে এক নতুন আশার সঞ্চার করে। অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্ট্যাডিওন (Stadion) ও আর্চডিউক চার্লস ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা করলেও জার্মানিতে যতদিন ফরাসি সেনাবাহিনী অটুট থাকবে ও নেপোলিয়ানের মিত্র হিসাবে জার আলেকজান্ডার থাকবেন ততদিন এই ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব ছিল না।

নেপোলিয়ানের রুশ অভিযানের প্রথম সংকেত হিসাবে ১৮১১ সালে জার আলেকজান্ডার পোল্যান্ডে রুশ সেনা প্রবেশ করে ও মিত্র সন্ধানের জন্য ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সহযোগী হিসাবে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও পোল্যান্ডের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনা শুরু করেন। আলেকজান্ডারের বিরোধী মনোভাব সংবাদ পেয়ে নেপোলিয়ান যুগপৎ ভাবে কূটনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি প্রাশিয়া থেকে ফরাসি বিরোধী সকল ষড়যন্ত্র বন্ধের জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটার্ণিক নেপোলিয়ানকে ৩০,০০০ সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে রাজি হলেও গোপনে তার সৈন্যদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখেন। নেপোলিয়ান পোল্যান্ডের সীমানায় ২ লক্ষ সৈন্যসমাবেশ করলেও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতা বিরোধী জোটকে উৎসাহিত করে। জার আলেকজান্ডার সুইডেনের সাথে বন্ধুত্ব ও অটোম্যান সাম্রাজ্যের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের তিক্ততার অবসান করেন।

১৮১২ সালের ২৫ জুন ৪৫,০০০ সৈন্য সহ নেপোলিয়ান পোল্যান্ডের নিমেন নদী অতিক্রম করে প্রত্যক্ষ ভাবে রাশিয়া আক্রমণের উদ্যোগ নেন। নেপোলিয়ানের আকস্মিক রাশিয়া অভিযান সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে মারাত্মক ভুল। একশো বছর পূর্বে সুইডেনের দিগ্বিজয়ী বীর রাজা দ্বাদশ চার্লস পরাজয় বরণ করেছিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ান বিগত ১৫ বছরে ক্রমান্বয়ে জয়লাভের ফলে তার মনে এমন এক আশার সৃষ্টি হয়েছিল যে, সমগ্র ইউরোপে তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়াকে পরাজিত করতে পারলে তিনি পুনরায় মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা কার্যকরী করতে পারবেন। এমনকি ইংল্যান্ডকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারবেন। নেপোলিয়ান রুশ অভিযানে যে গ্র্যান্ড আর্মি গঠন করেছিলেন তার এক তৃতীয়াংশ ছিল বহু যুদ্ধে অভিজ্ঞ ফরাসি সেনাদল, কিন্তু রাশিয়ার প্রচণ্ড শীত এবং রুশ সেনাদের পোড়ামাটি নীতি গ্রহণের ফলে তার বিপুল সেনাদলের মধ্যে মাত্র ১,৬০,০০০ জন অবশিষ্ট থাকে। তিনি সেন্টপিটার্স বুর্গের নিকট স্মলনেট শহরে জার আলেকজান্ডারের সঙ্গে যুদ্ধ অথবা সন্ধির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সেনাবাহিনী নিদারুণ শৈত্যপ্রবাহে ধ্বংস হয়ে ১৮১২ সালের ডিসেম্বর মাসে মাত্র ৩০,০০০ সেনাসহ রুশ সীমান্ত অতিক্রম করে। নেপোলিয়ান যদি রাশিয়ার ভূমিদাস কৃষকদের মুক্তি দান করতেন তা হলে হয়তো জারের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক অন্তর্বিপ্লবের প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হত। কিন্তু নেপোলিয়ান এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অসম্মত হওয়ায় তাঁর অজেয় ফরাসী সেনাবাহিনী বিধ্বস্ত হয় ও তার চূড়ান্ত পতন ত্বরান্বিত হয়।

নেপোলিয়ান তখনও তাঁর আত্মবিশ্বাস হারাননি। তিনি ফ্রান্স ও তার অনুগত রাজ্যগুলি থেকে পুনরায় ৫ লক্ষ সৈন্য সমবেত করেন। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে তাঁর চুক্তি ও রাইন রাজ্যসংঘ ও ইটালীর সঙ্গে তার সম্পর্ক অটুট থাকার ফলে তিনি তখনও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ফরাসি শোষণ ও তার বিরুদ্ধে এক প্রবল গণপ্রতিক্রিয়া ইউরোপীয় রাজনীতিতে নেপোলিয়ানের আধিপত্য শিথিল করে। নেপোলিয়ানের অনুগত রাজ্যগুলিকে শুধু যুদ্ধের সময় নয় শান্তির সময়েও প্রচুর অর্থ প্রদান করতে হতো। ইউরোপীয় কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেপোলিয়ানকে ওয়েস্ট ফেলিয়ার রাজ্য ছাব্বিশ মিলিয়ন ফ্রাঁ কর দিত। তার মধ্যে দশ মিলিয়ন ফরাসি সেনাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় করা হত। ইটালী ফ্রান্সকে ৩০ মিলিয়ন ফ্রাঁ কর দিত এবং ৪২ মিলিয়ন ফ্রাঁ সেনাদের ব্যয় নির্বাহের জন্য দিত। নেপলস ফরাসি সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য ৪৪ মিলিয়ন কর দিত। ফরাসি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে গণ বিক্ষোভ শুধু স্বাদেশিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়নি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিদেশি শাসন ও শোষণের অসহনীয় মাত্রা। স্পেন ও উত্তর ইটালীতে ফরাসি শাসন নব উন্মেষিত জাতীয় ভাবধারাকে আঘাত করেছিল। পোল্যান্ডে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফরাসি সেনাবাহিনী নিজেদের মুক্তিদাতা বলে তুলে ধরেছিল। অবশ্য জার্মানিতে জাতীয়তাবাদের বিকাশে অভিজাত শ্রেণি নয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রধান ভূমিকা নেয়। সেজন্য গণ জাগরণের প্রথম পর্বে কৃষকদের সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণির কোন সংযোগ ছিল না। তবে জার্মানিতে ফরাসি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদ সঞ্চার করেছিলেন হার্ডার, ফিকটে, স্লেগেল প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী। প্রাশিয়াতে স্টাইন, হার্ডেনবার্গ ও হুমবোল্ড সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা সংস্কার করে প্রাশিয়ার আধুনিকীকরণ করেছিলেন।

নেপোলিয়ান চতুর্থ কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে ১৮১৩ সালে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। তাঁকে সহজাত সামরিক অন্তর্দৃষ্টি ড্রেসডেনের প্রাথমিক যুদ্ধে তাঁকে জয়ী হতে সাহায্য করলেও তিনি লাইপজিগের চূড়ান্ত যুদ্ধে (অক্টোবর ১৮১৩) পরাজিত হন। মধ্য ইউরোপে তাঁর রাজনৈতিক আধিপত্যের সমাপ্তি ঘটে। তিনি মাত্র ৬০,০০০ সেনাসহ রাইন নদী অতিক্রম করে ফ্রান্সের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সচেষ্ট হন। নেপোলিয়ান মেটার্নিকের প্রস্তাবিত ফ্রাঙ্কফুর্টের সন্ধি অনুসারে ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমানা বহির্ভূত রাজ্যগুলির প্রত্যর্পণ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। নেপোলিয়ানের শেষ সামরিক অভিযান শুরু হয় ১৮১৪ সালের ১৪ জুন। মাত্র ১২,০০০ সেনাসহ বেলজিয়াম সীমান্তে ইংরেজ ও প্রাশিয়ান সেনাবাহিনীকে পৃথক পৃথক ভাবে আক্রমণ করে পরাজিত করার যে পরিকল্পনা নেপোলিয়ান করেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটনের নিপুণ সেনা পরিচালনা ও সংকট মুহূর্তে প্রাশিয়ান সেনাপতি ব্লুকারের সাহায্য ব্যর্থ করে ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়ানের পরাজয় তাঁর পতনকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। ইংরেজ সেনাবাহিনী আটলান্টিক মহাসাগরে দুর্গম সেন্ট হেলেনা দ্বীপে তাঁকে নির্বাসন করে। ১৮২১ সালে নেপোলিয়ানের মৃত্যু হয়।

৪.৩ নেপোলিয়ন ও বৈপ্লবিক উত্তরাধিকার

ফরাসি বিপ্লবের পটভূমিতে বোনাপার্টের বৈপ্লবিক ভাবধারার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন বেশ জটিল। ফরাসি বিপ্লবের ফল হিসাবে ফ্রান্সের জাতীয় জীবনে যে গভীর পরিবর্তন এসেছিল নেপোলিয়ান তাঁর প্রশাসনিক সংস্কার কর্মসূচির মাধ্যমে তাকে স্থায়ী রূপায়ণের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই প্রেক্ষিতে নেপোলিয়ানের প্রশাসনিক সংস্কারের মূল্যায়নের মাধ্যমে তার বিপ্লবী চরিত্রের স্বরূপ উপস্থাপন করা সম্ভব।

শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বিধান, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের বিশেষ উৎসাহ, আইনবিধি সংস্কার, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার পত্তন ও চার্চ সংস্কার ফরাসি বিপ্লবের মূলগত পরিবর্তনগুলিকে নেপোলিয়ান

স্থায়ী রূপে ফরাসি সমাজ ও প্রশাসন ব্যবস্থায় বিধৃত করে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। তবে নেপোলিয়ান ছিলেন মূলত রক্ষণশীল ও জনগণের সার্বভৌমত্ব তত্ত্বের বিরোধী। তাঁর শাসন ব্যবস্থার মধ্যে প্রজাতন্ত্রের আবরণে একনায়কতন্ত্রের প্রকাশ। ১৮০৪ সালের পূর্বে ইহা কিছুটা আবৃত থাকলেও তাঁর সাম্রাজ্য শাসনে নেপোলিয়ানই এককভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তবে ফরাসি বিপ্লবের উত্থান-পতনের জটিল আবর্তের মধ্যে জ্যাকোবিন বৈপ্লবিক আদর্শ নেপোলিয়ানের প্রশাসনে কিছুটা উপেক্ষিত। নেপোলিয়ানের সমাজ ও রাষ্ট্র পুনর্গঠনের বৈপ্লবিক কর্মসূচি ঊনবিংশ শতকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমাদর লাভ করেছিল।

বিজয়ী সম্রাট নেপোলিয়ান ইউরোপে ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ প্রসারিত করেন। হল্যান্ড, বেলজিয়ামে, জার্মানির অনেকাংশে এবং ইটালীতে সামন্ততন্ত্র ও সামাজিক বিশেষ অধিকার বিলোপ করে Code Napoleon-এর নীতিগুলি প্রবর্তিত হয়। চার্চের বিশেষ দাবিগুলি অস্বীকার করা হয়। রাষ্ট্রকে কর প্রদানের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণি, কৃষক ও অভিজাত শ্রেণির মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত হল। কর-সংগ্রহের ব্যবস্থা শৃঙ্খলাবদ্ধ হল। যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও বাণিজ্যের উন্নতি হল, শিক্ষার আধুনিকীকরণ করা হল এবং দুর্নীতি সংযত করা হল। শাসন-ব্যবস্থার উন্নততর মান এবং গুণানুসারে পদপ্রাপ্তির নীতি প্রবর্তিত হল। এককথায়, ইউরোপের অনেকাংশেই পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্তে অত্যন্ত দক্ষ ও আধুনিক ফরাসি শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। ফরাসি বিপ্লবের অধিকাংশ অবদানই চিরস্থায়ী হয়েছিল। এর একটি পরোক্ষ ফল হল জাতীয় চেতনার উন্মেষ। বৈদেশিক শক্তিগুলি বিপ্লবী ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে ফরাসি জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি হয়, নেপোলিয়ান বিজিত দেশগুলি যথেচ্ছভাবে শাসন করলে ইউরোপে অভূতপূর্ব জাতীয় চেতনার উদ্ভব হয়। যে জাতীয়তাবাদ নেপোলিয়ানের পতন ঘটাল, তাই উত্তর কালে ইউরোপের উন্নতিসাধনে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল। এই জাতীয় চেতনার ফলেই ইটালী ও জার্মানির ঐক্য স্থাপিত হয় এবং বেলজিয়াম ও বলকান রাষ্ট্রগুলি বৈদেশিক শাসন থেকে মুক্তিলাভ করে।

ফরাসি বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কালপঞ্জী :

১৭৮৭-১৭৮৯	:	অভিজাত বিদ্রোহ।
১৭৮৯, ৫ মে	:	ভার্সাই রাজপ্রাসাদে এস্টেট জেনারেলের অধিবেশন আহ্বান।
১৭৮৯, ১৭ জুন	:	টেনিস কোর্টে জাতীয় সভা পত্তনের শপথ গ্রহণ।
১৭৮৯, ১৪ জুলাই	:	বাস্তিল কারাদুর্গের পতন গণ-অভ্যুত্থানের স্মারক।
১৭৮৯, ৫ আগস্ট	:	সামন্ততন্ত্রের অবসান।
১৭৮৯, ২৬ আগস্ট	:	মানুষ ও নাগরিক-এর ঘোষণাপত্র
১৭৯১, ৩ সেপ্টেম্বর	:	নতুন সংবিধান রচনা।
১৭৯২, সেপ্টেম্বর	:	ফরাসি সাধারণতন্ত্র ঘোষণা।
১৭৯৩-৯৪	:	সন্ত্রাসের শাসন।
১৭৯৪, ২৯ জুলাই	:	রোবসপিয়ারের গিলোটিন।
১৭৯৫-১৭৯৯	:	ডিরেকটরি শাসন (থার্মিডোরিয়ান সাধারণতন্ত্র)।
১৭৯৯-১৮০৪	:	কন্সাল রূপে নেপোলিয়ান।
১৮০৪-১৮১৪	:	সম্রাট রূপে নেপোলিয়ান।
১৮০৬	:	মহাদেশীয় অবরোধ জারী।

১৮০৭	:	জার আলেকজান্ডার ও নেপোলিয়ানের মধ্যে টিলসিটের সন্ধি।
১৮০৮-১৮১৩	:	স্পেনীয় উপদ্বীপের যুদ্ধ।
১৮১২-১৮১৩	:	মস্কো অভিযান।
১৮১৫	:	ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়ানের পতন।

৪.৪ সারাংশ

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য গঠনের কাজ সমাপ্ত হবার আগেই তার পতন সূচিত হয়েছিল। বিপ্লবের সন্তান হিসাবে তিনি বুঝতে পারেননি যে সমগ্র ইউরোপের উপর ফ্রান্সের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ঊনবিংশ শতকে একান্তই অলীক স্বপ্ন। নিছক সামরিক শক্তির উপর স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থন ছাড়া কোনো সাম্রাজ্যই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি।

নেপোলিয়ানের জীবনের প্রথম পর্বে ইউরোপে বিপ্লবের মূর্ত প্রতীক হিসাবে তার যে উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ছিল তা পরবর্তীকালে মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা প্রবর্তনের ফলে ম্লান হয়। নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের স্ববিরোধিতার আরেকটি দৃষ্টান্ত হল জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পরস্পর বিরোধী ভূমিকা। ইউরোপে বিশেষত ইতালি ও জার্মানিতে অস্ট্রিয়ার শক্তি ধ্বংস করে এবং উভয় দেশে কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেও কোড-নেপোলিয়ানের মাধ্যমে তিনি ওই সব অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করেছিলেন। ফলে সাধারণ মানুষের জাগ্রত জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তার সাম্রাজ্যবাদী ধ্যান-ধারণার সংঘাত বাধল।

১৮০৮ সালে আইবেরিয়ান উপদ্বীপের যুদ্ধে ফরাসি সেনাবাহিনীর বিপর্যয় নেপোলিয়ানের চূড়ান্ত পতনের পথকে প্রস্তুত করেছে। নেপোলিয়ান এতদিন পর্যন্ত অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া প্রভৃতি স্বৈরাচারী রাজন্যবর্গের ভাড়াটে সৈন্যদের বিরুদ্ধে অল্পায়াসে যুদ্ধে জয়লাভ করতেন। উপদ্বীপের যুদ্ধে তিনি প্রথম জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ সেনাদলের সম্মুখীন হন এবং মহাদেশীয় অবরোধ জনিত ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংঘাত এই জাতীয় প্রতিরোধ সংগ্রামকে আরও গণসমর্থন পুষ্ট করেছিল।

নেপোলিয়ান মনে করেছিলেন যে, ইউরোপের বিস্তীর্ণ বাজার থেকে ব্রিটিশ পণ্যকে বহিষ্কার করতে পারলে ব্রিটিশ অর্থনীতি দ্রুত ভেঙে পড়বে। মিলান ডিক্রি, ফন্তেনব্লো ডিক্রি ও ট্রিয়ানন শুল্কনীতি ইংরেজ অর্থনৈতিক সংকটকে ঘনীভূত করেছিল। মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। ১৮১০-১১ সালে ফ্রান্সে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল তাতে শ্রমিক ছাঁটাই ও বেকার সমস্যা গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। ফলে মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা জারি করে ইংল্যান্ডকে জব্দ করতে গিয়ে নেপোলিয়ান নিজেই জব্দ হয়ে যান।

বিগত ১৫ বছরে ক্রমান্বয়ে জয়লাভের ফলে নেপোলিয়ানের মনে হয়েছিল যে, সমগ্র ইউরোপে তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়াকে পরাজিত করতে পারলে তিনি পুনরায় মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা কার্যকরী করতে পারবেন। ১৮১২ সালের ২৫ জুন ৪৫,০০০ সৈন্যসহ নেপোলিয়ান পোল্যান্ডের নিমেন নদী অতিক্রম করে প্রত্যক্ষভাবে রাশিয়া আক্রমণের উদ্যোগ নেন। নেপোলিয়ান রুশ অভিযানে যে গ্রান্ড আর্মি গঠন করেছিলেন তার এক তৃতীয়াংশ ছিল বহু যুদ্ধে অভিজ্ঞ ফরাসি সেনাদল। কিন্তু রাশিয়ার প্রচণ্ড শীত এবং রুশ সেনাদের পোড়ামাটির নীতি গ্রহণের ফলে তার বিপুল সেনাদলের মধ্যে ১৮১২ সালের ডিসেম্বর মাসে মাত্র ৩০,০০০ সেনা অবশিষ্ট থাকে। নেপোলিয়ান রাশিয়ার ভূমিদাস মুক্তির জন্য এক ব্যাপক অন্তর্বিপ্লবের প্রস্তুতি নিতেন তাহলে হয়তো জারের স্বৈরাচারী শাসনের পতন ত্বরান্বিত হত।

নেপোলিয়ান ফ্রান্স ও তার অনুগত রাজ্য থেকে পুনরায় ৫ লক্ষ সৈন্য সমবেত করেন। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে চুক্তিও রাইন রাজ্য সংঘ ও ইতালির সঙ্গে তার সম্পর্ক অটুট থাকার ফলে তিনি তখনও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। নেপোলিয়ান চতুর্থ কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে ১৮১৩ সালে ড্রেসডেনের যুদ্ধে প্রথমে জয়ী হলেও লাইপজিগের চূড়ান্ত যুদ্ধে (অকটোবর, ১৮১৩) পরাজিত হন। মধ্য ইউরোপে তার রাজনৈতিক আধিপত্যের সমাপ্তি ঘটে। তিনি ৬০,০০০ সেনাসহ রাইন নদী অতিক্রম করে ফ্রান্সের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য ১৮১৪ সালের ১৪ জুন ওয়াটারলুর যুদ্ধে তাঁর পরাজয় নেপোলিয়ানের পতনকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

৪.৫ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন

১। নেপোলিয়ান বোনাপার্টের প্রথম কনসাল হিসাবে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারগুলি আলোচনা করুন।

২। নেপোলিয়ান কতখানি বিপ্লবের উত্তরাধিকারী ও নির্বাহক ছিলেন?

৩। সম্রাট হিসাবে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি আলোচনা করুন।

৪। নেপোলিয়ান কেন মহাদেশীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন? কীভাবে এই ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল?

৫। 'নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য বিপ্লবের বিরতি নয়, প্রসার'—এই উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

৬। নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন।

৭। তুমি কি মনে কর যে, মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা, স্প্যানীয় ক্ষত এবং রাশিয়ার আক্রমণ সম্মিলিতভাবে নেপোলিয়ানের সর্বনাশের কারণ ছিল?

৮। ১৮০৭ সালের পূর্বে নেপোলিয়ানকে বিভিন্ন সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল এবং এর পর তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল জাতীয়তাবাদী তথা জাতিগুলির বিরুদ্ধে। নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদ নেপোলিয়নের পতনের জন্য কতটা দায়ী?

৯। নেপোলিয়ানের পতনের কারণ সমূহ আলোচনা করুন।

১০। ইউরোপের উপর নেপোলিয়ানের শাসনের প্রভাব আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ—

১। নেপোলিয়ানের প্রাক-বিপ্লবী জীবনের প্রথম পর্বকে বিবৃত করুন।

২। প্রথম কনসাল হিসাবে নেপোলিয়ানের বৈপ্লবিক উত্তরাধিকার বর্ণনা করুন।

৩। নেপোলিয়ানের আইন সংস্কারের মূল্যায়ন করুন।

৪। ইউরোপের কেন কোন রাজ্যে নেপোলিয়নের প্রভাব দূরপ্রসারী ছিল?

৫। কোন অর্থে নেপোলিয়ানের ইউরোপীয় সাম্রাজ্যকে বিপ্লবের প্রতীক বলা যায়?

৬। স্পেনীয় ক্ষত কি? একে জাতীয় অভ্যুত্থান বলা যায় কী?

৭। মহাদেশীয় অবরোধের রূপায়ণে ডিক্রির ভূমিকা কী?

৮। মহাদেশীয় অবরোধের রূপায়ণের প্রধান বাধা কী?

৯। রুশ অভিযানে নেপোলিয়ানের ব্যর্থতার কারণ কী?

১০। ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ প্রসারে নেপোলিয়ানের ভূমিকা ইউরোপে কতদূর সার্থক হয়েছিল?

৪.৬ উদ্দেশ্য

ফরাসি বিপ্লবের অগ্রণী নায়ক নেপোলিয়ান বোনাপার্ট সম্পর্কে গ্রন্থের প্রাচুর্য সংক্ষিপ্ত পাঠ নির্দেশের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থের নাম এখানে উল্লেখ করা হল —

১। Georges Rude–Revolutionary Europe (Fantana History of Europe)

২। Leo Gershoy - The French Revolution and Napoleon.

৩। Markham–Napoleon and the awakening of Europe

৪। Francois Furet–Revolutionary Franch (1770-1870), Black well, 1997

৫। A. Cobban - A History of France, Vol II (Penguin Series)

ই. এইচ. আই—৭
ইতিহাসের ঐচ্ছিক পাঠক্রম
পর্যায় ঃ ২৬

একক ১ □ ভিয়েনা সম্মেলন, ইউরোপীয় শক্তি সমবায় ও মেটারনিখ ব্যবস্থা

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ ভিয়েনা সম্মেলন

১.৪ ভিয়েনা ব্যবস্থা

১.৫ ভিয়েনা ব্যবস্থার রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য

১.৬ ভিয়েনা ব্যবস্থার সমালোচনা

১.৭ পবিত্র চুক্তি

১.৮ ইউরোপীয় শক্তি সমবায়

১.৯ শক্তি সমবায়ের ব্যর্থতা

১.১০ মেটারনিখ ও মেটার ব্যবস্থা

১.১১ সারসংক্ষেপ

১.১২ অনুশীলনী

১.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন—

- নেপোলিয়নের পতনের পর বিপ্লবের গতিরোধ করবার জন্য ইউরোপের রাজন্যবর্গ ও রক্ষণশীল রাজনীতিকরা কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।
- ফরাসি বিপ্লবের পূর্ববর্তী অবস্থা ফিরিয়ে এনে তাকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে কীভাবে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমবায় গড়ে উঠেছিল।

১.২ প্রস্তাবনা

১৮১৫ সালে নেপোলিয়ানের চূড়ান্ত পতনের পর ইউরোপের রাজন্যগোষ্ঠী ও রক্ষণশীল নেতৃত্বের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মহাদেশ থেকে বিপ্লবের প্রভাব মুছে ফেলা, বিপ্লবের সময়ে ক্ষমতাচ্যুত শাসককে আবার সিংহাসন ফিরিয়ে দেওয়া, বিপ্লব-পূর্ববর্তী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক কাঠামোর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং সেইসঙ্গে লক্ষ্য রাখা, যাতে আবার বিপ্লবের কোন ঢেউ ফ্রান্সকে বা ইউরোপীয় মহাদেশকে আঘাত করতে না পারে। অবশ্য এই সুযোগে ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক কিছু অতিরিক্ত সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যও যে কোন কোন রাজা বা নেতার ছিল না, তা নয়, তবে মূল কথা ছিল রাষ্ট্র ও সমাজকে রক্ষণশীল কাঠামোর মধ্যে আটকে রাখা। এই কাজ যে বিপ্লব-পরবর্তী পরিস্থিতিতে কোন একক রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়, তা বুঝতে পেরেছিলেন অস্ট্রিয়া বা রাশিয়ার সম্রাট। তাই তারা রাষ্ট্রসমবায় গঠন ও যৌথ দমনব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন। এই ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন মেটারনিখ ও তাঁর সহযোগীরা। কীভাবে রূপায়ণটি ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ সালের মধ্যে কার্যকর ছিল, সেটাই আপনারা নিম্নের আলোচনা থেকে জানতে পারবেন।

১.৩ ভিয়েনা সম্মেলন

১৮১৪ সালে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন নেপোলিয়ান। দুই দশকের যুদ্ধের ক্ষত সারিয়ে শান্তির জন্য, স্থিতির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন রণক্লান্ত মহাদেশীয় রাষ্ট্রনায়করা। বেলজিয়ানের রাজা লিওপোল্ড বলেছিলেন, "In Europe's state of social illness it would be unheard-of to let loose...a general war, Such a war...would certainly bring a conflict of principles, (and) from what I know of Europe, I think that such a conflict would change her form and overthrow her whole structure." পুরনো কাঠামোর এই ভাঙনকেই সবচাইতে বেশি ভয় পেয়েছিলেন তাঁরা। হব্‌স্‌বম তাই ভুল বলেননি যে, তাঁরা আগের চাইতে বেশি কুশলী হয়ে উঠেছিলেন তা নয়, তাঁরা আগের উগ্রতা ত্যাগ করে শান্তির পূজারী হয়ে পড়েছিলেন তাও নয়। তাঁরা ছিলেন আতঙ্কিত, সন্ত্রস্ত। পরিবর্তনের ভয় তাঁদের পেয়ে বসেছিল। তাই সেই পরিবর্তনকে ঠেকানোর জন্য তাঁরা একজোট হয়েছিলেন। ১৮১৪ সালে মিলিত হয়েছিলেন ভিয়েনা বৈঠকে। প্রকাশ্যে এই ভিয়েনা কংগ্রেসের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস। সম্মেলন চলেছিল ১৮১৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৮১৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত। সম্মেলনের মুখ্যসচিব ছিলেন অস্ট্রিয়ার ফ্রিডরিখ ফন গেনৎস্।

অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় আহূত বৈঠকে তুরস্ক ছাড়া ইউরোপের প্রায় সব রাষ্ট্রে প্রতিনিধিরাই হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের কাজ চালানোর ভার প্রধানত পড়েছিল চারটি রাষ্ট্রের ওপর—অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া ও ইংল্যান্ড। এর মধ্যে আবার প্রকৃত অর্থে সক্রিয় ছিল শুধু রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া। কারণ, ইংল্যান্ডের দুই প্রতিনিধি ক্যাসেলরি আর ওয়েলিংটন নিজেদের কিছুটা দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, কংগ্রেসের চরিত্রের সঙ্গে তাঁরা খাপ

খাওয়াতে পারেননি। অন্যদিকে প্রাশিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিক উইলিয়ম সব ব্যাপারেই রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডারের ওপর নির্ভর করতেন।

জার প্রথম আলেকজান্ডার কিন্তু ছিলেন উদারপন্থী। পোল্যান্ড ও ফিনল্যান্ডকে তিনি স্বায়ত্তশাসন দিয়েছিলেন। ১৮১৪ সালে নেপোলিয়ন হেরে যাওয়ার পর বিজয়ী সেনাদের হাতে চরম নিগ্রহের হাত থেকে তিনিই ফ্রান্সকে বাঁচিয়েছিলেন। অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর মেটারনিখ তাই প্রথম থেকেই তাঁকে আড়াল করে কৌশলে কংগ্রেসের কাজ নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। আলেকজান্ডার রাজনীতি ও ধর্মনীতিকে মিশিয়ে ফেলার চেষ্টা করায় মেটারনিখের কাজ আরও সহজ হয়ে যায়। তিনি জারকে 'অব্যবস্থিত-চিত্ত' হিসেবে সকলের সামনে তুলে ধরে বলেন, 'he is a mad man to be humoured'। ফলে শেষ পর্যন্ত ভিয়েনা কংগ্রেস-এর অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রপুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন মেটারনিখ।

১.০ উদ্দেশ্য

ভিয়েনা কংগ্রেসের সামনে উপস্থাপিত সমস্যা ছিল অনেক। সেসবের সমাধানও ছিল বহু আলোচনা ও সূক্ষ্ম কূটনীতি সাপেক্ষ। তবে মুখ্যত তিনটি নীতিই ভিয়েনা সম্মেলনের ভিত্তি হিসেবে গৃহীত হয় : প্রথমত, বিজয়ী মিত্রপক্ষের জন্য পুরস্কার ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা এবং ফ্রান্স ও তার সহযোগীদের জন্য শাস্তিবিধান; দ্বিতীয়ত, ইউরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থায় যথাসম্ভব প্রাক্-বিপ্লব অবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তৃতীয়ত, ইউরোপের ভবিষ্যৎ স্থিতি অব্যাহত রাখার বন্দোবস্ত।

ভিয়েনার প্রথম নীতি অনুসারে, নেপোলিয়ানকে হারানোর পুরস্কার হিসেবে রাশিয়া, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, গ্রেট ব্রিটেন এবং সুইডেন কিছু কিছু ভূখণ্ড পেয়ে যায়। রাশিয়া পায় পোল্যান্ডের কিছুটা, ফিনল্যান্ড ও তুরস্কের হাত থেকে জোর করে নেওয়া ভূখণ্ড। প্রাশিয়া নেয় পশ্চিম পোম্‌রনিয়া, স্যাক্সনির অংশবিশেষ এবং রাইন প্রদেশ। অস্ট্রিয়ার ভাগে পড়ে বেলজিয়াম এবং বিচ্ছিন্ন কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া নেপোলিয়ন যুগের আগে দখল করা গোটা দক্ষিণ জার্মানি। এছাড়া ঐ বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলির বদলে অস্ট্রিয়া পায় ভেনিসিয়া-র অধিকার। সব চাইতে লাভবান হয়েছিল গ্রেট ব্রিটেন, তার নৌশক্তি ও বাণিজ্যিক শক্তির বিচারে। সে পেয়েছিল হেলিগোলান্ড, মাল্টা দ্বীপ, স্পেন অধিকৃত ত্রিনিদাদ, ফ্রান্স-অধিকৃত মরিশাস, টোবাগো, হল্যান্ড-অধিকৃত সিংহল এবং উত্তমাশা অন্তরীপ। সুইডেনকে দেওয়া হয়েছিল নরওয়ে।

স্যাক্সনি যেহেতু ফ্রান্সের পক্ষে ছিল, তাই শাস্তি হিসেবে তার কিছু অঞ্চল কেড়ে নিয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রাশিয়াকে, অবশ্য তার রাজকীয় উপাধি খর্ব করা হয়নি। প্রধান যুদ্ধাপরাধী ফ্রান্সকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করার কথা বলা হয়েছিল। ফরাসি কূটনীতিক ত্যালির‍্যাঁ এবং রাশিয়ার জার-এর বাধায় তা সম্ভব হয়নি। তবে ফ্রান্সকে তার প্রাক্‌বিপ্লব সীমান্তে বেঁধে রাখা হল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্য মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করা হল। পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য একটি সম্মিলিত সেনাবাহিনী তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হল। আর নেপোলিয়ান যে ওয়ারশ গ্র্যান্ড ডাচি এবং ওয়েস্টফালিয়া রাজ্য দুটি তৈরি করেছিলেন, তার বিলোপ করা হল।

ভিয়েনা সম্মেলনের দ্বিতীয় ভিত্তি ছিল ত্যালিরাঁর 'Principle of Legitimacy' বা বৈধ অধিকারের নীতি। ত্যালিরাঁ ভেবেছিলেন, এই নীতি অনসৃত হলে ফ্রান্স খণ্ডিত হবে না, বুরবোঁ রাজবংশ ক্ষমতা ফিরে পাবে এবং পরাজিত ফ্রান্সের মর্যাদা কিছুটা রক্ষা পাবে। কিন্তু এই নীতি মেটারনিখের হাত শক্ত করেছিল এবং সব বিপ্লবী প্রভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিল। যাই হোক, ফরাসি সিংহাসনে বুরবঁ বংশ ফিরে এসেছিল। স্পেন ও নেপ্‌ল্‌সের সিংহাসন ফিরে পেয়েছিলেন নেপোলিয়ান যাঁদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন সেই রাজারা। পিডমন্ট-সার্ডিনিয়ায় স্যাভয় পরিবারের অধিকার এবং হল্যান্ডে অরেঞ্জ বংশের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। ভ্যাটিকানে গদি ফিরে পেয়েছিলেন পোপ আর রাইন কন্‌ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত জার্মান রাইখের রাজন্যবর্গ তাঁদের হারানো রাজ্য ও সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন।

ভিয়েনার তৃতীয় নীতিটির প্রধান লক্ষ্য ছিল ফ্রান্স ও জার্মানি। ধারণা করা হয়েছিল যে, ইউরোপের ভবিষ্যৎ শান্তি একমাত্র এই দুটি রাষ্ট্রই নষ্ট করতে পারে। তাই এই দুটো রাষ্ট্রকেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা ছিল ভিয়েনা সম্মেলনের উদ্দেশ্য।

ফ্রান্সের ওপর চাপ রাখার জন্য তার সীমান্তের চারপাশে শক্তিশালী রাষ্ট্রপ্রহরা স্থাপন করা হয়েছিল। উত্তরে ছিল বেলজিয়াম, তাকে হল্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। পূর্বে রাইন ভূখণ্ড-সমৃদ্ধ প্রাশিয়া, আর দক্ষিণে পিডমন্ট-সার্ডিনিয়া-জেনোয়া। মোটকথা, ভবিষ্যতে ফ্রান্স আর যাতে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে না পারে তার যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হল। জার্মানি সম্বন্ধেও একই দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর ছিল, কেননা একটি শক্তিশালী জার্মান রাষ্ট্র ছিল অস্ট্রিয়ার পক্ষে বিপজ্জনক, তাই জার্মানিকে ভেঙে ভেঙে অস্ট্রিয়ার অভিভাবকত্বে ঊনচল্লিশটি ছোট ছোট রাষ্ট্রের একটি দুর্বল সংঘে পরিণত করা হয়েছিল। এই সংঘটির জন্য ডায়েট (Diet) নামক একটি প্রতিনিধিসভা (সংসদ) গঠন করা হল। কিন্তু তার প্রতিনিধিরা কোন নির্বাচিত সদস্য নন। সকলেই মেটারনিখের অনুমোদনসাপেক্ষ মনোনীত প্রতিনিধি।

১.৫ ভিয়েনা ব্যবস্থার রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য

ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত এইসব ব্যবস্থা থেকে ইউরোপের রাষ্ট্রিক ভারসাম্য ও সে বিষয়ে প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ দেখতে পাওয়া যায়। মহাদেশীয় বিন্যাস সম্পর্কে এই বৈঠকে ব্রিটেনের তেমন কোন আগ্রহই ছিল না। ব্যাবসা-বাণিজ্য বিস্তার-এর কথাই শুধু তার মাথায় ছিল, এবং ঔপনিবেশিক স্বার্থ ইংলন্ডেরই সবচাইতে বেশি রক্ষিত হয়েছিল। রাশিয়ার মূল আগ্রহ ছিল বল্কান অঞ্চল সম্পর্কে, তবে তাকে প্রথম শ্রেণীর শক্তি হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল এবং পশ্চিম ইউরোপের ব্যাপারেও তার স্বার্থের অভিন্নতা মেনে নেওয়া হয়েছিল। সুইডেনকে বাল্টিক বহির্ভূত অঞ্চলের ওপর আধিপত্য করতে না দিয়ে ইউরোপীয় শক্তি হিসেবে তার প্রাধান্য একেবারে নষ্ট করা হয়েছিল। এরপর সে ছিল শুধুই একটি স্ক্যান্ডিনেভীয় শক্তি। অন্যদিকে মহাদেশীয় রাষ্ট্রকাঠামোর স্বঘোষিত অভিভাবকের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল অস্ট্রিয়া। জার্মানির অবস্থা শোচনীয় হলেও কিছুটা গুরুত্ব অবশ্যই প্রাশিয়া পেয়েছিল।

১.৬ ভিয়েনা ব্যবস্থার সমালোচনা

ভিয়েনা সম্মেলন সম্পর্কে আলোচনায় পরিষ্কার দু'ধরনের মত দেখা যায়। একদল ঐতিহাসিকের মতে, "(The makers of the Agreement were) mere hucksters in the diplomatic market, bartering the happiness of millions with a scented smile". আবার অন্যদলের মতে, "(They) did in fact prevent a general European conflagration for a whole century" হ্যারল্ড নিকলসন প্রথম মতটি অগ্রাহ্য করেছেন। দ্বিতীয় মতটিকে নাকচ করে মন্তব্য করেছেন, "Wars are neither caused nor prevented by treaties." হবস্‌বম অবশ্য একথা স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন ভিয়েনা চুক্তি দীর্ঘদিন ইউরোপকে যুদ্ধ থেকে মুক্ত রেখেছিল। তাঁর ভাষায় : "Indeed apart from the Crimean war there was no war involving more than two great powers between 1815 and 1914. The citizens of the twentieth century ought to appreciate the magnitude of this achievement (of the Vienna Settlement)"

ভিয়েনার সমালোচকদের মতে, ভিয়েনা চুক্তি-প্রণেতাদের কূটনীতির বাজারে দরাদরিতে রত ব্যাপারী বলে মনে হয়েছে। এই কূটনীতিকরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ভিয়েনার সমালোচকগণ মনে করেন যে, এই চুক্তির প্রণেতা সকলেই ছিলেন রক্ষণশীল এবং ইউরোপের সর্বত্র যে নতুন ধ্যানধারণা আদর্শ জনজীবনকে উদ্দীপিত করতে শুরু করেছিল, তার প্রতি উদাসীন। তারা শক্তিসাম্য, ন্যায্য অধিকার প্রভৃতি বাতিল হয়ে যাওয়া আদর্শগুলির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে মানুষের সুখদুঃখের চাইতে শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণে বেশি মনোনিবেশ করেছিলেন। ভিয়েনা সম্মেলনের সচিব গেনৎস্ (Gentz) তাই দুঃখ করে বলেছিলেন : "Men had promised the return of golden ages. But the Congress resulted in nothing but restorations."

সমালোচকদের মতে, "(the settlement of Vienna) was a network of bargains and negotiated compromises" উদ্যোক্তাদের প্রতিটি আচরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নতুন ভূখণ্ড লাভের জন্য তারা লালায়িত এবং ক্ষুদ্র ও অসহায় জাতিগুলির প্রতি নির্মম। ইউরোপের বিভিন্ন জাতিগুলির সুদীর্ঘ এবং ঐতিহাসিক সম্পর্ক তুচ্ছ করে তারা নরওয়েকে যুক্ত করেছিলেন সুইডেনের সঙ্গে এবং জেনোয়াকে তুলে দিয়েছিলেন সার্ডিনিয়ার হাতে, আবার জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করে বেলজিয়ামকে যুক্ত করেছিলেন হল্যান্ডের সঙ্গে, ভেনিসিয়া-লম্বার্ডিকে স্থাপন করেছিলেন অস্ট্রিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীনে। জাতীয়তাবাদ এবং উদার নীতির প্রতি এ জাতীয় অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য দীর্ঘকাল চুক্তি-প্রণেতারা ভর্ৎসিত হয়েছেন উত্তরসূরীদের দ্বারা, আর যে আদর্শ ও নীতিগুলি অগ্রাহ্য করে ভিয়েনা চুক্তি রচিত পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে দেখা যায় ধীর নিশ্চিত পদক্ষেপে তাদেরই জয়যাত্রা। যে-সমস্ত কীটদষ্ট ও জীর্ণ শাসক পরিবারকে তারা ১৮১৪ খ্রিঃ সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করেছিলেন ইউরোপের ক্ষুব্ধ মানুষ দীর্ঘকাল তাদের সহ্য করেনি।

আবার এই সমস্ত সমালোচনা অনেক ক্ষেত্রেই অযৌক্তিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রথমত, মনে রাখা দরকার যে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হবার জন্য অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়া, ইংল্যান্ড প্রভৃতি রাষ্ট্র পরস্পরের সঙ্গে এত প্রকাশ্য ও গোপন চুক্তি সম্পাদন করেছিল যে তাঁদের স্বাধীন আচরণের ক্ষেত্র ছিল অত্যন্ত সীমিত। সুইডেনকে নরওয়ে দেওয়া এবং হল্যান্ডের অধীনে বেলজিয়ামকে স্থাপন করার সিদ্ধান্ত বহু পূর্বেই গৃহীত হয়েছিল এবং ১৮১৫ খ্রিঃ এইসব সিদ্ধান্তবিরোধী কাজ করলে ইউরোপে নতুন করে অশান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল, যে অশান্তি দূর করাই ছিল ভিয়েনার প্রধান লক্ষ্য। তাছাড়া কাজের যে স্বাধীনতাটুকু তাদের ছিল তার সদ্ব্যবহার করতে মেটানিখ, আলেকজান্ডার প্রভৃতি রাষ্ট্রনেতারা কার্পণ্য করেননি। ইউরোপকে নতুন করে অশান্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা শক্তিসাম্য নীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। কোন শক্তিকে এককভাবে ইউরোপীয় শান্তির শত্রু হতে না দেওয়াই ছিল ভিয়েনা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। তাঁরা দীর্ঘকালের পুরোনো সীমান্তগুলির মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন এবং স্থায়ী শাসনের প্রচেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

ঐতিহাসিক সিম্যান এই অভিযোগ মানতে রাজী নন যে ভিয়েনার প্রণেতারা শাসিতের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র শাসকদের উদ্দেশ্য পূরণ করেছিলেন। ন্যায্য নীতির প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ প্রকাশের অভিযোগও অসত্য। পশ্চিম জার্মানির বিভিন্ন অংশে, পোল্যান্ড, স্যাকসনীতে, উত্তর ইতালী ও অস্ট্রিয় নেদারল্যান্ডে এই নীতি অনুসরণ করা হয়নি। ন্যায্য নীতির উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ ফ্রান্সেই উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছিল।

এটা ঠিক যে ইউরোপে জনগণকে ফিকটে (Fichte) এবং স্টেইন (Stein) যে অর্থে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন সে মুক্তি ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে হয়নি। অর্থাৎ ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের সার্বজনীন স্বীকৃতি হয়নি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে দুটি তথ্য স্মর্তব্য। প্রথমত ফ্রান্সে আবির্ভূত যে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের কূটনীতিকদের পরিচয় হয়েছিল তার ধ্বংসাত্মক রূপটি ছিল প্রবল। সুতরাং এই আদর্শের প্রতি তাদের বিরাগ ছিল স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য দেশে, যেমন স্পেন ও জার্মানিতে, জাতীয়তাবাদের আত্মপ্রকাশ ছিল অস্পষ্ট, অপূর্ণ এবং উপেক্ষণীয়। ইউরোপের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এমন কোন সংকেত ছিল না যা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে জাতীয়তাবাদ একটি স্থায়ী আদর্শে পরিণত হবে, এবং পরবর্তী প্রজন্মে ইউরোপীয় পরিবর্তন ঘটাবে। এই অতি দূরদৃষ্টি তাঁদের ছিল না বা তারা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ছিলেন না বলে ভিয়েনা-প্রণেতাদের দোষী করা যায় না। ১৮১৫ খ্রিঃ যদি তাঁরা এই অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ আদর্শের বাস্তব রূপায়ণে সচেষ্ট হতেন তাহলে ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সংঘাত-সংঘর্ষের সৃষ্টি ছিল অবধারিত। এক প্রখর বাস্তববোধ ও সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে মেটারনিখ ও তাঁর অনুগামীরা প্রাক্‌বিপ্লব রাষ্ট্রীয় বিন্যাসের পুনঃপ্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন যাতে ইউরোপে আকাঙ্ক্ষিত শান্তি ও নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

সুতরাং য়ুট্রেক্টের সন্ধি (১৭১৩) (Wtrecht) বা ভার্সাই চুক্তির (১৯১৯) তুলনায় ভিয়েনা ব্যবস্থা যে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল একথা বলা যায়। তাছাড়া ভিয়েনায় যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তার অনেকগুলোই ছিল পূবনির্ধারিত। নতুন করে তার বদল না ঘটিয়ে ভিয়েনার নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক প্রজ্ঞারই পরিচয়

দিয়েছিলেন। সম্ভবত এই কারণেই ডেভিড টমসন ভিয়েনা ব্যবস্থাকে বলেছেন "Statesmanlike"। ফ্রান্সের প্রতি কোন প্রতিশোধস্পৃহাও ভিয়েনায় দেখা যায়নি। হবস্‌বম তাই ঠিকই বলেছেন যে, এটা ছিল "realistic"। এবং "Sensible"।

ভিয়েনাচুক্তি প্রণেতাদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগই গ্রাহ্য যে তাঁরা এই ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করার ব্যর্থ প্রয়াস করেছিলেন। ১৮১৫ খ্রীঃ পর অস্ট্রিয়া রাশিয়া এবং প্রাশিয়ার কালপোযোগী নীতি রচনা করার, পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যর্থতা সমালোচিত হওয়ার যোগ্য। তবু ঘড়ির কাঁটাকে পিছিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে চলে না। তাদের এই দোষে অভিযুক্ত করা সম্ভব যে তারা ঘড়ির কাঁটাগুলিকে ১৮১৫ খ্রীঃ স্তব্ধ করে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন।

১.৭ পবিত্র চুক্তি (Holy Alliance)

ভিয়েনা-পরবর্তী ইউরোপে ভিয়েনা-সম্মেলনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আরো দুটো রক্ষণশীল প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। একটি ছিল রাশিয়ার জার-এর ব্যক্তিগত উদ্যোগ—যা পবিত্র চুক্তি বা Holy Alliance নামে পরিচিত, আর একটি হল ইউরোপীয় শক্তি সমবায় বা Concert of Europe, যা মূলত ভিয়েনা সম্মেলনেরই সৃষ্টি।

পবিত্র চুক্তির উদ্ভাবক ছিলেন রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার। মিস্টিক দার্শনিকতায় আচ্ছন্ন রুশ সম্রাট নেপোলিয়ানের পরাজয়ে ঐশী শক্তির লীলা অনুভব করেছিলেন। সুতরাং রাজনীতির সঙ্গে খ্রিস্টীয় ধর্মনীতিকে মিশিয়ে তিনি এক নতুন রাষ্ট্রনীতির স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, ফরাসি বিপ্লব ধর্মহীন, তাই তা পরাজিত। নেপোলিয়ান ধার্মিক নন, তাই তিনি নির্বাসিত। আবার ইউরোপে ধর্ম রাজনীতির খেলায় বিপর্যস্ত, তাই নেপোলিয়ানের হাতে মহাদেশ বিধ্বস্তপ্রায়। ভবিষ্যতে এ জাতীয় অঘটন যাতে না ঘটে, তার জন্য ইউরোপের রাজা বা সম্রাটদের উচিত ঐক্যবদ্ধ হয়ে সব দায়-দায়িত্ব ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রনীতি নিরূপণ করা। আলেকজান্ডার এই বিশ্বাস থেকেই 'পবিত্র চুক্তির' দলিল রচনা করিয়েছিলেন এবং বিরটেন, পোপরাজ্য ও তুরস্ক ছাড়া অন্য রাজ্যের রাজারা তাতে স্বাক্ষরও করেছিলেন।

পবিত্র চুক্তির ফলে খ্রিস্টান রাজন্যবর্গ একটি অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসংঘের সদস্য হয়েছিলেন এবং তাঁরা খ্রিস্টধর্মের আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই সংঘের কোন সদস্য বিপদগ্রস্ত হলে অন্য সদস্যরা তাদের বন্ধুকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পবিত্র সংঘের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, প্রথম থেকেই এই সংঘ আলেকজান্ডার ছাড়া আর কারও সুনজরে ছিল না। তাঁর অনুরোধে যারা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁরাও এই সংঘ সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন।

মেটারনিখ একে বলেছিলেন জোরালো ফাঁকা আওয়াজ (Loud-sounding nothing) ক্যাসেলরি একে 'বিমূর্ত প্রলাপ' (A piece of sublime mysticism and nonsense) বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন, আর গেনৎস এর মধ্যে 'রঙ্গমঞ্চ অলঙ্করণ' (stage decoration) ছাড়া আর কিছুই দেখেননি। পবিত্র সংঘের ব্যর্থতা তাই ছিল অনিবার্য।

আসলে সভ্যদের আন্তরিকতার অভাব পবিত্র সংঘের ব্যর্থতার প্রধান কারণ। তাছাড়া এর অন্তর্নিহিত অর্থ সমসাময়িক উদারপন্থীদের কাছে ভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়েছিল। তারা ভেবেছিলেন, এর মাধ্যমে শক্তিধর সভ্যরা ছোট ও দুর্বল রাজ্যগুলোর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন। যেহেতু রাজা-প্রজা সকলেই ধর্মীয় নীতির ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে, তাই বড় রাজ্যগুলো ছোট রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অধিকার রাখবে। এটাই স্বাভাবিক। ছোট রাজা ও তার প্রজা তো বড় খ্রিস্টান রাজার সন্তানতুল্য। অতএব পবিত্রচুক্তিতে আবদ্ধ বড় রাজারা ইউরোপের সব রাজ্য সম্বন্ধেই সিদ্ধান্ত নেবেন। পবিত্রচুক্তি সম্বন্ধে এই জাতীয় ভাবনাই চুক্তিটিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সাধারণ মানুষও একে ভালো চোখে দেখেনি। কারণ, ইউরোপীয় শক্তিসমবায় ও পবিত্র চুক্তির সদস্যরা অভিন্ন হওয়ায় পবিত্র সংঘকে শক্তিসমবায়ের মতো নিপীড়ন যন্ত্রের প্রতীক হিসেবে তারা ধরে নিয়েছিল।

১.৮ ইউরোপীয় শক্তিসমবায় (Concert of Europe)

ইউরোপীয় শক্তিসমবায়ের উৎস ছিল ভিয়েনা কংগ্রেস। ঐ কংগ্রেসে উপস্থিত নেতারা তাদের কাজ সম্পন্ন করেছিলেন একটি চতুঃশক্তি চুক্তি সম্পাদন করে। অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও ব্রিটেন এই চুক্তিতে অংশ নিয়েছিল। ভবিষ্যতের বিপ্লবী অভিঘাত আর যুদ্ধের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য এই চুক্তি। এর আগে ১৮১৪ সালের মার্চ মাসে শ্যুমঁর চুক্তি (Treaty of Chaumont) করে ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া এবং রাশিয়া মৈত্রী স্থাপন করেছিল, অঙ্গীকার করেছিল এই বলে যে, নেপোলিয়ানের পতনের পরেও আন্তর্জাতিক স্থিতি বজায় রাখার স্বার্থে তারা জোটবদ্ধ থাকবে। ইউরোপীয় শক্তিসমবায় এই অঙ্গীকারেরই ফল। ১৮১৫-র ২০ নভেম্বর, যেদিন প্যারিস-এর চুক্তি দ্বিতীয় ভিয়েনা কংগ্রেসে গৃহীত হয়, সেদিনই স্বাক্ষরিত হয় চতুঃশক্তি চুক্তি, গঠিত হয় শক্তিসমবায়, যেটাকে বলা যেতে পারে প্রথম আধুনিক আন্তর্জাতিক সংস্থা।

পবিত্র চুক্তির সঙ্গে চতুঃশক্তি চুক্তির একটি মৌলিক পার্থক্য ছিল। পবিত্র চুক্তির বক্তব্য ছিল, আইনসঙ্গতভাবে যেসব রাজবংশ বিভিন্ন দেশের সিংহাসন অধিকার করে আছে, খ্রীস্টধর্মের ভিত্তিতে তারা একই দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার। কিন্তু চতুঃশক্তি জোটের সদস্যরা পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা, বৈচিত্র ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এমনকি অবস্থাভেদে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনাও তারা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ভেবেছিলেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা ও অস্থিরতার মনোভাব যাতে আন্তর্জাতিক ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে না পারে, তার ব্যবস্থাও থাকা দরকার। এই প্রয়োজনবোধই ছিল চতুঃশক্তি চুক্তি ও শক্তিসমবায়ের

ভিত্তি। ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়ে প্রতিনিধিরা প্রতিশ্রুতি দেন, শ্যুমঁ, ভিয়েনা ও প্যারিস এর চুক্তিগুলো পরবর্তী কুড়ি বছর মেনে নিয়ে তারা পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত করবেন। তাদের আশা ছিল, কূটনীতির রাশ টেনে চতুঃশক্তি চুক্তির অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলো পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়ে নিজেদের সমস্যা দূর করে মহাদেশে শান্তি বজায় রাখতে পারবে। চুক্তিতে ধর্মীয় অনুষঙ্গ না থাকায় বিভিন্ন দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গেও তার রাখা সম্ভব হবে। ব্রিটিশ সংসদের পক্ষে অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের নীতি মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু শক্তিসমবায়ের মূল নীতি 'আলোচনার মাধ্যমে সমাধান' হওয়ায় ব্রিটেনের পক্ষেও এই ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য ছিল।

সর্ব-ইউরোপীয় সমস্যাগুলো আলোচনার মাধ্যমে মেটানোর জন্য কিছুদিন পর পর বৈঠকে মিলিত হওয়া শক্তি-সমবায়ের অন্যতম শর্ত ছিল। ভিয়েনা কংগ্রেসের অল্প পরেই বসেছিল এরকম চারটি বৈঠক আয় ল্য শ্যাপেল (Aixla Chapelle)—১৮১৮; ট্রপ্পো (Troppau) ১৮২০; লাইবাখ (Laibach)—১৮২১ এবং ভেরোনা (Verona)—১৮২২।

আয় ল্য শ্যাপেল-এর বৈঠক, ১৮১৮

১৮১৮ সালের প্রথম বৈঠকটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই বৈঠকে ফ্রান্স থেকে দখলদার সৈন্য প্রত্যাহার করা হয় এবং ফ্রান্সকে পঞ্চম শক্তি হিসেবে ইউরোপীয় শক্তিসমবায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নরওয়ে ও ডেনমার্কের সঙ্গে বার্নাকোত সন্ধি অনুযায়ী আচরণ না করার অভিযোগে সুইডেনকে অভিযুক্ত করা হয় এবং তার কৈফিয়ৎ তলব করা হয়। মনাকোর শাসনকর্তাকেও এই বৈঠকে কিছু প্রশাসনিক পরামর্শ দেওয়া হয়।

কিন্তু এই বৈঠকেই শক্তিসমবায়ের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ প্রকাশ্যে চলে আসে। রাশিয়া ভূমধ্যসাগরে নৌ-জাহাজ পাঠিয়ে বার্বারী জলদস্যুদের দমন করবার প্রস্তাব দিয়ে ব্রিটেন আপত্তি জানায়। তার আশঙ্কা ছিল এতে ভূমধ্যসাগরে রাশিয়ার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। দক্ষিণ আমেরিকার বিক্ষুব্ধ উপনিবেশ-এ সামরিক হস্তক্ষেপের স্পেনীয় সিদ্ধান্তেরও বিরোধিতা করে ব্রিটেন। ঐ অঞ্চলে তার বাণিজ্যিক প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয়ে। আবার ব্রিটেন যখন অবৈধ দাসব্যবস্থা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক জাহাজ তল্লাসীর প্রস্তাব করে, তখন অন্য সদস্যরা তাতে বাধা দেয়। কেননা এতে ব্রিটেনের সামুদ্রিক আধিপত্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল।

ট্রপ্পোর বৈঠক, ১৮২০

ইউরোপীয় শক্তিসমবায়ের অন্তর্বিরোধ ট্রপ্পো কংগ্রেসে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৮২০ সালে নেপল্‌স্, স্পেন ও পর্তুগালে বিদ্রোহীদের চাপে শাসকগোষ্ঠী শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে বাধ্য হয়। কিন্তু এতে শক্তিসমবায়ের সদস্যরা অসন্তুষ্ট হয়। ট্রপ্পো বৈঠকে তারা বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য মিলিত হয়। মেটারনিখ-এর পরামর্শে এই বৈঠকে যে 'ট্রপ্পো প্রটোকল' রচিত হয়, তাতে বলা হয়, যদি কোন দেশ অন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক শাসন-সংস্কার করে, তাহলে শক্তিসমবায় সেই দেশকে জোট থেকে বহিষ্কার করতে পারবে বা সেই

দেশের শাসন-সংস্কারকে বাতিল করতে পারবে এবং প্রতিসংস্কারের জন্য বলপ্রয়োগ করতে পারবে। এটা আসলে ছিল সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অতিরাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রস্তাব। ব্রিটেন ও ফ্রান্স তীব্রভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং বৈঠক নিষ্ফল হয়।

লাইবাখ-এর বৈঠক, ১৮২১

এই বৈঠকে ইতালির ব্যাপারে অস্ট্রিয়ার স্বার্থ জড়িত, এই নীতি স্বীকার করে অস্ট্রিয়াকে নেপল্‌সের বিদ্রোহ দমনের অধিকার দেওয়া হয় এবং অস্ট্রিয়া বিদ্রোহ দমন করে ফার্দিন্যান্দকে নেপলসের সিংহাসনে বসিয়ে দেয়।

ভেরোনার বৈঠক, ১৮২২

লাইবাখে কোন বড় সংকট দেখা না দিলেও সংকট ঘনীভূত হয় ভেরোনা বেঠকে। এই বৈঠকে দুটো প্রধান সমস্যা ছিল, একটি তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীসের বিদ্রোহ, আর অন্যটি স্পেনের গণবিদ্রোহ। অস্ট্রিয়া নেপল্‌সে হস্তক্ষেপ করেছে, এই উদাহরণ দেখিয়ে রাশিয়া এই বৈঠকে গ্রীসে অভিযানের অনুমতি চায়, আর স্পেনের রাজা সপ্তম ফার্দিনান্দের অনুরোধে ফ্রান্স স্পেনের বিদ্রোহ দমন করতে অগ্রসর হয়। ব্রিটেন দুটি ক্ষেত্রেই প্রতিবাদ করে। রাশিয়া সামরিকভাবে নিরস্ত হয়, কিন্তু স্পেনের রাজাও বুরবোঁ বংশোদ্ভূত, সুতরাং তাকে সাহায্য করা অবশ্যকর্তব্য এই অজুহাতে ফ্রান্স ব্রিটেনের বিরোধিতা সত্ত্বেও স্পেনে হস্তক্ষেপ করে। এর উত্তরে ক্যাসেলরি-র স্থলাভিষিক্ত ব্রিটিশ বিদেশ সচিব দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন এবং তার দেখাদেখি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ঐ স্বাধীনতা মেনে নেয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মনরো এই সময়েই তার বিখ্যাত 'মন্‌রো ডকট্রিন' ঘোষণা করে আমেরিকায় ইউরোপীয় হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করেন। ফলে মেটারনিখের হস্তক্ষেপ নীতি এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়, ব্রিটেন শক্তিসমবায় থেকে সরে আসে এবং কার্যত ইউরোপীয় শক্তিসমবায় নষ্ট হয়ে যায়।

১.৯ শক্তিসমবায়ের ব্যর্থতা

আসলে ইউরোপীয় শক্তি-সমবায়ের ব্যর্থতার বীজ গোড়া থেকেই উপ্ত ছিল। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই নিজের ভূখণ্ড-অধিকার বিষয়ে নিজস্ব নীতি ও স্বার্থ সম্পর্কে সজাগ ছিল, জোট-নীতির সাফল্য তাই ছিল অনিশ্চিত। সিম্যানের মতে, সেই সময়ে 'কংগ্রেস সিস্টেম' বলে কোনকিছুর অস্তিত্ব ছিল না। ছিল না কোন চার্টার। তাছাড়া নেপোলিয়ন পতনের সময়ে দুর্ভিক্ষ ও অর্থনৈতিক মন্দার ফলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো যে সামাজিক বিপ্লবের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিল, ১৮২০-র পর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সেই ভয় থেকে তাদের মুক্তি দেয়। সুতরাং জোটবদ্ধ রক্ষণশীলতার প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়, দেখা দেয় স্বার্থের দ্বন্দ্ব। ত্বরান্বিত হয় শক্তিসমবায়ের পতন। কিন্তু তখন একক চেষ্টায় রক্ষণশীলতার দুর্গকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন একজন। তিনি মেটারনিখ, অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর।

১.১০ মেটারনিখ ও মেটারনিখ ব্যবস্থা

মেটারনিখ ১৮০৯-১৮৪৮ সাল পর্যন্ত অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রপরিচালক ছিলেন এবং এই সময়ে শুধু অস্ট্রিয়ার নয়, ইউরোপের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক ছিলেন। তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় হিসাবে এটুকুই যথেষ্ট যে, তাঁর কর্মকুশলতার একাধিপত্যের জন্য ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ সালের অন্তর্বর্তী সময়ের নাম হয়েছে মেটারনিখের যুগ—Era of Metternich, তাঁর ব্যক্তিত্ব, সামাজিক সৌজন্য, কূটনীতিক ভূয়োদর্শিতা ও ক্ষমতা, লোকচরিত্র পাঠের অত্যাশ্চর্য শক্তি, জটিল রাজনৈতিক প্রশ্ন সমাধানের সহজ প্রতিভা—সব মিলে তাঁর মধ্যে এত বহুমুখী গুণের সমাবেশ হয়েছিল যে, ভিয়েনা বৈঠকে তাঁর প্রাধান্য ও পরে ইউরোপীয় ব্যাপারে তাঁর নৈতিক একাধিপত্য অস্বীকার করার কোন উপায় ছিল না। আত্মক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অত্যধিক সচেতন এবং এই আত্মপ্রত্যয় শত বিঘ্ন এবং পরাজয়েও অটুট ছিল। এমনকি, ১৮৪৮-এর বিপ্লবের পর যখন অস্ট্রিয়ার সম্রাট সিংহাসনচ্যুত হন এবং মেটারনিখ ইংল্যান্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখনও তার মুখে শোনা যায়—আমার মন কখনও ভুল করেনি—'My mind has never entertained error'.

ঐতিহাসিক পুরুষ হিসেবে ফরাসি বিপ্লবকে তীব্রভাবে ঘৃণা ও অস্বীকার করার জন্যই মেটারনিখ বিখ্যাত। ফরাসি বিপ্লবকে নিজের অলঙ্কৃত ভাষার সাহায্যে যথাসাধ্য হেয় তিনি করেছেন। 'It was a disease which must be cured, the volcano which must be extinguished, the gangrene which must be burned with hot iron, the hydra with jaws open to swallow up the social order.' অর্থাৎ,—ফরাসি বিপ্লব একটা মহাব্যাধি, যার চিকিৎসার প্রয়োজন—একটি আগ্নেয়গিরি যার নির্বাপনের প্রয়োজন—একটা গলিত ক্ষত যাকে গরম লোহা দ্বারা পোড়ানো দরকার, একটা সহস্রশীর্ষ দানব যার উন্মুক্ত মুখাবিবর সামাজিক কাঠামোকে গ্রাস করতে উদ্যত। বিপ্লবের প্রতি মেটারনিখের এই অশ্রদ্ধা তাঁর সব কাজের মধ্যে প্রতিফলিত, কি অভ্যন্তরীণ নীতিতে কি পররাষ্ট্র-পরিচালন পদ্ধতিতে।

অস্ট্রিয়ার রাজতন্ত্র এবং অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বে বিশ্বাসী মেটারনিখ ইউরোপে জাতীয়তাবাদের প্রসার দমন করতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ভিয়েনা ব্যবস্থার স্থিতিশীলতাকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করতেন, পার্লামেন্টীয় প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার প্রতি তাঁর গভীর ভীতি ছিল। ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখাই ছিল তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার প্রধান লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে ডেভিড টমসনের মন্তব্য : "He also had a philosophy of conservatism, a theory of how balance might be kept in Europe as a Continent....." মেটারনিখ-এর মতে, প্রতিটি দেশের মধ্যেই সমাজ-ব্যবস্থায় এক ধরনের ভারসাম্য (equilibrium) উপস্থিত থাকে, এবং সেই সামাজিক কাঠামোকে ধ্বংসাত্মক শক্তিগুলি থেকে রক্ষা করার প্রয়োজন হয়। একমাত্র সামাজিক শৃঙ্খলাই ঐ ভারসাম্যকে বজায় রাখতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেও একটা সমতা বা ভারসাম্য রক্ষা করা দরকার, তার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের ওপর

নির্ভর না করে একটি অতিরাষ্ট্রীয় (super-national) ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করা প্রয়োজন। মেটারনিখ বিশ্বাস করতেন, ইউরোপীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত।

মেটারনিখের বহু প্রচারিত 'সিস্টেম' বা 'ব্যবস্থা' তৈরি হয়েছিল অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের জাতিগত এবং অন্যান্য অনৈক্যের সুযোগ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। হ্যাপস্‌বার্গ সম্রাটের বহু পুরাতন 'divide and rule' নীতিকে তিনি প্রয়োগ করেছিলেন। এবং তাঁর ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা হয়েছিল বেহেমিয়াতে জার্মান সৈন্যবাহিনী এবং লম্বার্ডিতে হাঙ্গেরিয়ান সেনা উপস্থিত রেখে। তাঁর 'সিস্টেম' জার্মানিকে একটি দুর্বল ও শিথিল রাষ্ট্রসংঘে পরিণত করে রেখেছিল যাতে জার্মান ডায়েট (Diet, সংসদ) অস্ট্রিয়ার নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে। সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা দিয়ে তিনি অস্ট্রিয়াকে বেঁধে রেখেছিলেন। গুপ্তচর ছাড়ানো ছিল, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছিল, বিদেশী বই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, ছাত্র ও অধ্যাপকদের ওপর সরকারের তরফ থেকে কড়া নজর রাখা হয়েছিল। পুলিশের হাতে ছিল বিশেষ ক্ষমতা। অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার ভিয়েনাতে একটি বিশেষ দপ্তর বসিয়েছিলেন, সেখানে বিদেশী চিঠিপত্র খুলে দেখে, তার অর্থ অনুধাবন করে, সন্দেহজনক তথ্য চ্যান্সেলারের অফিসে পাঠিয়ে দিয়ে, তারপর আবার সেগুলি ঠিকমত বন্ধ করে যথাস্থানে পাঠানো হতো। ফলে মেটারনিখ ইউরোপের বিভিন্ন প্রশাসনিক গোপন কথা জানতে পারতেন, দেশে দেশে তাঁর অনেক গুপ্তচর উপস্থিত থাকত যারা তাকে সরাসরি খবর পাঠাত।

মেটারনিখ ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য ছিল জার্মানি। সময়টি ছিল জার্মানিতে রোমান্টিক চেতনার যুগ। যদিও কোন সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলন উনিশ শতকের প্রথমে জার্মানিতে গড়ে ওঠেনি, কিন্তু শিক্ষিত জার্মানদের ভাবজগতে রোমান্টিক আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। ঐ আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন, আন্তর্জাতিকতা এবং সার্বজনীনতার পরিবর্তে তাঁরা উপাসনা করেছিলেন জাতীয় সংস্কৃতির। ফ্রাইডরিখ শ্লেগেল এবং ফ্রাইডরিখ নেভোলিশ রক্ষণশীলতার প্রতিনিধি হয়েও জার্মানজাতির অতীতের কথা প্রচার করেছিলেন। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উদারনীতির প্রচার ও প্রসার। সৃষ্টি হয়েছিল বিদ্রোহী কিছু ছাত্র সংগঠন বা বার্শেনস্কাফ্‌টেন (Burchenschaften)। জেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ওয়ার্টবুর্গ উৎসব করেছিল, যেখানে তারা 'লাইপজিগ'-এর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় এবং 'রিফর্মেশন' বা প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম-আন্দোলনের ত্রিশতবর্ষ-পূর্তি উৎসব পালন করেছিল। দুটি ঘটনাই স্বৈরাচার বিরোধী। এর সঙ্গে যুক্ত হয় কট্‌জব্যু হত্যাকাণ্ড। কট্‌জব্যু (Kotzebue) ছিলেন এক প্রতিক্রিয়াশীল সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ওপর তাঁর আক্রমণ জার্মান লিবারেলদের অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এই ব্যক্তিকে ১৮১৯-এ হত্যা করা হয়েছিল। এই পটভূমিকাতেই মেটারনিখ সুচতুরভাবে তাঁর 'কার্লস্‌বাড্‌ ঘোষণা' জার্মানিতে প্রয়োগ করেন।

ভিয়েনা চুক্তি জার্মানিতে অস্ট্রিয়ার আধিপত্যকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। নেপোলিয়ন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যকে ভেঙে দিয়ে রাইন-এর রাজ্যসঙ্ঘ গঠন করেছিলেন, এবং তাঁর পতনের পরে ভিয়েনা কংগ্রেস-এর নেতারা সৃষ্টি করেছিল জার্মান কনফেডারেশন। কনফেডারেশন-এর সাংবিধানিক আইনে (Act of Confederation) বলা

হয়েছিল, এর উদ্দেশ্য হবে জার্মানির অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিধান করা এবং জার্মান রাজ্যসমষ্টির স্বাধীনতা রক্ষা করা। জার্মান রাজ্যগুলি নানা সমস্যায় একজোটে কাজ করবে সে কথাও বলা হয়েছিল। এই কনফেডারেশনের রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি দ্বিকক্ষযুক্ত ডায়েট (Diet) (পার্লামেন্ট-এর সমতুল্য) গঠিত হয়েছিল যার বৃহত্তর কক্ষে রাজ্যগুলিরই ন্যূনতম একজন (কোন কোন রাজ্যের ৩-৪টি) প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে সাধারণ সমস্যাগুলি সম্বন্ধে ভোট দিতেন। এই প্রতিনিধিরা কিন্তু শাসকদের মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন; জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নয়। এই ডায়েট স্বাধীন এবং কার্যকর একটি প্রশাসনিক সংস্থায় রূপান্তরিত হতে না পারায় ক্রমশ মেটারনিখের অনুশাসন এবং তাঁর তত্ত্বাবধান মেনে নিয়েছিল, আর তাঁর নির্দেশিত পথেই লিবারেল বা উদারপন্থী জার্মানদের আক্রমণ থেকে জার্মানিকে বাঁচাবার কাজে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিল। একটি দুর্বল প্রশাসনিক সংস্থাকে সহজেই অস্ট্রিয়ান চ্যান্সেলার নিজের দপ্তরে রূপান্তরিত করেছিলেন। ওয়ার্টবুর্গ উৎসব এবং কট্‌জ্‌ব্যু হত্যাকাণ্ডের পরে অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার তাঁর প্রচারের দ্বারা জার্মানির শাসকদের উদারনীতির পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে সহজেই সন্দিহান করে তোলেন, এবং শীঘ্রই ঐ দুর্বল জার্মান ডায়েটের মাধ্যমে তাঁর উদ্ভাবিত কার্লস্‌বাড্‌ ডিক্রি জারী করেন (১৮১৯)।

১৮১৯-এ ফেডারেল ডায়েট-এ গৃহীত কার্লস্‌বাড্‌ ঘোষণা জার্মান কনফেডারেশন-এ এক চরম রক্ষণশীলতা প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই ঘোষণা ছাত্র-সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে জার্মান শাসকদের কঠোর ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয়, এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করা আর সবরকম প্রকাশনা সেনসর করার ক্ষমতা দেয়। রাজনৈতিক গুপ্ত সংগঠনগুলি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিশনও কার্লস্‌বাড্‌ ঘোষণা অনুযায়ী গঠন করা হয়। প্রদেশীয় পার্লামেন্টগুলির ক্ষমতাও সঙ্কুচিত হয় এবং জার্মান রাজ্যগুলি তাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ডায়েট-এর হস্তক্ষেপের অধিকার স্বীকার করে নেয়।

মেটারনিখের ক্রিয়াকলাপ এই সময়কার 'কনসার্ট অফ ইউরোপ'কেও প্রভাবিত করেছিল। এই রাষ্ট্রজোটের কাছে প্রধানত মেটারনিখের চেষ্টায় গণবিপ্লব-বিরোধী নীতি অনুমোদিত হয়। অর্থাৎ, কোন রাজ্যে গণবিপ্লব ঘটলে শক্তিসমবায় যৌথভাবে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করবে, এই নীতি ইউরোপের প্রধান চতুঃশক্তি (অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া, ইংল্যান্ড) বাহ্যত মেনে নিয়েছিল। যদিও ব্রিটেনের এই হস্তক্ষেপ নীতিতে সমর্থন ছিল না। কিন্তু ট্রপ্পো কংগ্রেস এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং ঐ কংগ্রেসে রুশ সম্রাট আলেকজান্ডার এবং মেটারনিখ একমত হয়ে কংগ্রেসের তরফ থেকে বিভিন্ন দেশে গণবিদ্রোহের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপনীতি ঘোষণা করেছিলেন। ট্রপ্পো কংগ্রেসে গৃহীত ট্রপ্পো প্রটোকল-এর ঘোষণা অনুসরণ করেই মেটারনিখ ১৮২০-২১ খ্রিস্টাব্দে ইতালির নেপল্‌স্‌ এবং পিডমন্টে গণবিদ্রোহগুলি সৈন্য পাঠিয়ে দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তবে মেটারনিখের ব্যবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এর প্রতিক্রিয়াও ছিল তীব্র। প্রথম প্রতিক্রিয়া দেখা যায় ইতালিতে। নেপোলিয়ান বোনাপার্টের উন্নত শাসনব্যবস্থার সঙ্গে দীর্ঘকাল পরিচিত থাকার দরুন ইতালির

অধিবাসীরা মেটারনিখের শাসন তীব্রভাবে অপছন্দ করেছিলেন। ইতালিতে মধ্যবিত্তশ্রেণী পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক প্রশাসন এবং সামাজিক কাঠামোকে স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না। তাই তারা মেটারনিখকে মেনে নেয়নি। এমনকি পোপ এবং পিডমন্ট সার্ডিনিয়ার শাসকরাও সুযোগ পেলেই মেটারনিখের বিরোধিতা করেছেন। ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিশেষ পরিবর্তন এসেছিল দুটি ব্যাপারে—গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তার সাফল্য, এবং জার্মানিতে 'জোলভেরেন'-এর প্রতিষ্ঠা, ও ১৮৩৪ নাগাদ তার পূর্ণতা লাভ। এই ঘটনাগুলির সঙ্গে বেলজিয়ামের হল্যান্ড থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং নরওয়ে রাজ্যটির স্বাশাসনের দিকে অগ্রগতি ও জাতীয়তাবাদী আবহ তৈরি হওয়ার ব্যাপারগুলি যুক্ত করে বলা যায়, ১৮৩০ নাগাদই মেটারনিখ ব্যবস্থার নানাস্থানে ফাটল ধরেছিল।

১৮৩০-এ এবং ১৮৪৬-এ অস্ট্রিয়া অধিকৃত পোল্যান্ডে তীব্র কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল এবং অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার তাঁর চিরাচরিত পদ্ধতিতে সেই বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। কিন্তু তবুও ১৮৪৬-এর ঐ বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে অস্ট্রিয়ার প্রশাসন বহু ঘৃণিত রোবট বা শ্রমকর অস্ট্রিয়া অধিকৃত পোল্যন্ডের গ্যালিসিয়া প্রদেশে নিষিদ্ধ করে। পরে সমগ্র অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যে শ্রমকর বাতিল করতে বাধ্য হয় (Act of Emancipation, 1848)। ১৮৪৮-এর বিপ্লবে মেটারনিখ ব্যবস্থা তাসের বাড়ির মতন ভেঙে পড়ে।

দীর্ঘকাল ইউরোপীয় শান্তি অব্যাহত রাখতে পারলেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মেটারনিখ উচ্চস্তরের রাজনীতিকুশলী ছিলেন না। তাঁর মধ্যে অভাব ছিল দূরদর্শী প্রতিভার। তাঁর নীতি সুবিধাবাদ ও নেতিবাদের সংমিশ্রণ; সংগঠনী কুশলতার অভাব তাঁর মধ্যে যথেষ্ট ছিল, ফরাসি বিপ্লবের ধ্বংসকেই তিনি লক্ষ্য করেছেন, তার সৃষ্টি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। দুই যুগের সন্ধিস্থলে তাঁর আবির্ভাব—অপসৃয়মাণ যুগকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি, আবার আগত যুগকেও গ্রহণ করতে পারেনি। এই দুই যুগের স্বীকৃতি অস্বীকৃতির মধ্যেই আছে মেটারনিখ জীবনের ট্র্যাজেডি। এই বিষয়ে তাঁর নিজস্ব স্বীকৃতি উল্লেখযোগ্য—"I have come into the world either too early or too late. Earlier I should have enjoyed the age, later I should have helped to reconstruct it. Today I have to give my life to propping up mouldering institutions." 'এই জগতে আমার কিছু আগে বা কিছু পরে আসা উচিত ছিল। আগে আসতে পারলে যুগকে উপভোগ করতে পারতাম, পরে এলেও এই জগতের পুনর্গঠনে সহায়ক হতাম। আজ ক্ষয়িষ্ণু প্রতিষ্ঠানগুলো খাড়া রাখবার জন্য আমার জীবনপাত করতে হচ্ছে।'

১.১১ সারসংক্ষেপ

নেপোলিয়ানের পরাজয়ের পর ইউরোপের প্রধান ফ্রান্সবিরোধী দেশগুলো নেপোলিয়ানের তৈরি রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে প্রাক্-বিপ্লব রক্ষণশীল কাঠামো ফিরিয়ে আনবার জন্য এবং তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় মিলিত হয়। বৈঠক চলে ১৮১৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে

১৮১৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত। সম্মেলনের শেষে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তাতে অস্ট্রিয়া, ব্রিটেন, এশিয়া ও রাশিয়ার স্বার্থই প্রধানত রক্ষিত হয়। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য ও জাতীয়তাবাদের শিক্ষা উপেক্ষিত হয়। ভিয়েনা কংগ্রেসের প্রধান ব্যক্তিত্ব, অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর, মেটারনিখ জানতেন, ভিয়েনা ব্যবস্থা সত্ত্বেও দেশে বিপ্লবী ঢেউ-এর সম্ভাবনা থেকে গিয়েছিল এবং ইউরোপীয় শাসকগোষ্ঠীর মধ্যেও বিবাদ অবশ্যম্ভাবী ছিল। সুতরাং আন্তর্জাতিক অন্তর্বিরোধ যাতে যুদ্ধ ও বিপ্লবে পরিণতি লাভ না করে, ভিয়েনা ব্যবস্থা যাতে অন্তত কয়েকবছর অক্ষুণ্ণ থাকে, তার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের কথা তিনি ভেবেছিলেন। চতুঃশক্তি চুক্তিতে প্রস্তাবিত ইউরোপীয় শক্তিসমবায়কে এই ধরনের সংগঠনে পরিণত করেন তিনি। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী বৃহৎ শক্তিবর্গের চারটি বৈঠক আহূত হয়। বৈঠকের মাধ্যমে মহাদেশীয় নজরদারির এই জোটবদ্ধ প্রয়াসই ইতিহাসে 'কংগ্রেস সিস্টেম' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এর সঙ্গে ১৮৩০-এর দশক পর্যন্ত যুক্ত ছিল মেটারনিখের নিজস্ব ব্যবস্থা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভিয়েনা ব্যবস্থা, শক্তিসমবায় এবং মেটারনিখ ব্যবস্থা—সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল।

১.১৩ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন :

১। ভিয়েনা সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল? এই সম্মেলনে কী কী প্রধান সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল?

২। ভিয়েনা চুক্তি কি শুধুই কূটনৈতিক দরাদরি ছিল? একে কি কোন অর্থেই 'reasonable' এবং 'statesmanlike' বলা যায় না?

৩। পবিত্র চুক্তি ও পবিত্র সংঘের মূল নীতি কি ছিল? চতুঃশক্তি চুক্তির সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়?

৪। ইউরোপীয় শক্তিসমবায়ের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করুন। এই সংঘ কতদূর সফল হয়েছিল?

৫। মেটারনিখের রাজনৈতিক দর্শন কি ছিল? মেটারনিখ ব্যবস্থার মূল্যায়ন করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। ভিয়েনা সম্মেলনের নেতৃত্ব কোন কোন দেশের হাতে ন্যস্ত ছিল?

২। জার প্রথম আলেকজান্ডারকে মেটারনিখ 'mind man' বলেছিলেন কেন?

৩। 'Principle of Legitimacy'-র অর্থ কি?

৪। 'পবিত্র চুক্তি' সম্পর্কে মেটারনিখ কি মন্তব্য করেছিলেন?

৫। কোন কোন রাষ্ট্র চতুঃশক্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল?

৬। ইউরোপীয় শক্তিসমবায়ের মোট কটি বৈঠক কোথায় কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

৭। নেপল্‌স্-এর বিদ্রোহ কীভাবে দমন করা হয়?

৮। 'মনরো ডকট্রিন' কি?

৯। 'My mind has never entertained error', কী প্রসঙ্গে কে এই কথা বলেছিলেন?

১০। 'কার্লস্‌বাড্‌ ঘোষণা' ব্যাখ্যা করুন।

১.১৪ গ্রন্থপঞ্জি

১। E. J. Hobsbawm : The Age of Revolution.

২। David Thomson : Europe Since Napoleon.

৩। D. C. B Seaman : From Vienna to Versailles.

৪। G. Rude : Revolutionary Europe

৫। Norman Davies : Europe

৭। প্রফুল্ল চক্রবর্তী : য়োরোপের ইতিহাস

৮। চিত্র অধিকারী : আধুনিক ইউরোপ—বিন্যাস ও বিবর্তন।

একক ২ □ ১৮৩০ ও ১৮৪৮-এর বিপ্লব

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ ফ্রান্সের জুলাই (১৮৩০) বিপ্লবের কারণ

২.৪ ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের ফলাফল

২.৫ ইউরোপের অন্যান্য দেশে জুলাই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া

২.৬ মধ্য ইউরোপে জুলাই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া

২.৭ ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পটভূমি

২.৮ ১৮৪৮-এর বিভিন্ন বিপ্লবের প্রকৃতি

২.৯ সারসংক্ষেপ

২.১০ অনুশীলনী

২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

আগের এককটিতে নেপোলিয়ন-যুগের পরবর্তী ইউরোপীয় রক্ষণশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন, কিভাবে দুটি পর্যায়ে, পৃথক পৃথক বিপ্লবের ধাক্কায় সেই রক্ষণশীল ব্যবস্থা আবার ভেঙে পড়েছিল।

২.২ প্রস্তাবনা

উনিশ শতকের ইউরোপের ইতিহাসের মূল সুর ছিল দুই স্বতঃবিরোধী মতবাদের সংঘাত—একদিকে সাম্য ও জাতীয়তাবাদ (equality and nationalism)। আর অন্যদিকে স্বৈরাচার, রক্ষণশীলতা আর বৈধাধিকারবাদ (autocracy, conservatism, legitimacy)। এই দুই মতের দ্বন্দ্ব ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ পর্যন্ত

নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছিল। তবে এর মধ্যে রক্ষণশীলতা ও পরিবর্তনের মাপকাঠিতে বিচার করে দুটি প্রধান পর্বকে চিহ্নিত করা যায়। ১৮১৫-১৮৩০, এই সময়টি হল রক্ষণশীলতার যুগ। আর ১৮৩০-১৮৪৮, এই সময়টি হল পরিবর্তনের যুগ। ১৮৩০ সাল পর্যন্ত ইউরোপের স্বৈরাচারী শাসকরা একজোট হয়ে সামাজিক বিদ্রোহ ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। এই সময়কে তাই বলা হয় রক্ষণশীলতার যুগ। কিন্তু বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত ঠেকানো যায়নি। ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবের পর থেকে ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লব পর্যন্ত ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানি, ইতালি, সুইজারল্যান্ড, পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশে একের এক বিপ্লব সংঘটিত হতে থাকে। এই যুগটিকে তাই বলা যেতে পারে বিপ্লবের যুগ। রক্ষণশীলতার যুগ থেকে বিপ্লবের যুগে এই উত্তরণের বিষয়টিই বর্তমান এককের আলোচ্য।

২.৩ ফ্রান্সের জুলাই (১৮৩০) বিপ্লবের কারণ

প্রতি-বিপ্লবী রাষ্ট্রব্যবস্থা আর বিপ্লবী ধারণার সংঘাতকেই ১৮৩০-এর বিপ্লবের প্রধান কারণ বলা যেতে পারে। আর এই সংঘাতের তীব্রতাবৃদ্ধির কারণ হিসেবে দেখানো যেতে পারে ১৮১৫-১৮৩০-এর ফরাসি রাজতন্ত্রের দুমুখী প্রবণতার দ্বন্দ্বকে।

১৮১৫ থেকে ১৮২৪ পর্যন্ত ফরাসি সিংহাসনে ছিলেন অষ্টাদশ লুই। ভিয়েনা ব্যবস্থার বৈধ অধিকার-এর নীতির ভিত্তিতে বুরবোঁ বংশের এই রাজা সিংহাসনে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি মেটারনিখের মতো বা রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডারের মতো অন্ধ প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না। কঠোর প্রতিবিপ্লবী ব্যবস্থা স্থাপন বা চতুর্দশ লুই-এর চরম একনায়কতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আর যে ফ্রান্সে সম্ভব নয়, একথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি প্রশাসনিক সনদ অনুমোদন করে, নির্বাচিত প্রতিনিধিসভা মেনে নিয়ে, ব্যক্তিগত সাম্য, ধর্মের স্বাধীনতা আর সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করে উদার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। স্বভাবতই উগ্র রাজতন্ত্রীরা এতে খুশী হয়নি। দক্ষিণ প্রান্তে তারা অচিরেই দাঙ্গা বাধিয়েছিল, যা White Terror বা শ্বেত সন্ত্রাস নামে খ্যাত। এই সময়েই নিহত হয়েছিলেন নেপোলিয়ানের একসময়ের সহকারী 'নে' (Ney) এবং ফরাসি সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী দ্যুক দ্য বারি (Duc de Berry)। পরিস্থিতির চাপে অষ্টাদশ লুই উদার রাজতন্ত্রের আদর্শ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই যেটুকু রাজকীয় উদারতার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল, তাতেই ফরাসি বুর্জোয়া নেতৃত্ব আবার নিজেদের সংগঠন বাড়িয়ে নিয়ে ফরাসি জনগণকে আবার বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত করতে পেরেছিল। যেহেতু সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা একটুও কমেনি, তাই বিদ্রোহ তাদের কাছে আকাঙ্ক্ষিতই ছিল।

এই অবস্থায় সিংহাসনে এসেছিলেন দশম চার্লস। তিনি ছিলেন উগ্র রাজপন্থীদের নেতা, সুতরাং তাঁর আমলে অষ্টাদশ লুই-এর বিপরীত প্রবণতা দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। তিনি ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব করে জেসুইটদের ফিরিয়ে এনেছিলেন এবং ধর্মীয় সমালোচনা বন্ধ করবার জন্য আইন পাশ করেছিলেন। চার্চ ও অভিজাতদের সব সুযোগ

সুবিধে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ফ্রান্সকে যাজকদের সাহায্যে শাসন করতে চেয়েছিলেন। এই কারণে তাঁর সরকারকে বলা হত, 'Government by Priests, through Priests, for Priests'। সব সংস্কারের বিরোধী ছিলেন দশম চার্লস। তাঁর রাজত্বকালে মাতিনিয়াক (Martignac), পলিনিয়াক (Polignac) প্রভৃতির নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীসভাগুলির চরিত্রও ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। সুতরাং বুর্জোয়াদের সঙ্গে এই রাজতন্ত্রের লড়াই ছিল অনিবার্য।

এই অবস্থায় ফ্রান্সে ১৮৩০ সালে উদার বুর্জোয়া গোষ্ঠী সংসদে গরিষ্ঠতা অর্জন করে রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু রাজা দশম চার্লসকে বশে আনতে না পারায় সেখানে বৈপ্লবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়।

দশম চার্লস নতি স্বীকার করেননি, কুদেতার পথ বেছে নিয়েছিলেন। তিনি ১৮৩০-এর ২৬শে জুলাই চারটি অর্ডিনান্স জারি করেন : (১) সংসদ আবার ভেঙে দেওয়া হয়। (২) সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা বিলোপ করা হয়। (৩) সংশোধিত নির্বাচনী আইনে নির্বাচকদের সংখ্যা তিন-চতুর্থাংশ কমিয়ে নামিয়ে আনা হয় ২৫০০০-এ এবং (৪) নতুন নির্বাচনের একটি দিন স্থির করা হয়।

অর্ডিনান্সের প্রতিবাদে মুদ্রক ও সাংবাদিকদের ধর্মঘটের সঙ্গে সঙ্গে প্যারিসের সর্বত্র ব্যারিকেড তৈরি করা হয় এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে। তিনদিন লড়াইয়ের পর (Lestrois glorieuses, July 27-29, তিনটি গৌরবময় দিন, জুলাই ২৭-২৯) প্যারিসের বিপ্লবীরা বিজয়ী হয়। পরিস্থিতি যে এমন বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে চার্লস তা একেবারেই বুঝতে পারেননি এবং সম্ভাব্য বিপ্লবী অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে কোন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি। যখন অনেক সাংবিধানিক সুযোগ সুবিধা ফিরিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর সিংহাসন রাখতে চাইলেন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর পৌত্র দ্যুক দ্য বর্দোর (Duc de Bordeaux) অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই প্যারিসে এই রাজবংশের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। প্যারিস লুই ফিলিপ 'দ্যুক দলেয়াঁর' (Louis Philppe, Duc D'orleans) হাতে সিংহাসন তুলে দিয়েছে।

২.৪ ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের ফলাফল

দ্য তকভিল (De Tocquville) লিখেছেন, জুলাই বিপ্লবের ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে চলে যায়। লুই ফিলিপকে রাজমুকুট দেওয়ার আগে সনদের সংশোধন করে, এই শ্রেণী নিজস্ব স্বার্থরক্ষার সুদৃঢ় ব্যবস্থা করেছিল। পুরনো সনদের ভূমিকাটি বাদ দিয়ে ঐশী রাজতন্ত্রের ধারণাকে অস্বীকার করা হয়। রাজার অর্ডিনান্স ঘোষণার ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে, উচ্চতর কক্ষের বিশেষ ক্ষমতা বাতিল করা হয়; ভোটাধিকার কিছুটা প্রসারিত করার ফলে বুর্জোয়াশ্রেণীর অধিকাংশ মানুষ ভোটাধিকার পায়। রাজার উপাধির (title) পরিবর্তন করা হয়। এখন থেকে রাজার উপাধি হয় "King of the French" বা ফরাসিদের রাজা, আগেকার উপাধি ছিল King of France বা ফ্রান্সের রাজা। বুরবোঁদের শ্বেত পতাকার পরিবর্তে ফরাসী বিপ্লবের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাকে জাতীয় পতাকার মর্যাদা দেওয়া হয়।

এই বিপ্লব চার্চ ও অভিজাত শ্রেণীকে প্রচণ্ড আঘাত করে। যাজকদের কাছ থেকে শিক্ষাব্যবস্থা কেড়ে নিয়ে, শিক্ষাকে ধর্মনিরপেক্ষ ঘোষণা করা হয়। বিপ্লবের ফলে অভিজাত শ্রেণী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়।

২.৫ ইউরোপের অন্যান্য দেশে জুলাই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া

প্যারিসের জুলাই বিপ্লবের প্রভাব ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বেলজিয়াম, সুইটজারল্যান্ড, পর্তুগাল, স্পেন, জার্মানি, ইতালি ও পোল্যান্ডে এই বিপ্লবের প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। এমনকি ব্রিটেনেও এই বিপ্লবের উত্তাপ অনুভূত হয়েছিল।

বেলজিয়ামের স্বাধীনতার যুদ্ধ

১৮১৫-তে বেলজিয়ামকে হল্যান্ড-এর সঙ্গে জোর করে যুক্ত করা হয়েছিল। এই সময় থেকে দক্ষিণ নেদারল্যান্ড অর্থাৎ বেলজিয়ামের রোমান ক্যাথলিক ফরাসি ও ফ্লেমিস অধিবাসীদের মনে ওলন্দাজ আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমে উঠেছিল। দক্ষিণ ও উত্তর নেদারল্যান্ডের উদ্বর্তনের ইতিহাসও আলাদা। এই দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা ও ধর্ম আলাদা। আর্থনীতিক ক্ষেত্রেও এদের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী। কৃষি ও বাণিজ্য ওলন্দাজদের প্রধান জীবিকা। এরা অবাধ বাণিজ্যে বিশ্বাসী। অন্যদিকে বেলজিয়াম দ্রুত শিল্পায়িত হচ্ছিল এবং বেলজিয়ামের শিল্পপতিরা শুল্ক সংরক্ষণ চেয়েছিল। বেলজিয়ামকে হল্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত করে ভিয়েনা শক্তিবর্গ বেলজিয়ামের ক্যাথলিক যাজক, নির্মাতা সম্প্রদায়, ইতিহাস সচেতন বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য গোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে। সংযুক্ত রাষ্ট্রে বেলজিয়ানদের সংখ্যা ছিল ওলন্দাজদের দ্বিগুণ। কিন্তু স্টেট্স জেনারেলে ওলন্দাজ ও বেলজিয়ানদের প্রতিনিধি ছিল সমসংখ্যক। দেশের প্রশাসনে ওলন্দাজ কর্মচারীদের আধিপত্য ছিল এবং সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ওলন্দাজদের স্বার্থরক্ষা। এই থেকেই বেলজিয়ানদের মুক্তপন্থী বিরোধিতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছিল রাজা প্রথম উইলিয়ামের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী ক্ষোভ।

১৮৩০ সালের উৎপাদন সংকট আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়। এই সময়ে আসে ফরাসি বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ। ফলে দাবানলের মত বেড়ে ওঠে বেলজিয়ামের স্বাধীনতা যুদ্ধ। অবশেষে ১৮৩৯ সালে বৃহৎ শক্তিবর্গ একটি চুক্তির দ্বারা বেলজিয়ামকে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করতে বাধ্য হয়।

২.৬ মধ্য ইউরোপের জুলাই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া

সুইটজারল্যান্ড : জুলাই বিপ্লবের পর সুইটজারল্যান্ডের ২২টি ক্যান্টনকে বিপ্লবী আবেগ স্পর্শ করেছিল। এইসব ক্যান্টনের সরকারসমূহের অধিকাংশই ১৮২৫ পর্যন্ত রক্ষণশীল অভিজাতদের হাতে ছিল। ১৮২৫-এর পর কয়েকটি ক্যান্টনে মুক্তপন্থী গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তিত হয়। জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে ১৮৩০ থেকে ১৮৩৩-এর মধ্যে অবশিষ্ট ক্যান্টনসমূহে গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রবর্তিত হয়।

জার্মানি : জার্মান কনফেডারেশনে ও এই সময়ে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ব্রনসত্বিকের ডিউক বিতাড়িত হন এবং তাঁর উত্তরাধিকারী একটি মুক্তিপন্থী সংবিধান প্রবর্তন করতে বাধ্য হন। হ্যানোভার, স্যাক্সনি ও হেসে-কাসেলে ও শাসকদের কাছ থেকে অনুরূপ সুবিধা আদায় করা হয়। ব্যাভারিয়া, ব্যাডেন ও হবুরটেমবুর্গে মুক্তপন্থী দলগুলির শক্তিবৃদ্ধি হয়।

ইতালি : ইতালিতে একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী অভ্যুত্থান শুরু হয়। ১৮৩০-এ বিদ্রোহের ফলে মডেনার চতুর্থ ফ্রান্সিস বিতাড়িত হন। এই বিদ্রোহের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পার্মার মারি লুইসকে ও দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়। এ্যাপেনাইন পর্বতমালার পূর্বদিকে পোপের রাজ্যে বিদ্রোহের ফলে একটি অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

পোল্যান্ড : ১৮৩০-এর নভেম্বরের শেষভাগে পোল্যান্ডে অভ্যুত্থান শুরু হয়। বিদ্রোহীরা একটি অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করে এবং জারের কাছে সংস্কার দাবি করে।

স্পেন ও পর্তুগাল : স্পেন ও পর্তুগালে সাংবিধানিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ সময়ে প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ এসেছিল এই দুই দেশের সিংহাসনের দুই দাবিদারের কাছ থেকে। শেষ পর্যন্ত এই দুই দেশের নিয়মতান্ত্রিক রাজার পক্ষে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের হস্তক্ষেপের ফলে সাংবিধানিক ব্যবস্থা রক্ষা পায়।

গ্রেট ব্রিটেন : এইসব ইউরোপীয় অভ্যুত্থানের বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়া ছিল ১৮৩২-এর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সংস্কার আইন। এই আইনের দ্বারা ভোটাধিকার সম্প্রসারিত করা হয় এবং বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্রের শক্তির পুনর্বণ্টন করা হয়। ফলে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ব্যাপকতর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক সংস্কারের পথ প্রশস্ত হয়।

২.৭ ১৮৪৮ সালে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পটভূমি

১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফ্রান্সে দ্বিতীয়বার বিপ্লব ঘটে। প্রাক্-মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রসার, বুর্জোয়া শ্রেণীর অসন্তুষ্টি, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ক্লেশ ও সর্বোপরি ১৮৪৭-৪৮-এ উৎপাদন সংকট এই বিপ্লব ও দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের জন্ম দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে গোটা ইউরোপে। জার্মানিতে ঝিমিয়ে পড়া জাতীয়তাবাদী লড়াই নতুন করে শুরু হয়। ইতালিতে কারবোনারি গোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্য 'ইয়ং ইতালি, ও 'ইয়ং ইউরোপ' আন্দোলনের উদগাতা মাৎসিন্নি ইতালির জাতীয় নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন। পোল্যান্ড ও সুইটজারল্যান্ডেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। আপাত ব্যর্থতা সত্ত্বেও এইসব আন্দোলন যুগ পরিবর্তনের সূচনা করে। এমনকি অস্ট্রিয় সাম্রাজ্যও এই ধাক্কা থেকে রেহাই পায়নি। রাজনৈতিক বিপ্লব থেকেই জন্ম নেয় সামাজিক অভ্যুত্থান। ইংল্যান্ডের চার্টিস্ট আন্দোলন ও তার পরবর্তী পর্যায় এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সুতরাং ১৮১৫ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত সময়টি আসলে ছিল রক্ষণশীলতার অস্তিত্বরক্ষার প্রয়াস ও তার ব্যর্থতার যুগ আর ১৮৩০—১৮৪৮ সাল ছিলো সর্ব অর্থেই বিপ্লবের ও পরিবর্তনের যুগ। ব্যাপকতর অর্থে তাই ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ সাল এই পুরো সময়টিকেই বিপ্লবের বা পরিবর্তনের যুগ বলা যেতে পারে।

১৮৪৮-এ দ্রুত বিপ্লব সংগঠনের পেছনে শ্রমিকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো। এ যুগে আলসাস, নর্মান্ডি লিয়ঁ, লোয়ার উপত্যকা ও লোরেনে শিল্পায়নের ফলে ফ্রান্সে একটি শ্রমিকশ্রেণী গড়ে উঠেছিলো। এই শ্রেণী জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও কর্মক্ষেত্রে উন্নততর পরিবেশের জন্য সংগ্রামে প্রস্তুত ছিল। অথচ সরকার শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে কোন হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করেছিল। ১৮৪১-এ সরকার একটিমাত্র কারখানা আইন প্রণয়ন করে কিন্তু তাও কার্যকর হয়নি। সেঁ সিমঁ, ফরিয়ের প্রমুখের প্রাক্-মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা এ-যুগের ফ্রান্সে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতিতেই দেখা দেয় ১৮৪৬-এর অর্থনৈতিক সংকট।

গোটা উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপব্যাপী গম ও আলুর অজন্মা ও শিল্পে মন্দা থেকে এই সংকটের উদ্ভব ঘটে। অতিরিক্ত ফাটকাবাজি এই আর্থিক সংকট বাড়িয়ে দেয়, সর্বত্র অসন্তোষ দেখা দেয়। এই অসন্তোষ অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে উচ্চমহলের দুর্নীতি ও বিদেশনীতির ব্যর্থতার জন্য। ১৮৪০-এ তিয়ের (Thiers) মন্ত্রীসভার যুগে যে ইঙ্গ-ফরাসী আঁতাত গড়ে উঠেছিল, পূর্বাঞ্চলীয় সমস্যার সংকটে তা বিনষ্ট হয়। আশ্রিত আরব জাতীয়তাবাদী নেতা মহম্মদ আলিকে সমর্থন করে ফরাসী সরকার ইউরোপীয় শক্তি সমবায়ে ভাঙন নিয়ে আসে। পূর্বাঞ্চলীয় সংকটের ফলে যখন যুদ্ধের আশংকা দেখা দেয়, তখন ফ্রান্স সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন। মন্ত্রী গীজো জোড়াতালি দিয়ে কোনোরকমে শেষরক্ষা করেন। কিন্তু ফরাসি যুবরাজ দ্যুক দ্য মঁ পঁসিয়ের ও স্পেনের রাজকুমারী ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারিনী মারি লুইসা ফারনান্ডোর বিয়েকে কেন্দ্র করে আবার সংকট দেখা দেয় ১৮৪৬-এ। এই বিয়ে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতা লর্ড পামারস্টোনকে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তার ফলে ইঙ্গ-ফরাসি আঁতাতে ফাটল ধরে। ইউরোপের রক্ষণশীল রাজাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এবার গীজো লুই ফিলিপকে পরামর্শ দেন। সমগ্র ইউরোপে যখন মুক্তপন্থী হাওয়া, তখন রক্ষণশীল স্বৈরাচার। রাজতন্ত্রের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের প্রয়াস জনতাকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। রাজতন্ত্রের প্রতি বিদ্রোহ যখন ঘনীভূত, তখন সংসদীয় সংস্কারের জন্য নতুন আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনই ভোজসভা (Banquet) আন্দোলন নামে বিখ্যাত। আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভোটাধিকার সম্প্রসারণের আন্দোলন, ভোজসভাকে প্রচারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে। এই আন্দোলনে বিভিন্ন বিরোধী গোষ্ঠী একত্রিত হয়েছিল।

১৮৪৮-এর ২২ ফেব্রুয়ারি সরকার এই ভোজসভার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনতা সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে গীর্জার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় ব্যারিকেড গড়ে ওঠে। জনতার বিক্ষোভের এই স্পষ্ট চিহ্ন দেখে লুই ফিলিপ গাজোকে বরখাস্ত করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি পররাষ্ট্র দপ্তরের সম্মুখে সৈন্যরা গুলি চালায়। সঙ্গে সঙ্গে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। ঘটনার এই আকস্মিক পরিবর্তনে ভীত রাজা ২৪ ফেব্রুয়ারি নাবালক পৌত্র লুই ফিলিপ অ্যালবার্টের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করে

ইংল্যান্ডে নির্বাসনে যান। বিপ্লবীরা এরপর ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে ফ্রান্সে স্থাপিত হয় দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র।

২.৮ ১৮৪৮-এর বিভিন্ন বিপ্লবের প্রকৃতি

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ১৮৪৮-এর বিপ্লব একটি নির্দিষ্ট পথ ধরে অগ্রসর হয়নি। এইসব বিপ্লবের পরিণামও বিচিত্র। তবু এই বিপ্লবসমূহ একসূত্রে গাঁথা ছিল বলা চলে। কারণ এইসব বিপ্লবের উৎপত্তি ও লক্ষ্য, ঘটনা পরম্পরা ও পরিণামের মধ্যে প্রকৃতিগত অনেক সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য এসেছে ইউরোপীয় সভ্যতার ঐক্য ও অনৈক্যের টানাপোড়েন থেকে। ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮-এর মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের অভিঘাতও এই সাদৃশ্যের আরেকটি কারণ।

সবচেয়ে প্রথমে যা লক্ষণীয় তা হল দেশ ও কালের সাদৃশ্য। ১৮১৫-র ভিয়েনা ব্যবস্থায় এক প্রজন্ম কেটে যাওয়ার পর ইউরোপে বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে প্রত্যেকটি বিপ্লবই ভিয়েনা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। প্রত্যেক বিপ্লবই এই ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। ১৮৪৮-এর সব বিপ্লবী অভ্যুত্থানের এই হল সাধারণ চরিত্র। ১৮৪৮-এর বিপ্লব সচেতনভাবে ফ্রান্সের ১৭৮৯-এর মহান বিপ্লবকে অনুকরণ করেছিল।

ফরাসি বিপ্লবী ঐতিহ্যকে সক্রিয় করে ইউরোপে ফরাসী নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংকল্প ছিল এই বিপ্লবের। অস্ট্রিয়া ও ইতালিতে বিপ্লব সরাসরি ভিয়েনা ব্যবস্থাকে আক্রমণ করে হ্যাবসবুর্গ আধিপত্যের বিলুপ্তি ঘটাতে চেয়েছিল। নতুন সংবিধান ও নির্বাচিত সংসদ প্রবর্তন করে ইতালি ও জার্মানীর মানুষ ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন ইতালীয় ও জার্মান রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চেয়েছিল। হাঙ্গারীতে বিপ্লব ম্যাগিয়ার (Magyar) ও শ্লাভদের পরস্পর বিরোধী স্বাধীনতার সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েছিল। অস্ট্রিয়ার বাইরে সব বিপ্লবেরই একটি নেতিবাচক ঐক্য ছিল : প্রত্যেক বিপ্লবই অস্ট্রিয়াবিরোধী, স্বৈরাচারবিরোধী ও রক্ষণশীলতা বিরোধী। কিন্তু বিপ্লবের পদ্ধতি ও লক্ষ্য সম্পর্কে মুক্তপন্থী জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে গভীর মতবিরোধ ছিল। বিপ্লবের অসাফল্যের অন্যতম কারণও তাই।

দ্বিতীয়ত, দেশে ও কালে এই বিপ্লবসমূহের পরম্পরা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বিপ্লবের উৎসকেন্দ্র ছিল দুটি—ইতালি ও ফ্রান্স। ফ্রান্সের চেয়েও শক্তিশালী ঝটিকাকেন্দ্র ছিল ইতালি। ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আগে বিপ্লব শুরু হয়েছিল ইতালির পালের্মোতে। কিন্তু ফ্রান্স তখনো বিপ্লবী প্রেরণার উৎস হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। তাই ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর মার্চে জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গারীতে বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটে। কিন্তু সর্বত্র বিপ্লব শুরু হয়ে যাওয়ার পরে প্যারিস আর বিপ্লবের কেন্দ্র থাকেনি। বরং বিপ্লবের কেন্দ্র সরে যায় ভিয়েনা ও বুদাপেস্তে, তুরীন ও রোম, ফ্লোরেন্স ও ভেনিসে। বিপ্লবের নেতৃত্ব ফ্রান্স থেকে সরে যাওয়ায় এই বিপ্লবের জাতীয়তাবাদী চরিত্র ধরা পড়ে। ব্রিটেনের মতো ফ্রান্সও একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়েছে। তাই ফ্রান্সও ব্রিটেনের মতো তৃপ্ত, রক্ষণশীল। কিন্তু ইতালির জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার কামনা জার্মানী অথবা পোল্যান্ড অথবা রুমানিয়ার ঐক্য ও স্বাধীনতার কামনার সঙ্গে একসুরে বাঁধা ছিল।

তৃতীয়ত, যখন ইউরোপে বিপ্লবের আগুন জ্বলছিল, তখন কোনো কোনো দেশে কেন সামান্য গণ্ডগোল হয়েছে অথবা কিছুই হয়নি তা বিশেষভাবে অর্থবহ হয়ে ওঠে। যেমন পশ্চিমে ব্রিটেন ও বেলজিয়ামে এবং পূর্বে রাশিয়া এবং পোল্যান্ডে বিপ্লব হয়নি। বিপ্লব প্রধানত মধ্য ইউরোপে ঘটেছে। যেসব দেশে শিল্পায়নের পরিমাণ কম, (যেমন—জার্মানি, ইতালি ও সুইটজারল্যান্ড) আর যেসব দেশ কৃষিপ্রধান ও কৃষক অধ্যুষিত (যেমন বল্‌কান অঞ্চলের দেশসমূহ) সেইসব দেশেই বিপ্লব হয়েছে।

১৮১৫ থেকে ১৮৪৮-এর মধ্যবর্তী যুগে ইউরোপের অর্থনৈতিক প্রসার এবং ফরাসি বিপ্লবী ঐতিহ্যের সঙ্গে ১৮৪৮-এর বিপ্লবের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। মূলত তিনটি উপাদানের সংমিশ্রণে এ যুগের বিপ্লবী মেজাজ গড়ে উঠেছিল। এই তিনটি উপাদান হল : ১৮১৫-র আগেকার ভাবধারা ও আদর্শের আলোড়ন; অভাবনীয় জনস্ফীতির জন্য অস্থিরতা, এবং শিল্প ও পরিবহন ব্যবস্থার বিকাশ প্রসূত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির সামগ্রিক পরিবর্তন। দেশে দেশে এই তিনটি উপাদানের গুরুত্বের তারতম্য ঘটেছে। কিন্তু সর্বত্রই এই তিনটি উপাদানের উপস্থিতি চোখে পড়ে।

১৮৪৮-এর বিপ্লবসমূহকে শহুরে বিপ্লব বলা যেতে পারে। সব বিপ্লবেরই উৎস শহর, প্রেরণাও শহর। ইউরোপের সব দেশে শহরের মানুষেরাই প্রথমদিকে বিপ্লবের ঘটনা পরম্পরাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। লন্ডন ও বার্মিংহাম, প্যারিস ও ব্রাসেলস, ভিয়েনা ও বুদাপেস্ত বিপ্লবের গতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এ কথা বলা যেতে পারে যে, পূর্ব ইউরোপে যেসব শহরে এক লক্ষের বেশি অধিবাসী ছিলো, সেইসব শহরেই বিপ্লব এসেছে।

সব বিপ্লবেরই নেতৃত্ব এসেছিল বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্র, সাংবাদিক ও কবি—এরাই বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। লামার্তিন ও পেটোফির মতো কবি, মাজ্জিনি ও কোসুথের মতো সাংবাদিক, প্যালাকি, ডালমান ও বালসেসকোর মতো ঐতিহাসিক এইসব বিপ্লবের এক একটি রোমান্টিক চরিত্র। বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বধীন এইসব শহুরে বিপ্লবের ভাগ্য কিন্তু নির্ভর করছিল কৃষকদের উপর। ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার কৃষক জমির বিপ্লবের পর মালিকানা পেয়ে যায়।

প্রাগ্রসর শিল্পায়িত দেশে, বিশেষত ব্রিটেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে এবং অনেকাংশে জার্মানিতে ও ইতালিতে একটি শ্রমিকশ্রেণী গড়ে উঠেছিল। ১৮৪৮-এ এই শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব উপহার দিয়েছিল প্রাগের রক্তাক্ত 'জুনের দিন' এবং ভিয়েনার অক্টোবরের দিন'। এই প্রসঙ্গে ১৮৪৮-এর বিপ্লবের একটি বিশেষ পরিণাম স্মরণীয়। এই বিপ্লবের ফলে প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকার সমাজতন্ত্র নিয়ে আসতে পারে, বুর্জোয়াশ্রেণীর এই ভয় আর ছিল না। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এই বিপ্লবের পর।

১৮৪৮-এর নানা বিপ্লবকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল একটি রাজনৈতিক বাস্তব। এ যুগের রাজনীতির সবচেয়ে সম্ভাবনময় হাতিয়ার জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদ কোনো কোনো দেশে বিভিন্ন অংশের ঐক্যের আন্দোলনের রূপ নিয়েছিলো। যেমন জার্মানি ও ইতালিতে। কোনো কোনো দেশে বিদেশী রাষ্ট্রের অধীনতা থেকে মুক্তির আন্দোলনের রূপ নেয় জাতীয়তাবাদ। যেমন অস্ট্রিয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশসমূহ। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

যাইহোক, ফ্রান্সে বিপ্লব সংগঠিত হবার পরই এই বিভিন্ন ধরনে তা ইউরোপের অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এর কারণের আঞ্চলিক বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক সংকটই যে বিপ্লব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার কারণ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রাজতন্ত্রী ও বুর্জোয়া, বুর্জোয়া ও পাতি-বুর্জোয়া, বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণী—কৃষকশ্রেণী—এই ধরনের শ্রেণীবিরোধ বিপ্লবের গতি আরো বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং সাধারণভাবে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবসমূহের দ্রুত বিস্তারের প্রধান কারণ রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সংকট ও শ্রেণী বিরোধ।

তবে পরিবর্তনের আদর্শ ১৮৩০ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত বহু আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেলেও ১৮৪৮-এর পর কিন্তু সাময়িকভাবে রক্ষণশীলতারই জয় হয়। ১৮৫০ সাল নাগাদ জার্মান ও ইতালিয়ান জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে, স্লাভ হাংগারি ও রুমানিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনও ভেঙে যায়। প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়াতেও সাবেকপন্থীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি ফ্রান্সে ১৮১৫ সালে তৃতীয় নেপোলিয়ন দ্বিতীয় সাম্রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হন। সুতরাং ১৮১৫ থেকে ১৮৫০ এই সময়পর্বকে উচ্চ আশা ও আদর্শের যুগ বলা গেলেও পূর্ণ সাফল্যের যুগ সম্ভবত বলা যায়না।

২.৯ সারসংক্ষেপ

উনিশ শতকের ফ্রান্সের ইতিহাস ফরাসি বিপ্লবেরই অনুবৃত্তি। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ফ্রান্সের মানুষ লোকায়ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছে। কখনও তারা দু'পা এগিয়েছে, কখনও এক পা পিছিয়েছে। ১৮১৫ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের সিংহাসনে ছিল বুরবোঁ বংশ। ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবের ফলে এই রাজবংশ সিংহাসন হারায়। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের আশায় ফরাসিরা অর্লেয়াঁ বংশের লুই ফিলিপকে বসায়। কিন্তু এই রাজাও স্বৈরাচারের দিকে ঝুঁকে যাওয়ায় ১৮৪৮-এর বিপ্লবে বিতাড়িত হন। ফ্রান্সে ঘোষিত হয় দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্র বা Second Republic। বিপ্লবের ঢেউ ফ্রান্সের বাইরে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য ১৮৪০ নাগাদ এই ঢেউ কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

২.১০ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন।

১। ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবের কারণ ব্যাখ্যা করুন।

২। ফ্রান্সে ও তার বাইরে জুলাই বিপ্লবের প্রভাব কি ছিল?

৩। ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের দ্রুত সংগঠনের কারণ কি?

৪। ১৮৪৮-এর ইউরোপীয় বিপ্লবগুলোর সাধারণ প্রকৃতি ও চরিত্র ছিল কি?

৫। আপনি কি মনে করেন যে, ১৮১৫—১৮৪৮ যতটা 'প্রত্যাশার যুগ', ততটা 'প্রাপ্তির যুগ' নয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন।

১। উনিশ শতকের ইউরোপের স্বতঃবিরোধী মতবাদের সংঘাত বলতে কি বোঝায়?

২। অষ্টাদশ লুই কি উদার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন?

৩। দশম চার্লস কতটা প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন?

৪। ১৮৩০-এর ফরাসি অর্ডিন্যান্সগুলি কি কি?

৫। ১৮৩০-এর বিপ্লবের কি প্রভাব ইংল্যান্ডের উপর পড়ে?

৬। ১৮৪৮-এর বিপ্লবে শ্রমিকদের ভূমিকা কি ছিল?

৭। 'ভোজসভা আন্দোলন' কি?

৮। ১৮৪৬-এর বিবাহ সংকট ব্যাখ্যা করুন।

৯। ১৮৪৮-এর বিপ্লব কোন রাজবংশকে ফরাসী সিংহাসন থেকে সরিয়ে দেয়?

১০। ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্র কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?

২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। J. Grenrille : Europe Reshaped

২। Jonathan Sperber : The European Revolutions.

৩। G. Ruggiero : The History of European Liberalism.

৪। B. L. Woodward : French Revolutions.

৫। P. Robertson : Revolutions of 1848.

৬। প্রফুল্ল চক্রবর্তী : য়োরোপের ইতিহাস।

একক ৩ □ দ্বিতীয় সাম্রাজ্য ও তৃতীয় নেপোলিয়ন প্যারিকমিউন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ ফ্রেব্রুয়ারি বিপ্লব ও দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র

৩.৪ লুই নেপোলিয়ন

৩.৫ লুই নেপোলিয়নের জনসমর্থন লাভের কারণ

৩.৬ তৃতীয় নেপোলিয়নের অভ্যন্তরীণ নীতি

৩.৭ তৃতীয় নেপোলিয়নের বিদেশনীতি

৩.৮ তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের কারণ

৩.৯ তৃতীয় নেপোলিয়ন : একটি মূল্যায়ন

৩.১০ তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও প্যারি কমিউনের বিদ্রোহ

৩.১১ প্যারি কমিউনের প্রতিষ্ঠার পটভূমি

৩.১২ প্যারি কমিউনের চরিত্র ও কার্যাবলী

৩.১৩ প্যারি কমিউনের পতনে কারণ

৩.১৪ কমিউনের তাৎপর্য

৩.১৫ সার-সংক্ষেপ

৩.১৬ অনুশীলনী

৩.১৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পর ফ্রান্সে বুর্জোয়াদের স্থাপন করা দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রকে নষ্ট করে কিভাবে তৃতীয় নেপোলিয়ন দ্বিতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ১৮৭০ সালে সেই সাম্রাজ্যের পতনের পর কেন প্যারিসে একটি স্বতন্ত্র কমিউনের উত্থান ও পতন ঘটেছিল, তার বিস্তারিত আলোচনা করাই বর্তমান এককটির উদ্দেশ্য।

৩.২ প্রস্তাবনা

ফ্রান্সের ১৮৪৮ সালের গণবিপ্লবের সাফল্য ছিল সাময়িক। এই বিপ্লবের পর যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রথম নেপোলিয়ঁ বা নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই নেপোলিয়ঁ বা তৃতীয় নেপোলিয়ন। বুর্জোয়াদের দুর্বলতা, প্রজাতন্ত্রীদের মতবিরোধ এবং নেপোলিয়নের ঐতিহ্যের প্রতি ফরাসিদের মোহকে কাজে লাগিয়ে লুই নেপোলিয়ন ১৮৫২ সালে প্রজাতন্ত্রকে নাকচ করে ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ১৮৭০ সালে এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং ফ্রান্সের রাজধানীতে শ্রমজীবীদের সরকার 'প্যারি কমিউন' নাম নিয়ে গড়ে ওঠে। ছ'সপ্তাহ পরে অবশ্য প্রজাতন্ত্রীদের হাতে কমিউনেরও পতন ঘটে। বর্তমান এককে এই ঘটনাপরম্পরাই নির্দেশিত হবে।

৩.৩ ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ও দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র

ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর প্রজাতন্ত্রী দলের যৌথ উদ্যোগে একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল। কিন্তু মার্চ ও এপ্রিল মাসে তাদের মধ্যে বিভেদ তীব্র হয়ে ওঠে এবং পরবর্তী নির্বাচনে লুই ব্লাঁ-র সমাজতন্ত্রী দল পরাজিত হওয়ায় বামপন্থীদের মধ্যে বিক্ষোভ বাড়তে থাকে। ইতিমধ্যে পোল্যান্ডের বিপ্লবে ফরাসি প্রজাতন্ত্রী সরকার কোন সাহায্য না করায় সমাজতন্ত্রীরা পনেরোই মে তারিখে বিধানসভা ভবন অধিকার করার চেষ্টা করে। বিদেশমন্ত্রী লা মাতিন-এর চেষ্টায় অবশ্য বিধানসভা রক্ষা পায়। এরপর জুন মাসে সরকার সব জাতীয় কর্মশালা বন্ধ করে দেয়, বেকার হয়ে যায় লক্ষাধিক শ্রমিক। ২৩-জুন তারা প্রতিবাদ অবরোধে সামিল হয়। এই বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করেন দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের যুদ্ধমন্ত্রী য়্যজেন কাভেনিয়াক (Eugene Cavaignac)। ২৩ থেকে ২৬ জুন—এই চারদিনে প্রায় দশহাজার মানুষ হতাহত হয়। কয়েক হাজার শ্রমিক কারারুদ্ধ হয়। ইউরোপের ইতিহাসে তাই দিনগুলো 'জুন ডেজ' নামে কলঙ্কিত হয়ে আসে। ঐতিহাসিকরা বলেন, সন্ত্রাসের রাজত্বেও ফ্রান্সে এত রক্তক্ষয় হয়নি।

শ্রমিকদের ও সমাজতন্ত্রীদের দমন করবার পর ফ্রান্সের National Assembly বা জাতীয় সভা, মার্কস-এঙ্গেল্‌স-এর ভাষায় Assembly of Capitalists, একটি সংবিধান প্রস্তুত করে। সংবিধানে প্রশাসনের প্রধান হিসেবে চার বছরের জন্য জন-নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের রক্ষকরা ভেবেছিলেন, ক্ষমতাবান প্রেসিডেন্ট সরকারকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে পারবেন। কিন্তু পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল তাদের সবাইকেই হতচকিত করে দেয়। নির্বাচনে লা মাতিন বা কাভেনিয়াককে হটিয়ে দিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই নেপোলিয়ন বা তৃতীয় নেপোলিয়ন।

৩.৪ লুই নেপোলিয়

লুই নেপোলিয়ন ছিলেন বোনাপার্ট-পত্নী জেসোফিন-এর কন্যা হরটেন্‌শ্‌ ব্যুহানে এবং বোনাপার্ট-ভ্রাতা লুই-এর সন্তান। প্রথম নেপোলিয়ন-এর পুত্র 'ডিউক অব্‌ রাইখস্টাড্‌ট্‌' যেহেতু দ্বিতীয় নেপোলিয়ন হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন, তাই লুই নেপোলিয়ন নিজেকে তৃতীয় নেপোলিয়ন হিসেবে পরিচিত করে বোনাপার্টীয় ধারার প্রবহমানতাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। নেপোলিয়ন পতনের পর তিনি ইতালিতে পালিয়ে গিয়ে 'কারবোনারি' সমিতির সদস্য হয়েছিলেন। ১৮৩০-এর বিপ্লবের পর তিনি ফ্রান্সে ফিরে এসে দু'বার (১৮৩৬, ১৮৪০) ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ষড়যন্ত্রের শাস্তিস্বরূপ ১৮৪০ থেকে ১৮৪৬ পর্যন্ত তিনি কারাদণ্ডও ভোগ করেন। ১৮৪৬-এ হ্যাম দুর্গের কারাগার থেকে তিনি পালিয়ে যান এবং ৪৮-এর বিপ্লবের পর আবার ফ্রান্সে ফিরে আসেন। ধনী অভিজাত বন্ধুদের সাহায্যে তিনি রাজনৈতিক পরিচিতি লাভ করেন এবং ফরাসিদের মনে বেঁচে থাকা বোনাপার্টের গৌরবের স্মৃতিকে কৌশলে কাজে লাগাতে থাকেন। কুখ্যাত 'জুন-ডেজ'-এর পর প্রজাতন্ত্রীদের প্রতি ফরাসিদের তীব্র বিরক্তির সুযোগে তিনিই সবাইকে অবাক করে দিয়ে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

৩.৫ লুই নেপোলিয়নের জনসমর্থন লাভের কারণ

লুই নেপোলিয়ন এমন একটা সময়ে জনসমর্থন চেয়েছিলেন যখন ফ্রান্সের মানুষ সমর্থন করবার জন্যই একজন অপ্রজাতন্ত্রী কিন্তু জনদরদী ব্যক্তিত্বের সন্ধানে ছিল। জুন দিনের অভিজ্ঞতা তাদের ক্লান্ত-বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল। এর থেকে মুক্তির জন্য তারা লুই-এর হাত ধরতে চেয়েছিল। কেননা ইতিমধ্যেই লুই তাঁর The Nepoleonic Ideas' এবং 'The Extinction of Pauperism' বই দুটোতে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট-এর বিপ্লব-বন্ধুত্বের দিনগুলো ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দিয়েছিলেন। দরিদ্রের জন্য, ফরাসিদের সকলের জন্য তাঁর দুশ্চিন্তা ও সমাধান-স্বপ্নের কথা শুনিয়েছিলেন। ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবীরা, স্বল্পবিত্তরা তাঁকে দেখেছিলেন এক ভিন্ন ব্যবস্থার প্রতীক হিসেবে। উচ্চবিত্তরা ভেবেছিলেন, বোনাপার্টের মতো ফরাসি-পুঁজির লক্ষণীয় স্ফীতির ব্যবস্থা তিনি করবেন। লুই নেপোলিয়ন রোমান ক্যাথলিক চার্চকেও তুষ্ট করতে ভোলেননি। পাদ্রীদের তিনি বুঝিয়েছিলেন, রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা হাতে পেলে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার পাশাপাশি চার্চ-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাও চালু করা হবে। অর্থাৎ ফ্রান্সের সবশ্রেণীর মানুষই তাঁর প্রতি মোহগ্রস্ত হয়েছিল। নেপোলিয় বোনাপার্ট নিজেই তাঁর শেষ জীবনে যে 'মিথ' তৈরি করে গিয়েছিলেন, যে মিথকে অর্লেয়া রাজতন্ত্র ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছিল বুঁধ রাজতন্ত্রকে নিষ্প্রভ করে দেখানোর উদ্দেশ্যে, সেই মিথকেই লুই নেপোলিয়ন নিজের স্বার্থে সার্থক ব্যবহার করেছিলেন। তাই তার বিপুল জনসমর্থন। নির্বাচনে তিনি চার মিলিয়ন ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে

দিয়েছিলেন প্রজাতন্ত্রী কাভিয়েনাককে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি কাজ চালিয়েছিলেন মাত্র চার বছর। যেহেতু প্রেসিডেন্টের হাতে ক্ষমতা ছিল অনেক এবং প্রকৃত জনভিত্তি না থাকায় প্রজাতন্ত্রী নেতৃত্ব ছিল দুর্বল, তাই অল্প সময়ের মধ্যেই একনায়কত্ব অর্জন করেছিলেন তৃতীয় নেপোলিয়। অবশেষে তিনি ১৮৫২ সালে এক গণভোটের রায় নিয়ে নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন এবং ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠা করেন দ্বিতীয় সাম্রাজ্য।

৩.৬ তৃতীয় নেপোলিয়ন অভ্যন্তরীণ নীতি

প্রথম নেপোলিয়নের মতোই তৃতীয় নেপোলিয়নও একটি কঠোর কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আর সর্বোচ্চ ক্ষমতা রেখেছিলেন নিজের হাতে। অবশ্য একটি সেনেট ও দ্বিকক্ষযুক্ত আইনসভা ছিল। আইনসভার ওপরের কক্ষকে বলা হত 'কাউন্সিল অব্ স্টেট', নিম্নকক্ষকে বলা হত আইন পরিষদ, তার সদস্যসংখ্যা ২৬০। আইনসভার ক্ষমতা ছিল সামান্য। সংবিধানের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ছিল সেনেট। মন্ত্রীপরিষদ কিন্তু আইনসভা বা সেনেটের কাছে দায়বদ্ধ ছিল না। তাঁরা সম্রাটের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন। তাদের অধীনে 'প্রিফেক্ট' পদবাচ্য আমলারা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে, কমিউন ও পৌরসভায় সম্রাটের নির্দেশ বলবৎ করত। তৃতীয় নেপোলিয়ন সেনাদের পদোন্নতির প্রচুর সুযোগ দিয়ে, তাদের বেশি মর্যাদা ও বেতন দিয়ে অনুগত করে রেখেছিলেন। রোমান ক্যাথলিক চার্চকেও তৃতীয় নেপোলিয়ন নানাভাবে তুষ্ট করেছিলেন। তাঁর আমলে যাজকদের অর্থ ও প্রতিপত্তি দুইই বেড়েছিল। আর বেড়েছিল রাজধানীর জমক। তৃতীয় নেপোলিয়ন জর্জ হসম্যানকে প্যারিসের 'Prefect of the Seine' নিযুক্ত করেন। হসম্যান সম্রাটের মনের মতো করে আধুনিক সাজে সাজিয়ে ছিলেন প্যারিস শহরকে। ডেভিড টমসন একে বলেছেন, International Showmanship.

তবে তৃতীয় নেপোলিয়নের অভ্যন্তরীণ নীতি উদ্দেশ্যহীন ছিল না। বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব ফরাসি নাগরিক জীবনে যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছিল, তার অবসান ঘটানো ছিল তাঁর লক্ষ্য। ফ্রান্স তখনো প্রধানত কৃষির ওপর দাঁড়িয়ে। তৃতীয় নেপোলিয়ন তাই কৃষকদের দিকে নজর দিয়েছিলেন। সরকারের তরফে ঢালাও কৃষিঋণ আর অল্প সুদের বিধান দিয়ে তিনি ক্ষুদ্র জমির মালিকদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

শিল্প থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেননি তৃতীয় নেপোলিয়ন। শিল্পের প্রয়োজনে পরিবহণের উন্নতি ঘটিয়েছিলেন তিনি। ১৮৫৯ থেকে ১৮৭০-এর মধ্যে ফ্রান্সের রেলপথের বিস্তার জার্মানী ও ব্রিটেনের সঙ্গে তুলনীয় ছিল। রেলপথের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই কয়লা শিল্প ও ধাতুশিল্পের বৈপ্লবিক বিকাশ ঘটেছিল।

আলফ্রেড কোবান মনে করেন, তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে ফ্রান্সে ঋণব্যবস্থার সার্থক ব্যবহার সম্ভব হয়েছিল। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যকে তাই ব্যাঙ্কিং-এর স্বর্ণযুগও বলা চলে। সরকারি ও বেসরকারি—দুই প্রকার সংস্থা থেকেই ঋণ দেওয়া হত। সরকারি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলি হল—কঁতোয়া দ্য কোঁতে (Comptoir d'es Compute), ক্রেডিট ফঁসিয়ের (Credit Foncier) এবং ক্রেডিট এগ্রিকোল (Credit Agricole)। বেসরকারি ব্যাঙ্কের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পেরিয়র ভ্রাতৃদ্বয়ের ক্রেডিট মবিলিয়ের (Credit Mobilier)। ১৮৬৩-তে আর একটি বড় বেসরকারি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ক্রেডিট লিয়ন্যে (Credit Lyonnais)। এই বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিল বিখ্যাত 'রথস্চাইল্ড' সংস্থা। বলা যেতে পারে ফ্রান্সের মুদ্রাব্যবস্থা সচলতর হয়ে উঠেছিল তৃতীয় নেপোলিয়নের পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট এইসব ব্যাঙ্কের কল্যাণে। তাতে লাভবান হয়েছিল কৃষি ও শিল্প।

রাষ্ট্রে উৎপাদক শ্রেণীর স্বার্থে সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, ফরাসি সমাজতন্ত্রবাদী দার্শনিক সেঁ সিমঁ-র এই বক্তব্য তৃতীয় নেপোলিয়ন নীতির ওপর প্রভাব ফেলেছিল কিনা, সেই প্রশ্ন অনেকে তুলেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। তবে গ্রেনভিল যে শিল্পের ক্ষেত্রে তৃতীয় নেপোলিয়র অবদানকে মোটেই বড় করে দেখতে চান না, সেটা ঠিক নয়। শুধু মুদ্রা ব্যবস্থার উন্নতি করে নয়, অন্যান্য নানা উপায়েও সম্রাট শিল্পের বাঁধন খুলে দিয়েছিলেন। ১৮৬৪-তে শ্রমিক আন্দোলনের অধিকার মেনে নিয়ে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অনুমতি দিয়েছিলেন। শ্রমিকদের একটি প্রতিনিধি দলকে তিনি রাষ্ট্রের খরচে ইংল্যান্ড পাঠিয়েছিলেন। শ্রম-বিবাদ মেটানোর জন্য তিনি সালিসী-বোর্ড স্থাপন করেছিলেন। নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং ধর্মঘট আটকানোই সম্ভবত তৃতীয় নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ছিল। এর ফলে শিল্পায়নের যে অনেক বাধাই দূর করা গিয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শাসনের দ্বিতীয় পর্বে, বিদেশনীতির ব্যর্থতার সময়ে, তৃতীয় নেপোলিয়ন অভ্যন্তরে বোনাপার্টির উদারনীতির প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া, আইনসভাকে বাড়তি ক্ষমতা দেওয়া এরই অঙ্গ ছিল। এমনকি ১৮৬০-এর পর জনসভা ডাকার অধিকারও ফরাসিদের দেওয়া হয়, সেইসঙ্গে শিথিল করা হয় সংবাদপত্রের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ।

৩.৭ তৃতীয় নেপোলিয়নের বিদেশনীতি

বোনাপার্টির মিথকে আশ্রয় করে ক্ষমতায় এসেছিলেন তৃতীয় নেপোলিয়ন। সেই মিথ-এর একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল সফল চোখ ধাঁধানো বিদেশনীতি। তাই তৃতীয় নেপোলিয়নকেও আন্তর্জাতিক মর্যাদালাভের যোগ্য পররাষ্ট্রীয় নীতি অনুসরণ করতে হয়, যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ফরাসিদের গৌরব-বাসনাকে তৃপ্ত করা। কিন্তু এ ব্যাপারে তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁর অভ্যন্তরীণ নীতির মতো সফল হননি। কারণ কূটনীতি ও সমর-পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রথম নেপোলিয়নের মতো সাধ থাকলেও সাধ্য তাঁর ছিল না। তাঁর বিদেশ নীতিকে স্পষ্ট

দুটো পর্যায়ে ভাগ করা যায়। শাসনকালের প্রথম আটবছর (১৮৫২-১৮৬০) ছিল সাফল্যের যুগ, আর বাকি দশবছর ছিল (১৮৬০-১৮৭০) ব্যর্থতার পর্ব।

তৃতীয় নেপোলিয়নের বিদেশ নীতির প্রথম সাফল্য এসেছিল ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৪-৫৬)। বলকান অঞ্চলে অটোমান তুর্কীদের অধীনস্থ জাতিগুলির সমর্থনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তিনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগ দেন। প্রকাশ্যে তিনি জেরুজালেমের পবিত্র চার্চের রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার দাবি করেন। কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল মস্কো অভিযানে প্রথম নেপোলিয়নের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া। যুদ্ধে লুই নেপোলিয়ন সফল হয়েছিলেন। সন্ধির স্থান হিসেবে প্যারিসকেই সকলে বেছে নেন, ফলে ফ্রান্স আবার ইউরোপীয় রাজনীতির কেন্দ্রে ফিরে আসে। প্যারিসের চুক্তিতে মোলাডাভিয়া ও ওয়ালাসিয়ার সংযুক্তি করে রুমানিয়ার উদ্ভবের প্রস্তাবে সায় দিয়ে তিনি জাতীয়তাবাদের সমর্থক হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিচিতি ও ফরাসিদের কৃতজ্ঞতা লাভ করেন।

এর চাইতেও বেশি কৃতিত্ব তৃতীয় নেপোলিয়ন অর্জন করেন ইতালিতে। ইতালির জাতীয় ঐক্যের আন্দোলন তিনি সমর্থন করতেন। ১৮১৫ সালের গ্লানি মুছে ফেলার এটা ছিল একটা উপায়। তিনি ভেবেছিলেন, অস্ট্রিয়ার আধিপত্য থেকে ইতালির মুক্তির লড়াইয়ে ফ্রান্স সাহায্য করলে, মুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ ইতালির ওপর ফ্রান্সের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই ১৮৫৮ সালের জুলাই মাসে পিডমন্ট-সার্ডিনিয়ার মন্ত্রী কাউন্ট ক্যাভুরের সঙ্গে প্লমবিয়ার্সের চুক্তি করেছিলেন। ক্যাভুরকে সম্রাট এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, অস্ট্রিয়ার সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধে তিনি ইতালিয়দের সাহয্য করবেন। ফরাসি সাহায্যে পুষ্ট হয়েই ক্যাভুর 'ম্যাজেন্টা' ও 'সলফেরিনো'র যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে হারিয়েছিলেন। চারদিকে তখন ফ্রান্সের জয় জয়কার। কিন্তু ইতিমধ্যে পোপের রাজ্যের ভবিষ্যতে অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় গোঁড়া ফরাসি ক্যাথলিকরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে দেখে তৃতীয় নেপোলিয়ন চুক্তি থেকে সরে আসেন। তাছাড়া প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার সমর্থনে রাইন অঞ্চলে সেনা পাঠানোয় ফরাসি বাহিনীর সাফল্যও নিশ্চিত ছিল না। তাই তৃতীয় নেপোলিয়ন কূটনৈতিক পটবদলের আশ্রয় নিয়ে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে করেছিলেন ভিল্লফ্রাঙ্কার সন্ধি। অবশ্য টাস্কানি, মডেনা এবং রোমাগনা যাতে সার্ডিনিয়ার সঙ্গে মিলে যেতে পারে, তার জন্য তিনি ক্যাভুরকে আগের মতোই সাহায্য করেছিলেন, বিনিময়ে ১৮৬০-এ ক্যাভুর ফ্রান্সকে দিয়েছিলেন স্যাভয় এবং নিস। এভাবে ১৮১৫ সালের ভিয়েনা চুক্তির একটি গ্লানিময় শর্ত থেকে ফ্রান্সকে মুক্ত করে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তৃতীয় নেপোলিয়ন।

কিন্তু এরপরেই শুরু হয়েছিল নেপোলিয়নের ব্যর্থতার পর্ব। ক্রিমিয়া এবং ইতালি—এই দুটি যুদ্ধে যোগ দিয়ে ফ্রান্সের অর্থনীতি অল্প হলেও ঘা খেয়েছিল। ব্রিটেনের সঙ্গে কবডেনের চুক্তি করে (১৮৬০) সম্রাট একদিকে শক্তির বাণী আর অন্যদিকে উদার বাণিজ্যনীতির সুফল ছড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাইরের সামরিক অশান্তি তাঁর পিছু ছাড়েনি। ১৮৬৩ সালে রাশিয়ার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে পোল্যান্ড ফ্রান্সের কাছে সাহায্য চায়। নেপোলিয়ন বিদ্রোহীদের পক্ষ সমর্থন করে রুশ জার-এর কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠান। কিন্তু

জার ফ্রান্সের প্রতিবাদকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তৃতীয় নেপোলিয়নের মর্যাদা ধুলোয় মিশিয়ে দেন। নৃশংসতার সঙ্গে তিনি পোল্যান্ডের বিদ্রোহ দমন করেন। নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া তৃতীয় নেপোলিয়নের আর কিছু করার ছিল না।

সম্রাটের পরবর্তী ব্যর্থতার ক্ষেত্র ছিল মেক্সিকো। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সুযোগে মেক্সিকোর প্রজাতন্ত্র নষ্ট করে তিনি ১৮৬৪ সালে তার বশংবদ ম্যাক্সিমিলিয়াঁকে মেক্সিকোর সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। কিন্তু গৃহযুদ্ধের শেষে আমেরিকার চাপে তিনি মেক্সিকো থেকে ফরাসি সেনা তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অসহায় ম্যাক্সিমিলিয়াঁকে মেক্সিকোর শাসকগোষ্ঠী নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করায় কূটনৈতিক-সামরিক গ্লানির দায়ভার নিতে হয়েছিল তৃতীয় নেপোলিয়নকে। এমনকি চীনে ফরাসি ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ সুবিধা আদায় বা কোচিন-চীন দখল করার গৌরবও এই ব্যর্থতার মুখে ম্লান হয়ে যায়।

এই পরিস্থিতিতেই ১৮৬৬ সালে প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। ফ্রান্সের বুর্জোয়া গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধিকে আশঙ্কার চোখে দেখেছিলেন। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়নের ধারণা ছিল অন্যরকম। প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বিসমার্কের কূটনৈতিক আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, অস্ট্রিয়াকে আঘাত করাই প্রাশিয়ার মূল লক্ষ্য, ফ্রান্সের সঙ্গে সে কখনোই শত্রুতা করবে না। তৃতীয় নেপোলিয়ন তখন ভিয়েনা-ব্যবস্থার পরিবর্তন, অস্ট্রিয়ার পরাজয়—এই জাতীয় স্বপ্নে মগ্ন। প্রাশিয়াকে তিনি 'জেনার'—(Jena) যুদ্ধে (প্রথম নেপোলিয়নের সময়ে) ফ্রান্সের হাতে পরাজিত একটি রাষ্ট্র হিসেবেই দেখেছিলেন। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়নের বুঝতে ভুল হয়েছিল। বিসমার্কের কূটনীতির কাছে তিনি পরাস্ত হয়েছিলেন। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে প্রাশিয়া ফ্রান্সের সীমানায় একটি প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের সূচনা করায় ফরাসীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হল, কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়নের করার কিছু রইল না। বরং প্রাশিয়ার কাছে কিছু ভূখণ্ড ও অর্থ দাবি করে তিনি পরধনলোভী বলে নিন্দিত হলেন। ইংল্যান্ড ও অন্যান্য জার্মান রাজ্য তাঁর বিরুদ্ধে চলে গেল।

এরপরেই প্রাশিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়েছিল। ফ্রান্সকে না হারিয়ে বিসমার্ক দক্ষিণ জার্মান রাজ্যগুলোর ওপর আধিপত্য নিশ্চিত করতে পারছিলেন না বলেই তাঁর পক্ষে এই যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। স্পেনের রাজসিংহাসনে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নে প্রাশিয়ার রাজবংশের অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করে ফ্রান্স থেকে যে অনুরোধ প্রাশিয়ায় গিয়েছিল সে অনুরোধ প্রাশিয়ার রাজা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, এবং 'এমস্' থেকে টেলিগ্রাম করে খবরটা বিসমার্ককে জানিয়েছিলেন। সেই টেলিগ্রামটি চতুর বিসমার্ক এমনভাবে কাগজে ছাপিয়েছিলেন এবং প্রাশিয়ারাজের প্রত্যাখ্যানপর্ব এমনভাবে বর্ণনা করেছিলেন, যাতে ফ্রান্স খুবই অপমানিত বোধ করে এবং প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নেয়। ঘটনাক্রম বিসমার্কের পথেই গড়ায়, পরিস্থিতির ওপর তৃতীয় নেপোলিয়ন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং ঐ 'এমস্ টেলিগ্রামের' প্রতিক্রিয়ায় ১৮৭০-এর ১৯ জুলাই প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। এই যুদ্ধই ছিল তাঁর শেষ যুদ্ধ। সেডানের যুদ্ধে ফ্রান্স শোচনীয়ভাবে

পরাজিত হয়, তৃতীয় নেপোলিয়ন ইংল্যান্ডে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে চলে যান, সেই সঙ্গে ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটে।

সামরিক ব্যর্থতার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজে সম্পূর্ণভাবে দায়ী ছিলেন, একথা বলা যাবে না। সামরিক কমিশন গঠন করে সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ করতে তিনি চেয়েছিলেন। কিন্তু সামরিক খাতে অর্থব্যয় করতে বাধা দিয়েছিল আইনসভার প্রজাতান্ত্রিক সদস্যরা। ইতিমধ্যে প্রশাসনিক উদারীকরণের কথা ঘোষণা করায় এই বিরোধিতাকেও তৃতীয় নেপোলিয়ন অগ্রাহ্য করতে পারেননি। ফলে একদিকে অভ্যন্তরীণ উদারতা আর অন্যদিকে বৈদেশিক মর্যাদা-প্রয়াস—এই দুই-এর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব তার অবস্থানকে দুর্বল করে দিয়েছিল। গ্রেনভিল ঠিকই মন্তব্য করেছেন, "Napoleon's efforts to move away from autocracy to the Liberal Empire which strengthened the regime at home came fatally to weaken it abroad"।

তবে কূটনৈতিক ব্যর্থতার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত দায় অবশ্যই ছিল। পোল্যান্ডের ঘটনায় তিনি রাশিয়াকে শত্রু করেছিলেন, ভিল্লাফ্রাঙ্কার সন্ধি করে চটিয়েছিলেন ক্যাভুরকে, অস্ট্রো-প্রাশিয়া যুদ্ধে নিরপেক্ষ থেকে অস্ট্রিয়ার বৈরিতা ডেকে এনেছিলেন, আবার যুদ্ধের পর ক্ষতিপূরণ চেয়ে ক্ষুব্ধ করেছিলেন ইংল্যান্ড ও জার্মান রাজ্যগুলোকে, এদিকে প্রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীর সম্ভাবনা তো ছিলই না। অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে তৃতীয় নেপোলিয়নের কূটনৈতিক ভ্রান্তির মূল্য দিতে হয়েছিল ফ্রান্সকে। ফ্রান্স ইউরোপীয় চালচিত্রে মিত্রহীন একঘরে হয়ে পড়েছিল। সুতরাং অভ্যন্তরীণ নীতিতে তৃতীয় নেপোলিয়ন যতটা সফল, বিদেশনীতিতে তিনি ততটাই ব্যর্থ। ডেভিড টমসনের মন্তব্যটি এক্ষেত্রে যথাযথ, "The Second Empire, judged in terms of military glory or original achievement, was indeed only a pale shadow of the First (Empire).

৩.৮ তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের কারণ

তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের কারণ হিসেবে অনেকে তাঁর বিদেশনীতির ব্যর্থতাকেই সম্পূর্ণভাবে দায়ী করেন। কিন্তু সেডানের যুদ্ধ তাঁর অপসারণ ত্বরান্বিত করে থাকলেও সেটা পতনের প্রধান কারণ নয়। যুদ্ধে পরাজয়ের পরেও ফ্রান্সের ভৌগোলিক সীমা সঙ্কুচিত হয়নি বা প্রাশিয়া ফ্রান্সের প্রশাসনিক কাঠামোয় হস্তক্ষেপ করেনি। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর যদি রাশিয়ার জার-এর পতন না হয়ে থাকে, তাহলে সেডানের যুদ্ধের পরই বা কেন দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটবে!

আসলে দেশের ভেতেরও, যুক্তিনিষ্ঠ জনমুখী শাসন চালানো সত্ত্বেও, তৃতীয় নেপোলিয়নের সমর্থনের দুর্গে ধস নেমেছিল। একই সঙ্গে অনেক শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। ফলে শেষ পর্যন্ত কোন শ্রেণীই

সন্তুষ্ট থাকেনি। প্রশাসনিক কেন্দ্রীকরণ করে প্রজাতন্ত্রীদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, আবার দ্বিতীয় ধাপে উদারীকরণ করে কট্টর কেন্দ্রপন্থীদের অসন্তুষ্ট করেছিলেন। চার্চের পৃষ্ঠপোষণা করে বিপ্লবের উত্তরসূরীদের বিরক্ত করেছিলেন, আবার ইতালির জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন করে ক্যাথলিকদের সমর্থন হারিয়েছিলেন। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সুযোগে বুর্জোয়াদের একচেটিয়া হওয়ায় শ্রমজীবীরা ক্ষুব্ধ ছিল, আবার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন স্বীকৃতি পাওয়ায় মালিকগোষ্ঠী অসন্তুষ্ট হয়েছিল। এই সামগ্রিক অসন্তুষ্টির ধাক্কা সামলানো সেডানের পরাজয়ের পর আর সম্ভব ছিল না। তাই তৃতীয় নেপোলিয়নকে দেশ ছাড়তে হয়েছিল।

তাছাড়া ১৮৬০-এর পর ফ্রান্সের অভ্যন্তরে যখন তৃতীয় নেপোলিয়ন রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিয়েছিলেন এবং সংবাদ মাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করেছিলেন, সেই সময় ল্য সিয়েকল্ (Le Siecla) প্রভৃতি বহু পত্র-পত্রিকার পাতায় প্রজাতন্ত্রী নেতারা দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের তীব্র সমালোচনা শুরু করেন। তিয়ের (Thiers)-এর মতো মধ্যপন্থী এবং গাঁবেত্তার মতো চরমপন্থী—সকলেরই সমালোচনার লক্ষ্য ছিলেন তৃতীয় নেপোলিয়ন। আর এক সমালোচক ছিলেন ভিক্টর হুগো (Victor Hugo), যিনি নির্বাসনে বসে লিখেছিলেন 'পানিশমেন্ট' গ্রন্থটি। 'থ্রি জুল্স্' বলে চিহ্নিত তিন আইনজীবী জুল্স্ ফেরী, জুল্স্ সিম এর জুল্স্ ফারর তৃতীয় নেপোলিয়নকে প্রায় আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। এর ওপর ছিল বামপন্থী সমাজতন্ত্রীরা। এই প্রতিরোধ-এর সামনে এমনিতেই তৃতীয় নেপোলিয়ন অসহায় বোধ করছিলেন। সেডানের যুদ্ধে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাই তিনি দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

৩.৯ তৃতীয় নেপোলিয়ন : একটি মূল্যায়ন

শেষ বিচারে তৃতীয় নেপোলিয়ন একজন ব্যর্থ সম্রাট। তাই নানা সমালোচনা তাঁকে বিদ্ধ করেছে। রানী ভিক্টোরিয়া তাঁকে রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে মর্যাদা দিলেও কিংলেক বলেছেন রাজনৈতিক দুর্বৃত্ত, কার্ল মার্ক্স বলেছেন নির্বোধ আর ভিক্টর হুগো ব্যঙ্গ করে বলেছেন, 'ক্ষুদে নেপোলিয়ন'। সিম্যান তাকে বলেন দ্বিধাগ্রস্ত এবং অস্থিরচিত্ত। ".....his lack of ability to come to a clearcut decision about anything is the most pronounced feature of his character".

কিন্তু এতটা সমালোচনা বোধহয় তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রাপ্য নয়। অর্থনীতি ও সমাজনীতির দিক থেকে ফ্রান্সের জন্য যেসব পদক্ষেপ তিনি নিয়েছিলেন, তা ১৭৮৯-এর বিপ্লব ও প্রথম নেপোলিয়নের পর আর কখনো নেওয়া হয়নি। এই পদক্ষেপগুলোর যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন ডেভিড টমসন, "it has considerable importance for the material development of France and for the shaping of modern Europe." কিন্তু তবুও তৃতীয় নেপোলিয়কে অনেক সময়েই দুরভিসন্ধির মানুষ বলে মনে হয়েছে। আসলে ঐতিহাসিক লিপসনই ঠিক বলেছেন যে, বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও অব্যবস্থিতচিত্ত তৃতীয় নেপোলিয়ন কূটনৈতিক ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। সেই জাল কেটে তিনি বেরোতে পারেননি। তাই তিনি পরাজিত রাষ্ট্রনায়ক।

৩.১০ তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও প্যারি কমিউন বিদ্রোহ

সেডানের যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়নের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। সাময়িকভাবে জুল সিম (Jules Simon) ও জুল ফাবর-এর (JUles Fabra) নেতৃত্বাধীন মধ্যপন্থী প্রজাতন্ত্রী গোষ্ঠী এবং লিয়ঁ গাঁবেত্তার (Leon Gambetta) চরমপন্থী গোষ্ঠী যৌথভাবে ওতেল দ্য ভিল (Hotel de ville) থেকে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করে। লুই জুল ত্রশু-র (Louis Jules Trochu) নেতৃত্বে স্থাপিত হয় জাতীয় আত্মরক্ষার সরকার। ১৮৭১-এর ২৮ জানুয়ারি এই সরকার ভার্সাই-এর আরণি-মহলে (Hall of Mirrors) বিসমার্ক-এর সঙ্গে চুক্তি করে ফ্রান্সের পরাজয় মেনে নেয়। এরপর সীমিত নির্বাচনের মাধ্যমে ফ্রান্সে যে জাতীয় সংসদ গঠিত হয় এবং তার ভিত্তিতে তিয়ের-এর নেতৃত্বে যে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়, তারা ১ মার্চ ফ্রাংকফুর্টের সন্ধিতে জার্মানির হাতে ফ্রান্সের চরম অবমাননা মেনে নেয়। কিন্তু জার্মান সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ প্যারিসের শ্রমজীবী জনতা প্রজাতন্ত্র সরকারের বৈধতা মেনে নিতে অস্বীকার করে। শুরু হয় গৃহবিরোধ। তারই পরিণতিতে প্যারিস শহরে একটি বিদ্রোহী শাসন-সংস্থা বা শাসন-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাসে এটাই প্যারি কমিউন নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

৩.১১ প্যারি কমিউনের প্রতিষ্ঠার পটভূমি

১৮৭১ সালের প্যারি কমিউনের প্রতিষ্ঠা ছিল ফ্রান্সের দীর্ঘদিনের বুর্জোয়া বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিণতি। ১৮৩০-এর দশক থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল এর বাস্তব প্রেক্ষাপট। লুই ফিলিপের রাজত্বকাল (১৮৩০-১৮৪৮) সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় ক্রমশ প্রভাবিত শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে সমৃদ্ধ ছিল। ১৮৩১ সালে লিয়ঁর এবং ১৮৩৯ ও ১৮৪০ সালে পারির অভ্যুত্থান উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৮৪৮ সালের বিপ্লব। এই বিপ্লবের প্রথমদিকে উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা লুই ফিলিপের রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের দলে শ্রমিকদের নিয়ে নেয়। কিন্তু সশস্ত্র শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান শক্তিতে এরা ভীত হয়ে পড়ে এবং শেষ অবধি অবশিষ্ট সমস্ত শক্তির সহায়তায় শ্রমিকশ্রেণীকে দমন করে লুই নেপোলিয়ন বা তৃতীয় নেপোলিয়নকে সরকারি ক্ষমতা দখল করতে সাহায্য করে। এইভাবে ১৮৫২ সালে জন্ম হয় 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের'।

'দ্বিতীয় সাম্রাজ্যে'র আমলে ফ্রান্সের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি খুব দ্রুত হয়। ওখানকার পুঁজিপতিদের সমৃদ্ধিও খুব উল্লেখযোগ্য। পক্ষান্তরে ১৮৪৮ সালের দমন ও সাময়িক পরাজয় সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণীকে স্তব্ধ করা সম্ভব হয় নি। মজুরি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক দাবির জন্য তাদের সংগ্রাম ক্রমেই প্রসার লাভ করে। পুলিশ, আদালত, সৈন্যবাহিনী প্রভৃতি পীড়নের যন্ত্র থাকা সত্ত্বেও সমগ্র ফ্রান্সে ধর্মঘট বিস্তৃতি লাভ করে। ১৮৬৮ সালে শ্রমিক, শ্রেণীর নিজস্ব সংগঠনের প্রসারও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৮৬৪ সালে ইতিমধ্যে স্বয়ং মার্কসের নেতৃত্বে সার্বজাতিক শ্রমিকসংস্থার প্রতিষ্ঠা হয় এবং তার প্রভাব ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও বাড়তে থাকে।

'দ্বিতীয় সাম্রাজ' ফ্রান্সের উগ্র জাতীয়তাবাদে পুরোপুরি ইন্ধন যোগায় এবং 'প্রথম সাম্রাজ্যে'র (প্রথম নেপোলিয়নের অধীনে) সীমানা পুনরুদ্ধারের দাবি ওখানকার শাসকশ্রেণী তুলে ধরে। অর্থাৎ রাইন্ নদীর বাম তীরে জার্মানির অধীনে থাকা ভূমির জন্য দাবি করা হয়। স্পেনের সিংহাসনে প্রাশিয়ার রাজপুত্রের যে দাবি ছিল সে দাবি ইউরোপীয় ভারসাম্যের ক্ষতিকারক এই অছিলায় ফ্রান্স প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ১৮৭০ সালের ১৯ জুলাই।

যুদ্ধ ঘোষণার চারদি নপর 'সার্বজাতিক শ্রমিকসংস্থার সাধারণ পরিষদের প্রথম অভিভাষণে' শাসকশ্রেণীর যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকশ্রেণীর সার্বজাতিক কর্তব্যের কথা মার্ক্স মনে করিয়ে দেন পরিষদের সভ্যদের। মার্ক্সের 'প্রথম অইভভা,ণের' পূর্বেই ফ্রান্স ও জার্মানির শ্রমিকেরা তাদের সার্বজাতিক কর্তব্য পালন করতে শুরু করে দিয়েছিল। যুদ্ধ আরম্ভের প্রায় একটা সপ্তাহ পূর্ব থেকে উভয়দেশের শ্রমিকসংস্থাগুলি—বিশেষত নব প্রতিষ্ঠিত সার্বজাতিক শ্রমিকসংস্থার শাখাগুলি—প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছিল যে এ যুদ্ধ শাসকশ্রেণীর যুদ্ধ, এ যুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। একদেশের শ্রমিকের সঙ্গে অপর দেশের শ্রমিকের কোনো শত্রুতা থাকতে পারে না, তারা পরস্পরের বন্ধু এবং বর্তমান যুদ্ধ এই বন্ধুত্বকে নষ্ট করার উদ্দেশ্যে শাসকশ্রেণীর ষড়যন্ত্র।

শ্রমিকশ্রেণীর তখনকার আপেক্ষিক শক্তির পক্ষে যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। ফ্রান্সের পক্ষে এ যুদ্ধের ফলাফল সর্বনাশ হয়ে দেখা দেয়। সেপ্টেম্বরের দুই তারিখে ফরাসি সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং তৃতীয় নেপোলিয়ন ক্ষমতাচ্যুত হন। চার তারিখে 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্যে'র ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে প্যারিসের শ্রমিকরা সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করে। অন্যদিকে এক তথাকথিত 'জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার' গঠিত হয়। এই সরকারের সভ্যরা ছিল অংশত রাজতন্ত্রী অংশত সাধারণতন্ত্রী এবং এদের মধ্যে রাজতন্ত্রীদের হাতে ছিল পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনী। যে সময় প্যারিসের দিকে প্রাশিয়ার সৈন্যরা এগিয়ে এসেছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব নেতৃবৃন্দ সরকারি জেলখানায় বন্দী সে সময় শ্রমিকেরা এই ব্যবস্থা মেনে নেয় শুধু একটি শর্তে যে নব প্রতিষ্ঠিত সরকার প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে বাঁচাবার লড়াই চালিয়ে যাবে। জার্মানদের দিক থেকে এই যুদ্ধ আর আত্মরক্ষার যুদ্ধ ছিল না। পরিণত হয়েছিল আক্রমণাত্মক যুদ্ধে।

ইতিমধ্যে প্যারিসের প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্য অস্ত্রধারণক্ষম সমস্ত নাগরিককে সশস্ত্র করা হয় এবং তাদের নিয়ে গড়ে ওঠে 'জাতীয় রক্ষী বাহিনী' যার মধ্যে শ্রমিকেরা ছিল সংখ্যাগুরু। তথাকথিত 'জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার' আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে কেননা তারা বুঝতে পারে যে প্রাশিয়ার আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ফরাসি শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভের অর্থ ছিল ফরাসি বিত্তবানদের বিরুদ্ধে ফরাসি শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভ। 'জাতীয় কর্তব্য এবং শ্রেণীস্বার্থের এই সংঘাতে জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে পরিণত হয় জাতীয় প্রতারণার সরকারে।' পরবর্তীকালে বিভিন্ন দলিল থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে এই সরকার প্রথম থেকেই প্যারিসের আত্মসমর্পণের বড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

নতুন সরকারের প্রথম কাজ ছিল শ্রমিকশ্রেণীকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা। তারা দাবি করে যে প্যারিসীয় রক্ষীবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি এবং যুদ্ধাবসানে রক্ষীবাহিনীর সেগুলিকে রাখার কোনো অধিকার নেই। কিন্তু এই দাবি ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। রক্ষীবাহিনীর লোকেরা নিজেরা চাঁদা তুলে ঐ অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছিল এবং ২৮ জানুয়ারির আত্মসমর্পণের চুক্তিতে যেসব সরকারি অস্ত্রশস্ত্র প্রাশিয়ার হাতে তুলে দেওয়ার কথা হয় তার থেকে রক্ষীবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে বাদ দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ১৮ মার্চ তিয়ের্ তার সেনাপতির অধীনে এক সৈন্যবাহিনী পাঠায় জাতীয় রক্ষীবাহিনীর হাত থেকে কামান দখল করার জন্য। সেই থেকেই শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। অবশ্য রক্ষীবাহিনীর প্রতিরোধ এবং তাদের সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহারের জন্য তিয়েরের এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়। তিয়ের তার অনুচরদের নিয়ে পালিয়ে যান ভের্সাইয়ে। বিপ্লবীরা প্যারিসের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে এবং জাতীয় রক্ষীবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি অস্থায়ী সরকারে পরিণত হন।

২৬ মার্চ প্যারিসে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন হয়। ২৮ মার্চ ঘোষিত হয় কমিউন এবং কেন্দ্রীয় কমিটি তার সমস্ত ক্ষমতা কমিউনের হাতে তুলে দেয়।

৩.১৩ প্যারি কমিউনের চরিত্র ও কার্যাবলী

ইউরোপের মধ্যযুগীয় কমিউন এবং ফ্রান্সের ১৭৯০-এর দশকের কমিউনের সঙ্গে ১৮৭১-এর কমিউনের কিছু আপাতসাদৃশ্য থাকলেও মূলে কিন্তু এদের মধ্যে কোন মিলই ছিল না। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সদ্য আবির্ভূত বুর্জোয়াশ্রেণীর লড়াই-এ মধ্যযুগীয় কমিউন হাতিয়ারের ভূমিকা নিয়েছিল সত্য, কিন্তু পরবর্তীকালে এই কমিউনই হয়ে দাঁড়িয়েছিল বুর্জোয়া রাষ্ট্র-ক্ষমতার ভিত্তি, যাকে ধ্বংস করা ছিল ১৮৭১-এর কমিউনের একটি প্রধান কাজ। আগের কমিউনের কাজ ছিল কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকে বিকেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্রতে পরিণত করা, কিন্তু এই কমিউন কখনই রাষ্ট্রক্ষমতা ধ্বংসের কথা ভাবেনি। কিন্তু পুরনো রাষ্ট্র-যন্ত্র অর্থাৎ তার সৈন্যবাহিনী, পুলিশ, আইন এবং আমলাতন্ত্র যে বিত্তবানদের হাতে বিত্তহীনদের শোষণযন্ত্র হিসাবে কাজ করে সে সম্পর্কে ১৮৭১-এর কমিউন প্রথম থেকেই সচেতন ছিল এবং এই কারণেই সে চেয়েছিল পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রের উত্তরাধিকারী না হয়ে তাকে ধ্বংস করতে। পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গে কমিউনকে লক্ষ্য রাখতে হয় যেন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য থেকেই এমন এক গোষ্ঠী বেরিয়ে না আসে যারা পুরনো শোষণ-যন্ত্রের জায়গায় নতুন এক শোষণযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করবে। এই দ্বৈত কর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কমিউন প্রথমেই কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করে। স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর অবসান ঘটিয়ে তার জায়গায় দাঁড় করায় সশস্ত্র জনগণকে। আইন, শিক্ষা এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রতিটি পদের জন্যই জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচন প্রথা চালু করা হয় এবং স্থির করা হয় যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নির্বাচকরা যে কোনো সময়ে ডেকে পাঠিয়ে পদচ্যুত করতে পারেন। কমিউনের সভ্য থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি পদাধিকারীকে

বেতন দেওয়া হয় সাধারণ শ্রমিকের গড়পড়তা মজুরির হারে। শ্রমিকশ্রেণীর আর একটি বৈশিষ্ট্যও—সার্বজাতিকতা —প্রথম থেকে কমিউনের কাজে প্রকাশ পায় ফরাসি এবং বিদেশীদের মধ্যেকার রাজনৈতিক পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়ে কমিউন এদের সমান রাজনৈতিক অধিকার স্বীকার করে। বস্তুত কমিউনসভ্য এবং শ্রমমন্ত্রী ছিলেন এক হাঙ্গেরীয় এবং তার প্রথম সারির সেনাপতিদের মধ্যে ছিল দুইজন পোলদেশীয়।

রাজনৈতিক দিক ছাড়াও সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে কমিউন সমভাবে বিপ্লবী ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে দেওয়া হয় এবং ধর্মীয় সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্ত করে ধর্মযাজকদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাদের যার যার ব্যক্তিগত জীবনে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ধর্ম এবং রাষ্ট্র এই উভয়ের আওতা থেকে মুক্ত করার পর সেখানে জনসাধারণের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়। রুটি তৈরির কারখানায় রাত্রির কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। শ্রমিকদের উপর মালিকের জরিমানা বসানো নিষিদ্ধ করা হয় এবং বন্ধ কলকারখানা শ্রমিক সমবায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এইভাবে প্যারিসীয় আন্দোলনের শ্রেণীচরিত্র স্পষ্ট ফুটে ওঠে। শ্রমিকরা বা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কমিউনে অংশগ্রহণ করার ফলে কমিউনের সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রলেতারীয় রূপ গ্রহণ করে।

৩.১৩ প্যারি কমিউনের পতনের কারণ

কিন্তু বিপুল আশা ও উদ্দীপনা জাগিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও কমিউন স্থায়ী হয়েছিল মাত্র ৭২ দিন, তিয়েরের (Thiers) বুর্জোয়া সরকারের হাতে এর পতন ঘটেছিল ২৮ মে। স্বভাবতই শ্রমজীবী শ্রেণীর এই অভূতপূর্ব প্রচেষ্টা কেন অত অল্পদিনের মধ্যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল, ইতিহাসবিদ্‌দের কাছে এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

প্যারিসে কমিউনের দ্রুত পতনের কারণ হিসেবে ঐতিহাসিকেরা প্রথমেই যে বিষয়টির উল্লেখ করেন, তা হল প্রশাসনিক ও প্রতিরক্ষামূলক দায়িত্বের ভাগবাঁটোয়ারায় কমিউনের অন্তর্বিরোধ। কমিউন প্রতিষ্ঠার পর পরই নবগঠিত পরিষদের ওপর প্রশাসনিক দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে রক্ষীবাহিনীর সেন্ট্রাল কমিটি রাজনীতি থেকে দূরে সরে আসার কথা ঘোষণা করেছিল। তারা আরো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তারা সবসময়েই কমিউন পরিষদের প্রতি অনুগত থাকবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, পরিষদকে অগ্রাহ্য করে সেন্ট্রাল কমিটির (Public Proclamations) জারি করছে, সামরিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করছে এবং বিভিন্ন সাব-কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রশাসনের নিম্নস্তরেও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার চেষ্টা করছে। সেন্ট্রাল কমিটির এই ধরনের আচরণের ফলে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত কমিউন-পরিষদ পুরো প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দায়িত্বপালনের কোনো সুযোগই পায়নি।

প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণের পরও পরিষদ পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রের উত্তরাধিকার অস্বীকার করতে চেয়েও বিচার ও শিক্ষাক্রমের ক্ষেত্রে পুরনো কাঠামোই বজায় রাখে। ফলে বিপ্লবী মূল্যবোধ ও চেতনা সৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। যদিও কারখানার রাত্রিকালীন শ্রমব্যবহারের ওপর নিয়ন্ত্রণ, স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর বিলোপ ও সশস্ত্র নাগরিকদের দ্বারা তার স্থানপূরণ, সরকার থেকে ধর্ম ও চার্চের পৃথকীকরণ, শ্রমিকদের মজুরিহ্রাসের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি, বন্ধকী প্রতিষ্ঠানসমূহের অপসারণ, বন্ধ কলকারখানা প্রাক্তন শ্রমিকদের সমবায় সমিতির দ্বারা পরিচালনার ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় নিয়োগকেন্দ্রের মাধ্যমে কর্মে নিযুক্তি—ইত্যাদি কতকগুলো সংস্কার কমিউন করেছিল। কিন্তু এগুলোর কোনোটিই আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন আনবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। কেন কমিউন পরিষদ যথেষ্ট মৌলিক সংস্কারে ব্যর্থ হয়েছিল—এই প্রশ্নের উত্তরে সাধারণভাবে দুটো প্রধান কারণের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত প্যারি কমিউন কোনো নির্দিষ্ট আদর্শ ও সুসংহত নেতৃত্বের অধীনে ছিল না। কমিউন পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেছিল বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন চার্লস দেলেস-ক্লুজ্ (Charles Delescluze) এবং ফেলিক্স প্যাটের (Felix Pyat) এর মত জ্যাকোবিনরা, সেঁ সিমঁ (St. Simon) এবং ফুরিয়েরের (Fourier) অনুগামী সমাজতন্ত্রীরা, লুই ব্লাঁ (Blanc) স্বয়ং এবং প্রুধোঁর (Proudhon) শিষ্যরা। এছাড়াও ছিলেন লিও ফ্র্যাংকেল (Franckel) এবং এদুয়ার ভেইয়াঁর (Eduard Villant) মত মার্কসবাদী কমিউনিস্টরা। স্বাভাবিকভাবেই উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে এদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল অনিবার্য এবং এরই ফলে কমিউন নেতৃত্ব কোনো সুচিন্তিত সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, কমিউন নেতৃত্বের বিপ্লবী চেতনাও তখনো পর্যন্ত খুব একটা স্বচ্ছ ছিল না। তারা বুঝতে পারেনি যে, প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রতন্ত্র সরাসরি দখল করে তারপর তা পুরোপুরি অস্বীকার করা বা বদলে দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত আমলাতান্ত্রিক কাঠামো তারা সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেও সফল হয়নি এবং এটাও ছিল কমিউনের চূড়ান্ত ব্যর্থতার একটা অন্যতম কারণ।

সংস্কার পরিকল্পনার ব্যর্থতা, পরিচালন-পরিষদের অন্তর্বিরোধ পরস্পরবিরোধী বক্তৃতা ও অর্থহীন আইন প্রনয়ণে কালক্ষেপ ইত্যাদি কারণে কমিউন ক্রমশই সাধারণ জনমানসে অপ্রিয় হয়ে পড়ে। ১৬ই এপ্রিলে অনুষ্ঠিত সম্পূরক নির্বাচনে (Supplementary election) সীমিত সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ থেকেই সাধারণ মানুষের কমিউন পরিষদ সম্পর্কে হতাশার ছবি স্পষ্ট হয়ে যায়। মোট বিধিবদ্ধ নির্বাচনকারীদের মাত্র $১২\frac{১}{২}$ শতাংশ এই নির্বাচনে ভোট দেয় এবং ৩১টি শূন্য আসনের মধ্যে মাত্র ২১টি আসনে প্রতিনিধি নির্বাচন সম্ভব হয়।

একদিকে যখন খোদ প্যারিস শহরেই কমিউন জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে, অন্যদিকে তখন কমিউন নেতৃত্ব ফ্রান্সের অন্যান্য প্রদেশ বা শহরের সমর্থন আদায়েও ব্যর্থ হয়। ৬ এপ্রিল কমিউনের পক্ষ থেকে প্রচারিত একটি ঘোষণার মাধ্যমে—''কমিউন শুধু একটি সংকীর্ণ স্বার্থগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে'',—ভার্সাই সরকারের এই জাতীয়

বিবৃতির বিরোধিতা করে কমিউন সম্পর্কে সত্য প্রচার চালাবার উদ্দেশ্যে কর্মীদের বিভিন্ন প্রদেশে পাঠানো হয়। ১৯ এপ্রিল কমিউন "Declaration of the French people" নামক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনে কমিউনের নিজস্ব সাংগঠনিক চরিত্রের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় এবং ঘোষণা করা হয় ''প্যারিস সংগ্রাম করছে গোটা ফ্রান্সের জন্য। এর ত্যাগ তিতিক্ষা ও লড়াই-এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল গোটা ফ্রান্সের প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়ন।" প্রতিবেদনের শেষ অংশে ফ্রান্সের জনগণের উদ্দেশ্যে 'ভার্সাইকে নিরস্ত্র ও পরাজিত করার আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু এইসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ফ্রান্সের অন্যান্য প্রদেশ বা শহর প্যারি কমিউনকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানায়নি বা ১৫ই মে সশস্ত্র লড়াই-এর জন্য তার আবেদনেও কোনো সাড়া দেয়নি। কমিউন ক্রমশই ফ্রান্সের অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গ্রামীণ কৃষকসমাজের সঙ্গেও তার কোনো মৈত্রী স্থাপিত হয়নি। এই ব্যাপক গণসমর্থনের অভাবই তাকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে তোলে।

সংগঠনের চরমতম সংকটের সময়েও কমিউন নেতৃত্ব ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। ১৬ই এপ্রিলের নির্বাচনের পর প্রধানত জ্যাকোবিন গোষ্ঠীর শক্তিবৃদ্ধি ঘটে এবং তারা সংখ্যালঘু নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কমিউন পরিষদ কার্যত অকর্মণ্য হয়ে যায় এবং নেতৃত্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ "Committee of public Safety" নামে একটি সংগঠন তৈরি করে। সংখ্যালঘু অংশ প্রকাশ্যে এর সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে এবং পরিষদের সভায় যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ইতিমধ্যে ভার্সাই বাহিনীর হাতে গুরুত্বপূর্ণ ইজি (Issy) দুর্গের পতন ঘটে এবং এই সময়ে ''কমিটি অব পাবলিক সেফ্‌টি" ভেঙে দেওয়া হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পাল্টা সংগঠনের প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্বের তীব্র মতবিরোধ ও পারস্পরিক দোষারোপের প্রবণতা কমিউনকে দ্রুত পতনের পথে নিয়ে যায়।

কমিউন নেতৃত্বের এই সংকটের ফলে প্যারিসে কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়নি বা প্যারিসের প্রতিরক্ষার জন্য উপযুক্ত রণকৌশল নির্ধারণ ও সামরিক প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয়নি। পরিষদ বুঝতে পারেনি যে, ভার্সেইকে অবিলম্বে আক্রমণ করার ওপর কমিউনের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। পরিষদ 'ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স' দখল করেনি, যা হয়তো কমিউনের বিজয়ের সবচাইতে বড় হাতিয়ার হতে পারত। ফলে তিয়ের সময় পেরেছিলেন তাঁর দুর্বল বাহিনীকে সংহত করার। ১৮ মার্চের জয়ের পর জাতীয় রক্ষা বাহিনী সরকারি পুলিশবাহিনীকে বন্দী ও নিরস্ত্র না করে তাদের ভের্সাইয়ে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। এপ্রিলের শেষ দিক থেকে তিয়ের প্যারিস আক্রমণ করতে শুরু করেন। কিন্তু প্যারিসের রক্ষীবাহিনীর সেনাপতিরা প্রায় দায়িত্বজ্ঞানহীন ছিলেন বলা যেতে পারে। সুতরাং সরকারি বাহিনী যখন প্যারিস অবরোধ করে, তখন প্যারিসের রক্ষীবাহিনী প্রকৃত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। ১৬ই মে প্যারিসের প্রাচীরের একটি অরক্ষিত অংশ দিয়ে সরকারি বাহিনী প্যারিসে প্রবেশ করে। ২৮ মে প্যারি কমিউনের পুরোপুরি পতন ঘটে।

৩.১৪ কমিউনের তাৎপর্য

কিন্তু এই পরাজয়ই কমিউনের শেষ কথা নয়। কমিউন পরাজিত হলেও যে আদর্শ নিয়ে তার জন্ম হয়েছিল, তা অপরাজিতই থেকে যায়। কমিউন তার স্বল্পকালীন অস্তিত্বে যে শিক্ষা রেখে গিয়েছিল, শ্রমিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে তার মূল্য ছিল অপরিসীম।

মার্ক্স তাঁর Civil War in France নামক রচনায় প্যারি কমিউনকে কেন্দ্রীকৃত জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতের প্রোলেতারীয় বিপ্লবের আদর্শ হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। ডেভিড টমসন এই মতের সমালোচনা করে কমিউনের প্রোলেতারীয় চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অন্য কোন কোন ঐতিহাসিক প্যারি কমিউনের অতটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নন। কমিউনের চরিত্রে অস্বচ্ছতা ও স্ববিরোধী প্রবণতা থাকতেই পারে, কিন্তু তবুও ১৮ই মার্চের বিখ্যাত ঘোষণা কমিউনের আদর্শকে ইতিহাসে অম্লান করে রেখেছে। ঘোষণাটি ছিল : ''শাসকশ্রেণীর ব্যর্থতা ও বিশ্বাসঘাতকতার মুহূর্তে প্যারিসের সর্বহারা শ্রেণী উপলব্ধি করেছে যে, তাদের নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গঠন করার অঙ্গীকার নিয়ে সরকারি ক্ষমতা ও রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে নেওয়ার সময় এসে গেছে।'' মূলত প্যারি কমিউন ছিল এই অঙ্গীকারেরই ফলশ্রুতি।

রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাব, রণকৌশলের অনভিজ্ঞতা ও সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে কমিউন ভেঙে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তবুও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যের বিচারে ইতিহাসে তা আজ্ঞে বেঁচে আছে। মার্ক্স বলেছিলেন, যা করেছিল তা দিয়ে কমিউনের বিচার না করে যা করতে চেয়েছিল তাই দিয়ে তার বিচার করা উচিত। জে. টি. জোযিনের (J. T. Joughin) মতে, কমিউনের সত্যিকারের তাৎপর্য প্রতিফলিত হয়েছে। পরবর্তী বিপ্লবের ইতিহাসে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে কমিউন সংগঠিত না হলেও পরবর্তী প্রজন্মের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ প্রস্তুতিতে এর ভূমিকা ছিল অসাধারণ। ফ্রাঁকোয়া গেয়াগেল (Francois Goguel) শ্রমিক আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান চরমপন্থী ঝোঁকে কমিউনের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন, মাসৌ (E. S. Masou) কুড়ি শতকের সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের কাজের মধ্যে কমিউনের তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছেন এবং ফ্রাঙ্ক জেলিনেক (Frank Jellinek) বিপ্লবীতত্ত্বের প্রসারে কমিউনের প্রকৃত অবদানের সম্মান করেছেন। স্বয়ং লেনিন তাঁর বিপ্লবীতত্ত্ব ও দল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কমিউন থেকে মূল শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বলে স্বীকার করে গেছেন।

পরাজয়ের মধ্য দিয়েই কমিউন আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিল যে, বিপ্লবের যুগ শেষ হয়ে যায়নি, সার্থক প্রস্তুতি থাকলে শ্রমজীবীদের আন্দোলন সফল হতে বাধ্য। এই ঐতিহাসিক শিক্ষার মধ্যেই নিহিত ছিল প্যারি কমিউনের প্রকৃত বিজয়।

৩.১৫ সারসংক্ষেপ

১৭৮৯-এর ফরাসি বিপ্লবের পর সামরিক শক্তির ওপর ভিত্তি করে যে সব শক্তিশালী রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছিল তৃতীয় নেপোলিয়র দ্বিতীয় সাম্রাজ্য সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। ১৮৪৮-এর ফ্রেব্রুয়ারি বিপ্লব যে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র স্থাপন করে, সেই প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লুই বা তৃতীয় নেপোলিয়ন। অভ্যন্তরীণ শাসনে কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও তিনি কিন্তু বিদেশ নীতিতে ছিলেন ব্যর্থ। ১৮৭০-এ সেডানের যুদ্ধে প্রাশিয়ার কাছে হেরে গিয়ে তিনি ইংল্যান্ডে চলে যান, সেই সঙ্গে ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটে। একই সঙ্গে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হয় তৃতীয় প্রজাতন্ত্র তারা প্যারিসে প্যারি কমিউন। ছ সপ্তাহ পর অবশ্য প্যারি কমিউনের পতন ঘটে এবং তৃতীয় প্রজাতন্ত্র টিকে যায়।

৩.১৬ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন :

১। দ্বিতীয় ফরাসি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তৃতীয় নেপোলিয়নের অভ্যন্তরীণ শাসনকাঠামো কেন্দ্রীভূত ছিল কি? এই শাসনের গঠনমূলক বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

২। তৃতীয় নেপোলিয়নের বিদেশনীতির লক্ষ্য কি ছিল? ঐ লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে ফরাসি সম্রাট ফ্রান্সকে মিত্রহীন করে দিয়েছিলেন কি?

৩। তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের কারণ কি? তার কাজের মূল্যায়ন করুন।

৪। ফ্রান্সে প্যারি কমিউনের প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা করুন।

৫। প্যারি কমিউনের পতন হয়েছিল কেন?

ছোট প্রশ্ন :

১। 'জুন ডেজ' (June Days) বলতে কি বোঝায়?

২। লুই নেপোলিয়নকে তৃতীয় নেপোলিয়ন বলা হত কেন?

৩। তৃতীয় নেপোলিয়নের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়ে বিপুল জনসমর্থনের কারণ কি ছিল?

৪। লুই নেপোলিয়নের 'international showmanship' বলতে কি বোঝায়?

৫। আঠারো শতকের কমিউনের সঙ্গে উনিশ শতকের কমিউনের চারিত্রিক পার্থক্য কি?

৬। প্যারি কমিউনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। ফরাসি 'জাতীয় সভা'কে মার্ক্স-এঙ্গেলস কিভাবে অভিহিত করতেন?

২। লুই নেপোলিয়নের বংশপরিচয় কি ছিল?

৩। তৃতীয় নেপোলিয়ন কোথায় কোন দুর্গে বন্দী হয়েছিলেন?

৪। 'এমস্ টেলিগ্রাম' কি?

৫। দ্বিতীয় ফরাসি সাম্রাজ্যের কয়েকটি ঋণদানকারী সংস্থার নাম করুন।

৬। তৃতীয় নেপোলিয়নকে 'ক্ষুদে নেপোলিয়ন' কে বলেছিলেন?

৭। 'বোনাপার্ট-মিথ' কি?

৮। কবডেন চুক্তি, কাদের মধ্যে কেন সম্পাদিত হয়?

৯। ম্যাক্সিমিলিয়ঁ কে ছিলেন?

৩.১৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। E. Lipson : Europe in the 19th and 20th Centuries.

২। Stephen Lee : Aspects of European History, 1789-1950.

৩। Alfred Cobban : A History of Modern France, 1799-1945.

৪। David Thomson : France—Empire and Republic.

৫। J. F. Joughin : Paris Commune in French Politics.

একক ৪ □ বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রের গঠন—ইতালি ও জার্মানী ; পুরনো অস্ট্রিয় ও অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যের ভাঙন

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ ঐক্যবদ্ধ ইতালি-সৃষ্টির পটভূমি ও যোশেফ মাৎসিনি

৪.৪ যোসেফ মাৎসিনি

৪.৫ কাউন্ট কভুর

৪.৬ গ্যারিবল্ডি

৪.৭ মূল্যায়ন

৪.৮ বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে জার্মানির সংগঠন প্রস্তুতি

৪.৯ অটো ফন বিসমার্ক

৪.১০ জার্মান উদারপন্থীদের ভূমিকা

৪.১১ বিসমার্কের ''রক্ত ও লৌহ'' নীতির প্রয়োগ এবং জার্মান ঐক্য

৪.১২ মূল্যায়ন

৪.১৩ অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য ভাঙন

৪.১৪ তুর্কী সাম্রাজ্যের ভাঙন

৪.১৫ সারসংক্ষেপ

৪.১৬ অনুশীলনী

৪.১৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপে একদিকে যে বৃহৎ রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ আর অন্যদিকে যে পুরনো সাম্রাজ্যের ভাঙন দেখা দিয়েছিল, তার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই বর্তমান এককের উদ্দেশ্য।

৪.২ প্রস্তাবনা

১৮৭০-এর দশকের গোড়ায় যখন তৃতীয় ফরাসি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই সময়েই ইতালি ও জার্মানিতে গড়ে ওঠে দুটো বড় ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র। আবার এতদিন ধরে টিকে থাকা অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ সাম্রাজ্য আর অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্য এইসময়ে দুর্বল হয়ে পড়ে, ভাঙতে শুরু করে। এই ভাঙা-গড়ার একটি বিবরণ ও বিশ্লেষণের উপস্থাপনা করা হবে বর্তমান এককে।

৪.৩ ঐক্যবদ্ধ ইতালি সৃষ্টির পটভূমি ও যোশেফ মাৎসিনি

আঠারো শতকের ইউরোপে ইতালি নামে কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। এখন যে রাষ্ট্রটি ইতালি নামে পরিচিত, তার উত্তর দিকটিতে শাসন করত অস্ট্রিয়া, দক্ষিণ দিকটিতে ছিলেন ফরাসি বুরবোঁ রাজারা। মধ্যাংশটিতে ছিলেন পোপ। এর মধ্যে শুধু পিডমন্ট-সার্ডিনিয়া সীমিত স্বায়ত্বশাসনের অধিকারী ছিল। উনিশ শতকের গোড়ায় এই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মনেও জাতীয় রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা জাগে। এর প্রথম কারণ ফরাসী বিপ্লব। এই বিপ্লব ইতালিকে দিয়েছিল 'The inspiring concept of a nation as a comity of nations'। দ্বিতীয় কারণ, নেপোলিয়নের অভিযান। হ্যাপ্‌সবুর্গ ও বুরবোঁদের তাড়িয়ে দিয়ে, সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে, পোপকে ক্ষমতাহীন করে, খণ্ড-বিখণ্ড রাজ্যগুলোকে নেপোলীয়নীয় কাঠামোর মধ্যে এনে ফরাসি সম্রাট ইতালিবাসীদের ঐক্যের স্বাদ দিয়েছিলেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মনে যে ক্রমশ জাতীয়তাবাদী চেতনা অঙ্কুরিত হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল 'কনসিলিয়েটর' পত্রিকার পাতায়। ঐতিহাসিক শান্টু (Cantu), ত্রজা (Troya) ও ক্যাপ্পানি (Cappani) ভাষাবিদ তোম্মাসিও (Tommacio), ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক দ্য জেগ্‌লিও (Massimo d, Azeglio), সংস্কৃতিজীবী লিওপার্ডি (Leopardi) মানজোনি (Manzoni), বার্চেট (Berchet), সিলভিও পেলিকো (Silvio Pellico), গ্যিস্তি (Guisti)—এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের রচনা আর সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমে মানুষকে জাতীয় চেতনায় দীক্ষিত করতে শুরু করেছিলেন। যেসব বুদ্ধিজীবী—ইতালি ছেড়ে প্যারিসে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তারা সেখান থেকেই উদারনীতি আর জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা প্রচার করেছিলেন।

এইভাবে একদিকে যখন ইতালিয়রা নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ সেই সময়ে তাদের ওপর চেপে বসেছিল ভিয়েনা ব্যবস্থার স্বৈরাচার। ফলে প্রতিবাদী জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী গোষ্ঠীর জন্ম হতেও দেরি হয়নি। স্বৈরাচারী মেটারনিখীয় প্রতিবন্ধকতার কারণেই এই গোষ্ঠীগুলো গুপ্ত সমিতির চেহারা নিয়ে বেড়ে ওঠে।

৪.৪ যোসেফ মাৎসিনি

কার্বোনারি ছিল এই রকমই একটি গোপন সংগঠন। এই সংগঠনেই জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হন যোসেফ মাৎসিনি (Giuseppe Mazzini)। গ্যেটে, বায়রন, দাতঁর গুণমুগ্ধ রোমান্টিক ভাবাদর্শে আপ্লুত মাৎসিনি ইতালির গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে খুঁজেছিলেন দাঁত ও মাকিয়াভেলির লেখার মধ্যে। উদারনীতি আর জাতীয়তাবাদ ছিল তাঁর প্রধান আদর্শ। বাকুনিনের নৈরাজ্যবাদ বা মার্ক্সের সমাজতত্ত্ব তাঁর পছন্দ হয়নি। কিন্তু শ্রমজীবীদের জন্য তাঁর উৎকণ্ঠা ছিল। সাধারণ মানুষের মুক্তি ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষিত। রোমকে তিনি "Terza Rome" বা, তৃতীয় রোম হিসেবে গড়তে চেয়েছিলেন। 'প্রথম রোম' ছিল সিজারের, 'দ্বিতীয় রোম' ছিল পোপ এর 'তৃতীয় রোম' হিসেবে গড়তে চেয়েছিলেন। 'প্রথম রোম' ছিল সিজারের, 'দ্বিতীয় রোম' ছিল পোপ-এর 'তৃতীয় রোম' হবে জনতার, এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। ধর্মানুভূতি থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেননি ঠিকই। এমনকি একসময়ে 'ধর্মস্থাপনার' জন্যই তিনি পিডমন্টের রাজা চার্লস এ্যালবার্ট বা পোপ নবম পাইয়ুসকেও আহ্বান জানিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ধর্মবোধ বা আত্মিক সাধনা পুরোপুরি ঈশ্বর নির্ভর নয়, তা ছিল ইতালিয়দের আত্মিক নবজন্মের (Risorgimento) প্রয়াস। ১৮২০-র দশকের সংগ্রামের ব্যর্থতায় হতাশ মাৎসিনি মার্সেইতে ১৮৩০-এ 'ইয়ং ইতালি' (Giovine Italia) দল গঠন করেন। দলে দলে যুবক সম্প্রদায় 'ইয়ং ইতালির সদস্যপদ গ্রহণ করে। ১৮৩০ সালে পিডমন্টের গণ অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে মাৎসিনি দেশবাসীকে বলেন তারা যেন ভবিষ্যতে সমগ্র ইটালি ছাড়া কোন বিচ্ছিন্ন অংশের জন্য আন্দোলন না করেন। মাৎসিনি গভীর ভাবে প্রজাতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাস করতেন। তাঁর পরিকল্পনায় ভবিষ্যতের ঐক্যবদ্ধ ইতালি প্রজাতান্ত্রিক ছাড়া অন্য কিছু হবে না। দেশপ্রেম তিনি ধর্মের পর্যায়ে উন্নীত করেন। মাৎসিনি শেষ পর্যন্ত সফল হননি। প্রজাতান্ত্রিক ঐক্যবদ্ধ ইতালি তিনি দেখে যেতে পারেননি। হয়ত তাঁর অতিরিক্ত ভাবাবেগ, বাস্তব-বিমুখতা এর কারণ ছিল। জ্যাক ড্রজ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন "This great Patriot....had no political genius...."। হবসবম তাঁর সম্পর্কে আরও তীক্ষ্ণভাষী, "The woolly and ineffective self-dramatizer"। কিন্তু এই তিরস্কার নিতান্তই অবাঞ্ছিত। সম্ভবত মার্কসকে গ্রহণ করেননি বলেই এঁরা রেগে গিয়েছেন, কিন্তু মনে রাখা দরকার, শূন্য থেকে শুরু করেছিলেন মাৎসিনি আর রেখে গিয়েছিলেন এমন এক ইতালিকে, যে ইতালিতে, তাঁর কথামতো, ১৮৪৮-এর বিপ্লবের দিনগুলোতে রাজাদের যুদ্ধের শেষ, প্রজাদের যুদ্ধের শুরু'। আর তিনি রেখে গিয়েছিলেন তাঁর মন্ত্রশিষ্য গ্যারিবল্ডিকে। ইতালির ঐক্য আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন মাৎসিনি। এই প্রস্তুতি না থাকলে কাভুর তাঁর কূটনৈতিক খেলায় (diplomatic game) কতটা সফল হতেন, সন্দেহ।

১৮৪৮-র ইতালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অল্প সময়ের মধ্যেই ঝিমিয়ে পড়েছিল। ইতিমধ্যে পোপের নেতৃত্ব নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার একটা চেষ্টাও কারো কারো মধ্যে দেখা গিয়েছিল। মধ্যযুগীয় পোপপন্থী গুয়েলফ (Guelf) ঐতিহ্যকে মাথায় রেখে রাজানুগতদের বিপরীতে (মধ্যযুগে এদের বলা হত গিবেলিন, Ghibeline)

পাদ্রী জিওবার্টি (Geoberti) পোপকেই জনতার নেতা হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এইরকম পরিস্থিতিতে মাৎসিনির অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন পিডমন্টের প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট কাভুর (Count Cavour)।

৪.৫ কাউন্ট কাভুর

কাভুর প্রজাতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন, একথা পুরোপুরি ঠিক নয়। তবে মাৎসিনির মতো প্রজাতন্ত্রের প্রতি রোমান্টিক আবেগ তিনি দেখাননি। বাস্তববাদী কাভুর প্রকাশ্যে ঐক্যবদ্ধ সংসদীয় ইতালি গড়ার কথা বলে চার্চপন্থী, রাজতন্ত্রী ইত্যাদি সবার সহযোগিতাই চেয়েছিলেন এবং প্রয়োজনে বিদেশী সাহায্যও নিতে প্রস্তুত ছিলেন। ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য অস্ট্রিয়াকে জোর করেই সরাতে হবে, একথা তিনি মনে করতেন এবং এও বিশ্বাস করতেন যে, নেতৃত্ব দিতে হবে পিডমন্টকেই। পিডমন্টকে তাই তিনি আধুনিক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি জানতেন ভিয়েনা-ব্যবস্থাকে নষ্ট করবার জন্য ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন উন্মুখ। তাই তিনি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ফ্রান্সকে সঙ্গে রাখতে চেয়েছিলেন। সেইসঙ্গে কাবুর তাঁর সম্পাদিত 'ইল রিজর্গিমেন্টো (II Risorgimento) পত্রিকার মাধ্যমে ইতালির আঞ্চলিক শাসকদের কাছে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

১৮৪৮ সালে জাতীয়তাবাদের ব্যর্থতা দেখে কাভুরের দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে বিদেশী সাহায্য ছাড়া ইতালির অস্ট্রিয়া-বিরোধিতা সফল হবে না। তাই তিনি আন্তর্জাতিক গুরুত্ব পাওয়ার আশায় একরকম অসঙ্গত ও অনাহূত ভাবেই ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পিডমন্ট-সার্ডিনিয়ার সেনা পাঠান। যুদ্ধে তাঁর সেনারা বীরত্ব প্রদর্শন করায় সন্ধি-আলোচনায় প্যারিসে কাভুর আমন্ত্রণ পান। সেখানে ইতালির জাতীয়তাবাদী চেতনা ও অস্ট্রিয়ার অন্যায় কর্তৃত্বের কথা তিনি বলার সুযোগ পেয়ে যান। বিশেষ করে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের আনুকূল্য অর্জিত হয়। ১৮৫৮ সালে ফ্রান্স ও পিডমন্ট-সার্ডিনিয়ার মধ্যে সম্পাদিত হয় প্লমবিয়ার্সের চুক্তি (Compact of Plombiers)। চুক্তিটি ছিল অস্ট্রিয়া-বিরোধী। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জিততে পারলে পিডমন্ট-সার্ডিনিয়া লম্বার্ডি, ভেনিসিয়া, মোডেনা ও পোপ-রাজ্যের কিছুটা নিয়ে উত্তর ইতালিয় রাষ্ট্র গঠিত হবে বলে ঠিক নয়। ফ্রান্স পাবে স্যাভয় এবং নিস। অস্ট্রিয়া যুদ্ধে রাশিয়ার নিরপেক্ষতাও নিশ্চিত করা হয়। ইংল্যান্ড ফরাসি-বিরোধী হলেও ইতালিয় জাতীয়তাবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তাছাড়া অস্ট্রিয়ার দুর্দশায় প্রাশিয়ারও খুশি হওয়ার কথা। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণতই কাভুরের পক্ষে চলে এসেছিল। প্লমবিয়ার্সের চুক্তি ছিল কাভুরের কূটনৈতিক চাতুর্যের অন্যতম উদাহরণ।

এরপর কাভুর অস্ট্রিয়াকে উত্তেজিত করবার জন্য সীমান্তে ব্যাপক সমরসজ্জা শুরু করেন। অধৈর্য অস্ট্রিয়ারাজ ফ্রানড্ জোসেফ কাভুরের ফাঁদে পা দেন। অস্ট্রিয়া একটি চরমপত্র দিয়ে পিডমন্টকে ভয় দেখালে

সেটাই যুদ্ধের অজুহাত হিসেবে গৃহীত হয় এবং যুদ্ধ শুরু করেন। চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্স যুদ্ধে যোগ দেয়। পিডমন্ট-ফরাসী যুগ্মবাহিনী ম্যাজেন্টা ও সলফেরিনোর যুদ্ধে জয়ী হয়। লম্বার্ডি থেকে অস্ট্রিয়াকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। পার্মা, মোডেনা, ফ্লোরেন্স ও বোলনে বিদ্রোহ শুরু হয়। কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ ফ্রান্স যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়িয়ে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে 'ভিঅআফ্রাংকা'-র সন্ধি (১৮৫৯) করে। সম্ভবত, ফ্রান্সের পাশে শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ ইতালির অভ্যুদয়ের আতঙ্ক, যুদ্ধে অপরিমিত লোকক্ষয় ও ফরাসি ক্যাথলিকদের পোপ-এর প্রতি সমর্থন—এই সব কারণেই তৃতীয় নেপোলিয়ন পিছিয়ে এসেছিলেন। ফ্রান্স চুক্তিভঙ্গ করায় ক্যাভুরের আপত্তি স্বত্ত্বেও পিডমন্টরাজ অন্যানুয়েল অস্ট্রিয়ার সঙ্গে জুরিখের সন্ধি করে যুদ্ধের অবসান ঘটান। সার্ডিনিয়া শুধু লম্বার্ডি পায়, ভেনিসিয়া আগের মতোই অস্ট্রিয়ার অধীনে থেকে যায়।

ইতিমধ্যে পার্মা, মোডেনা, টাস্কেনি প্রভৃতি মধ্য-ইতালির রাজ্যগুলো পিডমন্ট সার্ডিনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে চায়। ক্যাভুর ফ্রান্সকে স্যাভয় ও নিস দিয়ে এই সংযুক্তির ব্যাপারে তার সাহায্য নেন। একটি গণভোটের আয়োজন করে সংযুক্তিটিকে বৈধ ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে রোম বাদ দিয়ে পোপের রাজ্য অ্যামব্রিয়া (Umbria) ও মার্চেস (Marches) ক্যাভুর জয় করে নেন। ঐক্যবদ্ধ হয় উত্তর ও মধ্য ইতালি। বাকি থাকে দক্ষিণ ইতালি।

৪.৬ গ্যারিবল্ডি

দক্ষিণ ইতালির সংযুক্তিকরণে মাৎসিনির শিষ্য গ্যারিবল্ডির 'লাল কুর্তা' বাহিনীর সামরিক অভিযান ও কাভুরের কূটনৈতিক প্রয়াস উল্লেখযোগ্য। সাধারণতন্ত্রে বিশ্বাসী জঙ্গী বিপ্লবী গ্যারিবল্ডি সিসিলি ও নেপল্‌স্ জোর করেই অধিকার করেছিলেন। কিন্তু তা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী হওয়ায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রনেতারা আপত্তি জানিয়েছিলেন। তখন গোপনে গ্যারিবল্ডিকে সমর্থন করেও প্রকাশ্যে কাভুর এই কাজের সঙ্গে সার্ডিনিয়ার সম্পর্ক অস্বীকার করেন। আবার তলে তলে ইতালির জাতীয় রাষ্ট্রের পক্ষে সিসিলি ও নেপল্‌সে জোর প্রচার চালান। ফলে গণভোট করে সিসিলি ও নেপল্‌সের মানুষ কাভুরের ইতালির পক্ষে যোগ দেয়। গণভোটের মাধ্যমে এই সংযুক্তি সম্ভব হয় বলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোও আর আপত্তি করেনি।

কিন্তু বিপদ দেখা দেয় যখন গ্যারিবল্ডি রোম অভিযান শুরু করেন। প্রথমত, রোমের প্রহরায় ফরাসি বাহিনী নিযুক্ত ছিল। সুতরাং গ্যারিবল্ডির রোম অভিযান ফরাসি হস্তক্ষেপ নিয়ে এলে ঐক্যের পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, গ্যারিবল্ডি কট্টর সাধারণতন্ত্রী হওয়ায় ইতালিতে রাজতন্ত্রী ও সাধারণতন্ত্রীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের আশংকা ছিল। কাজেই বাধ্য হয়ে কাভুর আপাতত গ্যারিবল্ডিকে নিরস্ত করতে পিডমন্ট সার্ডিনিয়ার রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে পাঠিয়েছিলেন। গ্যারিবল্ডি নিজেও বিপদ বুঝতে পেরে ইম্যানুয়েলের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে ক্যাপরেরা দ্বীপের কৃষি-খামারে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে চলে যান। উত্তরে ভেনিসিয়া ও মধ্যে রোম ছাড়া

বাকি ইতালি ঐক্যবদ্ধ হয়। এই সময়েই মৃত্যু হয় কাভুরের। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৬৬ সালে অস্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার 'সাদোয়া'র যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয়ের ফলে ভেনিসিয়া ইতালিতে যোগ দেয়, আর ১৮৭০ সালে সেডানের যুদ্ধে প্রাশিয়ার হাতে ফ্রান্সের পরাজয়ের ফলে রোম থেকে ফরাসি সেনা সরে যায় এবং রোম ইতালির সঙ্গে যুক্ত হয়। এইভাবে মাৎসিনি-কাভুর-গ্যারিবল্ডির স্বপ্ন পূর্ণ হয়, ঐক্যবদ্ধ হয় গোটা ইতালি। পিডমন্ট-রাজ ভিক্টর ইম্যানুয়েল ইতালির রাজা হিসেবে স্বীকৃত হন।

৪.৭ মূল্যায়ন

যদিও ইতালির চূড়ান্ত ঐক্য কাভুর দেখে যেতে পারেননি, তবু ইতালির ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থানে তাঁর অবদানই ছিল সবচাইতে বেশি। বাস্তববাদী কূটনীতিবিদ হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে, মাৎসিনির আদর্শবাদ আর গ্যারিবল্ডির সামরিক প্রতিভার সমন্বয় সাধন করে করে তিনি ইতালিকে আধুনিক রাষ্ট্রের স্তরে উন্নীত করেছিলেন। গ্যারিবল্ডি ছিলেন ইতালির 'রোমান্টিক হিরো'। মাৎসিনির 'ইয়ং ইতালি' আন্দোলনে দীক্ষিত গ্যারিবল্ডি ১৮৪৮-এ ফরাসি বাহিনীর হাত থেকে রোমানা প্রজাতন্ত্রকে বাঁচিয়েছিলেন, ১৮৫৯-এ লেক কোমো-তে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিলেন, আর কালাটাকিমি ও ভলটার্নের যুদ্ধ জিতে সামন্তরাজদের হাত থেকে সিসিলি-নেপ্‌ল্‌স্‌কে উদ্ধার করে কাভুরের পথ মসৃণ করে দিয়েছিলেন। কাভুরের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক মতবিরোধ ছিল, কিন্তু দুজনেই ছিলেন জাতীয়তাবাদী।

ইতালি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু মাৎসিনির মূল স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছিল, একথা বলা যাবে না। ইতালির কৃষকরা তখনো জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ ছিল না। কূটনীতি ও যুদ্ধের মাধ্যমে ইতালির ঐক্য এসেছিল। রেলপথ ছিল না, শিল্প ছিল না, ছিল যুদ্ধের আর্থিক চাপ আর এক রাজার শাসন। সংসদ থাকা সত্ত্বেও সাধারণের অধিকার ছিল সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ জাতীয় রাষ্ট্র আর তার জাতীয় সমরবাহিনী তৈরি হয়েছিল, গড়ে ওঠেনি জাতীয় সমাজ বা জতীয় মন। সম্ভবত অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে এই কারণেই ইতালিতে সহজে ফ্যাসিবাদ মাথা চাড়া দিয়েছিল, সুতরাং গ্রেনভিল যখন হতাশার সুরে বলেন, "Cavour saw Mazzini's ideas defeated", তখন সেই হতাশাকে নিরর্থক বলা যায় না।

৪.৮ বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে জার্মানির সংগঠন প্রস্তুতি

উনিশ শতকে বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে শুধু ইতালিরই অভ্যুদয় হয়নি, জার্মানিরও হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের সময় জার্মানীও ছিল একটি 'ভৌগোলিক সংজ্ঞা' মাত্র। প্রায় তিনশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জার্মান রাজ্যকে নেপোলিয়ন প্রথমে পনেরোটি অঞ্চলের 'রাইন যুক্তরাজ্যে' (Confederation of the Rhine) পরিণত করেন, জার্মানদের

মধ্যে জাগিয়ে তোলেন ঐক্যের স্বপ্ন। কিন্তু ১৮১৫ সালের ভিয়েনা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে জার্মানি আবার উনচল্লিশটি রাজ্যে বিভক্ত হয় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব। জার্মান শাসকবর্গের প্রতিনিধিসভা ডায়েট (Diet)-কে অস্ট্রিয়াই নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে, জার্মান জাতীয় চেতনা নিষ্পেষিত হতে থাকে মেটারনিখ ব্যবস্থা ও কার্লসবাড ডিক্রির যাঁতাকলে। ১৮৩০ সালে ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে হ্যানোভার, হেসি, স্যাক্সনি প্রভৃতি রাজ্যে আন্দোলন শুরু হয়। মেটারনিখ তৎপরতার সঙ্গে তা দমন করেন।

কিন্তু তবুও ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে যে জাতীয় ঐক্যের চেতনা একটু একটু করে জার্মানদের মনে চারিয়ে যাচ্ছিল, তা সমূলে উৎপাটিত হয়নি। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রগতিশীল চিন্তার ধারা, ফিকটে, হেগেল বা স্টেইনের দর্শন জার্মানিতে মবজাগৃতি নিয়ে আসে, গভীর জাতীয় আবেগের জন্ম দেয়। ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ঢেউয়ে জার্মান রাজ্যগুলোও আন্দোলিত হয়েছিল। ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন, স্যাক্সনি, হ্যানোভার-এ শাসন-সংস্কারের দাবিতে গণ-আন্দোলন দেখা যায় এবং প্রাশিয়ারাজ চতুর্থ ফ্রেডরিক উইলিয়ম-সহ অন্যান্যরা কিছু সংস্কার করতে বাধ্য হন। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য গঠিত হয় ফ্রাঙ্কফুট পার্লামেন্ট। অবশ্য অচিরেই গণ আন্দোলনের বেগ স্তিমিত হয়ে আসে। জার্মান রাজ্যগুলোকে এক কাঠামোয় নিয়ে আসার এরফুর্ট প্রস্তাব অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্যোয়ার্জেনবার্গ (Schwarzenberg)-এর বিরোধিতায় নাকচ হয়ে যায়। ১৮৫০-এর ওলমুজের চুক্তিতে প্রাশিয়া জার্মানিতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য মেনে নেয়। ১৮৬১ সালে প্রাশিয়ার সিংহাসনে বসেন প্রথম উইলিয়ম, ১৮৬২ সালে তিনি ব্যান্ডেনবার্গের অভিজাত সন্তান রাশিয়ায় প্রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত অটো ফন বিসমার্ককে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী করে নিয়ে আসেন। শুরু হয় জার্মান জাতীয় রাষ্ট্রগঠন প্রস্তুতির দ্বিতীয় অধ্যায়।

৪.৯ অটো ফন বিসমার্ক

"প্রখর বাস্তববাদী এই ব্যক্তি কোন অসীম উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ করতেন না"—বিসমার্ক সম্পর্কে এই উপলব্ধি গ্রেণভিলের। কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। গণতন্ত্র ও সংসদীয় রাজনীতির ওপর তাঁর সামান্যতম আস্থাও ছিল না। তিনি একক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করতেন। জার্মান স্বার্থের চাইতেও প্রাশিয়ার স্বার্থ তাঁর কাছে বড় ছিল। এক জার্মান রাষ্ট্রে প্রাশিয়ার বিলুপ্তি তিনি চাননি। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে এক জার্মান রাষ্ট্র ছিল তার অভীষ্ট। এই সিদ্ধি লাভের জন্য তিনি বিবেকহীন কূটনীতিতেও পিছপা নন। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের কাছে প্রাশিয়ার উদ্দেশ্য তাই তিনি ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতেন। ফরাসি সম্রাটকে তিনি একজোট হয়ে ভিয়েনাব্যবস্থা ভেঙে ফেলার লোভ দেখিয়েছিলেন। আবার, অস্ট্রিয়াকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, জার্মান কনফেডারেশন গঠন করে তার ওপর প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যৌথ কর্তৃত্ব স্থাপিত হোক।

যাই হোক, বিসমার্ক যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন প্রোটেস্ট্যান্ট প্রাশিয়া সামরিক ও আর্থিক শক্তিতে জার্মানির মধ্যে সবচাইতে অগ্রণী রাষ্ট্র। জার্মান শুল্ক সংঘের নেতা। ১৮১৯ সালে, ভিয়েনা সম্মেলনের পর পরই

'জোলভেরেন' (Zollverein) নামে এই শুল্ক সংঘটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৫০ সাল নাগাদ প্রায় সব জার্মান রাজ্যই এই সংঘে যোগ দিয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল গোটা জার্মান ভূখণ্ডে এক শুল্কনীতি বা অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রতিষ্ঠা করা। জোলভেরেন-এর মাধ্যমে জার্মান রাজ্যগুলোর শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নই সাধিত হয়নি, অর্থনৈতিক ঐক্যের ভিত্তিও তৈরি হয়েছিল। এই ভিত্তিটিই শক্ত করতে চেয়েছিলেন বিসমার্ক।

বিসমার্ক বুঝতে পেরেছিলেন, জার্মান ঐক্য প্রাশিয়ার নেতৃত্বেই আসবে। কিন্তু জনতার ভূমিকা পছন্দ করতেন না বলে, বা ইতিহাসে জনতার গুরুত্ব মানতেন না বলে, আন্দোলনের পথে না হেঁটে কূটনীতি ও যুদ্ধনীতির পথে হাঁটার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। অর্থাৎ তিনি মনে করতেন, জাতি তৈরি হয় রাজকর্তৃত্বকে কেন্দ্র করে। এক্ষেত্রে প্রাশিয়ার রাজকর্তৃত্ব হবে জার্মান জাতির কেন্দ্র। তার শক্তি জোগাবে অর্থবান জার্মানগোষ্ঠী, আবার ঐ অর্থবান গোষ্ঠীর জন্যই বিসমার্ক এক জাতি এক রাষ্ট্রের বিশাল বাজার নিশ্চিত করবেন। এই নিশ্চিতি অর্জিত হবে সামরিক বলপ্রয়োগের মাধ্যমে, অস্ট্রিয়াকে হাটিয়ে, দুর্বল করে আর সব জার্মান রাজ্যকে এক শাসনকর্তৃত্বের শেকলে বেঁধে রেখে। এইভাবেই বিসমার্কের ভাবনায় ও পরিকল্পনায় তত্ত্বস্থ হয়েছিল 'রক্ত ও লৌহে'র যুদ্ধনীতি (Policy of Blood and Iron)। কিন্তু এই নীতিতে সাধারণ নাগরিকের কোন গুরুত্ব না থাকলেও এর রূপায়ণের স্বার্থে তাদের মৌন সমর্থন জরুরী ছিল। এই সমর্থন বিসমার্ক আদায় করেছিলেন জার্মান উদারপন্থীদের প্রভাব কৌশলে ব্যবহার করে।

৪.১০ জার্মান উদারপন্থীদের ভূমিকা

ফরাসী বিপ্লবের মুক্তপন্থার আদর্শ (Liberalism) জার্মানিতেও ছড়িয়েছিল। জার্মান জাতীয়তাবাদী উদারপন্থীরা একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক জাতিরাষ্ট্র চেয়েছিলেন। জার্মান জনতার সমর্থন তাদের দিকেই ছিল। এই উদারপন্থীরা কর্তৃত্ববাদ ও সমরবাদের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ১৮৪৮-এর গণ আন্দোলনের ব্যর্থতা তাদের হতোদ্যম করে দেয়। উদারপন্থীরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যান। একদল ভাবতে থাকেন, উত্তর জার্মানির অস্ট্রিয়া-প্রাধান্যের চাইতে দক্ষিণ জার্মানির অস্ট্রিয়া-প্রাধান্য তুলনায় দুর্বল। তাছাড়া সেখানকার ক্যাথলিকরা ফরাসি ক্যাথলিকদের সহানুভূতি পায় বলে অস্ট্রিয়া সেখানে যথেষ্ট কঠোর নয়। তাই দক্ষিণ জার্মানিতে আবার গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং তার মাধ্যমেই জার্মান জাতীয় রাষ্ট্র অর্জিত হবে। কিন্তু আর একদল মনে করেন, গণ-আন্দোলনের চাইতেও বেশি জরুরী যে কোনভাবে ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্রগঠন। ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর জার্মানি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হবে। সেই রাষ্ট্রের ক্ষমতায় প্রবেশ করে সাংবিধানিক উপায়ে তখন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। প্রথম দলটির সভ্যরা জার্মানিতে পরিচিত হন 'উদারী-গণতান্ত্রিক (Liberal Democrat) হিসেবে, দ্বিতীয় দলের সভ্যরা পরিচিত হন 'উদার জাতীয়তাবাদী' (Liberal National) নামে। এরাই পরে National Liberal Party গঠন করেন। এদের দলটিকেই নিজের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছিলেন

বিসমার্ক। যেহেতু এরাও যে কোন উপায়ে ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্র চেয়েছিলেন, তাই বিসমার্কের 'রক্ত ও লৌহে'-র নীতিকে প্রশ্রয় দিতে আপত্তি হয়নি এদের।

৪.১১ বিসমার্কের 'রক্ত ও লৌহ'-নীতির প্রয়োগ এবং জার্মান ঐক্য

উদার-জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বিসমার্ক তার রক্ত ও লৌহের নীতি অনুসরণ করতে শুরু করেন। জার্মান জাতীয় সভা তার সমরসজ্জার জন্য অতিরিক্ত অর্থবরাদ্দে আপত্তি জানানোয় তিনি শুধু উচ্চকক্ষের সম্মতি নিয়ে করস্থাপন করেন। সমরসচিব ভনরুন ও সেনাপতি মল্টকে-র সাহায্যে কিছুদিনের মধ্যেই প্রাশিয়ার বাহিনীকে ইউরোপের অন্যতম সেরা সমরবাহিনীতে পরিণত করেন। পোল-বিদ্রোহ দমনে রাশিয়াকে সাহায্য করে তিনি রুশ জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। ইংল্যান্ডের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। ফ্রান্সও ততদিনে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের অব্যবস্থিতচিত্ততার জন্য ইউরোপীয় রাজনীতিতে বিচ্ছিন্ন। ফলে বিসমার্কের পক্ষে যুদ্ধ পরিস্থিতি ছিল অনুকূল। এই অবস্থায় ১৮৬২ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত তিনটি যুদ্ধের সাহায্যে বিসমার্ক জার্মানির ঐক্য সম্পূর্ণ করেন।

বিসমার্কের প্রথম যুদ্ধটি ছিল ডেনমার্কের সঙ্গে। ১৮৬৩ সালে ডেনমার্ক শাসন-সংস্কারের নামে জার্মান অধ্যুষিত শ্লেজহিগ ও হলস্টাইন রাজ্য দুটি সম্পূর্ণ গ্রাস করতে চাইলে বিসমার্ক আপত্তি জানান এবং এ ব্যাপারে তিনি অস্ট্রিয়ার সমর্থনও আদায় করে নেন। বিসমার্কের আপত্তিকে ডেনমার্ক অগ্রাহ্য করলে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া একযোগে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ডেনমার্ক যুদ্ধে হেরে যায় এবং ১৮৬৪-তে ভিয়েনায় এক সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। ডেনরাজ নবম খ্রীস্টিয়ান শ্লেজহিগ হলস্টাইনের ওপর সব অধিকার ছেড়ে দেন। ১৮৬৫-র গেস্টিনের চুক্তিতে শ্লেজহিগে প্রাশিয়ার এবং হলস্টাইনে অস্ট্রিয়ার আধিপত্য স্বীকৃত হয়।

এরপরই বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। অস্ট্রিয়ার হাত থেকে ভেনিসিয়া যাতে ইতালির হাতে যায়, সেই ব্যাপারে আশ্বাস দিয়ে তিনি ইতালিকে দলে টেনে নেন। ১৮৬৬ সালে শ্লেজহিগ-হলস্টাইন প্রশ্নটি অস্ট্রিয়া জার্মান কনফেডারেশনের সভায় উত্থাপন করলে, গেস্টিনের চুক্তি লঙ্ঘন করা হয়েছে, এই অজুহাতে বিসমার্ক হলস্টাইন আক্রমণ করে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দেন। সাত সপ্তাহের যুদ্ধের পর অস্ট্রিয়া সাদোয়া-য় শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। প্রাগের সন্ধি অনুসারে পুরনো জার্মান কনফেডারেশনের বিলুপ্তি ঘটিয়ে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জার্মান রাষ্ট্রজোট স্থাপিত হয়। ভিয়েনা-কেন্দ্রিক ইউরোপের রাজনীতি হয়ে ওঠে বার্লিন-কেন্দ্রিক।

প্রাশিয়ার এই উত্থানে ফ্রান্সের কূটনৈতিক পরাজয় ঘটে। স্বভাবতই উত্তেজিত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ফরাসি-সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন। ঠিক এই সময়ে স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে প্রাশিয়ার সঙ্গে

ফ্রান্সের বিরোধ দেখা দেয়। ১৮৬৯ সালে প্রজাবিদ্রোহের মুখে স্পেনের রানী ইসাবেলা দেশ ত্যাগ করলে স্পেন-এর অভিজাতগোষ্ঠী দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানির এক ক্ষুদ্র রাজ্যের যুবরাজ লিওপোল্ডকে স্পেনের সিংহাসনে বসার আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু প্রাশিয়া ও স্পেন একই হোহেনজোলার্ন বংশের হাতে চলে যাবে, এটা মেনে নিতে রাজি হননি ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন। তিনি কাউন্ট বেনেদিতিকে দূত হিসেবে এমস্ নামক এক স্বাস্থ্যনিবাসে প্রাশিয়ারাজ প্রথম উইলিয়মের কাছে পাঠিয়েছিলেন ফ্রান্সের আপত্তি জানাবার জন্য। প্রথম উইলিয়ম সে আপত্তি অগ্রাহ্য করেন এবং খবরটি টেলিগ্রাম করে বিসমার্ককে জানান। চতুর বিসমার্ক 'এমস টেলিগ্রামে'র অংশবিশেষ বিকৃত বিবরণসহ এমনভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন, যাতে মনে হয় ফরাসি দূত জার্মানির হাতে অত্যন্ত অপমানিত হয়েছেন। ফরাসি জনমত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তৃতীয় নেপোলিয়নের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং সম্রাট প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে বাধ্য হন। ১৮৭০-এর সেপ্টেম্বরে সেডানের যুদ্ধে ফরাসিবাহিনী প্রাশিয়ার হাতে বিধ্বস্ত হয়। ১৮৭১-এর মে মাসে সম্পাদিত ফ্রাঙ্কফুর্ট চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্স আলসাস লোরেন, মেৎস দুর্গ, স্ট্রাসবুর্গ প্রাশিয়ার হাতে তুলে দেয় এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাঁচশ কোটি ফ্রাঁ প্রাশিয়াকে দিতে রাজি হয়। দক্ষিণ জার্মানির ক্যাথলিকদের সব রকম সাহায্য দেওয়া থেকে ফ্রান্স বিরত হয়। ফলে দক্ষিণ জার্মানির রাজ্যগুলো অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রোটেস্ট্যান্ট প্রাশিয়ার নেতৃত্ব মেনে নেয় এবং উত্তর জার্মান রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়। এইভাবেই জার্মানি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাশিয়ার রাজা ঐক্যবদ্ধ জার্মানির সম্রাট হিসেবে স্বীকৃত হন। বিসমার্ক হন নতুন জার্মানির চ্যান্সেলর।

৪.১২ মূল্যায়ন

গণ-আন্দোলনের পথ ত্যাগ করে জার্মান জাতি-রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। এরপরেও বহু জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চল জার্মানির বাইরে থেকে গিয়েছিল। সিম্যান বিসমার্ককে 'a man with a limited objective' বলে সমালোচনা করেছেন, কেননা জাতীয়তাবাদী দলের সমর্থন কৌশলে আদায় করে যুদ্ধনীতির সাহায্যে বিসমার্ক যে জার্মান রাষ্ট্র তৈরি করেছিলেন, তা ছিল ক্ষুদ্র জার্মান তত্ত্বের বাস্তব প্রকাশ। জাতীয়তাবাদীরা চেয়েছিলেন জার্মান রাষ্ট্রে প্রাশিয়ার বিলুপ্তি, বিসমার্ক ঘটিয়েছিলেন প্রাশিয়ারাষ্ট্রে জার্মানির বিলুপ্তি। সেই অর্থে জার্মানির ঐক্য ছিল প্রাশিয়ার প্রাধান্য অর্জনের প্রয়াসের প্রায়োগিক পরিণতি। ডেভিড টমসন ভুল বলেননি যে ডেনমার্কের প্রতি, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের প্রতি যে নীতি বিসমার্ক গ্রহণ করেছিলেন, তা শুধু প্রাশিয়ার শক্তি বিস্তারের উদ্দেশ্যেই।

কিন্তু তবু বিসমার্ককে জার্মান জাতি রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে ভাবা সম্ভব নয়। দূরদৃষ্টি নিয়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক কাজ করবার যে দক্ষতা তিনি দেখিয়েছিলেন, তা উনিশ শতকের ইউরোপের ইতিহাসে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

জার্মান জাতি-রাষ্ট্র সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রাশিয়ার সুবিধাবাদ, বলপ্রয়োগের নীতি এসব ত্রুটি অবশ্যই ছিল। কিন্তু তবুও উনিশ শতকের ইউরোপের ইতিহাসে জার্মান জাতিরাষ্ট্রের গঠন ফরাসি বিপ্লবের মতোই সুদূরপ্রভাবী ঘটনা। পরবর্তীকালে জার্মান জাতির উগ্রতা ইতিহাসের সমস্যা তৈরি করেছিল, কিন্তু সেই সময়ে ইউরোপীয় মনীষায় জার্মানির একটি উজ্জ্বল স্থান ছিল। জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর ব্রিটিশ দার্শনিক কার্লাইল 'Times' পত্রিকায় লিখেছিলেন, "That...Germany should be at length welded into a nation and become Queen of the continent...seems to me the hopefullest public fact that has occurred in my time."

৪.১৩ অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে ভাঙন

ইতালি ও জার্মানি যখন ইউরোপে বৃহৎ জাতি-রাষ্ট্রের কাঠামো হাজির করেছিল, ঠিক সেই সময়েই স্পষ্ট হয়েছিল পুরনো ধাঁচের সাম্রাজ্যগুলোর ভাঙন। দুটো সাম্রাজ্যের কথাই এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। একটি হল অস্ট্রিয়ার হ্যাপস্‌বুর্গ সাম্রাজ্য আর অন্যটি অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্য।

অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য ছিল দশ-বারোটি জাতির সমাবেশ স্থল। ছিল জার্মান, হাংগারিয়ান ম্যাগিয়ার আর নানা উপজাতির লোক—যেমন রুমেনিয়ান, চেক, স্লোভাগ, সার্ব, পোল ইত্যাদি। ইতালি ও জার্মানিতে জাতি-রাষ্ট্র স্থাপন এইসব জাতি উপজাতির মনেও জাতীয়তাবাদী ঢেউ তুলে দিয়েছিল। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের ঢেউ, হাংগারিতে কোসুথের (Kossuth) নেতৃত্বে বিদ্রোহ অস্ট্রিয়ারাজ নিষ্ঠুরভাবে সামাল দিয়েছিলেন, কিন্তু ১৮৬০-এর দশকে তিনি আর তা পারেননি। ১৮৬৭ সালে অস্ট্রিয়ারাজ ফ্রান্‌জ্‌ জোসেফ হাংগারীর জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বাধ্য হন। এই আপসরফা (Ausgleich) নামে পরিচিত। বিদেশনীতি ও প্রতিরক্ষা ছাড়া অন্য সব বিষয়ে হাংগারীকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে দেন, প্রতিষ্ঠিত হয় অস্ট্রো-হাংগেরীয় দ্বৈতশাসন। ১৮৬৮-তে হাংগারীর দুই নেতা ডিক (Deak) ও এওত্বোস (Eotvos) আবার ক্রোটদের স্বতন্ত্র শাসনের প্রতিশ্রুতি দেন। এই প্রতিশ্রুতি যদিও রক্ষিত হয়নি এবং এরপরেও সার্ব, রুমানীয়, স্লোভাক প্রভৃতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার জোর খাটিয়েই দাবিয়ে রাখা হয়, কিন্তু অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যে ভাঙনের চিহ্ন তখন থেকেই ছিল স্পষ্ট, এবং তা সম্পূর্ণ হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পর হাংগারীর স্বাধীনতা প্রাপ্তির ফলে।

৪.১৪ তুর্কী সাম্রাজ্যের ভাঙন

অটেমান তুর্কীরা ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের বল্কান উপদ্বীপে এসেছিল পনেরো শতকে; কনস্টানটিনোপল তাদের দখলে আসে ১৪৫২ সালে। গড়ে ওঠে বিশাল তুর্কী সাম্রাজ্য। কৃষ্ণসাগরের তীর থেকে ভূমধ্যসাগরের ক্রীট ও সাইপ্রাস, আফ্রিকার উত্তরাংশ-মিশর থেকে মরক্কো পর্যন্ত আর লেবানন থেকে আরব ভূখণ্ড পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন কনস্ট্যানটিনোপল-ইস্তাম্বুলের তুর্কী সুলতান।

আঠারো শতক থেকেই এই তুর্কী সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করেছিল। অস্ট্রিয়া-রাশিয়ার চাপে, নেপোলীয়নীয় ধাক্কায় আর মেটারনিখ ব্যবস্থার আঘাতে তুর্কী সাম্রাজ্য ক্রমশ আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ফরাসি বিপ্লবের স্বাধীনতার বাণী তুর্কী-অধীন ছোট ছোট জাতিগুলোকে উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করে। তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহী হয় সার্বরা। ১৮২৭ সালে তারা সীমিত স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। এরপর স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু করে গ্রীকরা। মেটারনিখ-এর বিরোধিতা করা সত্ত্বেও ফ্রান্স, প্রাশিয়া, ব্রিটেন, রাশিয়ার প্রশ্রয় গ্রীক খ্রীষ্টানরা পেয়েছিল। তারা স্বাধীন হয়ে যায় ১৮৩০ সালে। এরপর স্বাধীন হয় রুমানিয়া ১৮৫৬ সালে।

এইভাবে একের পর এক স্বাধীনতা আন্দোলন আর বল্কান জাতীয়তাবাদের ধাক্কায় ক্রমেই তুরস্ক 'sickman of Europe' এ পরিণত হয়। শুধু খ্রিস্টানরাই নয়, মিশর-আলবেনিয়ার জাগরণও তুরস্কের সমস্যা তৈরি করেছিল। এই সুযোগে রাশিয়া চেয়েছিল তুর্কী সাম্রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করতে। কিন্তু রাশিয়ার এই প্রয়াসে আপত্তি ছিল ইংরেজদের কারণ মিশর হয়ে লোহিতসাগর তীর ধরে ভারতের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যপথ চালু ছিল। তুরস্কের ওপর রুশ আধিপত্যে সেই পথ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। বল্কান অঞ্চলে অস্ট্রিয়া রাশিয়ার প্রাধান্য দেখতে প্রস্তুত ছিল না। ভূমধ্যসাগরে রুশ শক্তিবৃদ্ধি ইতালিরও পছন্দ ছিল না।

কিন্তু গ্রীকচার্চের খ্রিস্টানদের নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাতে রাশিয়া বল্কান অঞ্চলে হাত বাড়াতে ছিল বদ্ধপরিকর। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালিও তাকে বাধা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। এর ফলেই হয়েছিল ১৮৫৪-৫৬-র ক্রিমিয়ার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে হেরেও রাশিয়া নিরস্ত হয়নি। তার মদতক্রমেই বল্কানদের জাতীয় আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৮৭০-এর দশকের বল্কান যুদ্ধের পর বুলগেরিয়া, সার্বিয়া ও মিন্টিনিগ্রো তুর্কী সাম্রাজ্য ভেঙে বেরিয়ে আসে। ১৮৭৮-এর বার্লিন চুক্তিতে এই রাজ্যত্রয়ের পৃথক অস্তিত্ব ইউরোপ মেনে নেয়। তবে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা তুরস্কের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অস্ট্রিয়ার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের স্বার্থসন্ধান যাই হোক না কেন, একদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আর অন্যদিকে রাষ্ট্র-কূটনীতির অভিঘাতে তুরস্ক সাম্রাজ্য দ্রুত ভাঙনের দিকে এগিয়ে যায়। এই ভাঙন সম্পূর্ণ হয় প্রথম মহাযুদ্ধের পর।

৪.১৫ সারসংক্ষেপ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ছিল বৃহৎ জাতিরাষ্ট্র গঠনের যুগ। জাতীয় চেতনা, ঐক্যের চেতনা ইতালি ও জার্মানির রাজ্যগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত গণ আন্দোলন নয়, কূটনীতি ও যুদ্ধের মাধ্যমে

ভিয়েনা ব্যবস্থা ধ্বংস করে ইতালি ও জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হয়। ইতালিতে এই জাতিরাষ্ট্রগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন মাৎসিনি—কাভুর ও গ্যারিবল্ডি। জার্মান ঐক্যের নায়ক ছিলেন বিসমার্ক।

এই পর্বেই আবার জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতাকামী আন্দোলনের প্রবণতা অস্ট্রিয়া ও অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরায়। সুতরাং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একই সঙ্গে ছিল গঠন ও ভাঙনের যুগ।

৪.১৬ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন :

১। ইতালির ঐক্য আন্দোলনে মাৎসিনি, কাভুর ও গ্যারিবল্ডির অবদানের তুলনামূলক আলোচনা করুন। এই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা কি?

২। জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসে বিসমার্ক কিভাবে রক্ত ও লৌহের নীতি প্রয়োগ করেছিলেন? এর নেতিবাচক দিক কি?

৩। উনিশ শতকে কিভাবে অস্ট্রিয়া ও অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দিয়েছিল?

ছোট প্রশ্ন :

১। ইতালির জাতীয় চেতনা উন্মেষের কারণ কি?

২। মাৎসিনির রাজনৈতিক দর্শন কি ছিল?

৩। মাৎসিনির সঙ্গে কাভুরের রাজনীতির তফাৎ কোথায়?

৪। বিসমার্কের রাজনৈতিক ধারণার ব্যাখ্যা করুন।

৫। জার্মানির ঐক্যে জোলভেরিনের ভূমিকা কি ছিল?

৬। জার্মানির ঐক্য আন্দোলনে লিবারালদের অবদান কি?

৭। ''এমস্ টেলিগ্রাম''-এর ঘটনাটি আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। 'কনসিলিয়েটর' কি?

২। ইতালির কয়েকজন জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীর নাম করুন।

৩। উনিশ শতকে ইতালিতে গুপ্তসমিতি কিভাবে গড়ে উঠেছিল?

৪। Risorgimento কি?

৫। ''ইয়ং ইতালি'' কিভাবে গঠিত হয়?

৬। পাদ্রী জিওবার্টি কে?

৭। জুরিখের সন্ধি কেন হয়েছিল?

৮। গ্যারিবল্ডির বাহিনীর নাম কি ছিল?

৯। "Confederation of the Rhine" কাকে বলা হত?

১০। ইউরোপের "Sickaman" কে?

৪.১৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। Bolton King : A History of Italian Unity

২। G. P. Gooch : Germany

৩। G. Barraclough : Rise of Modern Germany

৪। J. Grenville : Europe Reshaped

৫। A. J. P. Taylor : Struggle for Mastery of Europe

৬। A. J. P Taylor : Europe-Gramdeur and Decline

ই. এইচ. আই—৭
ইতিহাসের ঐচ্ছিক পাঠক্রম
পর্যায় ঃ ২৭

একক ১ □ শিল্প-বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের উদ্ভব

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ শিল্প-বিপ্লবের সংজ্ঞা

১.৩ শিল্প-বিপ্লবের সময়

১.৪ শিল্প-বিপ্লবের পটভূমিকা

১.৫ ইংল্যান্ডে কেন শিল্প-বিপ্লব আগে দেখা দিল?

১.৬ শিল্পায়নের দুই পর্ব

১.৭ শিল্প-বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য

১.৮ ইংল্যান্ড ভিন্ন অন্য দেশে শিল্প-বিপ্লব

১.৯ নতুন আবিষ্কার : কৃষিতে বিপ্লব

১.১০ নতুন আবিষ্কার : বস্ত্র-শিল্পে বিপ্লব

১.১১ নতুন আবিষ্কার : যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব

১.১২ শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল ও গুরুত্ব

১.১২.১ নতুন ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা

১.১২.২ নিঃস্ব মানুষের আবির্ভাব ও সমাজতন্ত্রের জন্ম

১.১২.৩ শিল্প-বিপ্লব কি সমাজ-পরিবর্তনে ছেদ এনেছিল?

১.১৩ সারাংশ

১.১৪ অনুশীলনী

১.১৫ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন

- শিল্প-বিপ্লব কাকে বলে, কবে এ বিপ্লব হয়েছিল, কেন হয়েছিল ও তার ফলাফল কী?
- মানব-সভ্যতায় এ বিপ্লবের স্থান কোথায়?
- কেন ইউরোপ বিগত কয়েকশ বছর ধরে পৃথিবীতে এত প্রাধান্য বিস্তার করেছে—তার শক্তির উৎস স্থল কী?
- কেন ইংল্যান্ড শিল্পায়িত আধুনিকতায় বিশ্বে প্রথম?
- কীভাবে শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল থেকে জন্ম নিল সমাজতন্ত্রের দর্শন।

১.১ প্রস্তাবনা

১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব মানুষকে শুনিয়েছিল তিনটি বাণী—স্বাধীনতা (Liberty), সৌভ্রাত্র (Fraternity) এবং সাম্যের (Equality) তিনটি বাণী—মানুষের সমাজ ও মনোবিপ্লবের তিনটি তড়িৎ উপাদান। একই সময়ে—এবং তার আগে ও পরে—ইংল্যান্ডে ঘটছিল আরেক পরিবর্তন। মানুষ—পদার্থ প্রকৃতির অন্তর্নিহিত উদ্দীপনশক্তিকে (energy) একটি সমন্বয়ের মধ্যে এনে এমন সব ক্ষমতার উদ্ভাবন ঘটানো হচ্ছিল যার দ্বারা অনড়কে সচল করা যায়, মন্দ-গতিকে ঝড়ের বেগ দেওয়া যায় এবং স্থবিরকেও স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া যায়। প্রযুক্তিতে বিজ্ঞানকে ব্যবহার (application of science to technology) করে আবিষ্কার করা হচ্ছিল নতুন যন্ত্র ও নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা। আসছিল যন্ত্রায়িত উৎপাদনের (mechanised production) যুগ। মানুষের ও পশুর পেশী শক্তির সীমা, বায়ু ও জলশক্তির অনিশ্চয়তা ইত্যাদি নিয়ে মানুষ অনেকদিন ধরে বিড়ম্বনা ভোগ করছিল। অতএব তার দরকার হচ্ছিল নতুন উত্তোলকের যার উত্তোলন ক্ষমতা বেশি। দরকার হচ্ছিল নতুন যন্ত্রের যার সঞ্চালন ক্ষমতা অধিক। দরকার হচ্ছিল নতুন জ্বালানি (fuel) ও উদ্দীপক শক্তির (energy) যার উচ্চতর তাপ প্রদানের ক্ষমতা বেশি। আর দরকার হচ্ছিল শক্ত ধাতব পাত যা চিরাচরিত কাঠের পাটাতনের থেকে বেশি মজবুত হতে পারে। এই সব প্রয়োজনগুলিকে মিটিয়েছিল ইংল্যান্ডের এবং পরে ইউরোপের অন্যান্য স্থানের ও আমেরিকার শিল্প-বিপ্লব। দীর্ঘকাল ইউরোপ ও পৃথিবী কৃষি-অর্থনীতির উপর নিজের সভ্যতাকে দাঁড় করিয়েছিল। এবার এই কৃষি—অর্থনীতির পাশে আস্তে আস্তে মাথা তুলে দাঁড়াতে লাগল আধুনিক অর্থনীতি—শিল্প অর্থনীতি—যার অনুষঙ্গে গড়ে উঠল নগরায়ণের ধারা, নগরবসতির নতুন বিন্যাস।

আসলে দেখা গেল সমাজ ও অর্থনীতির মধ্যে একসঙ্গে ছয় রকমের পরিবর্তন আসছে যে পরিবর্তনগুলি একটি আরেকটির দ্বারা তাড়িত ও প্রভাবিত—একটির সাথে আরেকটির অঙ্গ-সংযোগ (organic unity) রয়েছে। যেমন, (এক) কৃষিতে ভাঙন—কৃষিমানবের স্থানান্তর গমন—নতুন যন্ত্র প্রয়োগের দ্বারা কৃষিতে নতুন সংস্থান।

এর ফল হল কৃষির আড়ষ্টতা থেকে মনে, শরীরী উপস্থাপনায় ও জীবিকায় সতত চলমান থাকার নতুন ক্ষমতার আবির্ভাব। (দুই) নতুন যন্ত্রের আগমন—নতুন ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা—নতুন শিল্পপতি ও পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভব। এর সঙ্গেই আত্মপ্রকাশ করেছিল নতুন শ্রমিক শ্রেণী, সূচিত হয়েছিল নতুন শ্রমিক আন্দোলনের। এই (এক) আর (দুই) মিলে আনল নতুন পরিবর্তন যাকে বলা যেতে পারে উৎপাদনে নতুন সঞ্চার (new movement)। যন্ত্রের উৎপাদনই মূলত এর জন্যে দায়ী। (তিন) যন্ত্রের সাথে এল নতুন উত্তোলন, নতুন পরিবহন, নতুন সঞ্চারণ। মানুষ জয় করল পেশী শক্তির সীমা, জল ও বায়ু শক্তির অনিশ্চয়তা। (চার) যখনই মানুষ তার সীমাকে অতিক্রম করতে শিখল তখনই তার বন্ধন অসহিষ্ণু মনকে একটি শৃঙ্খলাবোধের মধ্যে রেখে এক নতুন লক্ষ্যে অভিনিবিষ্ট রাখার দরকার হল। এল নতুন জাতীয় অর্থনীতি (New National economy)। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যকে পরিশীলিত নীতির মধ্যে পরিচালিত করার দরকার হল। (তিন) ও (চার) ভাবনার জগতে আনল নতুন পরিবর্তন যাকে বলা যেতে পারে **নয়া নীতি** (New Policies)। (পাঁচ) নতুন উৎপাদন ও বিপণনের জন্য চাই বাজার। আরম্ভ হল বাজার খোঁজার জন্য দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ার চেষ্টা—নতুন সাম্রাজ্য, নতুন উপনিবেশ দখল করার বিশ্বময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। (ছয়) তার সাথে তাল রেখে শুরু হল ব্যাপকভাবে জাতি সম্প্রসারণ (race-expansion)। অর্থাৎ (পাঁচ) ও (ছয়) মিলে দ্বার খুলে দিল এক নতুন পরিবর্তনের যাকে বলা যেতে পারে অভিনব পরস্পর-নির্ভরতা (New interdependence)।

এই প্রারম্ভিক কথাগুলি যদি অনুসরণ করেন তবে আপনাদের শিল্প-বিপ্লব বোঝা সহজ হবে।

আসুন আমরা এবার শিল্প-বিপ্লবের গভীরতর পাঠের দিকে যাই।

১.২ শিল্প-বিপ্লবের সংজ্ঞা

শিল্প-বিপ্লব বলতে বোঝায় একটি দ্রুত পরিবর্তনের ধারা যার দ্বারা হস্তনির্মাণ ব্যবস্থার (handicraft) থেকে উত্তরণ ঘটল যন্ত্র-নির্মাণ ব্যবস্থায় (machine manufacture), কুটির শিল্প (Cottage industry) থেকে উদ্যোগ প্রসারিত হল বড় কারখানা শিল্পে (factory system) এবং শিল্পের চালিকা শক্তি হিসাবে পেশী-শক্তির (muscle power) বিকল্পে দেখা দিল প্রথমে বাষ্প-শক্তি (steam power) এবং পরে বিদ্যুৎ-শক্তি (Electrical power)। এর ফলে কৃষিব্যবস্থার বিপুল পরিবর্তন হল এবং অর্থনীতি যা একসময়ে কৃষিনির্ভর ছিল তা শিল্প-নির্ভর হয়ে পড়ল। নগরায়ণ ত্বরান্বিত হল, নগরে কারখানা-কেন্দ্রিক (factory-centric) নতুন জীবনব্যবস্থা গড়ে উঠল আর তার সাথে তাল মিলিয়ে অসংখ্য নারী-পুরুষ শহুরে কারখানাগুলির চারপাশে সারিবদ্ধ শ্রমিক হিসাবে বস্তির মধ্যে বসতি স্থাপন করল। আত্মপ্রকাশ করল নিম্নগামী জীবনে নিমজ্জমান সর্বহারার দল—প্রলেটারিয়েট—যাদের মুখোমুখি কলকারখানার মালিক পুঁজিপতিরা ক্রমবর্ধমান মুনাফা অর্জনের মধ্য দিয়ে স্ফীত হতে লাগল। এর সাথে বেড়েছিল যোগাযোগ—কৃষির সাথে শিল্পের দেয়ানেয়া—আর অধিক পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে বেড়েছিল বাণিজ্য। বাণিজ্যের সঙ্গে বাড়ল বাজার খোঁজার তাগিদ—সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশ গঠনের নেশা। দেখা দিল ডাক-তার-রেল ব্যবস্থা। সমাজে প্রকট হয়ে উঠল শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্ব। মানুষের বিপন্ন অস্তিত্বকে বুকে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল সমাজ-পরিবর্তনের দাবি। এক মরিয়া-সমাজের পরিবর্তনকামিতা থেকে জন্ম নিল সমাজতন্ত্রের দর্শন।

১.৩ শিল্প-বিপ্লবের সময়

শিল্প-বিপ্লব সম্বন্ধে প্রথম দৃষ্টিগোচর করার চেষ্টা করেন প্রথম দিকের ফরাসী লেখকরা। কিন্তু যিনি প্রথম 'শিল্প-বিপ্লব'—'Industrial Revolution'—শব্দ দুটি একটি অতিদ্রুত বিশেষ অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সূচকরূপে বর্ণনা করেছিলেন তিনি হলেন ঐতিহাসিক **আরনল্ড টয়েনবি** (Arnold Toynbee : 1852-83)। তিনি ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিস্ময়কর গতিকে বোঝানোর জন্য এই অভিধাটি ব্যবহার করেন। এরিক হব্‌সবম (E. J. Hobsbawm) লিখেছেন যে অনেকদিন ধরেই ইংল্যান্ডে শিল্পোন্নতি-জনিত অর্থনৈতিক প্রসার চলছিল। ১৮২০-র দশকের আগে ফরাসী ও ইংরাজ সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীরা এ ঘটনার সম্যক চরিত্রটি বুঝতে পারেননি এবং ১৮৩০-এর দশকের আগে, আরও শানিত করে বললে ১৮৪০-এর দশকের আগে—বিরাট কোন শিল্প পরিবর্তনের প্রভাব ইংল্যান্ডের বাইরে ইউরোপীয় মহাদেশে বা তার বাইরে বৃহত্তর পৃথিবীতে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। মোটামুটিভাবে ফরাসী দেশে রাজনৈতিক বিপ্লবের কথা ও প্রভাবকে মাথায় রেখে সমকালীন আরেকটি দ্রুত অলক্ষ্যচারী পরিবর্তনকে বোঝানোর জন্য বিপ্লব শব্দটি বুদ্ধিজীবীদের চিন্তায় আসা-যাওয়া করছিল। অবশেষে আরনল্ড টয়েনবির (Arnold Toynbee) আলোচনার সূত্র ধরে এই অভিধাটি সার্বিক ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন করে। তবে শিল্প-বিপ্লবের কবে শুরু এবং কবে শেষ এ নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন ঐক্যমত ঐতিহাসিকদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। জনৈক জার্মান অর্থনীতিবিদ **অধ্যাপক হফ্‌ম্যান** (Professor W. Hoffman) ইংল্যান্ডের শিল্পোন্নতির পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে বলেছেন যে বার্ষিক শতাংশ হারে ('annual percentage rate') ১৭৮০ সালে ইংল্যান্ডের একক উন্নয়ন সর্বপ্রথম দুই-এর বেশি হল অর্থাৎ সমহারে উন্নয়নের দ্বিগুণ হল এবং এই মাত্রায় তা স্থির ছিল প্রায় শতাব্দীকাল। এই পরিসংখ্যান তত্ত্বকে মাথায় রেখে বিখ্যাত ঐতিহাসিক **ফিলিস ডিন** (Phyllis Deane) লিখলেন 'তাহলে আধুনিক প্রথা হচ্ছে প্রথম শিল্প-বিপ্লবের ১৭৮০-র দশকে সূচিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া কারণ সেই সময় থেকে ব্রিটিশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ঊর্ধ্বগতি দেখা যায়' (The current convention then is to date the first industrial revolution from the 1780's when the statistics of British international trade show a significant upward movement')। এই ধরনের উন্নয়নের কথা ভেবেই **অধ্যাপক রস্টো** (Professor W. Rostow) বলেছেন যে ইংল্যান্ডে নিশ্চিত শিল্পোন্নতির অধ্যায়টি ছিল ১৭৮৩ থেকে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দ যে সময়কে তিনি বলেছেন 'আধুনিক সমাজগুলির জীবনে বড় জল-বিভাজিকা' (the great watershed in the life of modern Societies')। এই সময়ের মধ্যেই সুনিশ্চিত নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের উত্তর ('take off into sustained growth') হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন। অধ্যাপক রস্টোর বিপরীত কোটিতে দাঁড়িয়েছিলেন **অধ্যাপক নেফ** (Professor Nef)। তাঁর মতে রানি প্রথম এলিজাবেথের সময়ে যে ধনতান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থা গড়ে উঠছিল তার মধ্যেই লুকিয়েছিল শিল্প-বিপ্লবের ভ্রূণ। এইভাবে অধ্যাপক নেফ সূচনার প্রান্তসীমাকে কয়েক শতাব্দী পেছনে ঠেলে দিলেন আর অধ্যাপক রস্টো তাকে সঙ্কুচিত করে দিলেন নাটকীয় বিকাশের কয়েক দশকের মধ্যে। মোটামুটিভাবে আমরা আমাদের আলোচনায় এসব কথা মাথায় রেখেও অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকেই আমাদের আলোচনার কাল ধরে নেব।

১.৪ শিল্প-বিপ্লবের পটভূমিকা

শিল্প-বিপ্লবের একটি নিশ্চিত পটভূমিকা ছিল। এই পটভূমিকার আদিসীমা ষোড়শ শতাব্দী। ঐতিহাসিক এল. সি. এ. নোলস্ (L.C.A. Knowles) লিখেছেন যে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মৌলিকত্ব ও দ্রুততার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে উনিশ শতকের সঙ্গে তুলনা করা চলে শুধুমাত্র ষোড়শ শতাব্দীর। এই শেষোক্ত শতাব্দীতেই প্রথম সামুদ্রিক ও বাণিজ্যিক আবিষ্কারের ফলাফল বিশেষভাবে অনুভূত হতে থাকে। ভারতবর্ষ ও দুই আমেরিকার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হওয়ার সাফল্যের সাথে আত্মপ্রকাশ করল নতুন বাণিজ্যের উদ্ভাবন, নতুন সমুদ্রযাত্রী নাবিকের হাত ধরে এল নতুন বণিক, নতুন উপনিবেশ গড়ার স্বপ্ন, নতুন দুনিয়ার ধন—সোনারূপা, ফসল ও মানবশক্তিকে লুঠ করে নেওয়ার বেপরোয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জাতিতে-জাতিতে লড়াই, নবলব্ধ পুঁজির ঘনীভবন আর তার প্রভাবে শিল্পোদ্যোগের নয়া প্রচেষ্টা। ইউরোপ যুক্ত হল বিশ্বের সঙ্গে, বিশ্ব উন্মুক্ত হল ইউরোপের কাছে। এদিকে মহাদেশের ভেতরে হাজার বছরের পুরনো প্রতিষ্ঠান সামন্ততন্ত্র জীর্ণ হতে শুরু করল। সার্ফ ব্যবস্থা ভেঙে যেতে লাগল। গ্রামাঞ্চলের মানবশক্তি-চুয়ে চুয়ে শহরে আসতে লাগল। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইউরোপের সবদেশের প্রতিক্রিয়া এক ছিল না। পর্তুগাল ও স্পেন প্রথম পর্বের দুই সামুদ্রিক শক্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল নয়া দুনিয়ার সম্পদ। পর্তুগাল পূর্বদিকের সাম্রাজ্য আর মূল্যবান মশলা-বাণিজ্য থেকে আহৃত সম্পদ নিয়ে তৃপ্ত রইল। স্পেন মগ্ন রইল তার নববিশ্ব (New world) এবং দক্ষিণ আমেরিকার রৌপ্য খনিগুলি নিয়ে। প্রথম পর্বের এই দুই ক্যাথলিক শক্তি তাদের আহৃত সম্পদকে যতখানি ভোগের মধ্যে অপচয়িত করেছিল ততখানি অভ্যন্তরীণ উদ্ভাবনশীল সংগঠনের কাজে ব্যবহার করতে পারেনি। অচিরেই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখা দিল দুটি প্রটেস্ট্যান্ট রাজ্য—ইংল্যান্ড ও হল্যান্ড। এই দুই রাজ্য পূর্বতন প্রতিদ্বন্দ্বীদের সামুদ্রিক আধিপত্য ভেঙে দিল। উত্তর আমেরিকায় ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠা করল নিজের উপনিবেশ। ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেন ও পর্তুগাল বিশ্বসম্পদকে হাজির করেছিল ইউরোপের দরজায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে সেই কাজ করল হল্যান্ড। এই শতাব্দীতে বিশ্ববাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠল আমস্টারডাম (Amsterdam)। ঐতিহাসিকের ভাষায়—"Amsterdam was the exchange place of Europe"। এইবার ওলন্দাজদের অনুকরণ করতে লাগল ইংরাজরা। আঠারো শতকে তারাই হয়ে উঠল প্রধান।

দুটি কথা এখানে লক্ষণীয়। এক, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি হ্যাপস্‌বার্গ সাম্রাজ্য একটি বড় শক্তি হলেও সামুদ্রিক বাণিজ্যে এবং বিশ্বসম্পদ ভাগ-বাটোয়ারার ক্ষেত্রে কোন সুবিধা করতে পারেনি। আঠারো শতকে ফ্রান্স, ইংল্যান্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও তার অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় কাঠামো ইংল্যান্ডের মতো সবল ছিল না। ফলে বিশ্বসাম্রাজ্যের প্রতিযোগী হিসাবে ফ্রান্স ছিল ইংল্যান্ডের দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বী। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে শিল্প-বিপ্লবের উদ্‌যাপনের মুহূর্তের ছবিটি তাই হয়ে উঠেছিল খুব সরল। সনাতন দুই বাণিজ্যিক শক্তি স্পেন ও পর্তুগালের বিশ্বসম্পদকে ভাগ করে নেওয়ার আর কোন ক্ষমতা ছিল না। দক্ষিণ আমেরিকার রৌপ্যখনি নিঃশেষিত হয়েছিল। পূর্ব দিকে মশলাবাণিজ্যও আর অত্যাশ্চর্য মুনাফার জন্ম দিতে পারছিল না। ওলন্দাজরা সপ্তদশ শতাব্দীর উদ্দীপনাকে

আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারেনি। ফ্রান্স সারা আঠারো শতক ধরে রাষ্ট্রিক ব্যর্থতার ক্ষয়ে যাচ্ছিল এবং অবশেষে এক মহাদেশ কাঁপানো বিপ্লবের মধ্যে তার ব্যর্থ অস্তিত্বের গ্লানিকে মুছে দেবার চেষ্টা করল। শুধু ইংল্যান্ডই ছিল সজাগ টানটান একটি দেশ যে তরুণ সাম্রাজ্যবাদী উদ্দীপনায় বিশ্বের রসদ ভাণ্ডারকে উজাড় করে আনতে পারত। ফলে স্বাভাবিক নিয়মে ইংল্যান্ডই হল শিল্প-বিপ্লবের অগ্রণী দেশ। এ কথার অর্থ এই নয় যে, যে—দেশ বাণিজ্যিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পেরেছিল সেই দেশই শিল্প-বিপ্লব ঘটানোর গরিমা অর্জন করেছিল। শিল্প-বিপ্লব একটি দেশের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া মাত্র, সে দেশের সমাজ-সংগঠন, মানবমন ও অর্থনীতির মধ্যে পুঁজিশ্রম ও সংগঠনের প্রকৃষ্ট স্থিতিস্থাপকতা ও পারস্পরিক সংশ্লেষ এবং দেওয়া-নেওয়ার ভারসাম্যের উপর তা নির্ভর করে। বিশ্ববাণিজ্য একটি দেশকে দেয় কাঁচামালের সংস্থান, বাজার, শ্রমের যোগান ও পুঁজি আর দেয় তার নিজের সমাজের মানুষদের এক বড় কর্মক্ষেত্র, অর্থবিনিয়োগের সুবিধা। ইংল্যান্ড তার অভ্যন্তরীণ সংস্থান আর বহির্বাণিজ্যের মেলবন্ধন ঘটাতে পেরেছিল। তাই ইংল্যান্ডেই শিল্প-বিপ্লব সবচেয়ে আগে দেখা দেয়।

১.৫ ইংল্যান্ডে কেন শিল্প-বিপ্লব আগে দেখা দিল?

এটি আপাতভাবে ইতিহাসের একটি বিস্ময় যে ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্প-বিপ্লব হল, ফ্রান্সে হল না। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স ছিল একটি শিল্পোন্নত দেশ। তার জনসংখ্যাও ছিল বিপুল। উত্তর আমেরিকায় তার উপনিবেশও ছিল কানাডা থেকে লুইসিয়ানা (Louisiana) পর্যন্ত বিস্তৃত। আঠারো শতকে ভারতবর্ষে ও পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (West Indies) ফ্রান্সের অগ্রগতিও খারাপ ছিল না। দেশে জনসংখ্যা বেশি থাকায় দেশের শিল্প দেশের ভেতরেই তার বাজারকে খুঁজে পেয়েছিল। তাছাড়া পুঁজির অভাবও ফ্রান্সে ছিল না। কৃষকরা জমি কিনছিল। এর থেকেই বোঝা যায় যে পুঁজির অনুপস্থিতি জনিত সুস্থিতির অভাব কৃষিজগতে পরিলক্ষিত হয়নি। তাছাড়া ফ্রান্সের ছিল এক প্রসারশীল সামুদ্রিক বাণিজ্য যার ফলে তার আমদানি-রপ্তানির মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হয়নি। পুঁজি শ্রম বাণিজ্য বাজার—এক কথায় অর্থনীতির প্রধান দিকগুলি পর্যাপ্ত থাকায় ফ্রান্সের উৎপাদন কখনো নিম্নাভিমুখী হয়নি। স্বদেশ ও বিদেশের বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে উৎপাদনকে অনায়াসেই বাড়ানো যায়, এ ক্ষমতা ফ্রান্সের ছিল।

তবুও ফ্রান্সে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হল না—হল ইংল্যান্ডে। ১৭৮০ থেকে ১৭৯০-এর মধ্যে ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা ছিল ৯০ লক্ষ (ইংরাজি পরিভাষায় ৯ মিলিয়ন), কিন্তু শুধু ১৭৮৯ সালেই ফ্রান্সের জনসংখ্যা ছিল ২৬০ লক্ষ (ইংরাজি পরিভাষায় ২৬ মিলিয়ন)। ইংল্যান্ডে এই জনসংখ্যাগত অসুবিধার মধ্যে জন্ম নিল শিল্প-বিপ্লবের প্রথম প্রেরণা যা ফ্রান্সে অধিক জনসংখ্যার মধ্যে রইল অনুপস্থিত। ইংল্যান্ডের সামুদ্রিক উদ্যোগের ফলে বহির্বাণিজ্য বাড়ছিল। তার ফলে বাড়ছিল পণ্যের তাগিদ, বাড়ছিল শিল্পের উপর নতুন চাহিদা। শিল্পচাহিদা পূরণ করতে হলে চাই পুঁজি, শ্রম ও সংগঠন। পুঁজি ও সংগঠন ছিল। শ্রম কোথায়? ফ্রান্সে ২৬০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত শ্রম ছিল যাকে প্রয়োজনে গার্হস্থ্য শিল্পের চাহিদা মেটাতে ব্যবহার করা যেত। কিন্তু ইংল্যান্ডে ৯০ লক্ষ মানুষের মধ্যে উদ্বৃত্ত শ্রমের যোগান প্রায় ছিল না বললেই হয়। ৪০০ লক্ষ পাউন্ড স্টারলিং-এর [ইংরাজি পরিভাষায় £ 40 million] মূল্যের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় মানবশক্তি ফ্রান্সে ছিল ২৬০ লক্ষ অধিবাসী। ইংল্যান্ডে ঠিক একই সময়ে ৩২০ লক্ষ [£320] পাউন্ড স্টার্লিং-এর বহির্বাণিজ্যের জন্য

ছিল মাত্র ৯০ লক্ষ মানুষ যাদের মধ্য থেকে উদ্বৃত্ত গার্হস্থ্য শ্রমের (domestic labours) যোগান ছিল প্রায় অসম্ভব। শ্রমের অভাবে যা পূরণ করা সম্ভব নয় যন্ত্রের অভাবে ইংল্যান্ড তা পূরণ করতে চাইল। এইখানেই দেখা দিল যন্ত্র উদ্ভাবনের প্রেরণা, আসল প্রযুক্তি উন্নয়নের ধ্যান, বিজ্ঞানকে ব্যবহার করার চেষ্টা হল কারিগরিতে। বিজ্ঞান ব্যবহৃত হল প্রযুক্তিতে (application of science of technology), আর প্রযুক্তি ব্যবহৃত হতে লাগল উৎপাদনে। শিল্প-বিপ্লবের প্রাথমিক শর্ত প্রতিপালিত হল।

উপরের আলোচনায় একথা কখনো বলা হয়নি যে আঠারো শতকে ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা বাড়েনি বা জনসংখ্যার অভাবই ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লবের প্রধান কারণ। ফিলিস ডিন দেখিয়েছেন যে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা থমকে ছিল, স্থির হয়েছিল ৬০ লক্ষের কাছাকাছি কোন সংখ্যায়। ১৭৪১-১৭৫১-র দশকে তা ৩$\frac{১}{২}$ শতাংশ বাড়ে, ১৭৫১-১৭৬১ তে বাড়ে ৭ শতাংশ, ১৭৮০-র দশকে ১০ শতাংশ, ১৭৯০ এর দশকে ১১ শতাংশ এবং অবশেষে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তা বেড়ে হয় ১৬ শতাংশে। উন্নয়নশীল শিল্পের জন্য দরকার হয় গতিশীল মানবশক্তি, স্থিতিশীল সমাজ ও বিস্তারশীল পুঁজি। বহির্বাণিজ্য থেকে আসছিল পুঁজি, দেশের ভেতরে আত্মপ্রকাশ করছিল শ্রমের বিস্ফারিত উৎস। ফিলিস ডিন (Phyllis Deane) একেই 'জনশক্তির বিপ্লব' (Demographic Revolution) বলেছেন। এই বিপ্লবের হাত ধরে এসেছিল আরও তিনটি বিপ্লব। ফিলিস ডিন-এর ভাষায় 'কৃষি বিপ্লব', 'বাণিজ্য বিপ্লব' এবং 'পরিবহন বিপ্লব'। এই সমস্ত ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবন, উন্নয়নের ত্বরান্বিত গতি, মানুষ ও বস্তুর দ্রুত স্থান থেকে স্থানান্তরে গমনের ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে শিল্পায়নের সহায়ক শক্তি হিসাবে তারা আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিল।

ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করার আরও একটা বড় কারণ হল লোহা ব্যবহারের বিস্তার ও লোহা শিল্পের অগ্রগতি। লোহাকে না গলালে তাকে ব্যবহারযোগ্য করা যায় না, আর লোহা গলানোর জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানির কয়লা ইংল্যান্ডে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। কয়লাকে বলা হত গলানোর জন্য প্রয়োজনীয় 'সবচেয়ে সুলভ শক্তির মৌল উপাদান'। এই উপাদান ইংল্যান্ডে খুব বেশি ছিল। লোহা ও কয়লার খনিগুলি ছিল খুব কাছাকাছি এবং অনেক জায়গায় পাশাপাশি। ওয়েলস্ (Wales), নর্দাম্বারল্যান্ড (Northumberland) এবং স্কটল্যান্ডে (Scotland) এইসব খনিগুলি অবস্থিত ছিল। ফলে নিষ্পন্ন দ্রব্যকে (finished goods) স্থানান্তরে নেওয়া কঠিন হত না। কয়লা ও লোহার সহযোগে ইংল্যান্ডে দেখা দিল 'যান্ত্রিক কারখানা ব্যবস্থা' ('mechanized factory system')। যার ফলে ন্যূনতম সময়ে ন্যূনতম খরচে এবং ন্যূনতম শ্রমের ব্যবহারের ফলে উন্নতমানের বিপুল পরিমাণ পণ্যের উৎপাদন সম্ভব হল। আর এই উৎপাদনকে তার বহির্বাণিজ্যের নিষ্কাশন পথে মহাদেশের ও সমুদ্রপারের বাজারে চালান করে দেওয়া যেত। এদিকে দেশের ভেতরে বড় কারখানার চারপাশে—ব্রিটেনের মধ্য অঞ্চলের (British Midlands), শেফিল্ড, ইয়র্কশায়ার প্রভৃতি দেশে পেরেক, কাঁটা, ছুরি, ক্ষুর, কাঁচি, চামচ, হাতা ও পাত্র ইত্যাদি ছোট ছোট ধাতব অস্ত্রের ও দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রী তৈরির কারুশালা (workshops) গড়ে উঠল। এর ফলে শ্রমিকের জীবিকা ও অন্নের সংস্থান হল। শিল্পোদ্যোগের এই প্রথম পর্যায়ে ইংল্যান্ডের উপনিবেশগুলি থেকে আসত কাঁচামাল আর সেখানে ইংল্যান্ড বিক্রী করত তার উৎপন্ন দ্রব্য (finished products)। নিজের শক্তি প্রয়োগ করে ইংল্যান্ড উপনিবেশের কাঁচামাল কিনত সস্তায় আর নিজের দেশের তৈরি উৎপন্ন মাল বিক্রী করত চড়া দামে। এই সস্তায় কেনা ও চড়া দামে বিক্রী করার নীতি

(Buying cheap and selling dear) যখন ইংল্যান্ড বহির্দেশে প্রয়োগ করছে তখন ইংল্যান্ডই ছিল একমাত্র যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার দেশ **যে দেশ বিশ্ববাজারের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিল একমাত্র উৎপাদক জাতি হিসাবে**। হবসবমেব (Hobsbawm) ভাষায় 'a world market largely monopolized by a single producing nation'। এরকম দেশই তার উৎপাদনকারী ও আন্তেপ্রেনিয়রদের দিতে পারে তাদের উদ্যোগের পুরস্কার মুনাফা। এখানে মনে রাখতে হবে যে, ১৭৯৩ সাল থেকে ১৮১৫ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত মহাদেশীয় যুদ্ধগুলিই ছিল ইউরোপে শেষ ইঙ্গ-ফরাসী লড়াই। তারপর থেকে আমেরিকা ছাড়া অন্য কোন স্থানে ইংল্যান্ডের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। ("In effect the wars of 1793-1815, the last and decisive phase of century's Anglo Franch duel, virtually eliminated all rivals from the non-European world, except to some extent the young USA"—Eric Hobsbawm)। এইভাবে একমাত্র উৎপাদনকারী দেশ, যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা, অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্ববণিক এই তিন শক্তির মাত্রাকে একত্রিত করে ইংল্যান্ড দখল করে নিল উন্মোচনশীল এক বিশ্ববাজার। ইংল্যান্ডের শিল্প-বিপ্লবের রথে পড়ল যুগান্তরের পরিবর্তনশীল বিশ্ব শক্তির টান।

উপরের আলোচনা থেকে যে কথাটি স্পষ্ট হল তা এই রকম। ইংল্যান্ডে কেন শিল্প-বিপ্লব হল তা নিয়ে দুরকম ভাবনা দেখা যায়। প্রথম ভাবনা হল যে শিল্প-বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় দুটি উপকরণ—লোহা আর কয়লা ইংল্যান্ডে যথেষ্ট ছিল এবং এই দুই উপকরণকে কাজে লাগিয়ে শিল্পায়ন ঘটানোর মতো অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও সমাজমন ইংল্যান্ডে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এই ভাবনার পাশে আছে আরেকটি ভাবনা। তা হল এই যে সমস্ত উপাদান ও আনুষঙ্গিক সাংগঠনিকতা বিন্যাস সত্ত্বেও ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লব হত না যদি কিনা তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ ধরে বিশ্ববিস্তার, বিশ্বের বাজার দখল ও উপনিবেশের কাঁচামালের উপর খবরদারি করার ক্ষমতা না থাকত। আসলে এই দুই ভাবনাই একে অন্যের পরিপূরক। একটি ঘটনাকে অন্য ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে শিল্প-বিপ্লবের প্রকৃত চরিত্র বোঝা যায় না। এরপর ধ্রুপদী ঐতিহাসিক নোলস্ এর [L.C.A. Knowles, *The Industrial and Commercial Revolutions in Great Britain during the Nineteenth Century*] একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হল। এই উদ্ধৃতির মধ্যে নিহিত রয়েছে ইংল্যান্ডে কেন প্রথম শিল্প-বিপ্লব হল তার সংক্ষিপ্ত মীমাংসা।

"The reasons for the development of the industrial revolution in Great Britain well that she had a ready command of capital, a scarcity of hands, large and expanding markets, a free population, political security, a training in large scale business for over-seas markets, case of access to those markets through her geographical position and her shipping, while his iron and coal fields provided her with the most valuable raw material and motive power for machinery and for iron something." তাহলে দেখা যাচ্ছে পুঁজি, বাজার ও রসদের উপর আধিপত্য একদিকে, অন্যদিকে জনশক্তির অভাব, জনমনের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা গভীরভাবে শিল্পায়নের পশ্চাৎ শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল। এর কোনটির অভাব হলে ইংল্যান্ড শিল্পায়নে অগ্রসর হতে পারত না।

১.৬ শিল্পায়নের দুই পর্ব

দুটি পর্বে ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লব ঘটেছিল। একপর্বে সড়ক পথে, নদী ও খালের মাধ্যমে, নৌকায় ও

পালতোলা জাহাজে পণ্যসামগ্রী চলা ফেরা করত। পরের অধ্যায় যন্ত্রের বিস্তার ঘটল বিপুলভাবে। বাষ্পশক্তির ব্যবহার হতে লাগল, রেলব্যবস্থা ও বাষ্পযানের আবির্ভাব ঘটল। বাষ্পপোত, টেলিগ্রাফ ও রেলব্যবস্থা পণ্যের আনা-নেওয়াকে সহজ করল, যোগাযোগকে সরল করল, বিশ্ববাজার দখলকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে এল। তার সাথে তাল রেখে শ্রমের বিন্যাস ও বিভাজন এবং ব্যবসায়িক সংগঠন পরিবর্তিত হল প্রথমে স্থানীয় পর্যায়ে, পরে আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে এবং সর্বশেষে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। বাষ্পশক্তিকে প্রয়োগের দ্বারা প্রযুক্তির পরিবর্তনও দুটি পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৮৩০-এর দশকের আগে বাষ্পশক্তিকে শুধু উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হত। ডেভিড টমসন জানিয়েছেন যে ১৮৩০ সালের পর থেকে বাষ্পশক্তিকে যানবাহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতে লাগল। এরপর থেকে আসতে লাগল বড় মাপের বিস্ময়কর সামাজিক পরিবর্তন। আসল বড় মূলধনি উদ্যোগ, ট্রেড ইউনিয়ন, শহর প্রশাসনের জন্য পৌরসভা। এসব সত্ত্বেও শিল্প-বিপ্লবের গতি ও তার প্রারম্ভিকতা (earliness) নিয়ে কোন অতিরঞ্জন থাকা ঠিক নয়। ১৮১৫ সাল নাগাদ ও ইংল্যান্ডের শিল্প শ্রমিকদের একটি ক্ষুদ্র অংশ বড় বড় কারখানায় (factory) কাজ করত এবং বেশির ভাগ মানুষও তখন নগরায়িত জীবন যাপন করতে শেখেনি। ফ্রান্সেও শিল্প এককগুলি বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত ছোট ছোট ছিল। একথা জানিয়ে ডেভিড থম্পসন (David Thompson, Europe since Napoleon) বলেছেন যে পূর্ব ইউরোপে শিল্পায়ন হয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে। ইউরোপে বড় শহরের সার্বিক আবির্ভাব হয়েছিল ১৮৭০ সালের পর। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সূচনাকালে ইউরোপের একটি দেশের অর্থনীতি শিল্পায়িত হয়েছিল। তা হল ইংল্যান্ডের অর্থনীতি। ১৮৫০ সাল নাগাদ লক্ষ করা গিয়েছিল যে স্পেন, পর্তুগাল, স্ক্যান্ডেনেভিয়া, সুইজারল্যান্ড ও বলকান অঞ্চল মিলিয়ে ১০০ মাইল রেললাইন ইউরোপে পাতা হয়েছিল। তার অর্থ হল যে ১৮৫০ সালের আগে এক ইংল্যান্ড ছাড়া বড় মাপের শিল্পায়ন ইউরোপে আর কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। অর্থাৎ বৃহত্তর অর্থে ইউরোপীয় শিল্প-বিপ্লব উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ঘটনা, যদিও ১৮৩০-এর দশকে আমেরিকায় ও ১৮৪০-এর দশকে জার্মানিতে শিল্পায়নের প্রারম্ভিক প্রকাশ দেখা গিয়েছিল।

১.৭ শিল্প-বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য

শিল্প-বিপ্লবের প্রথম পর্বের বৈশিষ্ট্য হল যে তা ইংল্যান্ডের অর্থনীতিকে এবং তার সমাজ জীবনকে শিল্পায়িত করে দিয়ে ১৭৫০ থেকে ১৮৫০-এর মধ্যে বিশ্বকোষ রচয়িতারা যাকে বলেছেন 'ব্রিটেন' নামে একটি সর্বাধিক আধুনিক রাষ্ট্রের আবির্ভাবকে সূচিত করেছিল। আর তা করতে গিয়ে পরিবর্তনের কয়েকটি পর্যায়কে তা চিহ্নিত করেছিল। প্রাক্ শিল্পায়িত সমাজে বেশিরভাগ বস্তু উৎপন্ন হত বাড়ির ভেতরে, ছোট কারখানায় বা কারুশালায় (workshops)। আর তা হত ছোটখাটো শ্রমবিভাজনের মধ্য দিয়ে, মানুষের শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করে, পশুর পেশী শক্তির উপর নির্ভর করে। হাতযন্ত্র (Hand tools) ব্যবহার করে উৎপাদন করা হত। শিল্প-বিপ্লব ভিন্নতর উৎপাদন বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে এল। শ্রমের বদলে এল যন্ত্র, কারুশালার বদলে এল বড় ফ্যাক্টরি, পেশীশক্তি ও বায়ুশক্তির বদলে এল প্রথমে বাষ্প এবং পরে বিদ্যুৎশক্তি। জ্বালানি হিসাবে কাঠের বদলে এল কয়লা, ভারবাহিতার আধার হিসাবে কাঠের বিকল্প হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল লোহা। এইভাবে কৃষি ও হাতশস্ত্র অর্থনীতির রূপান্তর ঘটল শিল্প প্রধান যান্ত্রিক নির্মাণ অর্থনীতিতে (industry and machine manufacture

economy)। এই রূপান্তরের কতগুলি নিশ্চিত বৈশিষ্ট্য ছিল যাকে শুধুমাত্র প্রযুক্তিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগ (application of science to technology) বললে ভুল হবে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি আর মানুষ এই ত্রিশক্তির সমন্বিত পরিবর্তন ঘটছিল। এই পরিবর্তনের যদি একটি পর্যালোচনা করা যায় তবে শিল্প-বিপ্লবের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা পাই।

(এক) নতুন মৌল উপাদান (new basic materials) লোহা আর ইস্পাতের অবাধ ব্যবহার।

(দুই) নতুন উদ্দীপনা সম্পদ (new energy resources) জ্বালানি ও সঞ্চালক শক্তির (fuel and motive power) ব্যবহার। এর মধ্যে আছে কয়লা, বাষ্পীয় শকট (steam engine) বিদ্যুৎ, পেট্রোলিয়ম ও গ্যাস এবং অভ্যন্তর—দাহ্য যন্ত্র (internal combustible engine)।

(তিন) 'স্পিনিং জেনি' (Spining jenny) ও শক্তি চালিত তাঁত (power loom) ইত্যাদির মতন দ্রুত সঞ্চালনশীল যন্ত্র যার দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম মানবশক্তি (human energy) ও পশুশক্তিকে কাজে লাগিয়ে অনেক বেশি, অনেক দ্রুত ও অনেক উচ্চমানের পণ্য উৎপাদন করা যায়।

(চার) কাজের একটি নতুন সংগঠন, যাকে বলা হয় ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার দিকগুলি হল নগর কেন্দ্রিকতা, বৃহৎ কারখানার আত্মপ্রকাশ, অধিকতর শ্রমিক নিয়োগ, শ্রমের নবনব বিভাজন, কাজের বিশেষিকরণ (specialization), পরিবহন ও যোগাযোগের নতুন উন্নয়ন, বাষ্পশক্তির অধিকতর ব্যবহার, পুঁজির ঘনীভবন, ঘিঞ্জি বস্তির আবির্ভাব, শ্রমিক জীবনমানের অবনতি এবং এ সবের মধ্য দিয়ে ব্যাপক উৎপাদনবৃদ্ধি এবং শ্রমিক শোষণের মধ্য দিয়ে আগ্রাসী মুনাফালাভের বেপরোয়া তৎপরতা।

(পাঁচ) দ্রুত নগরায়ণ, শ্রমিক শ্রেণীর উত্থান, নতুন শাসনতন্ত্রের আবির্ভাব যার ফলে বংশভিত্তিক শাসন (dynastic rule) উঠে গিয়ে সমাজভিত্তিক শাসন (communitarian rule) আত্মপ্রকাশ করল এবং পুরনো দিনের অবসানে জনগণ 'প্রজা' থেকে হল 'নাগরিক'।

(ছয়) শ্রমিকরা দক্ষ ও অদক্ষে ভাগ হয়ে গেল। নতুন ও বিশেষিত দক্ষতা (new and distinctive skills) নিয়ে আবির্ভূত শ্রমিকের কাজ ও কাজের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক বদলে গেল। হাত ব্যবহারকারী কারিগর (craftsman) থেকে তারা পরিবর্তিত হল যন্ত্রবিদ (machine operator) তথা এক নৈর্ব্যক্তিক এককে (impersonal unit) পরিণত হল।

(সাত) মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক মানবিকতার পরিবর্তে পুঁজি বিনিয়োগ ও শ্রম প্রয়োগের নিরিখে বিচার করা আর্থিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিরূপিত হতে লাগল। অর্থাৎ ব্যক্তিগত দেওয়া-নেওয়ার সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন খসে গেল।

উপরে বর্ণিত কোন পরিবর্তনই সম্ভব হত না যদি না লোহা ও কয়লার অঙ্গাঙ্গী ব্যবহার না বাড়ত এবং তার সাথে পাল্লা দিয়ে যানবাহন ও যোগাযোগ, এক কথায় পণ্য ও চিন্তার পরিবহন না বাড়ত। আঠারো শতকে ইংল্যান্ড জলকে শক্তি হিসাবে এবং বায়ুকে সঞ্চালক হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বায়ু ছিল অনিশ্চিত, জলও ছিল সর্বৈব নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তা শুকিয়ে যেত, স্ফীত হয়ে বন্যা হত, জমে গিয়ে বরফ হত।

শিল্প-বিপ্লব জল ও বায়ুর বিকল্প হিসাবে এনে দিল বাষ্পশক্তি—বিস্ময়করভাবে স্বচ্ছন্দ একটি শক্তি যা অনিশ্চিত নয়, শুকিয়ে যায় না বা জমে না। সঞ্চালক শক্তি হিসাবে বাষ্পের ব্যবহার (use of steam as a motive power) শিল্প-বিপ্লবের একটি অনবদ্য বৈশিষ্ট্য। এর দ্বারা উৎপাদনে শ্রমের পৌনঃপুনিক প্রয়োগ বন্ধ হল, মানুষের কায়িক ক্ষয় রোধ হল, মানুষের টেনে নেওয়ার ও উত্তোলনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেল, ফলে শ্রমনিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির (Labour-intensive productive process) হ্রাস পেল এবং পশুশক্তির উপর নির্ভরতা কমে গেল। অর্থাৎ এর পর থেকে যে কোন শক্তিকে (energy) একটি নিশ্চিত সঞ্চালক শক্তিতে (motive power) রূপান্তরিত করার ক্ষমতা মানুষের করায়ত্ত হল। এর আগে অন্য কোন শক্তি, যেমন জল ও বায়ু এতখানি রূপান্তরযোগ্য (transferable) ছিল না। জলকে বাষ্পীভূত করতে হলে চাই জ্বালানি সেটা হল কয়লা। আবার বাষ্পশক্তির চাপ সহ্য করতে পারে এই রকম মজবুত পদার্থের প্রয়োজন হল। কাঠ পচনশীল ও নরম। তাই এল লোহার ব্যবহার। লোহা যখন এল তখন মানুষের উৎখনন— শক্তি ও পণ্য পরিবহন ক্ষমতা বাড়ল। ভাবুন পশুর পিঠে বা নৌকায় মাল আর অন্যদিকে লোহা দিয়ে নির্মিত বিরাট জাহাজ বা শকটে মাল—কোনটির ভারবহন ক্ষমতা বেশি। আবার তুলনা করুন কাঠকয়লার চুল্লি (charcoal furnace) ও বাতচুল্লি (Blast furnace) কার তাপপ্রদান জনিত বিগলন ক্ষমতা বেশি। এই অতিরিক্ত ক্ষমতাই মানুষের দক্ষতাকে বাড়িয়ে তার সভ্যতাকে ঊর্ধ্বমুখী করবে।

১.৮ ইংল্যান্ড-ভিন্ন অন্য দেশে শিল্প-বিপ্লব

ইংল্যান্ড ভিন্ন অন্য দেশে শিল্প-বিপ্লব দেরিতে এসেছিল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিকে নিয়ে যে হ্যাপসবার্গ (Hapsburg) সাম্রাজ্য তা উনিশ শতকে অর্থনীতিগতভাবে একটি শক্তিশালী দেশ ছিল না। এই দেশে ছিল এগারটি প্রধান জাতি (races), দশটি প্রধান ভাষা এবং তেইশটি আইন প্রণয়নকারী সংস্থা [পঠিতব্য seton Watson, German, Slav and Magyar, p. 10]। অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরি উভয় দেশের সরকারের লক্ষ্য ছিল তাদের প্রজাবর্গের মনে উদগত জাতীয়তাবাদের ভাবধারাকে প্রশমিত রেখে সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্যকে স্থির রাখা। এই রাষ্ট্রিক কাঠামো অবিসংবাদিত দুর্বলতাকে কাটাতে না পারায় অস্ট্রিয়া বা হাঙ্গেরি কেউই কৃষি, শিল্প বা বাণিজ্যে কোন প্রসারশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে তাদের অর্থনীতিও সবল ছিল না। শিল্পায়নে নতুন উড়ান (take off) তাদের সম্ভব ছিল না।

ফ্রান্স কয়লা সম্ভারে ছিল দুর্বল, আর হল্যান্ডে কয়লা ছিল না। কয়লা না থাকায় সেখানে শিল্পায়নের ধারা ব্যাহত হয়েছিল। এবং পাশাপাশি আমেরিকা বা জার্মানিতে উৎকৃষ্ট কয়লা পাওয়া যেত বলে তাদের শিল্পায়নের পথে যেতে অসুবিধা হয়নি। ফ্রান্স দীর্ঘদিন ধরে মানববিদ্যা ও কলাবিদ্যায় উন্নতি করেছিল। ফলে তার কারু ও কলা শিল্প সভ্যতার মূল্যবান উপকরণ হিসাবে উচ্চ দামে বিক্রয় হত। ফলে ফরাসীদের মানসিকতায় কারিগরি উদ্ভাবনের স্পৃহা ছিল কম। তাছাড়া কলা শিল্প-সামগ্রীর কদর হত তার নিজস্ব গুণমানের উপর তার ফলে এই ধরনের সামগ্রীর রাশিকৃত উৎপাদন (mass production) সম্ভব ছিল না। ফলে আধুনিক শিল্পায়িত উৎপাদনে রাশিকৃত পণ্যের সম্ভার তৈরি করা, তার বিপণনের জন্য বাজার খোঁজা, তার উৎপাদনের জন্য মৌল যন্ত্র তৈরি করা—এর কোনটির দিকে ঝোঁকই ফ্রান্স দেখাতে পারেনি। ফলে ইংল্যান্ডের অনেক আগে থেকে অগ্রসরশীল শিল্প সত্ত্বেও ১৯১৪ সালের আগে ইংল্যান্ডের সমকক্ষ পূর্ণ শিল্পব্যবস্থা ফ্রান্স গড়ে তুলতে পারেনি।

তাছাড়া ফ্রান্সে জনসংখ্যা বেশি থাকায় উদ্বৃত্ত শ্রমের ভাণ্ডার তার ছিল। ফলে শ্রমের অভাব তাকে কখনো ভুগতে হয়নি। অতএব শ্রমের বিকল্প যন্ত্রের উদ্ভাবনের কথা সে ভাবেনি। রাশিয়াতে বেশির ভাগ মানুষ থাকত শহরের বাইরে। সেখানে জারতন্ত্রের নিরঙ্কুশ শাসন ও শোষণে রাষ্ট্রের উদ্যোগ ছাড়া মানুষের ব্যক্তি পর্যায়ে বা সমাজ পর্যায়ে কোন শিল্পোৎসাহ গড়ে উঠতে পারেনি। উনিশ শতকের শেষে ফ্রান্সের পুঁজির বিনিয়োগ হতে থাকে রাশিয়াতে। তার পর থেকে ১৮৯০-১৯১৪ এই সময়ের মধ্যে রাশিয়াতে শিল্পায়ন দেখা দেয়। রাশিয়াতে ১৮৫৫ সালে মোট জনসংখ্যা ছিল ৬০,০০০০০০ বা ছয় কোটি। এর মধ্যে ৪০,০০০০০০ বা চার কোটি ছিল সার্ফ। সমস্ত দেশ দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষে ডুবে ছিল। ফলে শিল্প-বিপ্লবের প্রয়োজনীয় পরিবেশ রাশিয়াতে ছিল না।

ইউরোপের শিল্প-বিপ্লবের আলোচনা করতে গেলে স্মরণ রাখতে হবে যে সেখানে সমস্ত মহাদেশ জুড়ে যেখানে যেখানে লোহা আর কয়লা খনি ছিল ঠিক সেখানে বা তার সংলগ্ন স্থানেই এক বিরাট জনবসতির রেখা গড়ে উঠেছিল। গবেষকরা দেখেছেন যে এই খনিরেখা (line of mines) এবং বিস্ফারিত জনবন্ধনী (broad population belt) শুরু হয়েছিল স্কটল্যান্ডে এবং ব্যাপ্ত হয়েছিল মহাদেশের মধ্য পর্যন্ত। সেখান থেকে ভাগ হয়ে একটি শাখা দক্ষিণে চলে যায়, আরেকটি শাখা রয়ে যায় উত্তরের শাখা রূপে। এই উত্তরের শাখার শুরুর বিন্দু হল গ্লাসগো। সেখান থেকে শুরু হয়ে ইংল্যান্ডের ভেতর দিয়ে খনি ও জনবসতির এই বন্ধনী চলে যায় বেলজিয়াম ও উত্তর ফ্রান্সে। তারপর রাইন-অঞ্চল, সার উপত্যকা (Saar valley) হয়ে ওয়েস্টফ্যালিয়া (Westphalia), স্যাক্সনি (Saxony) ও সাইলেশিয়া (Silesia) স্পর্শ করে রাশিয়ার ডনেজ (Donetz) উপত্যকা পর্যন্ত প্রবহমান এই রেখা। খনি রেখার সঙ্গে যুগলমিলনে যে জনবসতির ক্ষেত্র গড়ে ওঠে সেই ক্ষেত্র বরাবর শিল্প-বিপ্লবের অক্ষরেখা তৈরি হয়েছিল। তার উপরেই স্থাপিত হয়েছিল সমস্ত নির্মাণ-শিল্প। এইভাবে প্রকৃতির দেওয়া ক্ষেত্রের উপরই শিল্পায়নের অভ্যুদয় ঘটেছিল। কয়লা আর লোহার ক্ষেত্রগুলি বরাবর এইভাবে জনবসতি গড়ে ওঠা কোন আধুনিক ঘটনা নয়, বরং সভ্যতার অনেক পুরানো ব্যাপার। কিন্তু যখন যন্ত্র আবিষ্কার হতে লাগল তখন উৎখননের জন্য জনশক্তির যোগান সংলগ্ন জনবসতিগুলি থেকে আসতে লাগল। যন্ত্রচালকের কাজ সম্পন্ন করার জন্য মানবশ্রমের চাহিদা পূরণ করেছিল মহাদেশময় সুনিশ্চিত জনবসতির অক্ষরেখা।

১.৯ নতুন আবিষ্কার : কৃষিতে বিপ্লব

শিল্প-বিপ্লবকে বলা হয় নীরবে সংঘটিত একটি ঘটনা। এর প্রস্তুতি চলছিল অনেক দিন ধরে। রেনেশাঁস মানুষের মনকে যুক্তিবাদী করে তাকে ফিরিয়ে এনেছিল পরলোক থেকে ঐহিকতার দিকে। ঐহিকতার মধ্যে লুকিয়ে থাকে প্রত্যক্ষের দাবি, প্রতিনিয়তের চাহিদা, আর তার পরিপূরণের আকাঙ্ক্ষা। ফলে মানব প্রকৃতির সহজ নিয়মে শুরু হল রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যার চর্চা, গণিতের বিচার, বলবিদ্যার প্রাথমিক পাঠ। ইতিমধ্যে আবিষ্কার হল মুদ্রাযন্ত্রের, জ্ঞানের বিস্তার সহজ হল। গবেষণা করার, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার, মাপজোক করার, হিসাব-নিকাশ করার একটি প্রবণতা আরম্ভ হল। কিছু লোক প্রশ্ন করতে লাগল চাষবাস ও কৃষিজগতের বিভিন্ন রীতিনীতির, কারণ তখন কৃষিই ছিল মানুষের সবচেয়ে বড় শিল্প। ১৭০১ সালে **জেথরো টুল** (Jethro Tull) গভীরভাবে মাটি খননের একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন যার দ্বারা মাটির ভেতর অনেকখানি কেটে বীজবপন করা যেত।

জমিকে নতুনভাবে চাষ করার একটি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হল। লর্ড টাউনশেন্ড (Lord Townshend) পর্যায়ক্রমে শস্য চাষ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। জেথরো টুলের নয়া চাষ পদ্ধতি এবং টাউনশেন্ডের শস্যের পর্যায়ক্রম চাষ (rotation of crops) কৃষিকাজের নতুন দিগন্ত খুলে দিল। এদিকে কৃষিকাজের প্রকরণ নিয়েও ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছিল। হকাম-নিবাসী জনৈক কোক (Coke of Holkham) নতুন কৃষি প্রকরণ তৈরি করেন। জেথরো টুল সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের (১৬৭৪-১৭৪১) মানুষ। তিনি লক্ষ করলেন যে বীজবপনের সনাতন প্রক্রিয়াটি হল হাতে করে বীজ নিয়ে হাওয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া। ইংরাজি ভাষায় তাকে বলা হত *broadcasting handfuls on to the land*। এই পদ্ধতিতে বীজ ইতস্তত মাটিতে ছড়াত এবং অনেক বীজ নষ্ট হত। জেথরো টুল সরলরেখায় মাটি কেটে সারিবদ্ধভাবে (in rows) বীজধান উৎপাদনের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করলেন। শুধু তাই নয় ঘোড়া দিয়ে লাঙল চাষের ব্যবস্থাতেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। এর ফলে শস্য ক্ষেত্রের আগাছা ও পরগাছা সব বিনষ্ট হত এবং জমি পরিষ্কার থাকত। জেথরো টুলের সমবয়সী ছিলেন লর্ড টাউনশেন্ড (১৬৭৪-১৭৩৮)। তিনি দেখালেন যে একই জমিতে প্রতিবছর একই শস্য চাষ করলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়। তাই তিনি নিজের ক্ষেতে পর্যায়ক্রমে একবছর গম, পরের বছর শালগম, তৃতীয় বছর ওটস্ বা বার্লি এবং চতুর্থ বছর ক্লোভার (clover) বা সেই জাতীয় অন্য শস্য চাষ করে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করলেন। তিনি দেখালেন যে গমের পর যে শুধু শাল গমই চাষ করতে হবে তা নয়, শালগমের মতো শিকড় আছে এইরকম যে কোন শস্যের চাষ করা যাবে। এইভাবে চার বছরে চার শস্যের পর্যায়ক্রমে (four-crop rotation) থাকলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয় না। গম জমি থেকে অনেক রসদ শুষে নেয় ফলে জমি নিঃশেষিত হয়। কিন্তু শালগম এতটা নেয় না। বরং শালগম চাষ করার সময়ে জমিকে পরিষ্কার করে নিতে হয়। তাতে আগাছা জমির ক্ষতিসাধন করতে পারে না। শুধু তাই নয়, শালগম জাতীয় ফসল শীতকালে পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হত। ফলে শীতকালে পশুদের বাঁচিয়ে রাখা আরও সহজতর হল। ইতিপূর্বে শীতের প্রারম্ভে অনেক পশুকে হত্যা করা হত কারণ তাদের বাঁচিয়ে রাখা যাবে না বলে। এখন আর তার প্রয়োজন হল না। এর পর থেকে সারা বছর তাজা মাংস পাওয়া সম্ভব হল। তার ফলে ইংরাজদের খাদ্য ব্যবস্থা বদলে গেল। লর্ড টাউনশেন্ডের ব্যবস্থা যে সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র সমানভাবে গৃহীত হয়েছিল তা নয়। তখনও একটা চাষের পর জমিকে অলসভাবে ফেলে রাখার (fallowing) প্রথা চলছিল। প্রথম প্রথম কৃষকরা আপত্তি করলেও পরে পর্যায়ক্রমে শস্যচাষের নীতি তারা মেনে নিয়েছিল এবং তার ফলে ইংল্যান্ডের কৃষি-অর্থনীতি সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভর হয়ে পড়েছিল।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে রবার্ট বেকওয়েল (১৭২৫-১৭৯৫) গার্হস্থ্য পশু প্রজনন (stockbreeding) ও পশুপালনের নতুন পদ্ধতি প্রচলন করেন। আগে মেষ প্রজননে বাছাবাছি করা হত না। রবার্ট বেকওয়েল (Robert Bakewell) বিশেষ বিশেষ মেষ বেছে নিয়ে প্রজননের ব্যবস্থা করান। এর ফলে উৎকৃষ্ট লোম ও সুস্বাস্থ্যসম্পন্ন মেষের জন্ম হতে লাগল। গবাদি পশুর ক্ষেত্রে তিনি সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। ১৭৫০ নাগাদ সে কাজ করেছিলেন চার্লস ও রবার্ট কোলিং (Charles and Robert Colling)। তাঁরা শর্ট হর্ণ (shorthorns) বা ছোট শিং বিশিষ্ট এক ধরনের গবাদি পশুর প্রজনন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই শর্ট হর্ণ গরুর দুধ ও মাংস ইংল্যান্ডের খাদ্যাভ্যাসকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। নতুন যে সমস্ত যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হয়েছিল তা দিয়ে চাষ করতে গেলে বড় জমির দরকার হয়। ফলে ছোট ছোট জমিকে একসঙ্গে রেখে

একটি সংলগ্ন বড় অঞ্চলকে ঘিরে ফেলার প্রবণতা দেখা দিল। এই ঘিরে ফেলাকে বলা হত এনক্লোজার (Enclosure)। এই সময়ে শহরে ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। অনেক দরিদ্র কৃষক নিজেদের জমিজমা বিক্রী করে মজুর হিসাবে শহরে চলে যাচ্ছিল। তাদের জমিগুলিকে একত্রিত করে বড় জমিতে পরিণত করে যন্ত্রায়িত কৃষির (mechanized farming) জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছিল।

১.১০ নতুন আবিষ্কার : বস্ত্রশিল্পে বিপ্লব

বস্ত্রশিল্পে উৎপাদনে দুটি ভাগ ছিল—সুতো কাটা (spining) এবং তাঁত বোনা (weaving)। তিন ভাবে এই দুই কাজ সম্পন্ন হত—(১) কোন বাড়িতে একটি ছোট যন্ত্র বসিয়ে একটি পরিবারের দু-একজন গেরস্থালি কর্মের মতো তা সম্পাদন করতে পারত; (২) একটি বাড়িতে (house) বেশ কিছু ছোট বড় যন্ত্র বসিয়ে দু-চারটি পরিবার বা এক এলাকার কিছু মানুষ সে কাজ করতে পারত। এই দুই কাজের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য ছিল না কারণ এই উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হত হস্তচালিত যন্ত্র। শুধু তফাত ছিল পুঁজির বিনিয়োগে ও শ্রমের যোগানে যার দ্বারা কাজের কিছু গতিবৃদ্ধি হত। (৩) তৃতীয় পদ্ধতি হল তাঁতযন্ত্রে শক্তি (power) প্রয়োগ করে কাজের গতি বাড়ানো, সময় সঙ্কোচন করা এবং উৎপাদন চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের বিকল্প গড়ে তোলা। তাঁত বোনায় বিপ্লব এনেছিলেন ১৭৬৪ সালে **জেমস হারগ্রিভস** (James Hargreaves)। তিনি **স্পিনিং জেনি** (Spinning jenny) নামে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন যার মধ্যে আটটি **স্পিন্ডল** (Spindle) বা তকলি থাকত। এর দ্বারা ছোট ছোট শলাকার (rod) সাথে লাগিয়ে ভিন্ন ভিন্ন অনেক আঁশকে (yarn) ঘূর্ণায়মান রেখে একসঙ্গে অনেক সুতো কাটা যেত। এর দ্বারা আঁশ বা সুতোর আড়াআড়ি প্যাঁচও (wefts) সম্ভব হল। এরপর ১৭৬৮ সালে আবিষ্কৃত হল **রিচার্ড আর্করাইটের** (Richard Arkwright) জল বা **ওয়াটার ফ্রেম** (water frame)। আড়াআড়িভাবে নিবন্ধ সুতোকে (warps) তাঁত যন্ত্রে বাঁধার এটি ছিল অভিনব পদ্ধতি। ১৭৭২ সালে ডার্বিশায়ারের (Derbyshire) অন্তর্গত ক্রমফোর্ড (Cromford) নামক স্থানে তিনি যে কল (mill) স্থাপন করেছিলেন সেখানে তিনি জল শক্তির দ্বারা তাঁর যন্ত্রচালনার ব্যবস্থা করেন। এই দুই যন্ত্রই ধীরে ধীরে বাতিল হয়ে গেল যখন ১৭৭৯ সালে (মতান্তরে ১৭৭৫ সালে) **স্যামুয়েল ক্রম্পটন** (Samuel Crompton) **স্পিনিং মিউল** (Spinning Mule) নামে নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। পূর্বতন যন্ত্রগুলির বিজ্ঞান ও নক্‌শাকে কাজে লাগিয়ে এই মিউল তৈরি হয়েছিল। ক্রম্পটনের জীবনকাল ১৭৫৩ থেকে ১৮২৭। অতএব তিনি অপেক্ষাকৃত পরের প্রজন্মের মানুষ। হারগ্রিভসের 'জেনি' এবং আর্করাইটের জল ফ্রেমের যে সুতো বের হত সে সুতো ছিল মোটা এবং কর্কশ। ১৭৭৯ সালে তিনি **হল-ইথ উড হুইল** (Hall-i'th Wood Wheel) বলে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন (তাঁর তন্তুবায় পিতা মাতার সঙ্গে শৈশবে যে বাড়িতে তিনি থাকতেন তার নাম ছিল Hall-i'th wood) এই যন্ত্রই পরে **মিউল** নামে বিখ্যাত হয়। এই যন্ত্রে মসলিনের মতো সরু কাপড় বোনা যেত। পরবর্তীকালে ক্যাম্বিক জাতীয় কাপড়ও এযন্ত্রে বোনা হত। হারগ্রিভস্, আর্করাইট ও ক্রম্পটনকে বলা হয় শিল্প-বিপ্লবে বস্ত্রশিল্পের ত্রয়ী। তাঁরা তুলো থেকে সুতো (cotton spining) এবং সুতো থেকে তাঁত বোনা (cotton weaving) শিল্পে বিপ্লব এনে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে লম্বা এবং ছোট উভয় রকম পশমই 'জেনি' এবং 'মিউলে' বোনা হত। ১৮২০ সালের মধ্যে হস্তচালিত যন্ত্রে পশম ও সুতোর কাটার কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সুতো কাটার সাথে বস্ত্রশিল্পে জড়িয়ে থকে বয়ন বা বুননের কাজ (weaving)। ইংল্যান্ডে সুতো কাটা হত প্রচুর, কিন্তু সেই তুলনায় তাঁতি যথেষ্ট সংখ্যায় ছিল না। ফলে দরকার হল এমন যন্ত্রের যে যন্ত্র একজন বা দুজন চালিয়ে বিপুল পরিমাণ কাপড় বুনতে পারবে। ১৭৩৮ সালে **জন কে** (John Kay) **উড়ন্ত মাকু** (Flying Shuttle) আবিষ্কার করে এই সমস্যার মীমাংসা করে দিলেন। এই যন্ত্রে মাকুটি দুটি দড়ির মধ্যে বাঁধা থাকত এবং দ্রুতগতিতে তা যন্ত্রের এদিক থেকে ওদিকে চলাফেরা করতে পারত। একটি হাতলের সাহায্যে তা চালানো হত। এর ফলে বাড়িতে বসেই তাঁতিরা অনায়াসেই অনেক বড় বড় কাপড় অল্প সময়ের মধ্যে বুনে ফেলতে পারত। এর ষাট-সত্তর বছরের মধ্যে **কার্টরাইট, জনসন** এবং **হরকস** (Cartwrigth, Johnson and Horrocks) শতি চালিত বুনন যন্ত্র আবিষ্কার করে কাপড় বোনার শিল্পে বিপ্লব এনে দিলেন। সূতিবস্ত্র শিল্পে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত হস্ততাঁত চালু ছিল। শক্তিচালিত তাঁতে লম্বা পশম (যাকে বলা হত 'উশ'—worsted) বোনা শুরু হয় ১৮২০ থেকে ১৮৩০-এর দশকে। কিন্তু ১৮৫০ থেকে ১৮৬০-এর দশকের আগে পশম ফ্যাক্টরি শিল্প হয়ে উঠতে পারেনি। ১৮৫০-এর দশক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে লিনেন বোনার কাজে শক্তির ব্যবহার যথেষ্ট হয়ে ওঠেনি। লেস এবং হোসিয়ারি শিল্প ফ্যাক্টরি ব্যবস্থার মধ্যে চলে আসে ১৮৪০ থেকে ১৮৮০-র মধ্যে। এই একই সঙ্গে গড়ে ওঠে বস্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত রসায়ন শিল্প।

১.১১ নতুন আবিষ্কার : যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব

শিল্প-বিপ্লবের ফলে রাস্তাঘাট, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছিল। ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ফলে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেই পণ্যসামগ্রীকে বাজারে প্রেরণ করার প্রয়োজন ছিল। আবার সেই পণ্য উৎপাদনের জন্য বাইরের থেকে কাঁচা মালের আমদানি করার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিল। এই পণ্য উৎপাদন-বণ্টন-বিপণনের তাগিদে যানবাহন, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটতে লাগল। **জেমস ওয়াট** (James Watt, ১৭৩৬-১৮১৯) বাষ্পশক্তির মধ্যে চাপ দিয়ে গতিসঞ্চার করার যে ক্ষমতা তাকে ব্যবহার করে বাষ্পীয় পোত (Steam Engine) আবিষ্কার করলেন। তার আগে **নিউকোমেন**-এর (Newcomen) ইঞ্জিন চালু ছিল। ওয়াট যে ইঞ্জিন আবিষ্কার করলেন তাতে একটি পিষ্টনকে (piston) উপরে ও নীচে ঠেলে গতিসঞ্চার করার জন্য বাষ্পশক্তিকে ব্যবহার করা হল। যে বৈজ্ঞানিক নীতির উপর নিউকোমেন-এর ইঞ্জিন চলছিল সেই নীতিকেই জেমস ওয়াট বদলে দিলেন। ১৭৬৫ সালে তিনি এ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। ১১ বছর পরে তাঁর সাফল্য আসে। এর আগে বাষ্প-ইঞ্জিন দিয়ে মাটির নীচ থেকে যেমন খনি থেকে জল তোলা হত। এবার অন্য কাজেও এই ইঞ্জিন ব্যবহার করা শুরু হল। এর কিছু দিনের মধ্যে জেমস ওয়াট আরও জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন। যেমন বিশেষ কালির দ্বারা পুঁথি পত্রের প্রতিলিপি করণ (Duplication by a specially prepared ink), জলের উপাদান কী, তার আবিষ্কার, হাইড্রোমিটারের উদ্ভাবন, জল-মোচড়ক-ঠেলকের (marine screw propeller) আবিষ্কার ইত্যাদি। বৈদ্যুতিক শক্তি মাপার যে একককে (unit) আমরা ওয়াট বলি (যেমন ৬০ ওয়াটের বাল্ব ইত্যাদি) তাও তাঁর নাম থেকে উদ্ভূত।

জেমস ওয়াটের আবিষ্কারের কিছু দিনের মধ্যেই **জর্জ স্টিফেনসন** (George Stephenson, 1781-1848), তাঁর লোকোমোটিভ ইঞ্জিন তৈরি করে ফেললেন। আগে কয়লা বোঝাই সবই ঘোড়ায় টানত। এবার

লোহার লাইন পেতে তার উপর শকট বসিয়ে বাষ্প শক্তির দ্বারা চালানো হল। ১৮১৪ সালে চার মাইল রাস্তা এইভাবে চালানো হল। বাষ্পের উদ্বৃত্ত অংশকে বর্জ্য করে চিমনির মধ্যে দিয়ে বাইরে বের করে দিয়ে ইঞ্জিনের গতিকে বাড়িয়ে তিনি দেখালেন যে বাষ্পশক্তির যে প্রগাঢ় চালক ক্ষমতা আছে তাকে ব্যবহার করে দ্রুত অনেক পরিমাণ পণ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহন করা যায়। ১৮২৫ সালে তাঁর 'লোকোমোশন নং ১" (Locomotion No. 1") স্টকটন-ডার্লিংটন রেলওয়েতে (Stockton-Darlington Railway) চলা শুরু করল। এর চার বছর বাদে তাঁর 'রকেট' লিভারপুল ম্যানচেষ্টার রেল কোম্পানির কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনের পুরস্কার পেল। এর ৫০ বছরের মধ্যে ইংল্যান্ডে ১৫০০০ মাইল রেললাইন পাতা হল।

চক্রযানের সঙ্গে সঙ্গে জলযানের উন্নতি হচ্ছিল। ১৮০৩ সলে আমেরিকার একজন ইঞ্জিনিয়ার **রবার্ট ফুলটন** (Robert Fulton, 1765-1815) **বাষ্প-নাও বা স্টিমবোট** (Steam boat) আবিষ্কার করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তিনি জলে চলার ইঞ্জিনের (marine engine) উদ্ভাবক ছিলেন না, স্টিমবোটের গঠনতন্ত্র বাষ্পশক্তি প্রয়োগের দ্বারা তার ভেতর গতির সঞ্চার এইসবের কৃৎ-কেলিল তিনি দিয়েছিলেন। ১৮০৭ সালে একটি বড় স্টিমবোট তৈরি করে তার নাম দিয়েছিলেন **ক্লেরমন্ট** (Clermont)। ইংল্যান্ডের অন্তর্গত বার্মিংহামের বিখ্যাত **বোল্টন এন্ড ওয়াট** কোম্পানি (Boulton and Watt) তা তৈরি করেছিল। হাডসন নদীতে দেড়শত মাইল রাস্তা এই স্টিমবোট ৩২ ঘণ্টায় অতিক্রম করেছিল। যেমন ১৮২৫ সালে 'লোকোমোশন নং ১' ছিল প্রথম পণ্য ও যাত্রীবাহী রেলশকট। সেইরকম ১৮০৭ সালেই প্রথম পরীক্ষিত হয় জলপথে বাণিজ্যিক স্বার্থে দ্রুতযানের সম্ভাবনা। এর কয়েক বছরের মধ্যেই নদীতে ও উপকূল রেখা ধরে বাষ্পযান বাণিজ্যের পসরা নিয়ে চলাফেরা করতে থাকে। ১৮৩৮ সালে সামুদ্রিক **স্টিমবোট সিরিয়াস** (Sirius) আঠারো দিনে আটলান্টিক অতিক্রম করে।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে সড়কপথও নতুন করে তৈরি হতে থাকে। **ম্যাক অ্যডম** (Mc Adam) গাড়ি চলার জন্য শক্ত রাস্তা তৈরি করার পদ্ধতি আবিষ্কার করে ইংল্যান্ডে পরিবহন বিপ্লব এনে দিলেন। তখনও স্বয়ংক্রিয় মোটর গাড়ি আবিষ্কৃত হয়নি। ঘোড়ায় টানা ভারি গাড়িই তখন চলত। এই নতুন রাস্তাকে বলা হত **ম্যাকাড্যামাইজড্ রোড** (macadamised road)। দেখা গিয়েছিল যে এই রাস্তা তৈরির পর একঘণ্টায় ১৪ মাইল যাওয়া সম্ভব হল।

পরিবহনের সঙ্গে তাল দিয়ে অন্য দূরসংযোগ ব্যবস্থাও গড়ে উঠল। ১৮৪৪ সালে আমেরিকার জনৈক গবেষক **স্যামুয়েল মোরস্** (Samuel Morse, 1791-1872) টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করলেন। এর ফলে একস্থান থেকে আরেকস্থানে তার সংযোগ করে বার্তা প্রেরণ করা সম্ভব হল। প্রথমে যে বার্তা প্রেরিত হয়েছিল তা হল এই—''কী ব্যবস্থা ঈশ্বর করেছেন?" (What hath God Wrought?") বলা হয়ে থাকে যে স্যামুয়েল মোরস্ যা করেছিলেন তা হল ''মহাশূন্যতার মধ্যে কথার সেতু রচনা করা।"—"to bridge space with flying words,"। ১৮৭৬ সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল (Alexander Graham Bell, 1847-1922) টেলিফোন আবিষ্কার করলেন। এইভাবে শুরু হল দূরভাষণের যুগ। শিল্প বিপ্লব নতুন পর্যায়ে উন্নীত হল।

১.১২ শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল ও গুরুত্ব

১.১২.১ (ক) নতুন ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা (The New Factory System)

ইংল্যান্ডের শহরে ও গ্রামে যে কুটির ও গৃহশিল্প (cottage and household industries) ছিল তা আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হয়ে ফ্যাক্টরি ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হল। ছোট ছোট কারুশালার (Small work-shops) বদলে স্থাপিত হল বড় বড় যন্ত্রদ্বারা চালিত মিল (Mill)। ধনী ব্যক্তিরা দুটি জিনিস করতে লাগল—কৃষকদের ফেলে আসা জমি ও গরীবদের পরিত্যক্ত আবাস কিনে নিয়ে সেখানে বড় বাড়ি বা আচ্ছাদন (shed) তৈরি করে যন্ত্রপাতি বসাতে শুরু করল। আর তার সাথে কিনতে লাগল নতুন নতুন কল। কল চালানোর জন্য চাই মানুষ। অতএব এই কলকারখানায় নতুন শ্রমিক নিযুক্ত হতে লাগল। গ্রাম থেকে মানুষ উজাড় করে এল শহরে, ভিড় করতে লাগল কল-কারখানার চারপাশে, আর তার ফলে ঘিঞ্জি জনবসতি বস্তির রূপ নিল। স্বল্প মজুরি দিয়ে মজুরদের শ্রমকে শুষে নিতে লাগল ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা অতিকায় কল-কারখানা ব্যবস্থা। অথচ গ্রামের জীবিকাহীন কৃষক আর ভুখা মানুষদের শহরে যাবার প্রলোভনকে স্থগিত রাখার মতো কোন ব্যবস্থা আর কৃষিজগতে রইল না। সনাতন গিল্ড (Guild) ব্যবস্থা ভেঙে গেল। ছোট ছোট শহর প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। যে শহরে কলকারখানা বেশি ছিল সেখানে মানুষের ভিড় বাড়ল, যেখানে শহরের আয়তন বৃদ্ধি পেল আর সেখানেই মানুষের জীবনমান ক্রমশ নিম্নাভিমুখী হতে লাগল। এদিকে যাদের হাতে পুঁজি ছিল তারা পুঁজির আরও বিনিয়োগ ঘটিয়ে মুনাফা করতে লাগল। যন্ত্র আর পুঁজি হাত ধরাধরি করে চলল। নগরায়ণের অপ্রতিরোধ্য প্রসারের মুখে তলিয়ে যেতে লাগল সরল গ্রাম্যজীবনের ধারা।

মনে রাখতে হবে যে ১৮০০ সালের আগে ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে চালু হয়নি। ফলে নগরায়ণের বিস্ফারিত আত্মবিস্তার তখনও ঘটেনি। তার আগে যে সব যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছিল যেমন মাকু এবং জেনি (shuttles and spinning jennies)। তাদের গার্হস্থ্য শ্রম ও গার্হস্থ্য পরিবেশে চালনা করা যেত। ছোট কারখানা, কারুশালা সবই ছিল তখন পর্যন্ত গার্হস্থ্য ব্যবস্থার অঙ্গ। ফলে এক স্থানে বিপুল শ্রমিকের ভিড় করার দরকার হয়নি। তখন পর্যন্ত যন্ত্রপাতি অতিশয় মূল্যবান না হওয়ার ফলে গৃহস্থ কারিগররা বা সামান্য পুঁজির মালিকরা তা কিনতে পারত এবং পারিবারিক কাঠামোর বহির্ভূত ভাবার কোন অবকাশ ছিল না।

এই পরিবেশ বদলে যেতে লাগল ১৯ শতকের প্রতম সিকিভাগ সময়ের মধ্যে। ১৮৩০-এর পর যখন বাষ্প শক্তিকে উৎপাদন থেকে পরিবহনে ব্যবহার করার উদ্যোগ আরম্ভ হল তখন থেকে যন্ত্রায়নের (mechanization) প্রভাব বাড়তে লাগল। ডেভিড টমসন লিখেছেন যে যন্ত্রায়িত শিল্প আনল নগরায়ণ ও নগরকেন্দ্রিকতা (urbanism)। প্রথমে বস্ত্রশিল্পে এবং পরে কয়লা লোহা ইস্পাত এই ভারী শিল্পে আসল নগর কেন্দ্রিকতা। নতুন যন্ত্র আর নগর-মুখিনতা, নতুন ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা ও নগরায়ণ হয়ে দাঁড়াল নতুন সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য ঘটনা। ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা মানুষের সৃষ্ট ব্যবস্থা। কিন্তু শেষে তা হয়ে দাঁড়াল অতিকায় এক নৈর্ব্যক্তিক শক্তি, অমোঘ ভাবে স্থিতি সংহারক, নিরন্তরভাবে পরিবর্তনের দিকে ঠেলে দেওয়া সভ্যতার নেপথ্যচারী শক্তি।

১.১২.২ নিঃস্ব মানুষের আবির্ভাব ও সমাজতন্ত্রের জন্ম (The coming of destitute humanly and the birth of socialism)

নতুন ফ্যাক্টরি ব্যবস্থায় দরকার হল নতুন শ্রমিকের। গ্রাম থেকে উজাড় করে আসা মানুষ হল এই শ্রমিক। তারা মূলত অদক্ষ শ্রমিক। ফলে তাদের মজুরি ছিল কম, তাদের খাটতে হত অনেক বেশি সময়, তাদের থাকার বাড়িঘর ছিল না, তাদের দিনযাপন ছিল নিঃস্বতম মানুষের মতো। ফলে তাদের সাথে তাদের পরিবার—নারী ও শিশুও দিনরাত মিল আর ফ্যাক্টরিতে খেটে যেত। পুরুষ শ্রমিক থেকে নারী ও শিশুর মজুরি ছিল আরও কম। যারা পুরানো দিনের গার্হস্থ্য কারিগরি ও হাতযন্ত্রে দক্ষ শ্রমিক ছিল তারা তলিয়ে গেল। ডেভিড টমসন লিখেছেন—'In over crowded homes in drab factory towns lived thousand of families, overworked and underpaid, creating a new social problem of immense proportions নিরানন্দময় শিল্প শহরগুলিতে অতিজনাকীর্ণ ঘরে থাকত হাজার হাজার পরিবার। ক্ষমতার অতিরিক্ত শ্রমে ক্লান্ত প্রাপ্য থেকে অনেক কম পারিশ্রমিকে বঞ্চিত এই শ্রমিকেরা এক নতুন বিশাল সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। শ্রমিকদের যখন এই রকম নাভিশ্বাস উঠছিল তখন তাদের নিয়োগকারী মালিকরা কী করছিল? ডেভিড টমসন লিখলেন—Their employers, engaged in fierce competition with rival firms and uncontrolled by any effection legislation, forced conditions of work and wages down to the lowest possible level. Economic life took on a ruthlessness, a spirit of inhumanity and fatalism, that it had not known before—শ্রমিকদের নিয়োগকারী মালিকরা প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মগুলির সঙ্গে হিংস্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হত। কোন কার্যকারী আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না থেকে তারা জবরদস্ত কাজের শর্ত আরোপ করত আর মজুরিকে নামিয়ে নিত তলানিতে। অর্থনৈতিক জীবন এক অমানবিক নির্মমতা গ্রাস করছিল। ভাগ্যের কাছে মানুষ এমনভাবে আত্মসমর্পণ করছিল যা আগে আর দেখা যায়নি। শিল্প-বিপ্লবের ফলে যখন মানব-জীবনের অবনতি ঘটতে লাগল, সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে অসহায়তা ও ক্ষোভ বাড়তে লাগল তখন স্বাভাবিকভাবে তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। কিছু তীক্ষ্ণধী মানুষ প্রশ্ন করতে লাগলেন শিল্পায়নের নেতিবাচক ফল—দারিদ্র্য, জীবনমানের অবনতি, অপরিকল্পিত ঘিঞ্জি বসতি, স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাব ইত্যাদি। তবে যন্ত্রলব্ধ আরামের জন্য শিল্পায়নকে মানুষ কি সত্যি সত্যি আশীর্বাদ বলে ধরে নেবে? তাঁরা দেখালেন যে শিল্পায়নের ফলে কিছু মানুষ ধনী হচ্ছে আর অধিকাংশ মানুষ নিঃস্ব হচ্ছে। শিল্পায়নের সূত্র ধরে উৎপাদন ও পরিবহনের ক্ষমতা যত বাড়ছে ততই বাজার আর কাঁচামালের জন্য হিংস্র লড়াই আরম্ভ হচ্ছে, ততই শ্রমিকরা পণ্যে পরিণত হচ্ছে, সব হারিয়ে তারা নিজেদের শ্রমটুকু বিক্রী করে অসহায় পশুর মতো দিনযাপন করছে। রবার্ট ওয়েন (Robert Owen 1711-1858), কাউন্ট সাঁ-সাইমঁ (Count Saint-Simon 1730-1825), এফ. এম. সি. ফুরিয়ার (F.M.C. Fourier 1772-1837), লুই ব্লাঁ (Louis Blance, 1811-82) ইত্যাদি বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিক স্বার্থের সমাজ উন্নয়নের ও ধনবৈষম্য হ্রাস করার জন্য সরকারের ভূমিকা কী হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এমনকী শ্রমিকদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের প্রতিবাদ ও সংগঠনের কর্মসূচি কী হওয়া প্রয়োজন তাও তাঁরা লিপিবদ্ধ করলেন এবং বাস্তবে প্রচার করার চেষ্টা করলেন। মুনাফালোভী মুষ্টিমেয়র স্বার্থ থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে, পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণ থেকে সমাজের নিয়ন্ত্রণে সমস্ত মৌল হাতিয়ারগুলোকে এনে একটি সুশৃঙ্খল সমাজ

কল্যাণের আদর্শ এইভাবে আত্মপ্রকাশ করল। সমাজ-কল্যাণের এই দর্শনই হল সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের দর্শন সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক রূপ লাভ করে **কার্ল মার্ক্স** (Karl Marx, 1818-83) এবং **ফ্রিড্‌রিশ এঙ্গেলস্**-এর (Friedrich Engels 1820-95) হাতে। কার্ল মার্ক্স তাঁর **ডাস ক্যাপিটাল** (Das Capital) এবং **কমিউনিস্ট ইস্তাহার** (Communist Manifesto) গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন যে এযাবৎকালের সমস্ত প্রচলিত সমাজের ইতিহাসই হল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। তাই তিনি ডাক দিয়েছিলেন 'বিশ্বের শ্রমিক এক হও'। এই ডাকের সাড়ায় বিশ্বময় শ্রমিক জেগে উঠেছে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় লেনিনের (Lenin) নেতৃত্বে বলশেভিক বিপ্লব (Bolshevik Revolution) এই জেগে ওঠারই পরিণতি।

১.১২.৩ শিল্প-বিপ্লব কি সমাজ বিবর্তনে ছেদ এনেছিল?

ইউরোপের ফনটানা অর্থনৈতিক ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ডে (The Fontana Economic History of Europe, Vol.3) ঐতিহাসিক কার্লো এম. চিপোলা (Carlo M. Cipolla—তিনিই এই ফনটানা সিরিজের সাধারণ সম্পাদক) লিখেছেন যে নতুন প্রস্তর যুগের বিপ্লবের পর শিল্প-বিপ্লব ছাড়া আর কোন বিপ্লব নাটকীয়ভাবে এতখানি বৈপ্লবিক ছিল না (....no revolution has been as dramatically revolution as the industrial Revolution except perhaps the Neolithic Revolution.") এই দুই বিপ্লবই ঐতিহাসিক চিপোলার মতে, ইতিহাসের ধারাবাহিক বিবর্তনে ছেদ টেনেছে, ইতিহাসের গতিকে আমূল বদলে দিয়েছে। চিপোলা লিখলেন—"Both these changed the curse of history, so to speak, each one bringing about a discontinuity in the historic process" এক সময়ে মানুষ ছিল বন্যপশু শিকারী, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। যাদের জীবন বিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক হবসের (Hobbes) ভাষায় ছিল 'নিঃসঙ্গ, হীন, নোংরা, হিংস্র ও সংক্ষিপ্ত' ('solitary, poor, nasty, brutish and short')। নব্যপ্রস্তর যুগ (Neolithic age) আসার পর সেই মানুষ স্থিতিশীল হল, কৃষিকাজ শিখল, সমাজ গড়ল এবং কৃষি নির্ভর সভ্যতার সূচনা করল। মানুষের এই কৃষক-রাখাল সভ্যতার থেকে তাকে বের করে আনল শিল্প-বিপ্লব। তাকে করল নৈর্বক্তিক শক্তির দ্বারা চালিত যন্ত্রের পরিচালক—The Industrial Revolution transformed man from a farmer-shephered into a manipulator of machines worked by inanimate energy (Cipolla). প্রথমে বাষ্প, তারপর কয়লা, আরও পরে বিদ্যুৎ এবং শেষ পর্যন্ত আনবিক শক্তি ও খনিজ তেলকে কাজে লাগিয়ে মানুষ সভ্যতার চরিত্র ও গতিকে এমনভাবে বদলে দিয়েছিল যে ১৮ ও ১৯ শতক পূর্বাপর ইতিহাসের এক বৈপ্লবিক ছেদবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে মানুষ শুধু জ্বালানি হিসাবে কাঠ ও উত্তোলক শক্তি হিসাবে পেশীশক্তিকে ব্যবহার করতে জানত শিল্প-বিপ্লব তার হাতে এনে দিল শুধু জ্বালানি কাঠ, কয়লা, তেল—নয়, আরও বড় শক্তি তা হল বিদ্যুৎ। অতীতের সঙ্গে এর যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া ভার।

আসলে এই 'হঠাৎ পরিবর্তন'—sudden transformation-এর যে ধারণা তা আরনল্ড টয়েনবি (Arnold Toynbee) লেখা থেকেই মানুষ ধারণা করেছিল। আজকাল ঐতিহাসিকরা একটু ভিন্ন করে ব্যাপারটি বুঝবার চেষ্টা করেছে। টয়েনবি বলেছেন যে মধ্যযুগের শিল্প জীবনের যে কাঠামো ধীরে ধীরে ভাঙছিল তা অকস্মাৎ বাষ্প-ইঞ্জিন ও শক্তি-চালিত তাঁতযন্ত্রের প্রচণ্ড আঘাতে চুরমার হয়ে গেল—"The slowly dissolving framework of medieval industrial life...was suddenly broken in pieces by the mighty blows of steam engine and the power loom," এ মতকে পাশ কাটিয়ে আধুনিক গবেষকরা বলেন যে

শিল্প-বিপ্লবের একটা প্রস্তুতি দীর্ঘকাল ধরে লোকচক্ষুর আড়ালে একটু একটু করে গড়ে উঠছিল। **ফিলিস ডিন** বলেছেন যে শিল্প-বিপ্লব এসেছিল অন্য নানা বিপ্লবের সংসর্গে, ফলে তার হঠাৎ অভ্যুদয় সম্ভব নয়। ঐতিহাসিক **নেফ** (Nef) বললেন যে গ্রেট ব্রিটেনের শিল্পভাব ব্যাখ্যা করতে হলে বলতে হবে যে তা ষোড়শ শতক থেকে আরম্ভ হয়ে উনিশ শতক পর্যন্ত চলেছিল। অর্থাৎ তিন শতকের ধারাবাহিক কোন ঘটনা পূর্বাপর সম্পর্ক ছিন্ন হতে পারে না। **হার্বার্ট হিটন** (Herbert Heaton) বলেছেন যে টয়েনবির যুগে ১৭৬০-এর আগের ও পরের অধ্যায়কে যত স্পষ্ট করে বোঝা গিয়েছিল তার থেকে আজকাল বৃহত্তর গবেষণার মধ্য দিয়ে আরও স্পষ্ট করে বোঝা যায়। এখন আমরা জানতে পেরেছি যে শিল্প-বিপ্লব হঠাৎ একটা অপরিবর্তনশীল জগৎকে ভেঙে দেয়নি। হঠাৎ সনাতন জগতের পুঁজিবাদী ছোট ছোট উৎপাদন-এককের উপর তা আছড়ে পড়েনি, পরিবর্তনের গতিকে অস্বাভাবিক দ্রুতও করতে পারেনি, আর এমন কথাও ঠিক নয় যে ১৭৬০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে সামাজিক অর্থনৈতিক দুঃসহ জীবনের ছবিই সমস্ত প্রেক্ষা জুড়েছিল।

মনে রাখতে হবে যে শিল্প-বিপ্লব এতটাই ধারাবাহিক যে আজকাল ঐতিহাসিকরা একটার জায়গায় দুটো শিল্প-বিপ্লবের কথা বলেন। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে ১৮৭০এর দশকে শুরুতে শেষ হয়ে যায় 'প্রথম বিপ্লব' (The First Revolution) যা আঠারো শতকের মাঝামাঝি শুরু হয়েছিল। এই বিপ্লবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল ১৮৩০ থেকে ১৮৭১ সাল। এরপর যে অধ্যায় আরম্ভ হল তা শিল্প-বিপ্লবের দ্বিতীয় অধ্যায়। মিকিনের (Meakin) ভাষায় 'নতুন শিল্প-বিপ্লব' (The New Industrial Revolution), আর জিভনস্-এর (Jevons) ভাষায় 'দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লব' (The second Industrial Revolution)। ১৮৭১ থেকে আজ পর্যন্ত শিল্প-বিপ্লবের একটা নতুন ধারা শুরু হয়েছে যেখানে আমেরিকা, জার্মানি ও জাপানের মতো দেশ নতুন বৈজ্ঞানিককে হাতিয়ার করে বিপ্লবের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। আনবিক শক্তির উপর দখল এনে মানুষ এত দ্রুত পরিবর্তনের গতিকে বদলে দিচ্ছে যে তার সাথে তাল রেখে অগ্রসর হওয়া অনেক দেশের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তা বলে একে অতীতের সাথে যোগশূন্য বলে ভাবা যাবে না। ইতিহাসে সব কিছুর পরম্পরা আছে। শিল্প-বিপ্লব এই পরম্পরার বাইরে নয়। সভ্যতার ধারাবাহিকতা নিরন্তর ও অবিচ্ছিন্ন।

১.১৩ সারাংশ

আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে আত্মপ্রকাশ করে দুশো বছরের অধিক সময় ধরে যে বিপ্লব পৃথিবীতে চালু রয়েছে তার কোন অতর্কিত উদ্ভব ঘটতে পারে না। শিল্প-বিপ্লবের আত্মপ্রকাশের কোন অধ্যায়ের দ্রুততা থাকতে পারে কিন্তু তা স্বতঃস্ফূর্ত নয়। টয়েনবি বা চিপোলার মতো ঐতিহাসিকরা এই বিপ্লবের স্বতঃস্ফূর্ততায় এতবেশি মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাকে পূর্বাপর ইতিহাসের মধ্যে একটি 'ছেদ' (Break) বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন। আসলে যা হয়েছিল তা এই। প্রায় ষোড়শ শতাব্দী থেকে একটা সমাজ পরিবর্তনের ফল্গু ধারা জনমানসের পরিবর্তন আনছিল। পুঁজির নতুন সঞ্চয়ে সাহায্য করছিল বহির্বাণিজ্য, অভ্যন্তরীণ গিল্ডগুলি (Guild) আর শ্রম সংগঠনে সাহায্য করতে পারছিল না, গ্রামাঞ্চলে সামন্ততন্ত্রের কাঠামো জীর্ণ হলে জীবিকাচ্যুত অনেক মানুষ শহরে আসছিল। তা সত্ত্বেও জনসংখ্যা কম থাকায় নতুন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিকের যোগান যথেষ্ট ছিল না। ঠিক এই সময় থেকে আসতে শুরু করল বিদেশী বাজারের চাহিদা, মানুষ ঝুঁকে পড়ল যন্ত্র তৈরির দিকে।

এই সময় থেকে পেশীশক্তির সীমা বোঝা যেতে লাগল। মানুষ অনুভব করল যে জল ও বায়ুশক্তিও অনিশ্চিত এবং মানুষের নিয়ন্ত্রণে নেই। তখনই মানুষ জানতে পারল যে বাষ্পের মধ্যে শক্তি অনড়কে সচল করার ক্ষমতা রাখে। আবিষ্কৃত হল বাষ্পীয় ইঞ্জিন। বাষ্পশক্তির চাপকে দিনের পর দিন সহ্য করার মতো ক্ষমতা কাঠের ছিল না। তাছাড়া কাঠের স্থিতিস্থাপকতা থাকলেও তা পচনশীল ছিল। তাই ব্যবহৃত হতে লাগল লোহা আর লোহার পাটাতন। লোহা গলিয়ে তৈরি হল ইস্পাত। এইবার হল জ্বালানির ও শক্তির বিকল্প সন্ধান। কাঠ ও কাঠ-কয়লার স্থানে এল খনি থেকে আহৃত কয়লা। লোহা আর কয়লার ভাণ্ডার যে দেশের আছে সেই দেশ—ইংল্যান্ড—সহজেই হয়ে উঠল পৃথিবীর প্রথম শিল্প-বিপ্লবের দেশ। হল্যান্ডের ও ফ্রান্সের মজুত শক্তি ইংল্যান্ডের সমান ছিল না। তাছাড়া ফ্রান্সের জনশক্তি অনেক বেশি ছিল ফলে শ্রমের যোগান ছিল প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই কারণেই যন্ত্রের প্রয়োজন ইংল্যান্ডে যেভাবে অনুভূত হয়েছিল ফ্রান্সে হয়নি।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে শিল্পায়িত দেশগুলিতে ফ্যাক্টরি ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। শ্রমিকরা নিষ্পেষিত হচ্ছিল বেশি কাজ, কম মজুরি আর বিরতিহীন একঘেয়েমির জাঁতাকলে। নারীরা কোথাও কোথাও তলিয়ে যাচ্ছিল অন্ধ কলকারখানার শ্রমিক হিসাবে। বিবাহিত নারীরা নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিল তাদের স্বামীদের উপার্জনের উপর। আর পরিবারের পর পরিবার শ্রমিক বসতির ঘিঞ্জি পরিবেশে জীবনমানের অবনতি ঘটিয়ে মানবসম্পদের অবক্ষয় ঘটাতে লাগল। এর প্রতিবাদে জেগে উঠল সমাজতন্ত্রের দর্শন।

এইভাবে সমাজের ছবি হয়ে দাঁড়াল দুই বিপরীতের সমাবেশ। একদিকে শ্রমক্লান্ত খেটে খাওয়া মানুষ আর অন্য দিকে মুনাফায় স্ফীত হওয়া ধনিক গোষ্ঠী, যারা পুঁজিপতিরূপে উৎপাদনের চাবুক নিজেদের হাতে রাখত। কার্ল মার্ক্স এদেরই বুর্জোয়া ও প্রলেটারিয়াট বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এই দুই বিরোধী মানুষের শ্রেণীদ্বন্দ্ব শিল্প-বিপ্লবের সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক ঘটনা। একসময় মনে করা হত যে শিল্প-বিপ্লবে সরকারের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় দর্শকের। একথা বলার পেছনে বিশ্বাস ছিল যে সমস্ত উদ্যোগই ছিল বেসরকারি উদ্যোগ ও ব্যক্তিগত পুঁজির ঘনীভবন সম্ভব হয়েছিল এ কথা অনেকদিন বলা হয়নি—আর বলা হয়নি কারণ অনেকদিন ধরেই জনমানসে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে দেশের উন্নতি ঘটেছে অবাধ বাণিজ্যের (free trade) ফলে। কারণ অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) বুঝিয়েছিলেন যে অর্থনীতির পেছনে এক 'অদৃশ্য হাত' (invisible hand) কাজ করে। ফিলিস ডিনের মতন গবেষকরা দেখিয়েছেন যে শিল্প-বিপ্লবের পেছনে অদৃশ্য পরিচালকের হাত অনেক সময়ে দৃশ্যমান ছিল। সরকার একের পর এক শিল্প ও পুঁজি বিনিয়োগ সংক্রান্ত এমন সব আইন খারিজ করে যে আইনগুলি না বাতিল হলে শিল্পায়নের প্রতিবন্ধকতার অবসান হত না। তাছাড়া উনিশ শতকে ইংল্যান্ডে সরকার অনেকবার প্রত্যক্ষভাবে অর্থনীতি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছিল যা শিল্প-বিপ্লবের সহায়ক হয়েছিল। ইংল্যান্ডের সরকার উদাসীন, অনড় ও নিষ্ক্রিয় হলে শিল্প-বিপ্লব হত না।

পরিশেষে একথা মনে রাখতে হবে যে শিল্প-বিপ্লব মোট ছয়টি বড় শিল্প-পরিবর্তনকে বোঝাত। (এক) কয়লা, বিদ্যুৎ, খনিজ তেল, গ্যাস ইত্যাদির আবিষ্কার ও ব্যবহারের ফলে জ্বালানি ও শক্তির নতুন সৃষ্টি জনিত শিল্প-পরিবর্তন, (দুই) লোহা গলানোর দ্বারা মূল আকর থেকে ধাতুকে পৃথক করা (smelting) এবং লোহাকে গলিয়ে তাকে পেটাই করার (iron-founding—এইরূপ কারখানার নাম iron-foundry) ফলে নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পব্যবস্থার উত্থান, (তিন) বাষ্পকে ব্যবহার এমন শক্তির সঞ্চার করা যার দ্বারা অনড়বস্তু সচল হয়—অর্থাৎ

স্থান থেকে স্থানান্তর পরিবহনের ব্যবস্থা হয়। যার থেকে জন্ম হয় পাম্প ও পরিবহন শিল্পের, (চার) বস্ত্রশিল্পের নতুন উদ্ভাবন-জনিত উন্নয়ন এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাসায়নিক শিল্পের (industrial chemistry) আবির্ভাব। কাপড়ের নির্মলকরণ (Bleaching), কাপড়কে রাঙানো (Dyeing), কাপড় ছাপানো (printing) ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নতুন রসায়ন-শিল্পের উদ্ভব; (পাঁচ) ফ্যাক্টরি ব্যবস্থার আবির্ভাব ও (ছয়) সরকারের ভূমিকার পরিবর্তন ও সমাজে যুগপরিবর্তনের মনস্কতা তৈরি হওয়া।

শিল্প-বিপ্লব একটি সামগ্রিক ঘটনা। তাকে খণ্ড করে ভাবা যাবে না।

১.১৪ অনুশীলনী

১. নীচের বক্তব্যগুলির কোনটি ঠিক কোনটি ভুল তা [✓] এবং [×] এই দুই চিহ্নের সাহায্যে উত্তর দিন।

(ক) ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লব সমসাময়িক ঘটনা। [ ]

(খ) শিল্প-বিপ্লবের অর্থ হল প্রযুক্তিতে বিজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োগ। [ ]

(গ) শিল্প-বিপ্লবে যে জ্বালানি (fuel) ও উদ্দীপক শক্তির (energy) ব্যবহার বেশি হয়েছিল তা হল কয়লা, খনিজ তেল, বিদ্যুৎ ও আনবিক শক্তি। [ ]

(ঘ) শিল্প-বিপ্লবের সবচেয়ে বড় ঘটনা হল লোহা, কয়লা ও বাষ্পশক্তির ব্যবহার। [ ]

(ঙ) শিল্প-বিপ্লবের একটি অনিবার্য দান হল ইংল্যান্ডে বস্ত্রশিল্পের আবির্ভাব। [ ]

(চ) শিল্প-বিপ্লব শুধু শিল্পে এসেছিল, কৃষিতে নয়। [ ]

(ছ) শিল্প-বিপ্লব নতুন গতি এনেছিল কিন্তু পুরানো নীতিকে বদলায়নি। [ ]

(জ) ইংল্যান্ডের শিল্প-বিপ্লবে সরকার কোন ভূমিকা গ্রহণ করেনি। [ ]

(ঝ) সমাজতন্ত্র শিল্প-বিপ্লবের দান। [ ]

(ঞ) বাষ্পশক্তির ঠেলে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল। শিল্প-বিপ্লবে এই ক্ষমতার ব্যবহার হয়েছিল। [ ]

(ট) ১৭৬০ সাল থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে শিল্প-বিপ্লবের প্রাথমিক সূচনা হয়েছিল। [ ]

(ঠ) ১৭৮৩ থেকে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দ হল অধ্যাপক রস্টোর মতে 'আধুনিক সমাজগুলির জীবনে বড় জলবিভাজিকা'। [ ]

(ড) কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন যে শিল্প-বিপ্লবের আদি সীমা ষোড়শ শতাব্দী। [ ]

(ঢ) সপ্তদশ শতাব্দীতে আমস্টার্ডম বিশ্ববাণিজ্যের কেন্দ্র হয়েছিল। [ ]

(ণ) শিল্প-বিপ্লবের সময়ে ফ্রান্সের জনসংখ্যা ইংল্যান্ডের জনসংখ্যার চেয়ে কম ছিল না। [ ]

(ত) শিল্প-বিপ্লবের সূচনা কালে ফ্রান্সের জনসংখ্যা এত বেশি ছিল যে তা শিল্প-বিপ্লবের সহায়ক ছিল না। [ ]

(থ) শিল্প-বিপ্লবের সময়ে ইংল্যান্ডে 'কৃষি-বিপ্লব' বা 'যানবাহন বিপ্লব' ঘটেনি। [ ]

(দ) কয়লা ছিল ইংল্যান্ডের 'সবচেয়ে সস্তা শক্তির মৌল উপাদান'। [ ]

(ধ) 'যন্ত্রায়িত কারখানা ব্যবস্থা' প্রাক-শিল্প-বিপ্লব ঘটনা। [ ]

(ন) জনশক্তির অভাব, জনমনের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা গভীরভাবে ইংল্যান্ডের শিল্পায়নের পশ্চাৎ শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল। [ ]

(প) জেথরো টুল ওয়াটার ফ্রেম আবিষ্কার করেন। [ ]

(ফ) রিচার্ড আর্করাইট স্পিনিং মিউল আবিষ্কার করেন। [ ]

(ব) জন কে 'উড়ন্ত মাকু' আবিষ্কার করেন। [ ]

(ভ) জেমস ওয়াট বাষ্প ইঞ্জিন বা বাষ্প পোত আবিষ্কার করেন। [ ]

(ম) রবার্ট ফুলটন বাষ্প-নাও আবিষ্কার করেন। [ ]

২। তিনটি বাক্যে উত্তর দিন

(ক) লোহা আর কয়লার সহযোগে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা কীভাবে হয়েছিল?

(খ) তিনটি উদাহরণ দিয়ে যন্ত্রায়িত উৎপাদনের ব্যাখ্যা দিন।

(গ) শিল্প-বিপ্লবের যে কোন তিনটি নতুন আবিষ্কারের উল্লেখ করুন।

(ঘ) শিল্প-বিপ্লবে নতুন সঞ্চার অর্থাৎ গতি, নতুন ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ নয়া নীতি এবং নতুন সংযোগ অর্থাৎ পরস্পর নির্ভরতার যে পরিবেশ তৈরি করেছিল তার স্বরূপ লিখুন।

(ঙ) শিল্প-বিপ্লবে সরকারের কী ভূমিকা ছিল?

(চ) ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা কী?

(ছ) শিল্প-বিপ্লবের ফলে পুঁজিপতি শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর যে আবির্ভাব ঘটল তার প্রেক্ষিত কী?

(জ) শিল্প-বিপ্লব বস্ত্র-শিল্পের নতুন উদ্ভাবন কী হয়েছিল?

(ঝ) শিল্প-বিপ্লবে বাষ্প শক্তিকে কীভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল?

(ঞ) শিল্প-বিপ্লবের সংজ্ঞা কী?

(ট) আরনল্ড টয়েনবি (Arnold Toynbee) কে? তাঁর বক্তব্য কী?

(ঠ) 'প্রতিপালিত উন্নয়নের ভিতর উড়ান' কী?

(ড) ফিলিস ডিন-এর বক্তব্য কী?

(ঢ) অধ্যাপক রস্টো-র তত্ত্ব কী?

(ণ) অধ্যাপক নেফ-এর মত কী?

(ত) কেন পর্তুগাল ও স্পেন শিল্প-বিপ্লবে অগ্রণী হতে পারল না?

(থ) অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর হ্যাপস্‌বার্গ সাম্রাজ্য কেন বহির্বাণিজ্য ও শিল্প-বিপ্লবে অগ্রণী হতে পারল না?

(দ) ফ্রান্স কেন ইংল্যান্ডকে অতিক্রম করে প্রথম শিল্প-বিপ্লবের দেশ হতে পারল না?

(ধ) ফ্রান্সের জনসংখ্যা কী তার দেশে শিল্প-বিপ্লবের অন্তরায় ছিল?

(ন) লোহা শিল্পের অগ্রগতি ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লবের অন্যতম বনিয়াদ—ব্যাখ্যা করুন।

(প) ইংল্যান্ড বিশ্ববাজারের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিল একমাত্র উৎপাদক জাতি হিসাবে—ব্যাখ্যা করুন।

(ফ) শিল্পায়নের দুটি পর্ব কী?

(ব) শিল্প-বিপ্লব কী ধারাবাহিক ভাবে একটি বিপ্লব?

(ভ) 'স্পিনিং জেনি' কী?

(ম) ইউরোপে যে খনিরেখা ধরে জনবন্ধনী গড়ে উঠেছিল তা বর্ণনা করুন।

(য) 'জেথরো টুল' কে?

(র) হকাম-নিবাসী কোক কী করেছিলেন?

(ল) শিল্প-বিপ্লবের ক্ষেত্রে রবার্ট বেকওয়েল বিখ্যাত কেন?

(ব) স্যামুয়েল ক্রম্পটন কী আবিষ্কার করেছিলেন?

(শ) 'স্পিনিং মিউল' কী?

৩। দশটি বাক্যে উত্তর দিন

(ক) শিল্প-বিপ্লব কী সমাজ বিবর্তনে কোন ছেদ এনেছিল?

(খ) কার্লো এম. চিপোলা কে? শিল্প-বিপ্লবের গুরুত্ব সম্বন্ধে তার মত কী?

(গ) শিল্প-বিপ্লব কী কোন হঠাৎ পরিবর্তন? এ বিষয়ে ফিলিস ডিন ও হার্বাট হিটনের মত কী?

(ঘ) সমাজতন্ত্রের উদ্ভব কীভাবে হয়েছিল?

(ঙ) সমাজতন্ত্রের চারজন দার্শনিকের নাম লিখুন ও তাদের দর্শন আলোচনা করুন।

(চ) নতুন ফ্যাক্টরি ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

(ছ) পরিবহন বিপ্লবের একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করুন।

(জ) শিল্প-বিপ্লব কৃষিতে কী পরিবর্তন এনেছিল?

(ঝ) শিল্প-বিপ্লবের ফলে বস্ত্রশিল্পের কী উন্নতি হয়েছিল?

(ঞ) রাশিয়া, ফ্রান্স ও জার্মানিতে কেন পরে শিল্প-বিপ্লব হয়েছিল?

(ট) শিল্প-বিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করন।

(ঠ) শিল্প-বিপ্লব নিয়ে হবসবম ও ডেভিড টমসনের মতামত আলোচনা করুন।

(ড) সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্ববাণিজ্য ও বিশ্ববাজার—এই তিনের সঙ্গে শিল্প-বিপ্লবের কি কোন যোগ আছে?

(ঢ) ''তবুও ফ্রান্সে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হল না হল— ইংল্যান্ডে''—ব্যাখ্যা করুন।

(ণ) অধ্যাপক হফ্‌ম্যান, অধ্যাপক রস্টো এবং অধ্যাপক নেফ-এর মতামত আলোচনা করুন।

(ত) শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল কী হয়েছিল?

(থ) ''পরিশেষে বলতে হবে যে শিল্প-বিপ্লব ছয়টি বড় শিল্প পরিবর্তনকে বোঝাত।'' এই ছয়টি পরিবর্তন বর্ণনা করুন।

(দ) জেমস ওয়াট, জর্জ স্টিফেনসন ও রবার্ট ফুলটন—এই তিনজনের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

(ধ) শিল্প-বিপ্লবে পেশীশক্তির বিকল্প শক্তি কী এসেছিল? তার দ্বারা শিল্প-বিপ্লব কীভাবে ত্বরান্বিত হল?

(ন) ''মনে রাখতে হবে যে শিল্প-বিপ্লব এতটাই ধারাবাহিক যে আজকাল ঐতিহাসিকরা একটার জায়গায় দুটো শিল্প-বিপ্লবের কথা বলেন''—ব্যাখ্যা করুন।

(প) 'দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লব' বলতে কী বোঝায়?

(ফ) শিল্প-বিপ্লবের ফলে কোন শ্রেণী লাভবান হয়েছিল? কোন শ্রেণীই বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল?

(ব) নতুন শিল্প-বিপ্লব কাকে বলে?

(ভ) ''ইতিহাসে সবকিছুর পরম্পরা আছে। শিল্প-বিপ্লব এই পরম্পরার বাইরে নয়''—বুঝিয়ে বলুন।

৪। শূন্যস্থান পূরণ করুন

(ক) ''প্রযুক্তিকে —— আবিষ্কার করা হচ্ছিল নতুন যন্ত্র ও নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা।''

(খ) ''এবার এই কৃষি অর্থনীতির পাশে আস্তে আস্তে মাথা তুলে দাঁড়াতে লাগল একটি আধুনিক অর্থনীতি ——''

(গ) ''এর সঙ্গেই আত্মপ্রকাশ করেছিল ———, সূচিত হয়েছিল নতুন শ্রমিক আন্দোলনের''।

(ঘ) ''শিল্পের চালিকা শক্তি হিসাবে পেশীশক্তির বিকল্পে দেখা দিল প্রথমে — এবং পরে — ''।

(ঙ) ''আত্মপ্রকাশ করল নিম্নগামী জীবনে ——— প্রলেটারিয়েট''।

(চ) কিন্তু যিনি প্রথম 'শিল্প-বিপ্লব' ('Industrial Revolution') শব্দ দুটি একটি অতিদ্রুত বিশেষ অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সূচকরূপে বর্ণনা করেছিলেন তাঁরা হলেন ————।

(ছ) ''তাঁর (অধ্যাপক নেফ) মতে রানি প্রথম এলিজাবেথের সময়ে যে —— গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে লুকিয়ে ছিল ——।''

(জ) ''এই সময়ের মধ্যেই সুনিশ্চিত ——————— take off into sustained growth' হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন।''

(ঝ) ''এইবার ওলন্দাজদের অনুকরণ করতে লাগল —— আঠারো শতকে তারাই হয়ে উঠল প্রধান''।

(ঞ) ''বিশ্ববাণিজ্য একটি দেশকে দেয় কাঁচামালের সংস্থান, বাজার ——— ও —— আর দেয় তার নিজের সমাজের মানুষদের এক বড় —, — —।''

(ট) ''তবুও ফ্রান্সে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হল না, — —।''

(ঠ) ''৪০০ লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিং-এর (ইংরাজি পরিভাষায় £ 40 million) মূল্যের আমদানির রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য — — — ছিল — — অধিবাসী।''

(ড) ''ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লবে আত্মপ্রকাশ করার আরও একটা বড় কারণ হল — — — ও — — অগ্রগতি''।

(ঢ) ''— বলা হত গলানোর জন্য প্রয়োজনীয় 'সবচেয়ে সস্তা শক্তির মৌল উপাদান।''

(ণ) ''ব্রিটেনের মধ্য অভ্যন্তরের দেশগুলিতে, —, — প্রভৃতি দেশে পেরেক, —, —, —, — চামচ, হাতা, পাত্র ইত্যাদি ছোট ধাতব অস্ত্রের ও দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রী তৈরির কারুশালা গড়ে উঠল।''

(ত) ''এখানে মনে রাখতে হবে যে — সাল — থেকে — সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত মহাদেশীয় যুদ্ধগুলিই ছিল — — ইঙ্গ ফরাসী লড়াই।''

(থ) ''প্রাক-শিল্পায়িত সমাজে বেশির ভাগ বস্তু উৎপন্ন হত — —, ছোট —, বা কারুশালায়।''

(দ) ''জলকে বাষ্পীভূত করতে হলে চাই জ্বালানি —।''

(ধ) ''রাশিয়াতে — সালে মোট জনসংখ্যার ছিল— বা — —।''

(ন) ''— সালে জেথরো — গভীরভাবে মাটি খননের একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন।''

(প) ''— — সরলরেখায় মাটি কেটে সারিবদ্ধভাবে বীজধান উৎপাদনের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করলেন।''

(ফ) ''আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে — — (১৭২৫-১৭৯৫) গার্হস্থ্য পশু প্রজনন ও — — নতুন পদ্ধতি প্রচলন করেন।''

(ব) ''তাঁত বোনায় বিপ্লব এনেছিলেন — সাল — —।''

(ভ) ''... ১৭৭৯ সালে ... — — স্পিনিং মিউল নামে নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করলেন।''

(ম) ''১৭৩৮ সালে — — — মাকু আবিষ্কার করে এই সমস্যার মীমাংসা করে দিলেন।''

১.১৫ গ্রন্থপঞ্জী

কোন সংক্ষিপ্ত পরিসরে শিল্প-বিপ্লবের পাঠ-যোগ্য গ্রন্থতালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। আপনারা যদি শিল্প-বিপ্লবের কোন বিস্তৃত পাঠ চান তবে তিনভাগে তা করতে পারেন। প্রথমভাগে থাকবে সাধারণ পাঠ — শিল্প-বিপ্লবের সূচনা, সময়, বিস্তার সাধারণ চরিত্র ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পাঠ। দ্বিতীয়ভাগে থাকবে অঞ্চল ভিত্তিক আলোচনা, আর তৃতীয়ভাগে শিল্প-ভিত্তিক পর্যালোচনা। পরের পাতায় আমরা গ্রন্থের তালিকা সেইভাবেই সাজিয়ে দিলাম।

সাধারণ পাঠ (General Studies)

Ashton, T.S. *The Industrial Revolution 1760-1830 (rev. ed. 1968).*

Clapham, J.H. *An Economic History of Modern Britain vol. I (1939).*

Deane, Phyllis *The First Industrial Revolution, (Second ed.).*

Deane Phyllis and Cole, W.A. *British Economic Growth 1688-1959 (1961).*

Hobsbawm, E.J. *Industry and Empire : An Economic History of Britain since 1750 (1968).*

The Age of Revolution : Europe 1789-1848.

Knowles, L.C.A *The Industrial and Commercial Revolutions in Great Britain during the Nineteenth century (Reprint of fourth revised edn.)*

সাধারণভাবে ইউরোপের অর্থনৈতিক ইতিহাস পড়তে গেলে পড়তে হয় Carlo M. Cipolla (general Editor) সম্পাদিত The Fontana Economic History of Europe-এর বিভিন্ন খণ্ড। আমাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন এই Fontana series-এর Vol.3 এবং vol.4 বিশেষ করে তৃতীয় খণ্ডে Cipolla-র সম্পাদকীয় মন্তব্য অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া *Encyclopaedia Britannica, Vol.6* (15th edn. Micropaedia) এবং *Collier's Encyclopaedia, vol, 12* অবশ্য পঠিতব্য গ্রন্থ। একটু পুরনো হলেও কাজের বই A.P. Usher, *Economic History of Europe since 1750* (1937). এর সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে অপেক্ষাকৃত পরের বই K. Polanyi, *The great transformation* (published as Origins of our Time in England, 1945)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শিল্প-বিপ্লব নিয়ে যে গবেষণা তা পাওয়া যাবে নীচের বইগুলিতে।

C. Cipolla *The Economic History of World population*

Singer, Holmyard, Hall and Williams, A History of Technology, Vol.IV : The Industrial Revolution 1750-1840 (1958).

W.H. Armytage, A social History of Engineering (1961).

W.T. O'Dea *The Socil History of lighting* (1958).

অঞ্চল ভিত্তিক পাঠ (Regional Studies)

Dod, A.H. *The Industrial Revolution in North Wales* (1933).

Hamilton, H. *The Industrial Revolution in Scotland* (1932).

Mackenzie, K. *The Banking systems of Great Britain, France, Germany and the* USA (1945)

Henderson W.O. *Britain and Industrial Europe 1750-1870* (1954).

The Industrial Revolution on the continent : Germany, France, Russia 1800-1914 (1961).

Goodwin A.(ed.) *The European nobility in the 18th century* (1953).

W. O. Henderson-এর বই দুটিতে চমৎকার পুস্তক তালিকা দেওয়া আছে। মনে রাখতে হবে যে শিল্প-বিপ্লবের উপর বই-এর সংখ্যা বিপুল। তাছাড়া ইউরোপের ইতিহাস সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান না থাকলে শিল্প-বিপ্লব বোঝা যায় না। তাই ইউরোপের ইতিহাস পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় বইয়ের তালিকা সমেত দুটি বই আছে। তাদের নাম নীচে দেওয়া হল। প্রয়োজনে সেগুলি দেখা যেতে পারে।

J. S. Bromley and A Goodwin ed. (Oxford (1956), *A Select List of Works on Europe and Europe Overseas 1715-1815*.

Allan bullock and A.J.P. Taylor ed. (1957), A *Select List of Books on European History 1815-1914*.

শিল্প-পাঠ (Industry Studies)

Ashton, T.S. and Sykes, J., *The Coal Industry of the Eighteenth Century* (1959).

Colemen, D.C. *The British Paper Industry 1495-1860* (1958).

Clow, A. and N.L. *The Chemical Revolution* (1952).

Haber, L.F. *The Chemical Industry during the Nineteenth Century* (1958).

Mathias, P. *The Brewing Industry in England, 1700-1830* (1959).

একক ২ □ সমাজতন্ত্র

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ ফরাসী দর্শন ও সমাজতন্ত্র

২.৪ প্রথম পর্বের কল্পান্তিক সমাজতন্ত্র

২.৫ সমাজতন্ত্রের প্রথম পর্যায়ের বৌদ্ধিক রচনা

২.৬ পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র : কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিয়েডরিশ এঙ্গেলস

২.৭ দ্বান্দ্বিকতা কী?

২.৮ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

২.৯ শ্রেণী-সংগ্রাম তত্ত্ব

২.১০ ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা

২.১১ নৈরাজ্যবাদ

২.১২ সরকার ও সমাজতন্ত্রীদল

২.১৩ সারাংশ

২.১৪ অনুশীলনী

২.১৫ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন—

- শিল্প-বিপ্লব কাকে বলে, কবে এ বিপ্লব হয়েছিল, কেন হয়েছিল ও তার ফলাফল কী।
- মানব-সভ্যতায় এ বিপ্লবের স্থান কোথায়।
- কেন ইউরোপ বিগত কয়েকশো বছর ধরে পৃথিবীতে এত প্রাধান্য করছে—তার শক্তির উৎস স্থল কী।
- কেন ইংল্যান্ড শিল্পায়িত আধুনিকতায় বিশ্বে প্রথম।
- কীভাবে শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল থেকে জন্ম নিল সমাজতন্ত্রের দর্শন।

২.২ প্রস্তাবনা

সমাজতন্ত্র হল সাম্যবাদ। সামাজিক বৈষম্য ও বৈষম্য জনিত নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাওয়ার চিন্তা থেকে জন্ম নেয় সাম্যবাদ। অতএব সাম্যবাদের ধারণা কোন নতুন ধারণা নয়। কিন্তু সাম্যবাদ যখন সমাজ-পরিবর্তনের কর্মসূচীকে গ্রহণ করে সমাজ-বিবর্তনে একটি সঙ্কল্পবদ্ধ দর্শনরূপে আত্মপ্রকাশ করে তখন মানুষের কিছু সমানাধিকারের মৌল আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান জানাতে দায়বদ্ধ হয় তখনই সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়। যে সমাজতন্ত্রকে আজকে আমরা জানি, বলা হয়ে থাকে যে তার আবির্ভাব শিল্প-বিপ্লবের সময়ে। শিল্প-বিপ্লব যখন আরম্ভ হল, যখন যন্ত্রের প্রভাব এবং প্রয়োগ বাড়তে লাগল, যখন শিল্পায়ন তার প্রারম্ভিক পর্যায় ছিল, ঠিক তখনই শিল্প-বিপ্লবের সেই অস্ফুট ঊষায় কোন কোন মানুষ বুঝতে পেরেছিলেন যে এই বিপ্লবের সামাজিক ফল সবসময় মঙ্গলজনক হবে না। লাগামহীন শিল্পায়নের বিরুদ্ধে একটু একটু করে প্রতিবাদ দেখা দিতে শুরু করেছিল। কিছু চিন্তাশীল মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে শিল্পায়ন যেমন একদিকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরামের ব্যবস্থা করছে, অন্যদিকে তলিয়ে দিচ্ছে বহু মানুষকে দীনতার মধ্যে—নিঃসীম দারিদ্র্য, ক্ষয়, রোগ ও মৃত্যুর মধ্যে। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে মুষ্টিমেয় মানুষ যেমন বিপুল মুনাফা অর্জন করে স্ফীত হচ্ছে ঠিক তেমনই অসখ্য মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে সর্বহারার ভিড়ে মিশে যাচ্ছে। তারা প্রশ্ন করলেন যে ঘিঞ্জি শহর, রোগগ্রস্ত মানুষ, শোষিতের হাহাকার, ক্রমক্ষয়িষ্ণু জীবনমান এবং অপসৃয়মাণ মানবিকতা একদিকে, অন্য দিকে যন্ত্রের স্বাচ্ছন্দ্য ও বাণিজ্যের মুনাফা—এর কোনটি গ্রহণীয়? তাঁরা দাঁড়ালেন লাঞ্ছিত মানবতার পক্ষে, প্রতিবাদ করলেন যন্ত্রের কাছে মানুষের একতরফা বিকিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে, চাইলেন সর্বহারার পুনর্বাসন, সাম্য আর অধিকারের মধ্যে এবং ঘোষণা করলেন যে শিল্পায়নের মূল্য কখনো মানব অস্তিত্বের বলিদান হতে পারে না। শিল্প-বিপ্লবের নেতিবাচক ফলের বিরুদ্ধে এই আত্মিক জাগরণই সমাজতন্ত্র নামে বিখ্যাত।

ডেভিড থমসন (David Thompson) বলেছেন যে, ১৮৪৮ সাল এবং মার্ক্সবাদের উত্থানের আগে 'সমাজতন্ত্র' ইউরোপের রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার কাছে কোন ভয়ের এবং আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। তখন সমাজের সুবিধাভোগী রক্ষণশীলেরা আতঙ্কিত হত 'গণতন্ত্র' শব্দটির দ্বারা। অনেকদিন ধরেই সমাজতন্ত্র কতগুলি পর্যায় পেরিয়ে বিকশিত হচ্ছিল। এগুলি ছিল সমাজতন্ত্রের প্রারম্ভিক, কল্পান্ত অভিসারী, স্থূল অর্থে মানবিক পর্যায়। অসংখ্য ধর্মীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায় তখন ছিল যারা একদিকে শিল্পায়নের যন্ত্রণা ও জাতীয় যুদ্ধের আলোড়নের বাইরে আমেরিকায় গিয়ে সরল যূথবদ্ধ সমাজজীবন উপভোগ করতে চাইত। তাদের কাছে সনাতন জীবনের জটিলতা ও আড়ষ্টতার বাইরে সমাজতন্ত্র একটি সরল জীবনবোধকে বোঝাত [David Thompson, *Europe since Napoleon*, Ch. 7]। ১৮৫০ সাল পর্যন্ত সমাজতন্ত্র (Socialism) এবং কমিউনিজম (Communism) এই দুইয়ের মধ্যে রাজনৈতিক দর্শন হিসাবে কোন পার্থক্য করা হত না। তখন সমাজতন্ত্র যতখানি তার প্রাকৃতিক আশ্রয় পেয়েছিল ইউরোপে তার থেকে অনেক বেশি পেয়েছিল আমেরিকায় যেখানে অফুরন্ত জমি ও স্বাধীন প্রবেশাধিকার ইউরোপের জীর্ণ রাজতন্ত্রগুলি থেকে মুক্তিকামী মানুষকে হাতছানি দিত ["until after 1850 or so, socialism and communism (at first hardly distinguishable as political ideas) found that natural home not in Europe but in the United States, where abundance of land and free

immigration offered a new mode of life to all who wanted to escape from the restored monarches of Europe"]। **রবার্ট ওয়েন (Robert Owen)** তাঁর **নয়া সাম্যের (New Harmony)** যে পরীক্ষা ইন্ডিয়ানাতে করেছিলেন বা এটিয়েঁ ক্যাবে (Etienne Cabet) ইলিনয়েসে (Illinois) যে **আইকেরিয়ান কমিউনিটির (Icarian community)** পরিকল্পনা করেছিলেন তা সবই ছিল প্রারম্ভিক সমাজতন্ত্রের কল্পিত স্বপ্ন ভুবন। মানবিক সাম্য (human equality) এবং স্ব-শাসন (self-government) এই দুইয়ের সম্মিলনে গড়ে ওঠা এক মার্জিত জীবন ছিল এই স্বপ্ন-ভুবনের বিষয় যা মার্ক্স-পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্র নির্মাণ করতে চেয়েছিল। এই নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নালু সমাজতন্ত্রের দান। এই সমাজতন্ত্র অসার্থক নয় কারণ নয়া দুনিয়ার (New World)—আমেরিকার অপরিমিত সম্পদ ও অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে সাম্যবাদী সংগঠনের যে স্বপ্ন তারা দেখেছিল যে রক্ষণশীল ইউরোপের পুরানো দুনিয়ায় কোন সাম্যের ভুবন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। নয়া দুনিয়ায়—অর্থাৎ আমেরিকায়—বিপুল মানুষের অভিবাসন রক্ষণশীল ইউরোপের পুরানো দুনিয়ার প্রতি হতাশাকে ভিত্তি করেই প্রারম্ভিক সমাজতন্ত্রের স্বপ্নালু আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল [David Thompson-এর গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য]।

২.৩ ফরাসী দর্শন ও সমাজতন্ত্র

আদিপর্বের সমাজতন্ত্রের ধারণা অনেকটাই জন্ম নিয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের দর্শন থেকে। রুশো (Rousseau), **এবে ম্যাব্লি (Abbé Mably)**, **এলভেসিয়াস (Helvetius)** প্রমুখ দার্শনিকদের লেখা থেকে প্রথম পর্বের সমাজতন্ত্রের অস্পষ্টবোধ আত্মপ্রকাশ করেছিল। রুশো লিখেছিলেন যে মানুষ জন্মে স্বাধীন, সমাজ তাকে শৃঙ্খলিত করে—"Man is born free and everywhere he is in chains" (Contrat Social, I, i)। ম্যাব্লি রুশোর সাথে সহমত হয়ে বলেছিলেন যে সম্পত্তি ও অধিকারের বৈষম্য থেকে জন্ম নেয় সামাজিক ও রাজনৈতিক অমঙ্গল। তিনি স্পষ্ট করে লিখেছিলেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে (Private property) মেনে নিয়ে এবং তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে মানুষ সভ্যতার সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এলভেসিয়াস লিখেছিলেন যে মানুষ শক্তি ও ক্ষমতায় জন্মগতভাবে সমান। সমাজ ও সরকারের অব্যবস্থা এই ক্ষমতার বৈষম্য আনে। অতএব তিনি দাবি করেছিলেন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার। আরেকজন ফরাসী দার্শনিক এই সময় প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তিনি হলেন **ব্যারণ ডি হলব্যাক**

প্রান্তলিপি

"রুশোর সামাজিক চুক্তি হবসের সামাজিক চুক্তির ঠিক বিপরীত। হবস বলেন যে প্রাক্ সামাজিক জীবনে মানুষ ছিল নিঃসঙ্গ, হিংস্র, হীন এবং জঘন্য। তারা শুধু আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য লড়াই করত। এই হিংস্র জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করে একটি তৃতীয় শক্তির কাছে তাদের সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকার সমর্পণ করল। এই তৃতীয় শক্তি হল রাষ্ট্র। সকলের আত্মসমর্পণকে আত্মসাৎ করে এক দুর্ধর্ষ, অপ্রতিরোধ, বেপরোয়া সংগঠন। আর সমস্ত মানুষ হয়ে রইল ক্ষমতাহীন প্রজা, রাষ্ট্রের কাজে বলিপ্রদত্ত। রুশো বললেন যে এক সামাজিক পরিবেশে মানুষ ছিল স্বাধীন, বর্বর হলেও মহান (Noble Savage)। নিজের এই প্রকৃত স্বাধীনতাকে সংরক্ষিত করার জন্য মানুষ সমাজ গঠন করল। তারা চুক্তি করল নিজেদের মধ্যে— একের সাথে অন্যের, সকলের সাথে সকলের চুক্তি। এই চুক্তির দ্বারা নিজেদের সম্মিলিত অস্তিত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করল, কোন তৃতীয় পক্ষ বহিঃশক্তির কাছে নয়। এর ফলে যে রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব হল প্রত্যেক মানুষ হয়ে রইল সেই রাষ্ট্রশক্তির অংশ, তার অবিভাজ্য উপাদান। এইভাবে হবসের লেখা থেকে জন্ম নিল দায়িত্বহীন (irresponsible) স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, আর রুশোর লেখা থেকে জন্ম নিল প্রজাতন্ত্র যা শাসিত হত সকলের সাধারণ ইচ্ছা বা General will-এর দ্বারা।

(Baron d' Holbach)। তিনি রুশোর সামাজিক চুক্তি অনুসরণ করে বললেন যে সমাজজীবনে সরকার ও জনগণের মধ্যে এক অলিখিত চুক্তি আছে। সরকারের কাজ হল মানুষের কল্যাণ করা, সাম্যের ভিত্তিতে তার মঙ্গলসাধন করা, জনগণকে স্বাধীনতা দেওয়া। এ কাজ থেকে বিরত হলে সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নেই।*

এইভাবে ফরাসী বিপ্লবের সমসাময়িক কালে ফ্রান্সে সমাজ কল্যাণের লক্ষ্যে সমাজ পরিবর্তনের দর্শন আত্মপ্রকাশ করছিল। মনে রাখতে হবে যে ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে প্রায় একশত বছর ধরে ইউরোপে যে অর্থনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল তার থেকেই সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়। চার্চ ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের (Church and Nobility) জমি রাষ্ট্র কেড়ে নিয়েছিল। তখন থেকে আলোচনা শুরু হয়েছিল সম্পত্তি ও তার অধিকার নিয়ে, প্রশ্ন উঠেছিল ব্যক্তি সম্পত্তি মানুষের পক্ষে মঙ্গলজনক কিনা এবং শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়েছিল গরীব মানুষের সম্পত্তিহীনতা যা তার দারিদ্রের সূচক তা সম্পত্তিবানদের ষড়যন্ত্র প্রসূত এক বিরাট সামাজিক অপকর্ম ছাড়া আর কিছুই নয় [দ্রষ্টব্য William Archibald Dunning, A HISTORY OF POLITICAL THEORIES : FROM ROUSSEAU TO SPENCER. Ch. IX]। এতৎসত্ত্বেও কার্ল মার্ক্সের আবির্ভাবের আগে সমাজতন্ত্র যে একটি মহান দর্শনে পরিণত হয়নি তার কারণ সে সময়ে বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা ভিন্ন বিষয় নিয়ে মগ্ন ছিলেন। উদারনীতিকরা (Liberals) ভাবতেন স্বাধীনতার আদর্শ (ideal of liberty) নিয়ে। গণতান্ত্রিকরা (Democrats) ভাবতেন সাম্যের আদর্শ (ideal of equality) নিয়ে। গণতান্ত্রিকরা (Democrats) ভাবতেন সাম্যের আদর্শ (ideal of equality) নিয়ে। ফলে সমাজতন্ত্রীরা সাম্যকে একান্তভাবে নিজেদের বিষয় বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। প্রারম্ভিক পর্যায়ে সমাজতন্ত্রীরা সৌভ্রাত্রের আদর্শ (ideal of fraternity) নিয়ে বেশি ভাবিত ছিল ["Just as liberals placed greatest emphasis on the ideal of liberty, and democrats on the ideal of equality, so socialists cherished particularly the ideal of fraternity"–David Thompson]। তাদের ধারণা ছিল এই যে মানুষ প্রকৃতিগতভাবে ভাল এবং সুন্দর। সামাজিক বৈষম্য ও দারিদ্র্য নামক কৃত্রিম বিকৃতি না থাকলে প্রত্যেক মানুষ অন্য মানুষের সাথে ভ্রাতৃভাবে বিরাজ করত। প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতাই মানুষের প্রবৃত্তি-সঞ্জাত বাসনা (instinctive desire)। অতএব স্বাধীনতা (liberty) এবং সাম্য বা সমানাধিকারের (equity) আদর্শকে যদি প্রয়োগযোগ্য বিষয় হিসাবে একটি যৌক্তিক বিন্দু (logical point) পর্যন্ত প্রসারিত করা যায় তবে আসবে আত্মপ্রকাশের জন্য পূর্ণ মুক্তি (Complete equality of opportunity and of wealth)। ঠিক তখনই শুরু হবে সৌভ্রাত্রের রাজত্ব। ঐতিহাসিকের ভাষায় "...and the reign of fraternity would begin"।

স্পষ্টতই এই ধারণার মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্রের (liberty, equality and fraternity) বাণী দীপ্যমান। মনে রাখতে হবে প্রথম পর্বের সমাজতান্ত্রিক দার্শনিকেরা যারা ফরাসীদের বিপ্লব আদর্শ থেকে বাণী গ্রহণ করেছিল তারা শিল্পবিপ্লবের প্রবহমান ধারাকে ততটা সম্যকভাবে বুঝতে পারেননি যতটা বুঝতে পেরেছিলেন পরবর্তীকালে বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা কার্ল মার্ক্স এবং এঙ্গেলস্-এর মতো দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিদরা শিল্প-বিপ্লবের প্রক্রিয়াকে স্পষ্টভাবে বুঝতে না পারলেও তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে ইউরোপ অর্থাৎ পুরানো দুনিয়ায় এক শিল্প-মনস্কতা বা **শিল্পবাদ (industrialism)** আত্মপ্রকাশ করছে যার

ভেতরে আছে নিঃসীম শোষণের একটা ছবি। এই শিল্পবাদ দরিদ্র ও বৈষম্যের কারণ একথা ভেবে তারা চেষ্টা করতেন এই শিল্পবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে। প্রতিবাদ আন্দোলন সবল না হলে তার মর্যাদা থাকে না। ফলে প্রথম পর্বের সমাজতন্ত্রী আন্দোলন ইউরোপে শিকড় গাঁথতে পারেনি ["often protesting against industrialism as a new cause of property and inequality, early socialist movements could never find roots or room in Europe"—David Thompson] আরও পরে যখন সমাজতন্ত্রের তত্ত্বগুলি **লুই ব্লাঁ**-র (Louis Blanc) মতো রাষ্ট্রবাদী সমাজতন্ত্রী (State socialists) বা কার্ল মার্ক্স (Karl Marx)-এর মতন বিজ্ঞানমনস্ক অর্থনীতিবিদদের দ্বারা প্রভাবিত হল তখন সমাজতন্ত্রের দর্শন পূর্ণতালাভ করে ইউরোপের ক্রমবর্ধমান শিল্পায়িত দেশগুলির দৈনন্দিন চাহিদা ও প্রযোজনীয়তাকে নিজের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে সক্ষম হল। তারপর থেকে সমাজতন্ত্র ইউরোপের পূর্ণাঙ্গ মহাদেশীয় দর্শনের রূপ লাভ করল।

২.৪ প্রথম পর্বের কল্পান্তিক সমাজতন্ত্র

প্রথম পর্বের সমাজতন্ত্রীদের বলা হত **কল্পান্তিক সমাজতন্ত্রী** (Utopian Socialists)। কল্পান্তিক শব্দটি এসেছে স্যার টমাস মোর-এর (Sir Thomas More) utopia বা **কল্পলোক** নামক গ্রন্থ থেকে। এই গ্রন্থটিতে একটি আদর্শ রাষ্ট্রের (Ideal State) বর্ণনা রয়েছে। কল্পান্তিক সমাজতন্ত্রীদের পরিকল্পনা ছিল সমাজকে নতুন করে সংগঠিত করা এবং এমন একটি সমাজ ব্যবস্থার আয়োজন করা যেখানে শ্রমের মুনাফা সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা হবে। কল্পান্তিক সমাজতন্ত্র প্রারম্ভিক সমাজতন্ত্র যেখানে সমাজ পরিবর্তনের দর্শন ছিল প্রগাঢ়ভাবে স্বপ্নাবিষ্ট ও আচ্ছন্ন। সেখান থেকে যাত্রা করে সমাজতন্ত্র উনিশ শতকের শেষে এক বিজ্ঞান ভিত্তিক অর্থনৈতিক সূত্রের (Scientific economic formula) মধ্যে পরিণতি লাভ করেছিল। কল্পান্তিকতা (Utopianism) এবং বিজ্ঞানভিত্তিক অর্থনৈতিকতা এই দুই বিপরীত মেরুর মাঝে আছে নানা ধরনের সমাজতন্ত্র —রাষ্ট্রবাদী সমাজতন্ত্র (State Socialism), সিন্ডিক্যালিজম্ নৈরাজ্যবাদ (anarchism) আরও নানা সূক্ষ্ম ভেদাভেদ। আদ্যিকালের এক ঐতিহাসিক কেটেলবি (D. M. Ketelbey–*A History of modern times from 1789 to the Present Day* (p. 337) লিখেছেন যে সমাজতন্ত্রের দর্শনের মধ্যে ২৬০ রকমের সমসাময়িক সংজ্ঞা লুকিয়ে আছে। এজন্য কথায় বলা হত যতজন সমাজতন্ত্রী আছে ঠিক ততরকম সমাজতন্ত্রের ভেদ রয়েছে—"There are as many varieties of socialism as there are socialists."

কল্পান্তিক পর্বের প্রথম প্রবক্তা হলেন রবার্ট ওয়েন (Robert Owen)। তাঁর সময়কাল ১৭৭১ থেকে ১৮৫৮। তিনি ছিলেন একজন ধনী শিল্প-নির্মাতা। **স্কটল্যান্ডে নিউল্যানার্ক (New Lanark)** নামক স্থানে তিনি একটি কারখানা শহর (factory town) তৈরি করেছিলেন। একে সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিকেরা প্রথম পর্বের একটি আদর্শ সমাজ (model society) বলে উল্লেখ করেছেন। ওয়েন বিশ্বাস করতেন যে সারা পৃথিবীতে এরকম ছোট ছোট আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে। এই রকম এক একটি সমাজে ১২০০ করে মানুষ থাকবে। তারা সবাই একটি মস্ত বড় বাড়িতে থাকবে এবং ক্ষেত খামার, কারখানা যেখানেই তারা কাজ করুক তাদের শ্রমের থেকে

উদ্ভূত লাভের অংশীদার হিসাবেই সেখানে তারা বিরাজ করবে। ওয়েনের আদর্শকে সম্বল করে নিউ ল্যানাকের ছায়ায় কিছু সমাজ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তারা কেউই স্থায়ী হতে পারেনি। ওয়েনের প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। তাঁর প্রেরণা থেকে জন্ম নিয়েছিল এক নতুন ধরনের সমবায় আন্দোলন। শ্রমজীবী মানুষ জমিতে বা কারখানায় যেখানেই তার শ্রমদান করুক না কেন শ্রম থেকে সৃষ্ট মুনাফার অংশ তারা পাবে এই ভাবনাও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল রবার্ট ওয়েনের আন্দোলনের ফলেই। মনে রাখতে হবে যে ১৮৩০ থেকে ১৮৪৮ সালের মধ্যে ওয়েনের নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল শ্রমিকদের মুক্তি।

কল্পান্তিক দার্শনিকদের মধ্যে আরেকজন প্রধান দার্শনিক ছিলেন কোঁৎ দ্য সেঁ সিমঁ (Comte De St. Simon)। তিনি একজন ফরাসী অভিজাত। তিনি ফরাসী বিপ্লব ও চলমান শিল্প-বিপ্লব থেকে তথ্য ও সচেতনতা গ্রহণ করে এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি গড়ে তুলেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং রাজনৈতিক বিপ্লব প্রসূত প্রগতি যে বিপুল সামাজিক শক্তিকে উদ্ঘাটিত করেছে তাকে সাধারণের স্বার্থে ব্যবহার করা উচিত। বলা হয়ে থাকে যে সমাজের সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর স্বার্থে সমাজ সংগঠনের জন্য তিনিই সর্বপ্রথম একটি সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার উদ্ভাবন করেছিলেন ["Saint Simon was the first to announce a socialistic scheme for the reorganization of society in the interest of the most numerous class"—Charles Downer Hazen, Modern Europe upto 1945, ch. xv)। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সমস্ত উৎপাদনের হাতিয়ার (means of production) রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়া উচিত এবং রাষ্ট্রেরই কর্তব্য হল শিল্পকে সংগঠিত করা। শিল্প সংগঠনের নীতি হবে একটাই, তাঁর ভাষায়—'Labour according to capacity, reward according to services"—ক্ষমতা অনুযায়ী শ্রমদান, সেবার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পুরস্কার। এ কথার অর্থই হল যে কর্মের গুণগত প্রভেদ অনুযায়ী পুরস্কারের পার্থক্য তিনি মেনে নিয়ে ছিলেন। সমাজের বনিয়াদ অর্থনীতির মধ্যে প্রোথিত একথা জেনেই তিনি তিনটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিলেন—এক, পরজীবী অনুৎপাদকদের হাত থেকে উৎপাদন প্রসূত সম্পদকে মৌল উৎপাদক শ্রেণীর (primary produces) নিয়ন্ত্রণে আনতে চেয়েছিলেন, দুই, কর্মসংস্থানে রাষ্টের ভূমিকাকে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন, তিন, উৎপাদনে সামাজিক মালিকানা বহাল রেখে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়িক জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের দ্বারা তার প্রশাসন চালু করতে চেয়েছিলেন।

সেঁ-সিমঁর (Sanit Simon) সমসাময়িক ছিলেন **শার্ল ফুরিয়ের (Charles Fourier)**। তিনি ছিলেন **ফালাঁস্তার**-এর **(Phalanstere)** প্রবক্তা। ফালাঁস্তার হল একটি সহযোগিতামূলক উপনিবেশ। ফুরিয়ের মনে করতেন যে এই উপনিবেশ হল এক একটি সামাজিক একক। এরকম অনেক ফালাঁস্তার নিয়ে একটি করে সমাজ গঠিত হবে। প্রত্যেক ফালাঁস্তারে থাকবে ১৫০০ বা ১৬০০ মানুষ। তারা বাস করবে যৌথভাবে এক একটি অট্টালিকায় এবং তারা কাজও করবে একসাথে। এইভাবে যৌথ শ্রমদান ব্যবস্থার মধ্য থেকে যে আয় হবে তার শ্রমের সাথে সমানুপাতিক ভাগ সবাই পাবে। মানুষের আয় ও মর্যাদা যে সমান হবে না তা তিনি যেমন মেনে নিয়েছিলেন তেমন মেনে নিয়েছিলেন সম্পত্তির অধিকার। ফুরিয়ের মত অনেকটা ওয়েনের মতের কাছাকাছি ছিল। দুজনকেই উৎপাদকদের সমবায়ের প্রবক্তা বলে উল্লেখ করা হয়। সেঁ-সিমঁ এবং শার্ল ফুরিয়ের দুজনেই ছিলেন 'দূরকল্পী চিন্তাবিদ' (Speculative thinkers)। তাঁরা বাস্তব কর্মকুশল মানুষ ছিলেন না। কিন্তু তারা সমাজ

পরিবর্তনের বোধকে জাগিয়ে ছিলেন, আর তুলে ধরেছিলেন একটি দর্শন যার ভিত্তিতে বৃহত্তর জনস্বার্থের কর্মসূচিকে কোন রাষ্ট্রিক প্রকল্পের মধ্যে আনা যেত। একজন দক্ষ মানুষ—রাজনীতিবিদ, দলের নেতা, জনগণের দৃষ্টি কেড়ে নেওয়ার মত সক্ষম এমন যে ব্যক্তি তিনিই এই প্রারম্ভিক সমাজতন্ত্রের কল্পান্তিক স্বপ্নকে সার্থক করতে পারতেন। এরকম একজন মানুষ ছিলেন **লুই ব্লাঁ (Louis Blanc)** যিনি জুলাই রাজতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠিয়ে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র আসার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। তাঁর লেখায় তিনি ফ্রান্সের শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, বোঝাতে চেয়েছিলেন যে চলমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আড়াল করা আছে নিপীড়নের কী মহাশক্তি। তিনি সামাজিক অমঙ্গলকে উচ্ছেদ করে ন্যায় ও সাম্যের রূপটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। বুর্জোয়াজির (Bourgeoisic) দ্বারা পরিচালিত সরকারকে তিনি ধনীদের, ধনীদের দ্বারা গঠিত ও ধনীদের স্বার্থে পরিচালিত সরকার বলেছেন, "a government of the rich, by the rich, and for the rich"। তিনি চাইতেন যে এধরনের রাষ্ট্র মুছে যাক। তার স্থানে আসুক গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সরকার। লুই ব্লাঁ ঘোষণা করেছিলেন যে মানুষের জন্য কর্মসংস্থান রাষ্ট্রের কর্তব্য এবং কর্মলাভ করাটা প্রত্যেক মানুষের একটি অচ্ছেদ্য অধিকার। মানুষকে তার অধিকারে আশ্বস্ত করতে হলে সরকারকে শিল্প-সংগঠন করতে হবে। তা না হলে রাষ্ট্র তার মৌলিক কর্তব্য থেকে চ্যুত হবে। লুই ব্লাঁ বলেছিলেন যে রাষ্ট্রকে তাঁর নিজস্ব পুঁজি দিয়ে জাতীয় কর্মশালা (national workshop) প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই কর্মশালার তদারকি ও পরিচালনা করবে শ্রমিকরা যাতে শেষ পর্যন্ত তাদের শ্রমের ফসল তারা লাভ করতে পারে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা মালিক শ্রেণী (employers) উঠে যাবে এবং শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃত্বে আসীন হবে। লুই ব্লাঁর এই মত ছিল সরল ও স্বচ্ছ এবং শ্রমিক কর্মসূচিতে তা গৃহীত হয়েছিল। এইভাবে একটি সমাজতন্ত্রী দলের জন্ম হয়। এই দল প্রজাতন্ত্রে (Republic) বিশ্বাস করত। প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী আরও দুএকটি দল ছিল। কিন্তু তাদের সঙ্গে এই দলের পার্থক্য হল এই যে তারা শুধু সরকারের পরিবর্তন চাইত। এই দল চাইত সমাজ পরিবর্তন, সরকার পরিবর্তন এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় মাত্র।

২.০ সমাজতন্ত্রের প্রথম পর্যায়ের বৌদ্ধিক রচনা

সমাজতন্ত্রের প্রথম পর্যায়ের দার্শনিকেরা নানাবিধ গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বোধের উন্মেষ ঘটিয়ে ছিলেন। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে প্রায় সমার্থক করে দিয়ে সমাজতন্ত্রকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন পি. লেরুক্স্ (P. Leroux) এবং জে. রেনো (J. Renaud) তাঁদের লেখা অ্যাসিক্রোপোদি নূতেল ও অন্যান্য নানা রচনায়। ১৮২৮ সালে ফিলিপ মিশেল বুওনারত্তি 'সমানদের ষড়যন্ত্র' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বাবউফের ধারণাকে সারা ইউরোপীয় মহাদেশে প্রচার করার চেষ্টা করেছিলেন। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের একজন বড় লেখক হলেন সেঁ-সিমঁ। তিনি সংহতিবাদী ছিলেন এবং মনে করতেন যে মানুষের সমাজ একটি বিশ্বব্যাপী সংহতির দিকে এগুচ্ছে। এই সংহতিতে খ্রিস্টধর্ম, বিশেষ করে রোমান ক্যাথলিক চার্চের একটি ভূমিকা রয়েছে। তাই তিনি একটি বই লেখেন, তার নাম নুভো ক্রিস্তিয়ানিজম (Nouveau Christianisme) বা নতুন খ্রিস্টধর্ম। এই গ্রন্থে তিনি দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বসমাজের জন্য নতুন ধর্মের প্রস্তাব করেন। ১৮০৮ সালে শার্ল ফুরিয়ের (Charles Fourier) তাঁর মতামত প্রকাশের জন্য রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **তেওরি দে কাতর মুভমঁ**

(Theories des quatre movements) এছাড়াও ফুরিয়ের আরও গ্রন্থ লিখেছিলেন। ইংল্যান্ডে সমাজতান্ত্রিক গ্রন্থ রচনার ধারা তৈরি করেছিলেন রবার্ট ওয়েন। তিনি মনে করতেন যে মানুষের সামাজিক সংস্কারের কথা সর্বাগ্রে বিবেচনা করতে হবে। তবেই মানুষের নৈতিক সংস্কার আনা সম্ভব হবে নচেৎ নয়। তাছাড়া মানুষের যৌথ অস্তিত্ব ও সমবায়িত জীবনের আদর্শকে তিনি তুলে ধরেন। তাঁর এই মতবাদ প্রকাশের জন্য তিনি লিখেছিলেন **নিউ ভিউ অফ্ সোসাইটি (New View of Society)** এবং **রিপোর্ট টু দ্য কাউন্টি অফ্ ল্যানার্ক (Report to the Country of Lanark)**। তাঁর আদর্শকে সার্থক করার জন্য তিনি সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন, ফুরিয়ের মতো তিনি রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থাপনাকে নিষ্প্রয়োজন ভেবে নিজেকে সরিয়ে রাখেননি। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের পর (Napoleonic Wars) তিনি সরকারের কাছে দুটি আবেদন রেখেছিলেন—এক, কারখানা সংক্রান্ত আইনের দ্বারা শ্রমিকদের রক্ষা করা হোক এবং দুই, গ্রামের সমবায় প্রতিষ্ঠা করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জনকল্যাণের ব্যবস্থা করা হোক। এব্যাপারে সরকারের অনাগ্রহ দেখে তিনি আবেদন করেছিলেন মানবদরদী জনসমাজের কাছে। সেখানেও যথেষ্ট সাড়া না পেয়ে তিনি সরাসরি শ্রমিক শ্রেণীর কাছে যান।

প্রান্তলিপি

অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে ফ্রাঁসোয়া নোয়েল বাবউফ (Francois Noel Babeuf) ছিলেন সমাজতন্ত্রের 'প্রারম্ভিক বিন্দু'। তিনি ছিলেন সমানদের সমিতির (Societe des Egaux) নেতা। ১৭৯৬ সালে ফ্রান্সে ডিরেক্টরির বিরুদ্ধে একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থান হয়েছিল। তিনিই ছিলেন তার নায়ক। কার্যকর সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি প্রণয়নে তিনিই ছিলেন অগ্রণী। কারও কারও মতে সমানদের ইশতাহারই (Manifeste des Egaux) হচ্ছে প্রথম সমাজতান্ত্রিক ধারণার দলিল। বাবউফ ও তাঁর অনুগামী ও সমর্থকরা মনে করতেন যে ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব একটি যুগপরিবর্তনকারী ঘটনা। তাকে পরিণতির দিকে নিতে হলে ভূমি ও শিল্পের সামাজিকীকরণ দরকার। স্পষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে তাঁরা মানুষকে জানিয়ে ছিলেন যে প্রকৃতির সম্পদকে ভোগ করার পূর্ণ অধিকার মানুষের আছে। তা তাদের স্বাভাবিক অধিকার। এই অধিকার মানুষকে ভোগ করতে হবে। তার দারিদ্রের অবসান ঘটাতে হবে। তাকে সমস্ত মানবিক সুখ উপভোগ করতে দেওয়ার অধিকার দিয়ে তার সামাজিক অবস্থানকে নিশ্চিত করতে হবে।

২.৬ পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র : কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিয়েডরিশ এঙ্গেলস

আঠারো শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের প্রথম থেকে ইউরোপে সমাজ চেতনার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল এবং তার সঙ্গে বদলাচ্ছিল সমাজতন্ত্রের দর্শন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে সমাজতন্ত্রের দর্শন ও কর্মসূচি ইউরোপের রাজনীতি ও সমাজাদর্শে স্থায়ী আসন লাভ করতে থাকে। ১৮২০-র দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত 'সমাজতন্ত্রী' (Socialist) ও 'সমাজতন্ত্র' (Socialism) শব্দ দুটি তাদের আচ্ছন্নতা কাটাতে পারেনি। ১৮৪১ সালে ওয়েন-পন্থীরা সরকারিভাবে এই শব্দ দুটিকে গ্রহণ করে। এ সময় থেকে এ ধারণা জমে উঠেছিল যে মোটামুটিভাবে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর তার রূপান্তর ঘটাতে হবে। সমাজসত্তার অর্থনৈতিক রূপান্তরের কথা নতুন নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে **জন লিলবার্ণ**-এর **(John Lilburne)** নেতৃত্বে লেভেলাররাও (Levellers) সম্পত্তির বৈষম্য, একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা জনিত ধন ও প্রতিপত্তির তারতম্যকে ভেঙে ফেলে সমাজে উচ্চ-নীচের ভেদাভেদকে সমান (Level) করে দিতে

চেয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে আবেগ ছিল বেশি, বোধ ছিল আচ্ছন্ন। ফলে বৈজ্ঞানিক কার্য-কারণ শৃঙ্খলার ব্যবচ্ছেদ ঘটিয়ে সমস্যা সমাধানের অর্থনৈতিক সূচিগুলিকে তারা বুঝতে পারেননি। তারা সামাজিক সমস্যার উৎসকে খুঁজে পেয়েছিল, কিন্তু সেই সমস্যার অন্তর্পটে সভ্যতার উত্থান-পতনের মৌল নিয়মগুলিকে তারা আবিষ্কার করতে পারেনি। কল্পান্তিক সমাজতন্ত্রীরা যখন এলেন তখন সমস্যা শিল্প-বিপ্লবের অভিঘাতে আরও জোরালো হয়ে উঠেছে। নতুন যুগে সমাজবিবর্তনের বিজ্ঞানকে যারা বুঝতে চেয়েছিল সেই কল্পান্তিক সমাজতন্ত্রীরা অন্তত এটুকু বুঝেছিল যে সমাজ দাঁড়িয়ে আছে তার অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপর। অতএব জীবন ও কর্মের সংগঠনের জন্য মানুষকে ব্যক্তিগত শক্তির পরিবর্তে সামাজিক শক্তির উপর নির্ভর করতে হবে, ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণকে উচ্ছেদ করে সেখানে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রতিষ্ঠা ঘটাতে হবে। তাহলেই সমাজের রূপান্তর ঘটবে, না হলে নয়। এই ভাবে সমাজে ব্যক্তি শক্তির বদলে যূথশক্তির অনিবার্যতার ধারণা উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, আর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই বোধ যে যাকে আমরা সমাজ বলি তা আসলে একটি বাহ্যিক সত্তা। যার নিগূঢ় অন্তর্পটের অদৃশ্য, পরিচালিকা শক্তি হল অর্থনীতি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে এবার এই বোধ পাকাপাকি হতে লাগল যে অর্থনীতিই যেখানে প্রধান সেখানে বস্তুর ভূমিকাই প্রধান—বিমূর্ত মন ও অপার্থিব চৈতন্য সেখানে অপ্রধান। এইভাবে সমাজতন্ত্রের দর্শনে সমাজ শৃঙ্খলাকে কোন অনির্ণীত অলৌকিকের অভিপ্রায় সঞ্জাত না ভেবে বস্তুঘন পৃথিবীর বস্তুকেন্দ্রিক মানবিক সম্পর্কের উপস্থাপনা ভিত্তিক ব্যবস্থা বলে চিহ্নিত হতে লাগল।

কাল মার্ক্স ও ফ্রিয়েডরিশ এঙ্গেলস :

ইউরোপে সমাজতন্ত্রের দর্শন ও কর্মসূচি পরিণতি লাভ করেছিল **কাল মার্ক্স (Karl Marx)** ও **ফ্রিয়েডরিশ এঙ্গেলস**-এর **(Friedrich Engels)** হাতে। তাঁরা ভাববাদের বিরুদ্ধে বস্তুবাদকে উপস্থাপিত করেছিলেন। সমাজ পরিবর্তনের অর্থনৈতিক তত্ত্বের উদ্ভাবন করেছিলেন, শ্রেণী সংঘাতকে ইতিহাসের চালিকা শক্তি বলে প্রমাণ করেছিলেন এবং দ্বান্দ্বিকতার তিনটি অমোঘ সূত্রকে ইতিহাস ও দর্শনকে বোঝার প্রামাণ্য হাতিয়ার—দর্শনের ভাষায় 'লজিক'—রূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মার্ক্স ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ **ডেভিড রিকার্ডো (David Ricardo)** ও অন্যান্য ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের থেকে **মূল্যের শ্রমতত্ত্বটি** (Labour Theory of Value) গ্রহণ করেছিলেন। এই তত্ত্বের মূলকথা হল এই যে কোন দ্রব্যের 'অর্থনৈতিক মূল্য' (economic value) লুকিয়ে আছে 'ঘনীভূত মানবশ্রমের মধ্যে' (in

প্রান্তলিপি

হাইনরিক কার্ল মার্ক্স (Heinrich Karl Marx) [1818-1883] জন্মেছিলেন এশিয়ার রাইন অঞ্চলে ট্রিয়ার (Trier) নামক স্থানে। তাঁর পিতা ছিলেন একজন ইহুদী আইনজীবী। তিনি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন প্রাশিয়ার একজন রাজকর্মচারী। ঢিলেঢালা জীবনে অভ্যস্ত তাঁর সংসারে একটা শিক্ষার বিভাস সদা-সর্বদা বিরাজ করত। সংসারের সহজভাব ও আলোকপ্রাপ্ত মন এই নিয়ে মার্ক্স বড় হয়েছিলেন। বন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইতিহাস ও দর্শন নিয়ে পড়াশুনা করেন। অর্থনীতি তিনি পাঠ করেছিলেন পরে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করার সময়ে। তিনি দার্শনিক হেগেলের শিষ্য ছিলেন কিন্তু চিন্তায় ছিলেন তাঁর বিপরীত। হেগেল বিশ্বাস করতেন মন আগে, বস্তু পরে। মার্ক্স ঠিক এর বিপরীতটিতেই বিশ্বাস করতেন। ১৮৪৩ সালে মার্ক্স বিপ্লবীদের মিলনকেন্দ্র প্যারিসে চলে যান এবং সেখানে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয় ফ্রিয়েডরিশ এঙ্গেলস-এর (১৮২০-১৮৯৫) সঙ্গে যিনি এর পর থেকে সারাজীবন তাঁর বন্ধু ছিলেন। এঙ্গেলস একজন বিত্তশালী জার্মান সূতা ব্যবসায়ীর সন্তান ছিলেন এবং কিছুদিন ম্যাঞ্চেস্টারে বসবাস করে ইংল্যান্ডে শিল্পায়িত নগর সভ্যতার সংকট নিজের চোখে দেখে এসেছিলেন। তিনি মার্ক্সকে অনেক সাহায্য দিয়েছেন। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পর মার্ক্স পাকাপাকিভাবে ইংল্যান্ডে বসবাস করেন। সারা জীবন তিনি অসহনীয় দারিদ্র্যকে মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু বিপ্লবের পথ থেকে সরেননি। হাইগেট সমাধিক্ষেত্রে (Highgate) তাঁর দেহ সমাহিত করা হয়।

'human labour crystallized')। এই 'ঘনীভূত মানবশ্রম' হল আসলে সেই বস্তুর নির্মাণে শ্রমিক মানব যে শ্রম দিয়েছেন সেই শ্রম। এই তত্ত্বটিকে মার্ক্সের আগে রিকার্ডো এইভাবে বলেছিলেন— কোন দ্রব্যের মূল্য তার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় আপেক্ষিক শ্রমের উপর নির্ভর করে ('the value of a commodity' depended 'on the relative quantity of labour necessary to its production')। এর থেকে আরও এক পা এগিয়ে রিকার্ডো ও অন্যান্য অর্থনীতিবিদরা বললেন যে শ্রমের নিজস্বমূল্য অর্থাৎ মজুরির হার—সেই বস্তুর উৎপাদক শ্রমিকের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খরচের সমানুপাতিক ("...the value of labour itself, or the rate of wages, similarly depended upon the cost of the labourer's subsistance"—R. N. carew Hunt, *The Theory and Practice of Communism*, p.81) কার্ল মার্ক্স এই মূল্যের শ্রমতত্ত্বকে (Labour Theory of Value) সমাজতন্ত্রের অপরিহার্য একটি সূত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন। ইতিমধ্যে জার্মানির সমাজতাত্ত্বিক নেতা **ফার্ডিনান্ড লাসাল** ও (**Ferdinand Lassalle**) এই তত্ত্বকে 'মজুরির লৌহ নিয়ম' (Iron Law of Wages) বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। মার্ক্স আরও অগ্রসর হয়ে দাবি করলেন যে বস্তুর মূল্য যদি প্রদত্ত শ্রমের উপর নির্ভর করে তবে বস্তুর মূল্য বা মূল্য সঞ্জাত মুনাফা কেন সেই শ্রমিককে দেওয়া হবে না যে শ্রমিক সেই বস্তুর উৎপাদনে নিজের শ্রমদান করেছে? [পঠিতব্য গ্রন্থ Bertrand Russell, *Freedom and Organization*, p.129]। মার্ক্স লিখলেন যে প্রত্যেক শ্রমিকের বেঁচে থাকার জন্য, অর্থাৎ বেঁচে থাকার উপকরণ উপার্জনের জন্য যেটুকু শ্রম প্রদান তাকে করতে হয় পুঁজিপতি মালিকরা তার অনেক বেশি শ্রম শ্রমিকদের কাছ থেকে আদায় করে নেয় অথচ এইভাবে আত্মসাৎ করা শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রমের মূল্য যা শ্রমিকের পাওয়া উচিত তা তাকে দেওয়া হয় না। এইভাবে শ্রমিকরা তাদের বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম উপকরণ যা না হলে তারা বাঁচবে না, শ্রমের উৎস শ্রমিকের প্রজনন বন্ধ হয়ে যাবে, সেই টুকু পাওয়ার জন্য যে শ্রম, যাকে প্রয়োজনীয় শ্রম (Necessary Labour) বলা হয়, তার মূল্যটুকু সম্বল করে তাদের জীবন ধারণ করতে হয়। শ্রমিকের সমস্ত উদ্বৃত্ত শ্রমের মূল্য পুঁজিপতি মালিকরা আত্মসাৎ করে নেয়। এইভাবে পুঁজিবাদে পুঁজিপতিরা ক্রমশ স্ফীত হয়, শ্রমিকরা ক্রমশ নিঃস্ব হয় (The rich becomes riches, the poor becomes poorer)। এইভাবে তৈরি হয় দুটি শ্রেণী—মালিক ও শ্রমিক, শোষক ও শোষিত, উৎপাদনের হাতিয়ারগুলি নিয়ন্ত্রণ করা পুঁজিপতি ও সর্বহারার দল যাদের শৃঙ্খল ছাড়া আর হারানোর কিছুই থাকে না। এই উদ্বৃত্ত শ্রমের মূল্যকে আত্মসাৎ করে নিয়ে পুঁজিপতির স্ফীত হওয়ার ঘটনাকে নিয়ে যে তত্ত্ব মার্ক্স লিখেছিলেন তাকে **উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব (Theory of Surplus value)** বলা হয়। তাঁর **ডাস ক্যাপিটাল (Das Capital)** নামক গ্রন্থে তিনি এই তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করেন।

আজকের দিনে মার্ক্সবাদ বলতে আমরা যে রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক দর্শনকে বুঝে থাকি তা তিনটি আকর বিষয়কে নিয়ে গঠিত হয়েছে—(এক) হেগেলের* কাছ থেকে পাওয়া এক দ্বান্দ্বিকতার দর্শন যাকে মার্ক্স তার ভাববাদের খোলস থেকে বার করে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের রূপ দিয়েছিলেন যার থেকে পরে নিসৃত হয়েছিল তাঁর দ্বান্দ্বিক ইতিহাসের বস্তুতত্ত্ব, (দুই) এক রাজনৈতিক অর্থনীতি (political economy) যার দুটি প্রধান বিষয় হল মূল্যের শ্রমতত্ত্ব ও উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব (Labour Theory of Value and Theory of Surplus value) এবং এই দুটি থেকে নিঃসৃত অন্যান্য সূত্র [এই সূত্রগুলি উপরে আলোচিত হয়েছে], এবং (তিন) রাষ্ট্র ও বিপ্লব তত্ত্ব (A Theory of State and Revolution)। মার্ক্স তাঁর অর্থনীতির তত্ত্ব পেয়েছিলেন

ইংল্যান্ডের ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে, তাঁর দ্বান্দ্বিকতার দর্শন পেয়েছিলেন সনাতন গ্রীক দর্শন ও উনিশ শতকের জার্মান ভাববাদী স্কুল (German Idealist School) থেকে এবং রাষ্ট্র ও বিপ্লবের ধারণা পেয়েছিলেন ফ্রান্সের বিপ্লবী ইতিহাস থেকে। লেনিন বলেছেন যে এইভাবে মার্ক্স ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের প্রধান তিনটি দেশের আদর্শের ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাকে পরিণতি দান করেছিলেন [Marx 'continued and completed the main ideological currents of the nineteenth century belonging to the three most advanced countries of mankind"—*The Teaching of Karl Marx* (1914) (Little Lenin Library), p. 17]

প্রান্তলিপি

জর্জ উইলহেলম ফ্রিয়েডরিশ হেগেল (George Wilhelm Friedrich Hegel 1770-1831)—একজন জার্মান দার্শনিক যাঁকে 'চরম ভাববাদী স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা' ('founder of the schoolof absolute absolutism') বলে বর্ণনা করে হয়েছে। তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। হেগেলের পূর্বে এই অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করেছিলেন বিশিষ্ট দার্শনিক ফিক্টে (Fichte)। হেগেল মনে করতেন যে মন বস্তুর আগে জড়ের থেকেও প্রাথমিক ও প্রধান হল চৈতন্য। ইতিহাস মানবমনের মধ্য দিয়ে এক বিশ্বসত্তার অমোঘ প্রকাশ মাত্র। আত্মিক সত্তার অর্থাৎ চৈতন্যের প্রাথমিকতায় এবং মৌলিকতায় শুধু হেগেল নয়, আরও অএনক দার্শনিকই বিশ্বাস করতেন—যেমন বার্কলে, স্পিনোজা, লাইবনিৎস, কান্ট, ফিক্টে, শেলিং, ব্র্যাড্‌লি এবং ক্রোচে ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে হেগেলই একমাত্র দার্শনিক যিনি মার্ক্সকে সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর দ্বান্দ্বিকতার সূত্রে (Theories of the dialectic) তিনি বলেছিলেন যে প্রগতির প্রসার দ্বন্দ্বের মধ্যে, কোন সরল রেখায় নয় কোন ঋজু পতে নয়। মার্ক্স এই সূত্রের অন্তর্নিহিত ভাববাদকে বাদ দিয়ে এই 'লজিক' গ্রহণ করেছিলেন। যেখানে হেগেল দ্বান্দ্বিকতাকে বিমূর্ত চৈতন্যের প্রক্রিয়া ভেবেছিলেন সেখানে মার্ক্স বস্তুর পরিমণ্ডলে মানবিক অধিষ্ঠানের প্রেক্ষিতে প্রথমে বস্তুর সাথে মানুষের এবং পরে মানুষের সাথে মানুষের উদ্বোধনের প্রক্রিয়া ভেবেছিলেন।

মার্ক্স পুঁজিবাদের প্রসারের মধ্য দিয়ে ইউরোপের সমাজে যে অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হচ্ছিল তাকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বে (Theory of Surplus value) তিনি শিল্পায়িত সমাজে পুঁজিবাদ ও পুঁজিপতিদের আগ্রাসনশীল কর্মসূচির মধ্যে যে অপ্রতিরোধ্য ঘটনার আবির্ভাব দেখেছিলেন তাকে তিনি তিনটি সূত্রের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। (এক) পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের সূত্র (The Law of Capitalist accumulation) পুঁজিপতিদের মধ্যে উৎপাদনবৃদ্ধির বাজার দখল, শ্রমিকদের উদ্বৃত্ত শ্রমকে বাজেয়াপ্ত করে তার ফসল ভোগ করার প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবিরত চলতে থাকে। আর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ধনতন্ত্রকে দেয় তার অন্তর্নিহিত গতি। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপে প্রত্যেকটি পুঁজিপতির প্রবণতা হচ্ছে তার পুঁজির সঞ্চয় বাড়ানো। কখনো শ্রমিকদের কম মজুরি দিয়ে, কখনো অতিরিক্ত উৎপাদন বাজারে মজুত (Dump) করে এবং কখনো কারখানায় শ্রমিক বিতাড়ন করে এবং তার স্থানে মানবিক শ্রম বাঁচানো যায় এ রকম বড় বড় ও আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার চালু করে তারা পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের ঘনীভবন ঘটায়। তাদের চেষ্টা থাকে ক্রমশ শ্রম-নিবিড় উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে পুঁজি নিবিড় উৎপাদন ব্যবস্থায় (from labour intensive to capital intensive system of production) উত্তীর্ণ হওয়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর দ্বারা পুঁজিপতিরা সংকটে পড়ে। স্থির পুঁজির সঙ্গে চলিত পুঁজির অনুপাত বেড়ে গেলে ('...any increase in the proportion of constant to variable capital is liable to result in a fall in his profits"—R.N. Carew Hunt) পুঁজিপতির লাভ বা মুনাফা কমে যায়। অধিক উৎপাদনের ফলে যোগান বৃদ্ধি পায় পণ্যসামগ্রীর দাম কমে এবং পুঁজিপতিদের উপর আঘাত নেমে আসে। (দুই) পুঁজির ঘনীভবনের সূত্র (The Law of the Cocentration of Capital)—পুঁজির ঘনীভবন ধনতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ নিয়ম। পুঁজিপতিদের মধ্যে সীমাহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল হল এই যে দুর্বল পুঁজিপতিরা প্রতিযোগিতার চাপ সহ্য করতে না পেরে হটে যায়, ক্রমশ তাদের অর্থনৈতিক নিঃস্বতা প্রকট হয়, তারা সামাজিক ক্ষেত্রে দুর্বল

হতে হতে শেষ পর্যন্ত মজুরি উপার্জনকারীর (Wage-earns) জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। যে পুঁজিপতিরা টিকে থাকে তারা উৎপাদনে, বাজার নিয়ন্ত্রণে এবং শ্রমিক শোষণে নিজেদের আধিপত্য বাড়ায়। তাদের হাতে পুঁজির ঘনীভবন ঘটে। এইভাবে ব্যর্থ পুঁজিপতিদের ক্রমশ অবসান হওয়ার ফলে সফল পুঁজিপতিদের সংখ্যা কমে। তাদের অবস্থান, ক্ষমতা ও প্রভুত্ব নিরঙ্কুশ হয়, একচেটিয়া কর্তৃত্বের (monopoly) আবির্ভাব ঘটে। মার্ক্স লিখেছেন যে ''একজন পুঁজিপতি অনেক পুঁজিপতিকে মারে'' (''One Capitalist kills many'')। সফল পুঁজিপতিরা তখন ট্রাস্ট (Trust–''combination of produces to do away with competition and keep up prices''), কার্টেল (Cartel—''industrial combination for the purpose of regulating prices, output'') ইত্যাদি গঠন করে তাদের পুঁজির বুনিয়াদকে মজবুত করে তাদের লড়বার ক্ষমতা বাড়ায়। (তিন) **ক্রমবর্ধমান দৈন্যর সূত্র** (The Law of Increasing Misery)—ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উপরে উল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলি চালু থাকার জন্য শ্রমিকদের দীনতা বৃদ্ধি পায়। নিজেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঁচিয়ে রাখতে পুঁজিপতিরা যতই মরিয়া হয় শ্রমিক শোষণ ততই বাড়তে থাকে। হয় শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্যকে আত্মসাৎ করে, না হয় শ্রমনিবিড় (labour intensive) ব্যবস্থা থেকে ক্রমশ পুঁজিনিবিড় (Capital intensive) অর্থাৎ যন্ত্রনির্ভর ব্যবস্থায় উপনীত হওয়ার চেষ্টার মধ্য দিয়ে পুঁজিপতিরা তাদের মুনাফার মাত্রাকে স্থির রাখার বন্দোবস্ত করে। এতে শ্রমিক দীন থেকে দীনতর হয়, সর্বহারা মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে এবং শেষকালে সমাজ একটা পিরামিডের আকার নেয় যেখানে মাথায় থাকে শীর্ষপর্যায়ের দু-একজন সফল বেপরোয়া, নিরঙ্কুশ পুঁজিপতি, আর নীচে থাকে ক্রমশ বিস্ফারিত হাহাকারে তলিয়ে যাওয়া সর্বহারার দল। এরজন্য কোন একজন পুঁজিপতিকে দায়ী করে লাভ নেই। এটি একটি ব্যবস্থা, একটি প্রক্রিয়া, একটি নিরন্তর চলমান অপ্রতিরোধ্য অর্থনীতি, এক নিরঙ্কুশ সমাজব্যবস্থার যান্ত্রিক প্রসারমাত্র।

যেমন অর্থনীতিতে মার্ক্স মূল্যের শ্রমতত্ত্বকে গ্রহণ করেছিলেন ইংরাজ অর্থনীতিবদদের কাছ থেকে সেই রকম তিনি জার্মান ধ্রুপদী দার্শনিকদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর দর্শনের হাতিয়ার তাঁর লজিক— যা দর্শনের ইতিহাসে **দ্বান্দ্বিকতা** বা ***Dialectic*** নামে বিখ্যাত।

২.৭ দ্বান্দ্বিকতা কী?

দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের মধ্য দিয়ে বিস্তার—এই হল দ্বান্দ্বিকতা (Dialectic)। ভাববাদী জার্মান দার্শনিক হেগেলের কাছে এবং পরবর্তীকালে মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর কাছে দ্বান্দ্বিকতা হল **দুই বিপরীতের মিলনের সূত্র**— ('the theory of the union of opposites')। মার্ক্স তাঁর **ক্যাপিটাল** ও **কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো** (*Communist Manifesto*) গ্রন্থে, এঙ্গেলস তাঁর **এন্টিডুরিং** (Anti-Duhring) ও **ডায়ালেকটিকস অফ নেচার** (*Dialectics of Nature*) গ্রন্থে এবং লেনিন তাঁর **নোটস অন হেগেলস্ লজিক** (*Notes on Hegel's Logic*) গ্রন্থে দ্বান্দ্বিকতার আলোচনা করেছেন।

মার্ক্স হেগেলের দ্বান্দ্বিকতা বা ডায়ালেকটিকের যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তা তিনটি সূত্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। (এক) **পরিমাণ থেকে বস্তুর গুণগত পরিবর্তন ও তার বিপরীতের সূত্র** (*The Law of Transformation of Quantity in Quality and vice versa*)—এই নিয়মের দ্বারা পরিমাণের গুণগত

রূপান্তর ও তদ্বিপরীতকে বোঝায়। বস্তুর পরিমাণগত পরিবর্তন যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটে যায় তবে এক সময় তার গুণগত পরিবর্তনেরও সূচনা হয়। এই পরিবর্তন একমুহূর্তে একটি বিন্দুতে এসে হঠাৎ করে হয়। এই অকস্মাৎ পরিবর্তনের বিন্দুটিকে হেগেল 'নোড' (Node) বলেছেন। জল তাপিত হলে ১০০° সেন্টিগ্রেডে সে হঠাৎ বাষ্প হয় বা তাকে শৈত্যের মধ্যে রাখা হলে ০° সেন্টিগ্রেডে তা হঠাৎ শিলিভূত হয়ে বরফ হয়ে যায়। একটা বিন্দু পর্যন্ত সমস্ত পরিবর্তন সত্ত্বেও জল জলই থাকে, কিন্তু পরের মুহূর্তে পরের বিন্দুতেই তা বাষ্প বা বরফ হয়। পরিমাণগত পরিবর্তনের এই বিন্দুটি হল নোড (Node)। এর থেকে একটা উল্লম্ফনের সাহায্যে পরিবর্তন ঘটে। এটি হল হেগেলের **উল্লম্ফন তত্ত্ব (Theory of Leap)**। মার্ক্স বলেছেন যে সমাজ জীবনে এই উল্লম্ফনই হল বিপ্লব। যেমন তাপ বা শৈত্যের প্রয়োগে জলের পরিবর্তন হয় সেরকম শক্তিশালী সমাজদর্শন, রাজনৈতিক আদর্শ ও অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা নিয়ে অগ্রসর হওয়া রাজনৈতিক দলের প্রভাবে সমাজে পরিবর্তন আনা যায়।

(দুই) **দুই বিপরীতের মিলন সূত্র** (*The Law of the Unity of opposites*) এটি একটি বিপরীতের ঐক্যের নিয়ম। এই নিয়ম স্বীকার করে নেয় যে যে-কোন অবস্থানে ঘটমান বা পুরাঘটিত বাস্তব সত্তা ও বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে একটি প্রকৃতিগত স্ববিরোধিতা রয়েছে। বাস্তবকে বিশ্লেষণ করলে দুটি জিনিস পাওয়া যাবে—একটিকে বলা যেতে পারে **থিসিস** (*Thesis*)। যা অস্তিত্বশীল, চলমান, একটি প্রত্যক্ষ অবস্থান ও তার বৈপরীত্য। তাকে বলা যেতে পারে **এন্টিথিসিস** (*Anti-thesis*)। থিসিসের অন্তর্নিহিত সত্য মেলে এন্টিথিসিসের অন্তর্লীন সত্যের সাথে। দুই সত্যের মিলনে জেগে ওঠে এক নতুন কিন্তু পূর্ণ সত্তা যাকে বলা যেতে পারে **সিনথিসিস** (*Synthesis*)। যেমন বিজ্ঞানে ইলেকট্রনের পরা ও অপরা মেরুর মিলন ঘটে ঠিক সেইভাবে সমাজ-জীবনেও যার অস্তিত্বশীল চলমান এবং তার ভেতরে যা পরিবর্তনকামী বিপরীত তা সমন্বয় ঘটে। মার্ক্স বলতেন যে বুর্জোয়া সমাজেও যেখানে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা কায়েম আছে সেখানেও পুঁজিপতিদের সঙ্গে শ্রমিকদের এই বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের শ্রম শোষণ না করে বাঁচতে পারে না আর শ্রমিকরাও পুঁজিপতিদের কাছে নিজেদের শ্রম বিক্রয় না করে বাঁচতে পারে না। এইভাবে শিল্পায়িত বুর্জোয়া সমাজে দুই বিপরীত শক্তির সমন্বয় প্রতিনিয়তই ঘটতে থাকে। (তিন) **অপলোপের অবলোপ তত্ত্ব** (*The Law of the Negation of the Negation*) এই সূত্রের প্রধান কথা হল থিসিস, এন্টিথিসিস ও সিনথিসিস (বাংলায় বলা হয় প্রস্তাব, বিপ্রস্তাব ও সমন্বয়) হল আসলে বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়, থিসিসের ভেতর থেকে তার স্ববিরোধিতার বৈপরীত্য তাকে বাধা দেয়, থিসিস ভেঙে পড়ে। এন্টিথিসিস প্রবল হয়। থিসিসের পর্যায়কে অবলুপ্ত করে এন্টিথিসিস নতুন পর্যায়ের উদ্বোধন ঘটায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেও মুছে যায় সিনথিসিসের আবির্ভাবে। এইভাবে একটি পর্যায়কে অবলুপ্ত করে আত্মপ্রকাশ করে ইতিহাসের নতুন পর্যায়। কিন্তু বিলীয়মান তার বৈধ উপাদান রেখে যায় উদীয়মানের অন্তঃকরণে যাতে নেতির পরে নেতি, অবলোপের পর অবলোপ ঘটলেও ইতিহাসের যোগসূত্র নষ্ট হয় না। এইভাবে ইতিহাসের ধারা চলে, তার কোন পর্যায়ই চিরন্তন হয় না, জীর্ণতার ভগ্নস্তূপকে সরিয়ে চলতে থাকে অবলোপের অবলোপ, নেতির নেতি। ইতিহাস এইভাবে শেষপর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় নিঃসীমভাবে ঋণাত্মক (negative), কিন্তু অফুরন্তভাবে দুই বিপরীতের মিলনে চলমান ধনাত্মক (positive)।

উপরে আমরা যা পড়লাম তা হল বস্তুকেন্দ্রিক মানবজীবনের দ্বান্দ্বিকতা যাকে বলা হয় **দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ**

(*Dialectical materialism*)। মনে রাখতে হবে যে মার্ক্স এবং এঙ্গেলস হেগেলের ভাববাদকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কিন্তু গ্রহণ করেছিলেন তাঁর দ্বান্দ্বিকতা। এই দ্বান্দ্বিকতাকেই তাঁরা জুড়ে দিয়েছিলেন তাঁদের বস্তুবাদের ধারণা যার থেকে জন্ম নিয়েছিল তাদের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। মার্ক্স তাঁর **ডাস ক্যাপিটাল** গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় একথা স্পষ্ট করে দিয়ে বলেছিলেন যে তাঁর দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি তাঁর নিজস্ব, হেগেলের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। হেগেলের মতে কোন চিরায়ত শক্তি এবং চিরন্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যখন মূর্ত হয় তখন তাকে আমরা বাস্তব বলি। বাস্তব জগৎ স্রষ্টার বা বিশ্ব-আত্মার (Idea) বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কিন্তু মার্ক্সের দ্বান্দ্বিকতা, মার্ক্স লিখেছেন, বিশ্বাস করে যে বস্তুময় বাস্তবতা যখন মানবচৈতন্যে প্রতিফলিত হয় তখনই আত্মার উদ্ভাস ঘটে। বস্তুময় অস্তিত্বেই আত্মা চিন্ময়। মার্ক্স তাঁর এই বস্তুবাদকে ইতিহাসেও ব্যবহার করেছিলেন। তার থেকেই জন্ম নিয়েছিল তংার **ঐতিহাসিক বস্তুবাদ** (*Historical Materialism*)।

২.৮ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হল ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা। আসলে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে যখন সমাজের মধ্যে কতগুলি মানব-সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তখনই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের জন্ম হয় [*Historical materialism, or the materialistic interpretation of history, is simply dialectical materialism applied to the particular field of human relations within society"*—R. N. Carew Hunt] মার্ক্স তাঁর **ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকনমি** (Critique of Political Economy) গ্রন্থের ভূমিকাতে বলেছেন যে, যে নীতি সমাজস্থ মানুষের তাবৎ সম্পর্ককে রূপ দেয় তা নিসৃত হয় একটি লক্ষ্য থেকে যে লক্ষ্যে সমস্ত মানুষ ধাবিত হয়, জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণের উৎপাদনই হল সেই লক্ষ্য। এর পরের লক্ষ্য হল উৎপনন দ্রব্যের বিনিময় অর্থাৎ বণ্টন। মার্ক্স এইভাবে ইতিহাসকে নিয়োজিত করলেন মানব সম্পর্কের দুই বস্তুময় লক্ষ্যে। তাহলে জীবন সংরক্ষণের জন্য অপরিহার্য উৎপাদন ('production of the means to support life') ও তদনুবর্তী বণ্টন ('the exchange of things produced')। প্রকৃতি মানুষকে দিয়েছে তার অপার সম্পদ এবং সেই সম্পদকে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম ও ব্যবহারিক দক্ষতা (labour and practical skill)। তা দিয়ে মানুষ তৈরি করে হাতিয়ার, তার শ্রমের দ্বারা নিষ্পন্ন সামগ্রী। মার্ক্সের ভাষায় এ সমস্ত হল **'উৎপাদক শক্তি** (*'Productive Forces'*) অর্থাৎ মানুষের সাথে বস্তুর সম্পর্কই হল উৎপাদক শক্তি। বস্তুর পরিমণ্ডলে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক হল **উৎপাদক সম্পর্ক** ('Productive Relation')। উৎপাদক শক্তির দ্বারা উৎপাদক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয়। এইখানেই মার্ক্স তাঁর ইতিহাসতত্ত্বকে বস্তুবাদ ও অর্থনৈতিক উপর দাঁড় করিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে উৎপাদক শক্তিই প্রধান। উৎপাদক শক্তির যখন পরিবর্তন হয় তখনই উৎপাদক সম্পর্কের পরিবর্তন হয়, তার আগে নয়। উৎপাদক শক্তি হল মানব অর্থনীতির বনিয়াদি ঘটনা, তাই অর্থনীতিই হল সমাজ সংগঠনের ভিত—অবতল, মার্ক্সের ভাষায় unterban (substructure), আর বাদবাকি যা আছে আইন, ধর্ম, নৈতিকতা, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য সব হল সমাজ সংগঠনের ঊর্ধ্বতল, মার্ক্সের ভাষায় Oberban (superstructure)। অবতল না বদলালে ঊর্ধ্বতল বদলায় না।

২.৯ শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্ব

মার্ক্সের মতে অর্থনীতির উপর দাঁড়িয়ে থাকা সমাজ শ্রেণী বিভক্ত। আদিম যুগে প্রকৃতির সমস্ত রসদ, মানুষের তৈরি সমস্ত হাতিয়ার—means of production—মানুষের শ্রমের সমস্ত ফসল—সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণ করত সমাজ, প্রকৃতির দান, শ্রমের ফসল সবাই ভাগ করে নিত সমানভাবে। একে মার্ক্সীয় ভাষায় বলা হয় উৎপাদনের সরঞ্জাম ও হাতিয়ার—জমি ও বস্তুর—সামাজিক অধিকার স্বত্ব (communal ownership of the means of production)। কিন্তু সভ্যতার আদিপর্বে কিছু মানুষ এই অধিকার স্বত্ব দখল করে নিল। তারা হল প্রভু, আর সব মানুষ হল দীন, হীন, অকিঞ্চন। প্রভুর নিয়ন্ত্রণাধীন জমি ও রসদ, হাতিয়ার ও সরঞ্জাম হল তার সম্পত্তি। এইভাবে জন্ম হল ব্যক্তি সম্পত্তির (Private Property)। যা হল সভ্যতার আদিতম বিকৃতি। আর এই বিকৃতির ফলে সমাজ শোষক শোষিত, মালিক শ্রমিক, অধিকার ও অনধিকারী (Have-s and Have-nots) এই দুই বিবদমান দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। উৎপাদনের হাতিয়ার ও সরঞ্জাম, জমি ও পুঁজি নিয়ন্ত্রণ করা আর না করা হয়ে দাঁড়াল একটি নিরিখ যার ভিত্তিতে সমাজ বিভক্ত হল দুই শ্রেণীতে পাওয়া আর না পাওয়া শ্রেণী যারা দাঁড়াল মুখোমুখি একে অন্যের বিরোধী শক্তি হিসাবে, সতত দ্বন্দ্বময়, নিরঙ্কুশ লড়াইয়ের বিরতিহীন অংশগ্রহণকারী দুটি যুযুধান মানবগোষ্ঠী রূপে। এইভাবে সমাজ আপসহীন বিরোধের (irreconcilable contradiction) মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হল। এর পর থেকে সমাজের লক্ষ্য হল একটাই—শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের আদি বিকৃতিকে উচ্ছেদ করে প্রকৃত ইতিহাসের সূচনা করা।

মার্ক্স ১৮৪৮ সালে তাঁর **কমিউনিস্ট ইস্তেহার** (*Communits Manifesto*) গ্রন্থে এই শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এইটি কোন গ্রন্থ নয়, একটি পুস্তিকামাত্র যা একটি মহাদেশীয় বিপ্লবের প্রেক্ষিতে রচিত হয়েছিল। এই পুস্তিকায় বুর্জোয়া শ্রেণীর উত্থান ও বিস্তারের প্রেক্ষিতে বিশ্বসভ্যতার অগ্রগতি ও শ্রেণী সংগ্রামের ঘনীভবনের কথা বলা আছে। এই পুস্তিকার প্রথম বাক্যটি মার্ক্সবাদের অমর উক্তি : "**এ-যাবৎ কালের সমস্ত প্রচলিত সমাজের ইতিহাসই হল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস**" [The history of all hitherto existing society is the history of class struggles"]। মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর কাছে শ্রেণীই হল ইতিহাসের একক, জাতি নয়। কান্ট, ফিক্‌টে, হেগেল প্রমুখ দার্শনিকরা জাতিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন বলেছিলেন যে ইতিহাস পরিণতি লাভ করে রাষ্ট্রের অঙ্গনে জাতিসত্তার মধ্য দিয়ে। হেগেলের মতে ইতিহাসের পরিচালিকা শক্তি হল '**ভাব**' (*Idea*) যা আসলে একটি বিশ্বসত্তা (*Univversal spirit*)। বিমূর্ত ভাব জাতিতে মূর্ত হয়। মার্ক্স বললেন ইতিহাসর পরিচালিকা শক্তি অর্থনীতি, তার রূপ দ্বান্দ্বিক, তার বিষয় সংঘাত ও দ্বন্দ্ব, তার গতি ঊর্ধ্বমুখী ও ঘূর্ণায়মান (Spiral) এবং তার লক্ষ্য চিরন্তনভাবে এক, শোষককে ধ্বংস করে শোষিতকে মুক্ত করা। এই লক্ষ্যে দরকার হয় আদর্শ (Ideology) ও সংগঠন বা দল (party)। এ লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ একটাই, শ্রেণী সংগ্রাম। তাই শ্রেণী সংগ্রাম অপ্রতিরোধ্য (irresistible) এবং অপ্রত্যাবর্তনীয় (irreversible)। মার্ক্স বলেছেন যে প্রত্যেক মানুষই জন্মায় এক একটি শ্রেণীর মধ্যে, বড় হয় সেই শ্রেণীর পরিমণ্ডলে, তার চৈতন্যে বিধৃত থাকে সেই শ্রেণীরই সংস্কৃতি। ইতিহাসের লক্ষ্য আর চলমানতার মধ্যে রয়েছে এক অনির্দেশ্য অনিবার্যতা (inevitability) এবং অবধারিত প্রাক্‌নির্ণয়তা (Predeterminism)। প্রত্যেক মানুষের

শ্রেণীর ভেতর যে অবস্থান তা তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ, প্রাক্‌নির্ণীত। ইতিহাসের লক্ষ্য স্থির, অতীত থেকে বয়ে আনা পরম্পরাগতভাবে শোষকের বিরুদ্ধে লড়াই। এ লড়াইয়ের পদ্ধতিও স্থির দ্বান্দ্বিক। এর রূপও আবহমান কালের ধারাবহিকতায় নিশ্চিত শ্রেণী সংগ্রাম। এর কালান্তরের উদ্দেশ্যেই এক এবং অমোঘ, ইতিহাসের আদিম বিকৃতিকে মুছে দিয়ে প্রকৃত ইতিহাসের আরম্ভের দিকে যাওয়া শ্রেণীহীন সমাজ তৈরি করা যে সমাজে ব্যক্তি সম্পত্তির বিসর্জন ঘটবে, উৎপাদনের সমস্ত রসদ ও হাতিয়ার সমস্ত সমাজের হাতে থাকবে। এঙ্গেলস প্রথম তাঁর এন্টিডুরিং-এ বলেছেন যে এইটিই হবে সেই আদর্শ পরিবেশ যেখানে মানুষের উপর মানুষের শাসন মুছে গিয়ে সেখানে আসবে বস্তুর উপর মানুষের প্রশাসন। এই শ্রেণীহীন সমাজই হবে সমাজতন্ত্রের (Socialism) প্রথম পর্যায়। এর পর রাষ্ট্রও আস্তে আস্তে মুছে যাবে (the state will wither away)। মানুষ বাস করবে মুক্ত দুনিয়ায়। মার্ক্স বলেছেন যে এ যাবৎকাল পর্যন্ত চার রকমের উৎপাদন ব্যবস্থা দেখা গেছে। আর রাষ্ট্রের রূপও তৈরি হয়েছে তার সাথে সঙ্গতি রেখে। এগুলি হল আদিম-সামাজিক (primitive-communal), দাস-নির্ভর (slave), সামন্ততান্ত্রিক (feudal), পুঁজিবাদী (Capitalist)। আরেকটি ব্যবস্থা আছে প্রত্যামন্ন— সমাজতান্ত্রিক (socialist)। প্রথম ব্যবস্থায় উৎপাদনের মাধ্যমগুলি (means of production) নিয়ন্ত্রণ করত কোন ব্যক্তি নয়, সমাজ। দ্বিতীয়টিতে নিয়ন্ত্রণ করত দাসের মালিকরা (salve owners)। তৃতীয়টিতে সামন্ততান্ত্রিক প্রভুরা তা নিয়ন্ত্রণ করত। আর চতুর্থটিতে যা বর্তমান ও চলমান— তাতে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি ও শ্রম, জমি ও রসদ নিয়ন্ত্রণ করে পুঁজিপতিরা যাদের মার্ক্স বুর্জোয়া (bourgeoisie) বলেছেন। এদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে প্রলেটারিয়তরা (proletariat) যারা নিঃস্ব, যাদের শ্রম ছাড়া আর কোন রসদ নেই যা দিয়ে তারা বাঁচতে পারে। সারা পৃথিবীর নিঃস্ব শ্রমিকরা একই শ্রেণীভুক্ত, তাদের ঐক্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে নতুন পৃথিবী গড়ার সম্ভাবনা। তাই মার্ক্স ডাক দিয়েছিলেন 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' (Workers of the world unite)। বুর্জোয়া পুঁজিপতিরা শোষণের যে যুগ কায়েম করেছে তা শ্রেণীবিভক্ত ইতিহাসের শেষ যুগ, বিকৃত ইতিহাসের সমাপ্তির আগের যুগ (penultimate stage of history) । মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা দুই বিপরীত শ্রেণীর দ্বন্দ্ব শেষ হবে কোন আপসে নয়— বুর্জোয়ার পতনে, পুঁজিবাদের অবসানে, প্রলেতারিয়তের একনায়কত্বের (Dictatorship of the proletariat) উত্থানে। এই একনায়কত্বের উত্থান, তার মধ্য দিয়ে শোষণের অবসান ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রশমন— এ সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে জাগবে স্বাধীন মানুষের বেঁচে থাকার মুক্ত অঙ্গীকার। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন ইতিহাস হয়ে থাকবে দুই বিপরীতের চলমান ভারসাম্য।

২.১০ ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা এক ছিল না। ইংল্যান্ডের জনচেতনায় বিপ্লবমুখিনতার অভাব ছিল কারণ সেখানে ক্রমাগত সংস্কারের (reforms) মাধ্যমে সমাজের চাহিদা পূরণের চেষ্টা চলত। ফ্রান্সের রাজতান্ত্রিক সরকার সংস্কার বিমুখ ছিল বলে বারবার সেখানে বিপ্লব হয়েছে, আর প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। প্রথমবার হয়েছে আঠারো শতকের শেষে ফরাসী বিপ্লব চলার সময়ে (১৭৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৮০৪ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির সম্রাট হওয়ার সময়ের মধ্যে), দ্বিতীয়বার হয়েছে ১৮৪৮-এর বিপ্লবের পর (১৮৪৮-১৮৫২) এবং তৃতীয়বার হয়েছে ১৮৭০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানির (প্রাশিয়া) কাছে ফ্রান্সের

পরাজয়ের পর। প্যারিস ছিল ফ্রান্স তথা ইউরোপের বিপ্লবের কেন্দ্রস্থান। জার্মানি অপরাভূত রাজতন্ত্র অখণ্ড দাপট নিয়ে রাজ্যপাট চালাত। ফলে সেখানেও অসন্তোষ ধূমায়িত হয়েছিল। আর রাশিয়ার জারতন্ত্র নির্মম শাসনে সেখানকার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সেখানে বিপ্লব এসেছিল বিংশ শতাব্দীর শুরুতে (১৯০৫ সালে) এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সময়ে (১৯১৭ সালে)। সাধারণভাবে শিল্প-বিপ্লব ছাড়াও প্রত্যেক দেশের অভ্যন্তরীণ নানা সমস্যা ছিল যার উপর ভিত্তি করে সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ এর মধ্যে ইউরোপে পরিবর্তনপন্থী ও পরিবর্তন -বিরোধী শক্তির মধ্যে নিরন্তর সংগ্রাম চলছিল। এই সংগ্রাম ক্রমশ একটা দ্বান্দ্বিক রূপ নিচ্ছিল। একদিকে প্রতিক্রিয়ার দমন-নিপীড়ন অন্যদিকে বিপ্লবের উত্থান এই দুই-বিপরীতের মধ্য থেকে ইতিহাস তার রাস্তা করে নিচ্ছিল। ১৭৮৯ সালের পর ইউরোপের ইতিহাসের রাজনৈতিক দ্বান্দ্বিকতা—পরিবর্তনের দাবি ও অপরিবর্তনীয় স্থবিরতার সংগ্রাম—১৮৪৮ সালে একটি শিখরে পৌঁছাল। মনে রাখতে হবে যে ১৭৮৯ থেকে ১৮১৫ সালের মধ্যে ইউরোপের যে রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছিল তার থেকে শক্তি সঞ্চয় করেছিল জাতীয়তাবাদ ও উদারপন্থা। আর উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শিল্প-বিপ্লবের আপাত জৌলুসের অন্তরালে সঞ্চিত হিংস্রতা থেকে জন্ম নিচ্ছিল সমাজবাদ। আলোড়িত হচ্ছিল কৃষক-কারিগর শ্রমজীবী মানুষ। ফরাসী বিপ্লব সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করেছিল, চার্চের ক্ষমতাকে খর্ব করেছিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়ার ক্ষমতাকে কায়েম করেছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা আর সাম্য বুর্জোয়া চেয়েছিল এবং পেয়েওছিল। এবার সমাজবাদের প্রবক্তারা চাইল অর্থনৈতিক সাম্য ও পীড়িত দলিত স্খলিত মানুষের জন্য ক্ষমতা। দীর্ঘদিন ধরে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ফলে বিশেষ করে রিফর্মেশনের প্রভাবে এবং পার্লামেন্টে জনগণের প্রতিনিধিত্বের উত্থানে সেখানে চার্চের, রাজতন্ত্রের এবং অভিজাততন্ত্রের ক্ষমতাকে খর্ব করা সম্ভব হয়েছিল। সেখানে শাসনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল সংস্কারের কর্মসূচি ফলে যে ধরনের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ফ্রান্স, জার্মানিতে বা রাশিয়ায় হয়েছিল সে ধরনের আন্দোলন ইংল্যান্ডে হয়নি। ফ্রান্স, জার্মানি ও রাশিয়াতেও সমাজবাদী আন্দোলনের প্যাটার্ন এক ছিল না। তা কীরকম ছিল তা এবার আমরা আলোচনা করব।

ইংল্যান্ড : যেভাবে ফ্রান্সে, জার্মানিতে এবং পরবর্তীকালে রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করেছিল সেভাবে ইংল্যান্ডে কখনে সে আন্দোলন দেখা দেয়নি। সেখানে আন্দোলন প্রথম পর্যায়ে ওয়েনবাদ অর্থাৎ রবার্ট ওয়েনের মতবাদকে কেন্দ্র করে সমবায় ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দিকে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে তা **সনদবাদী** (Chartist) আন্দোলনের রূপ নেয়। **শিল্প-বিপ্লবের** ফলে যে বৃহদায়তন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং নিশ্ছিদ্র শ্রমিক শোষণের ব্যবস্থা হয়েছিল ওয়েন তার সমালোচনা করেন। তিনি যে কোন প্রতিষ্ঠিত ধর্মকেও নিন্দা করেছিলেন কারণ ধর্ম মানুষকে শেখায় যে তার মন্দভাগ্যের জন্য সেই দায়ী, মন্দ পরিপার্শ্বের কথা তাকে বুঝতে দেয় না। সেইজন্য ওয়েন মানুষের নৈতিক সংস্কার নয়, সামাজিক সংস্কারে ব্রতী হন। তিনি মানুষকে প্রতিযোগিতার পথ থেকে সরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন কারণ প্রতিযোগিতা মানুষকে শোষণের পথে নিয়ে যায়। ওয়েন চেয়েছিলেন সমবায় আন্দোলন—যৌথ জীবন, যৌথ শ্রমদান ও যৌথভাবে শ্রমের ফসল ভোগের পরিকল্পনায় সমবায়িত জীবন। তাঁর লক্ষ্য ছিল সমবায়িত গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা।

শ্রমিকরা ওয়েনের মতবাদের দ্বারা আকৃষ্ট হতে শুরু করলে ইংল্যান্ডের একটি নতুন শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। ১৮৩০ থেকে ১৮৪৮ এর মধ্যে ওয়েন একজন শ্রমিকনেতায় পরিণত হন। ইংল্যান্ডে একটা বিরাট ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল শ্রমিক মুক্তি। আন্দোলনকারীরা একথা বিশ্বাস করত যে সমবায়ী উৎপাদক সমিতি ও শ্রম কেন্দ্র গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের মুক্তি আসবে। শ্রমিকরা গড়ে তুলতে পারবে শ্রমবিনিময় কেন্দ্র যা শ্রমসময়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেখানে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় ঘটবে। শ্রমিক ও সমচিন্তার মানুষদের নিয়ে ওয়েন গড়ে তুলেছিলেন **গিল্ড অফ বিল্ডার্স** (*Guild of Builders*) এর মতো বৃহৎ জাতীয় সঙ্ঘ। আশা ছিল এরকম সঙ্ঘ শিল্পের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার ভার হাতে তুলে নিয়ে পুঁজিপতিদের শোষণ থেকে শ্রমিকদের মুক্তি দেবে। ওয়েনের এই স্বপ্ন সার্থক হয়নি, শ্রমিকদের এ আন্দোলনও বেশিদূর এগোতে পারেনি। ১৮৩৪ সালে এ আন্দোলন শেষ হয়ে যায়। এরপর থেকে ওয়েনবাদী আন্দোলন গ্রাম-সমবায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে। উনিশ শতকের শেষ থেকেই ওয়েনবাদের অবসান হতে থাকে।

ওয়েনবাদী আন্দোলন শেষ হওয়ার পর ইংল্যান্ডে আত্মপ্রকাশ করে সনদবাদী (chartist) আন্দোলন। এই আন্দোলন ১৮৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে আরম্ভ হয়। **হুইগ** (whig) সরকারের ব্যর্থতার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর হতাশা ও ক্ষোভ থেকে এই আন্দোলনের জন্ম হয়। রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়েছিল বলে বলা হয়ে থাকে যে এইটিই প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন। এইটিই প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন বলে একেই ইংল্যান্ডে শ্রমিক দলের অগ্রদূত বলা হয়ে থাকে। এই সংগঠনের শাখা ছিল ইংল্যান্ডের সব জায়গায়, এমনকী আয়ারল্যান্ডেও। এর লক্ষ্য ছিল সংসদীয় ব্যবস্থাকে এমনভাবে পরিবর্তন করা যাতে শ্রমিক দল ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে আসতে পারে। ['with branches all over Britain, including Ireland, it Äimed to change the parliamentary system so that the working classes would be in control"–*Mastering Modern British History,* Norman Lowe, p. 65]` সনদবাদীরা (The chartists) একটি ছয়দফা দাবি সনদ তৈরি করেছিল। একে বলা হত **জনগণের সনদ** (People's charter) ১৮৩৯, ১৮৪২ ও ১৮৪৮ সালে তিনবার পার্লামেণ্টের কাছে আবেদনের (petition) আকারে এই দাবি পেশ করা হয়েছিল। দশ লক্ষের অধিক মানুষ এই আবেদনে স্বাক্ষর করেছিল। তিনবার হাউস অফ কমন্স-এর সভায় তা বাতিল হয়ে যায়। প্রত্যেকবার বাতিলের পর ইংল্যান্ডে দাঙ্গা শুরু হয়ে যেত। ১৮৪৮ সালের তৃতীয়বার বাতিল হওয়ার পর আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। সনদবাদী আন্দোলনের (The Chartist Movement) উদ্ভব হয়েছিল অর্থনৈতিক মন্দা থেকে। ১৮৩৪-এর দরিদ্রের আইন (Poor Law) থেকে যে দুর্গতির সূচনা হয়েছিল তা গড়িয়ে ছিল চল্লিশের দশক পর্যন্ত। একদিকে শিল্পের মন্দা আর অন্যদিকে খাদ্যাভাব সবমিলিয়ে 'ক্ষুধার্ত চল্লিশের দশক' ছিল ভয়াবহ। এই ভয়াবহতার মধ্যে সনদবাদের (chartism) বিকাশ ও ব্যর্থতা যদিও তার সূচনা হয়েছিল তিরিশের দশকের মাঝামাঝি। সনদবাদী বিদ্রোহ হল ক্ষুধার বিদ্রোহ। তার কোন তাত্ত্বিক ভিত্তি ছিল না, ছিলনা অর্থনৈতিক কর্মসূচি। ফলে এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

ফ্রান্স : ১৮৩০ থেকে ১৮৪৮ সালের মধ্যে **লুইফিলিপ**-এর (Louis Philippe) রাজত্বকাল সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ফ্রান্সে বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের অন্তর্নিহিত পরিবর্তনের যে ধারা তা একটা সীমার মধ্যে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। জাতীয় জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে গণতান্ত্রিক পথে প্রবাহিত করার

কোন বাসনা বুর্জোয়া শ্রেণী দেখাতে পারেনি। ফলে খুব সহজেই নেপোলিয়নের পতনের পর পুরানো ব্যবস্থা ফিরে এসেছিল। এ ব্যবস্থা ছিল রাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা। কিন্তু সে ব্যবস্থা যতই শক্তিশালী হোক শেষপর্যন্ত তা ছিল রাজতান্ত্রিক। ফরাসী বিপ্লব রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে ফিরে আসা রাজতন্ত্র মানুষের মনের সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করে নিজের অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি।

১৭৮৯ সালে বিপ্লবের সময়ে জনগণ মনে করেছিল যে রাজার চরম ক্ষমতা (absolute power) এবং অভিজাততন্ত্রের অফুরন্ত সুবিধা (Privilege) ও অধিকার ধ্বংস করা যায় তবে জনগণের মঙ্গল হবে। তাদের এ আশা আংশিকভাবে পূর্ণ হয়েছিল। ১৮১৫ সালে দেশে শান্তি ফেরার সময় থেকে নতুন করে শিল্পায়ন দেখা দিয়েছিল। এই শিল্পায়ন ইংল্যান্ডে এসেছিল আঠারো শতাব্দীতে। এবার ফ্রান্সে এল উনিশ শতাব্দীতে যখন ফ্রান্সের রাজনৈতিক কাঠামরে মধ্যে নির্মম রক্ষণশীলতা কাজ করছিল। এরই মধ্যে এল ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা ইংল্যান্ডে যে দুর্গতি এনেছিল ফ্রান্সেও নিয়ে এল সেই দুর্গতি—শ্রমিক শোষণ ও বেকারি, নিঃস্ব মানুষের ঘিঞ্জিবসতি এবং সুষ্ঠু সাফাই (sanitary) ব্যবস্থার অভাবে রোগ ও মারী। এর সাথে এল পরিকল্পিত শ্রমিক শোষণ—ন্যূনতম মজুরিপ্রদান, দিনে রাতের দীর্ঘসময় বাধ্যতামূলক শ্রমদান, শিশুশ্রমিক নিয়োগ, মহিলা শ্রমিকদের কম মজুরি ইত্যাদি। এই কষ্টের থেকে মানুষদের মধ্যে এই বোধ জন্মাতে লাগল যে শুধু রাজনৈতিক বিপ্লবই যথেষ্ট নয়, সমাজকে বদলে দিতে না পারলে জনগণের দুঃখ দুর্দশা কমবে না। যাতে সমাজের সমস্ত লাভ ও সমস্ত সুবিধা মুষ্টিমেয়র হাতে না যায়। যে কোন সমাজতান্ত্রিক দর্শনের এইটিই ছিল মূল কথা। ফ্রান্সে এই দর্শনের মূল প্রবক্তা ছিলেন লুই ব্লাঁ (Louis Blanc)। তিনিই প্রথম অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছিলেন যে রাষ্ট্রের উচিত কর্মশালা প্রতিষ্ঠা করা যেখানে কর্মহীন মানুষ কাজ পাবে আর তার কাজের পরিশ্রমিক তাকে মিটিয়ে দেবে রাষ্ট্র। এইভাবে শ্রমজীবী মানুষই কর্মশালাকে (workshop) গুছিয়ে রাখবে। তার তত্ত্বাবধান করবে এবং তার লাভ সমানভাবে ভাগ করে নেবে। এইভাবে তিনি মনে করতেন ব্যক্তি মালিকরা যারা গরীবের শ্রমে ফুলে উঠছে তারা মুছে যাবে। [" ...Louis Blanc who in 1839 published pamphlet called *The Organization of Labour* ... claimed that every man had the right to work and that the state should organize workshops where every unemployed man could find work for which he was to be paid by the state. The workpeople were to manage the workshops and share the profits : in this way, he claimed, the private employer, waxing rich on the labour of the poor, would disappear"–S. Reed Brett, *Modern Europe, 1789-1939.* p. 134]

লুই ব্লাঁকে ফ্রান্সের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী বলা যাবে না— তাঁর কাজই ফ্রান্সের প্রথম সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি ছিল না। ১৮৩১ সালে ফ্রান্সের অন্তর্গত লাইয়ঁর তাঁতিরা বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহই ফরাসী প্রলেতারীয় আন্দোলনের প্রারম্ভিক বিন্দু। লুই-ব্লঁ-র থেকেও অনেক বেশি বিপ্লবী মানুষ ছিলেন **লুই ওগুস্ত ব্লাঁকি** (*Louis Auguste Blanqui—1805-81*)। ফরাসী বিপ্লবের জ্যাকোবিনবাদের দ্বারা (*Jacobinism*) প্রভাবিত হয়েছিল লুই ব্লাঁকির বিপ্লবীদল। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দল যিনি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন তিনি হলেন **বাবউফ** (Babeuf 1760-1767)। বাবউফ ঘোষণা করেছিলেন যে 'প্রকৃতি তার সমস্ত সম্পদকে ভোগ করার অধিকার প্রত্যেক মানুষকেই দিয়েছে' ('Nature has granted to every man the equal right to

enjoy all her goods')। ব্লাঁকি ও তাঁর দলের উপর বাবউফের প্রভাব ছিল গভীর। ব্লাঁকি গোপন তৎপরতা পছন্দ করতেন এবং বিপ্লব শুধুমাত্র আত্মনিবেদিত পেশাদারী বিপ্লবী রাজনীতিবিদদের কাজ একথা বলে তিনি এবিষয়ে লেনিনের উত্তরসূরি হয়েছিলেন। বাবউফের একজন সক্রিয় শিষ্য **ফিলিপো বুওনারোত্তির** (*Filippo Buonarroti* -তিনি ছিলেন মিকেলেঞ্জেলোর বংশধর) সংস্পর্শে এসে তাঁর মাধ্যমে **কার্বোনারি** (carbonari) নামে এক ইতালীয় গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি নিজেও গুপ্ত সমিতি গড়ে ছিলেন। কিন্তু এই গুপ্ত সমিতিগুলির কোন জনসংযোগ ছিল না। ফলে ১৮৩৯ সালে গুপ্ত সমিতির দ্বারা অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তার ফলে ব্লাঁকি ৪০ বছরেরও বেশি তাঁর অবশিষ্ট জীবন কারাগারে কাটান। ১৮৮১ সালে কারাগারের বাইরে মুক্ত মানুষরূপে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ব্লাঁকির চিন্তায় দুটি দিক ছিল যা একদিকে ফরাসী সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতাকে সূচিত করে এবং অন্যদিকে যা রুশ সমাজতন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ব্লাঁকির কোন বিজ্ঞান ভিত্তিক তত্ত্ব ছিল না। তিনি ট্রেড ইউনিয়নে বিশ্বাস করতেন না এবং সমাজব্যবস্থার সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে দিতে চাইতেন আর বিশ্বাস করতেন যে ধর্মকে ধ্বংস না করলে প্রগতির পথ রুদ্ধ হবে। এরকম বোধ প্রায় নৈরাজ্যের (anarchism) চর্চামাত্র। এর থেকে সমাজতন্ত্রের সুষ্ঠু, বিজ্ঞানসম্মত, বাস্তবভিত্তিক কোন কর্মসূচি গড়ে উঠতে পারে না। অন্যদিকে ব্লাঁকির কর্মতৎপরতার মধ্যে যে গোপনীয়তা, ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা ও পেশাদারী বিপ্লবীয়ানার ছাপ ছিল তা পরবর্তী কালে লেনিন ও রুশ সমাজতন্ত্রকে প্রভাবিত করেছিল।

লুই ফিলিপের রাজত্বকালে সমাজতন্ত্রে আস্থাবান ফরাসী জনগণ অনেক বেশি অনুসরণ করত লুই ব্লাঁকে এবং তার সাথে হয়তো বা **পিয়ের জোসেফ প্রুধোঁকে** (Pierre Joseph Proudhon)। প্রুধোঁ ছিলেন প্রকৃত অর্থে নৈরাজ্যবাদী যদিও তিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলে চিহ্নিত করতেন। লুই ব্লাঁ ছিলেন ফ্রান্সের সোস্যাল ডেমোক্র্যাট মতবাদের প্রকৃত প্রবর্তক। ফরাসী সমাজতন্ত্রের বিবর্তনে তাঁর অবদান অনন্য সাধারণ।

জার্মানি ঃ জার্মানিতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক দল প্রতিষ্ঠা করেন **ফার্ডিনান্দ লাসাল** (*Ferdinand Lassalle*)। তাঁর অপূর্ব সাংগঠনিক প্রতিভা, বাগ্মীতা আর কর্মকুশলতার জন্য সমাজতান্ত্রিক দল জার্মানির বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত প্রসারলাভ করে। ১৮৪৮ সালে মার্ক্স যখন কোলনে (Cologne) **ন্যু রেইর্নিশ জাইতুং** (*News Rheinische Zeitung*) নামে সরকার বিরোধী পত্রিকার সম্পাদনা করছিলেন তখন তিনি মার্ক্সের সঙ্গে যুক্ত হন। পরের বছরই অতিবিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং এর পরের দশ বছর মার্ক্সের সঙ্গে আর তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। ১৮৬৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পর লাসাল-সৃষ্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব গিয়ে পড়ে **জোহান ফন সোয়াইৎসারের** (Johann von Schweitzer) উপর। ১৮৬৩ সালে লাইপজিগ (Leipzig) শহরে **আরবেইটারবুন্দ** (Arbeiterbund) নামে আরেকটি সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের জন্ম হয়। মার্ক্সের শিষ্য **আগষ্ট বেবেল** (August Bebel) এবং **উইলহেলম লাইবনেক্ট** (Wilhelm Leibnecht) এই সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে যে সরকার বিরোধী পত্রিকা সম্পাদনা করার জন্য মার্ক্স সরকারের রোষে পতিত হন এবং জার্মানি ত্যাগ করে প্যারিসে গমন করেন। সেখানেও সমাজতন্ত্রীদের নিয়ে শ্রমিক আন্দোলনে উস্কানি দেবার জন্য তিনি সরকারের বিরাগভাজন হন এবং শেষপর্যন্ত প্যারিস ত্যাগ করে প্রথমে ব্রাসেলসে এবং পরে লন্ডনে বসবাস করতে থাকেন। এরফলে জার্মানির সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে মার্ক্স বড় কোন ভূমিকা নিতে পারেননি।

আরবেইটারবুন্দ প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুব শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। ১৯৬৮ সালে এই সংগঠন ইন্টারন্যাশনালের সাথে নিজের যোগ স্থাপন করে। এই শেষোক্ত সংস্থার পুরো নাম **ইন্টারন্যাশনাল ওয়ারকিং মেনস্ এসোসিয়েশন** (*International Working Man's Association*)। ইতিহাসে তা প্রথম **ইন্টারন্যাশনাল** বা আন্তর্জাতিক নামে (First International) বিখ্যাত হয়। মার্ক্স এই সংগঠন তৈরি করেছিলেন কারণ তিনি মনে করতেন যে নিজেদের স্বার্থে শ্রমিকরা এক হবে এবং তাদের হওয়া উচিত। এই লক্ষ্যকে চরিতার্থ করার জন্য তিনি এই সংগঠন তৈরি করেন।

১৮৬৯ সালে আরবেইটারবুন্দ তার নাম বদলে নিজেকে সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলে পরিণত করে। তখন তার নাম হয় **সোজিয়ালডেমোক্র্যাটিশ আরবেইটার পারটেই** (*Sozialdmokratische Arbeiterpartei*)। যেহেতু আইসেন্যাক (Eisenach) নামক স্থানে পার্টি কংগ্রেসে এই নাম পরিবর্তন হয়েছিল বলে এর সদস্যদের বলা হত **আরসেন্যাকার্স** (*Eisenachers*)। এদের বিপরীত ছিল লাসালের দল। তাদের বলা হত **লাসালিয়ানস্** (Lassalleans)। ১৮৭৫ সালে গোথা কংগ্রেসে (Gotha Congress) এই দুই দল তাদের আন্দোলনের দুই ধারাকে মিলিয়ে দিল, আর দুই দল সম্মিলিতভাবে হয়ে দাঁড়াল **সোজিয়ালিসটিস আরবেইটার পারটেইডয়েসল্যান্ডস** (*Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands*)। যে কর্মসূচি নিয়ে এই সংযুক্তিকরণ ঘটল তাতে মার্ক্সের আপত্তি থাকলেও তা গ্রাহ্য হয়নি। ১৮৯১ সালে এরফুট (Erfurt) কংগ্রেসে এই সংযুক্তদলের নতুন নামকরণ হয়, পুরানো নামের থেকে শুধু আরবেইটার শব্দটি তুলে দেওয়া হয়। এই কংগ্রেসে যে কর্মসূচি দেওয়া হয়েছিল তাতে এঙ্গেলস -এর কিছু কিছু আপত্তি থাকলেও, মোটামুটিভাবে একটি গ্রাহ্য মার্ক্সবাদী কর্মসূচিই গ্রহণ করা হয়েছিল।

সমাজতন্ত্রের অগ্রগতিতে একটা বড় দিগন্ত খুলে গিয়েছিল কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে। ১৮৬৪ সালের প্রথম ইন্টারন্যাশন্যালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে সদস্যরা এসেছিলেন। এই সংগঠনের নিয়ম শৃঙ্খলা মার্ক্সই রচনা করে দিয়েছিলেন। ইউরোপের বিভিন্ন শহরে এর অধিবেশন হয়েছিল। ১৮৬৮ থেকে মার্ক্সবাদী সমাজতন্ত্রীরা **বাকুনিন** (Bakunin)-এর নেতৃত্বে নৈরাজ্যবাদীদের প্রভাবে পড়েছিল। কিন্তু মার্ক্স নৈরাজ্যবাদ পছন্দ করতেন না। তাই যেমন লাসালের সাথে ঠিক সেইরকম বাকুনিন—এর সাথেও তাঁর বনিবনা হয়নি। ১৮৭২ সালে মার্ক্স বাকুনিনের দলকে ইন্টারন্যাশনাল থেকে বহিষ্কার করে দেন। এই বহিষ্কারের ফলে প্রথম ইন্টারন্যাশনাল স্তিমিত হয়ে যায় ("with that expulsion, however,, the first International lost vitality and it died of inanition after a congress at Geneva in 1874"—Ketelbey)। এর পর দুবার—১৮৮৯ এবং ১৯৯০ সালে, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় ইন্টারন্যাশন্যাল প্রতিষ্ঠা করে সমাজতন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক বা ইন্টারন্যাশনালকে রুশ সমাজতন্ত্রীরা চালু করেছিলেন এবং মস্কোতে (Moscow) এর সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তৃতীয় ইন্টারন্যাশনালে প্রথমটির মতো কঠোর, রক্ষণশীল ধ্রুপদী মার্ক্সবাদের বিপ্লবী চেহারাকে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল বিশ্বব্যাপী বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করা। এইভাবে যখন মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্র বিশ্ববিপ্লবের পথে অগ্রসর হচ্ছিল তখন ফ্রান্সে মার্ক্সবাদের প্রতিহত হচ্ছিল **সিন্ডিক্যালবাদের** (Syndicalism) দ্বারা। সিন্ডিক্যালিস্টরা মার্ক্সবাদীদের মতো শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাস করত, শুধু তারা মনে করত যে প্রলেতারিয়তের একনায়কত্ব এক নতুন স্বৈরাচারের সূচনা করবে। তাতে মানুষের মঙ্গল হবে না। জার্মানিতে দীর্ঘদিন ধরে লাসাল প্রবর্তিত সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল মার্ক্সবাদী কর্মসূচির

মূল বৈশিষ্ট্যগুলি মেনে চলছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বার্ণস্টেইন-এর (Bernstein) নেতৃত্বে 'সংশোধনবাদ' (Revisionism) এই নামে এক নতুন মতবাদ চালু হয়েছিল যা মার্ক্সবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্নতর সমাজতন্ত্রের সূচনা করতে চেয়েছিল। তা শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়নি।

রাশিয়া : রাশিয়াতে সরকারের স্বৈরাচার, জারতন্ত্রের ব্যর্থতা, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও রাজনৈতিক অনগ্রসরতা দেশের ভেতর যে হতাশার জন্ম দিয়েছিল তার মধ্যে বিপ্লবী মার্ক্সবাদ ও শ্রেণী সংগ্রামের জঙ্গী মানসিকতা খুব সহজে বেড়ে উঠেছিল। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে **লেনিনের** (Lenin) নেতৃত্বে বলশেভিক দল পৃথিবীর প্রথম ও প্রধান সফল মার্ক্সবাদী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রূপায়ণ করে। এই বিপ্লবের পর লেনিন সংযুক্ত সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হন এবং ট্রটস্কি পররাষ্ট্র মন্ত্রী হন। এর আগে ১৯০৫ সালে একবার বিপ্লবের চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। উনিশ শতকের শেষ থেকে রাশিয়াতে বুদ্ধিজীবীদের কারও কারও মানসিকতায় প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার জন্ম হচ্ছিল। এই মানসিকতা ক্রমশ আরও উগ্র হয় এবং সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে নতুন সমাজ গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। এই আকাঙ্ক্ষা থেকে জন্ম নিয়েছিল **নিহিলিজম্** (*Nihilsm*)। একটি সংহারের দর্শন—প্রচলিত সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে গুঁড়িয়ে দিয়ে নবীনের উদ্বোধন ঘটানোর বেপরোয়া কর্মসূচি। নিহিলিষ্টদের একটি প্রচারপত্রে তাদের উদ্দেশ্যকে এইভাবে বলা হয়েছে—"To found on the ruins of the present social organization the empire of the working classes"—প্রচলিত সমাজসংগঠনের ধ্বংসের উপর শ্রমিক শ্রেণীর সাম্রাজ্য গড়ে তোলা।" স্পষ্টতই নিহিলিজমের মধ্যে সমাজতন্ত্রের দর্শন ও কর্মসূচি গভীরভাবে প্রবেশ করেছিল। ফলে একে প্রতিরোধ করার জন্য সরকার সর্বশক্তি নিয়ে নেমেছিল। সন্ত্রাস, পীড়ন, কারাবাস, সাইবেরিয়ার নির্বাসন, হত্যা, সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া—কিছুই বাদ ছিল না। এর প্রত্যুত্তরে বিপ্লবীরাও সেখানে ধ্বংসের গোপন মারমুখী অভিযানকে শ্বেত-সন্ত্রাসের সমুচিত জবাব ধরে নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। এমনকী জারের জীবননাশের চেষ্টা করতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদের কোন চেষ্টাই সফল হতে পারছিল না। অবশেষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জারতন্ত্রের ব্যর্থতা, জনতার অর্থনৈতিক দুর্দশা, যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ে জাতীয় মর্যাদার অবক্ষয়, দেশের অভ্যন্তরে নিদারুণ খাদ্যাভাব ইত্যাদি অনেক সমস্যা পুঞ্জীভূত হয়ে জনরোষকে তুঙ্গে নিয়ে যায়। জনরোষের শিখরে দাঁড়িয়ে লেনিন (Lenin) আসন্ন বিপ্লবের সঠিক মুহূর্তটিকে বুঝতে পেরেছিলেন। বলশেভিক দলও ইতিহাসের এই যুগ সন্ধিক্ষণের নায়ককে চিনতে ভুল করেনি। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে রাশিয়ায় বিপ্লবের আয়োজনে দল ছিল প্রস্তুত, নেতা উপস্থিত, কর্মসূচি স্থির আর কাল বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটার সম্যকভাবে আবির্ভূত। দল-নেতা-কাল-কর্মসূচি এই চার উপাদানের অভূতপূর্ব মিলনে রাশিয়ার সূচিত হল পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক বিপ্লব ও বিজ্ঞান সম্মত মার্ক্সবাদের নিরঙ্কুশ জয়।

২.১১ নৈরাজ্যবাদ

সমাজতন্ত্রের এক চরমপন্থী বিকাশ হল **নৈরাজ্যবাদ** (Anarchism)। প্রুধোঁ (১৮০৯-৬৫), **মিখাইল বাকুনিন** (১৮১৪-৭৬), **পিটার ক্রুপটকিন্** (১৮৪২-১৯২১) ইত্যাদি দার্শনিকরা ছিলেন এর প্রবক্তা। এই মতবাদ রাষ্ট্রব্যবস্থাকে মানেন, রাষ্ট্র ও সমাজের যে কোন প্রতিষ্ঠান মানুষের স্বাধীন কর্মকে ব্যাহত করার চেষ্টা করে তাকেই তারা ভেঙে

ফেলতে চান। নৈরাজ্যবাদীরা চান রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বদলে স্বাধীন ব্যক্তি মানুষের স্বেচ্ছা প্রসূত সমবায়ী সমাজব্যবস্থা। নৈরাজ্যবাদের "প্রবক্তারা সমস্ত ধরনের আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সৃষ্ট অবিচারের বিরুদ্ধে মৌল প্রতিবাদের আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। তাঁরা স্বাধীন ব্যক্তিমানুষের একটা শিথিল সংগঠনে বিশ্বাসী ছিলেন। সেখানে সশস্ত্রবাহিনী, আদালত, জেলখানা বা লিখিত আইনের কোনও ভূমিকা নেই। তাঁদের মধ্যে কারও বিশ্বাস ছিল শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনে, কেউ চাইতেন রক্ত জরা বিপ্লব।" (রাজনীতির অভিযান সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ১৬০। পঠিতব্য অতীন্দ্রনাথ বসু—নৈরাজ্যবাদ)।

২.১২ সরকার ও সমাজতন্ত্রী দল

দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের সময়ে ফ্রান্সে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল তা দু ধরনের রাজনৈতিক মানুষদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। একদিকে ছিল প্রজাতন্ত্রীরা যাদের নেতা ছিলেন **লামারতাঁ** (Lemartine)। এরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা চাইতেন রাজতন্ত্র মুছে যাক, আসুক প্রজাতন্ত্র—জনগণের সরকার। অন্য গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন লুই ব্লাঁ (Louis Blanc)। তাঁরা প্রজাতন্ত্র চাইতেন কিন্তু প্রজাতন্ত্রই লক্ষের শেষ একথা মানতেন না। তাঁদের কথা ছিল প্রজাতন্ত্র একটা বৃহত্তর লক্ষ্যের সামরিক বিরতি, আর সে লক্ষ্য হল সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। লুই ব্লাঁ সরকারে থেকে অর্থনৈতিক বিপ্লব চেয়েছিলেন যেখানে শ্রমিকদের চাকুরি নিশ্চিত হবে, শ্রমিকস্বার্থে আইন প্রণীত হবে এবং সমাজতন্ত্রের আদর্শ সরকারি কর্মসূচিতে বহাল থাকবে। লুই ব্লাঁর চাপে সরকার সমস্ত প্রজার কর্মলাভের অধিকার ("right to employment") মেনে নিয়েছিল এবং জাতীয় কর্মশালা (national workshops) চালু করেছিল। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য লুই ব্লাঁর নেতৃত্বে একটি শ্রমকমিশন ও গঠন করা হয়েছিল।

জার্মানীতে সমাজতান্ত্রিকদের বিসমার্কের দ্বারা পরিচালিত সরকারের কঠিন বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে লড়বার জন্য তিনি তাঁর অন্যতম শত্রু যাজকদলের সঙ্গে আপস করে নিয়েছিলেন। ১৮৭১ সালের পর থেকে সমাজতন্ত্রীরা রাইকস্ট্যাগে (Reichstag) নির্বাচিত হতে শুরু করে। তাদের যে নীতি সমূহের ভিত্তিতে তারা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করত সেগুলিরই সবই ছিল জার্মানির তাবৎ চালু প্রতিষ্ঠানের বিরোধী। তারা ছিল গণতান্ত্রিক, জার্মানি ছিল রাজতান্ত্রিক। তারা সকলের জন্য ভোটাধিকার দাবি করত, সে যুগে তা ছিল বিপজ্জনকভাবে বৈপ্লবিক। তারা সমস্ত মানুষের হয়ে কথা বলত, সেযুগের রাজনীতিতে তার প্রচলন ছিল না। তারা রাষ্ট্রতান্ত্রিক কাঠামো যেমন রাজতান্ত্রিক শাসন ও স্বৈরাচারী ক্ষমতা পছন্দ করত না ঠিক সেই রকমভাবে তারা রাষ্ট্রের যুদ্ধবাজ (militaristic) বনিয়াদও পছন্দ করত না। ফলে 'রক্ত ও লৌহ' (Blood and Iron) নীতিতে বিশ্বাসী বিসমার্ক সমাজতন্ত্রীদের সম্পর্কে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রী দলকে ভেঙে ফেলার সমস্ত রকম চেষ্টায় নিজেকে সচেষ্ট করেন। এমন আইন তিনি পাশ করলেন যার দ্বারা দল গঠন (societies), বৈঠক (meetings), পুস্তিকাপ্রকাশ (Journels) যার দ্বারা সমাজতন্ত্রের বিকাশ হয় তা বন্ধ করে দিলেন। এর ফলে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন কোথাও গুপ্ত সমিতির আড়ালে চলে গেল, কোথাও বা নাম বদল করে কর্মসূচির ধারাকে গোপন করে ফেলল। ১৮৭১ সালের নির্বাচনে রাইকস্ট্যাগে দুজন সমাজতন্ত্রী নির্বাচিত

হয়েছিল। ১৮৯০-তে এই সংখ্যা বেড়ে হল পঁয়ত্রিশ। ফলে বিসমার্ক তাঁর ক্ষমতায় অবস্থানের শেষ দিকে সমাজতন্ত্রীদের সম্বন্ধে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলান এবং তাদের মনজয় করার জন্য নানাবিধ শ্রমিক কল্যাণ আইন চালু করেন। ১৮৮৩, ১৮৮৪ এবং ১৮৮৯ সালে শ্রমিকদের জন্য রাষ্ট্রীয় বীমার (State Insurance) আইন চালু হয়। কিন্তু বিসমার্ক সমাজতন্ত্রকে দমন করতেও যেমন পারেননি তেমনি সমাজতন্ত্রীদের জয় করাও তার ক্ষমতার বাইরে ছিল। তিনি যে সমাজতন্ত্র চালু করার চেষ্টা করেছিলেন তা হল রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র (State socialism) যা একজন স্বৈরাচারীর দান! সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা চেয়েছিলেন অন্য জিনিস তা হল গণতন্ত্রের উপর দাঁড়িয়ে থাকা সমাজতন্ত্র (Socialism based on democracy)।

২.১৩ সারাংশ

শিল্প বিপ্লবের অন্তর্লীন অবাধ শোষণকে প্রতিরোধ করার জন্য সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল। তার লক্ষ্য ছিল সার্বিক সমাজ পরিবর্তন, শাসকদের দান কোন বিক্ষিপ্ত সমাজ সংস্কার নিয়ে সমাজতন্ত্র কখনো সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। প্রথম দিকের কল্পান্তিক সমাজতন্ত্র পরিবর্তনের কর্মসূচিকে জোরদার করতে পারেনি কারণ প্রারম্ভিক পর্যায়ের চিন্তাধারাতে আবেগের আতিশয্য ছিল, বিজ্ঞান-সম্মত বোধের অভাব ছিল এবং কোন কর্মসূচিকে বহাল করার মতো সংগঠন তখনও গড়ে ওঠেনি। বিজ্ঞান সম্মত সমাজতন্ত্র মার্ক্সবাদকে আশ্রয় করে গড়ে উঠল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলগুলির আবির্ভাবের পর থেকে বাস্তব সম্মতভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে রাষ্ট্রক্ষমতায় নিজের অবস্থানকে চিহ্নিত করতে পেরেছিল মহাদেশীয় সমাজতন্ত্র। ইংল্যান্ডে ওয়েনবাদ ট্রেড ইউনিয়নের পথে গেলেও ফ্রান্সে এবং জার্মানিতে এবং পরে রাশিয়াতে সমাজতন্ত্র বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়েছিল। জার্মানিতে বিসমার্কের লৌহশাসন আর রাশিয়াতে জারতন্ত্রের সন্ত্রাস এই দুইয়ের মুখোমুখি লড়াই করতে হয়েছিল সেখানকার সমাজতন্ত্রের সমর্থকদের। জার্মানিতে লাসাল সংগঠিত করেছিলেন সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল আর ফ্রান্সে লুই ব্লাঁ সমাজবাদী প্রজাতন্ত্রী দলকে ক্ষমতায় আসীন করেছিলেন দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের সময়ে। রাশিয়াতে লেনিন বলশেভিক দলকে বিপ্লবের পথে নিয়ে গিয়ে শেষপর্যন্ত পৃথিবীর প্রথম ও সর্ববৃহৎ শ্রমিক উত্থানের সাফল্যকে সূচিত করেছিলেন। মার্ক্স বলেছিলেন যে শ্রমজীবী মানুষকে নিজের স্বার্থে বিশ্বময় ঐক্য প্রচেষ্টায় সামিল হতে হবে। এইজন্য তিনি ডাক দিয়েছিলেন 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'। আর এই ডাককে সার্থক করার জন্য তিনি গঠন করেছিলেন সমাজতন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক ঐক্য কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল। পরে ১৯১৯ সালে লেনিনের নেতৃত্বে তৃতীয় ইন্টারন্যাশনাল এই ঐক্যবোধকে একটি বিপ্লববোধে রূপান্তরিত করে বিশ্বময় বিপ্লবকে ছড়িয়ে দেওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করল। সমাজতন্ত্রের দর্শন নিজের ভেতর নানা দ্বন্দ্ব ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত নৈরাজ্যবাদের মতো চরমপন্থাকে উপেক্ষা করে শ্রেণী সংঘাতের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের পথে প্রলেতারিয়তের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার ধারণায় লীন হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্র নিপীড়িত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হয়নি। জার্মানিতে বিসমার্কের মতন দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসকও শেষপর্যন্ত সমাজতন্ত্রের গুরুত্বকে বুঝতে পরে তার সঙ্গে আপস করেছেন—State socialism বা রাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্রের ভিন্নতর এক-দিগন্তকে খুলে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইউরোপের সমাজতন্ত্রীকে কোন সংস্কার চাননি,

চাননি রাষ্ট্রের দান। শক্তিধরের কৃপা আপাতভাবে মধুর হলেও তার মধ্যে দীনতা আছে। পশ্চিমের সমাজতন্ত্র এই দীনতায় লীন হতে চায়নি। নিজের শক্তির দ্বারা শোষককে ধ্বংস করে নিজের কর্মসূচিকে বহাল রাখার যে অঙ্গীকার তাকে সমাজতন্ত্র কোন দিনই পরিহার করেনি। শ্রেণীহীন সমাজকে চোখের সামনে ধরে আবহমান কালের শ্রেণী দ্বন্দ্বকে একটি স্থায়ী পরিণতির লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার অপরাজিত স্বপ্নকে কার্লমার্ক্স সমাজতন্ত্রীদের দিয়েছিলেন। সে লক্ষ্যে সমাজতন্ত্র আজও স্থির আর এই স্থির লক্ষ্যে শোষক শোষিতের বিরামহীন সংঘর্ষের দ্বান্দ্বিকতায় ইতিহাস হয়ে আছে দুই বিপরীতের সমন্বয়।

২.১৪ অনুশীলনী

১। একটি বাক্যে উত্তর দিন

(ক) শিল্প-বিপ্লবের সাথে সমাজতন্ত্রবাদের যোগ কী?

(খ) সাম্যবাদ কখন জন্ম নেয়?

(গ) ১৮৪৮ সালের আগে সমাজতন্ত্র কি ইউরোপের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার কাছে ভয়ের ও আশঙ্কার কারণ ছিল?

(ঘ) ডেভিড টমসনের বইয়ের নাম কী?

(ঙ) ইউরোপের বাইরে যে নয়া দুনিয়ায় সাম্যবাদ গড়ার স্বপ্ন জেগেছিল সে নয়া দুনিয়া কোথায় ছিল?

(চ) এবে ম্যাব্লি ও এলভেসিয়াস কে ছিলেন?

(ছ) রুশো কে?

(জ) সমাজতন্ত্র কি ফরাসী বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল?

(ঝ) Uptopia বা কল্পলোপ কে লিখেছিলেন?

(ঞ) রবার্ট ওয়েনের সময়কাল কী?

(ট) নিউ ল্যানার্ক কেন বিখ্যাত?

(ঠ) কোঁৎ দ্য সেঁ-সিমঁ কী করেছিলেন?

(ড) ফালান্তার-এর প্রবক্তা কে?

(ঢ) লুই ব্লঁ কোন দেশের মানুষ ছিলেন?

(ণ) সমাজতন্ত্রের প্রথম পর্বের একটি বৌদ্ধিক রচনার নাম করুন।

(ত) বাবউফ কে?

(থ) সমাজতন্ত্রবাদের এক জঙ্গি প্রবক্তার নাম করুন।

(দ) দুভো ক্রিস্তিয়ানিজম কে লিখেছিলেন?

(ধ) জন লিলাবার্ণ কোন দলের নেতা ছিলেন?

(ন) লেভেলাররা কী চেয়েছিলেন?

(ণ) দ্বান্দ্বিকতা কী?

(ফ) কার্ল মার্ক্স এবং ফ্রিয়েডরিশ এঙ্গেলস কোন দেশের মানুষ ছিলেন?

(ব) মূল্যের শ্রমতত্ত্বের মূল কথা কী?

(ভ) ডেভিড রিকার্ডোর থেকে সমাজতন্ত্র কোন ধারণা গ্রহণ করেছিল?

(ম) বার্ট্রান্ড রাসেলের কোন গ্রন্থ আপনার পাঠ্যবিষয়ে উল্লিখিত আছে?

২। চিহ্ন দিয়ে ঠিক [✓] বা ভুল [×] জানান—

(ক) সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল সমাজতন্ত্রী ছিল না। [ ]

(খ) লুই ব্লঁ ফ্রান্সের সমাজবাদী প্রজাতন্ত্রী দলের নেতা ছিলেন। [ ]

(গ) বিসমার্ক জার্মানিতে সমাজতন্ত্রকে রুখে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। [ ]

(ঘ) বিসমার্ক ১৮৮০ দশকে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে আপস করেছিলেন। [ ]

(ঙ) কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো কার্ল মার্ক্সের লেখা নয়। [ ]

(চ) লাসাল মার্ক্সপন্থী ছিলেন। [ ]

(ছ) প্রুধঁ যা প্রচার করতেন তা নৈরাজ্যবাদ। [ ]

(জ) উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে লেখা আছে। [ ]

(ঝ) অবলোপের অবলোপ সূত্রকে শুধু হেগেলই ব্যবহার করেছেন। [ ]

(ঞ) হেগেলের উল্লম্ফন তত্ত্বকে মার্ক্স সমাজ-বিপ্লবের তত্ত্ব বলে ব্যবহার করেছেন। [ ]

(ট) 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'—একটি বই-এর নাম। [ ]

(ঠ) ডাস ক্যাপিটাল একটি স্লোগান। [ ]

(ড) চার্টিষ্ট আন্দোলন ফ্রান্সে সংগঠিত হয়েছিল। [ ]

(ঢ) লুই অগুস্ত ব্লাঁকি একজন জার্মান বিপ্লবী। [ ]

(ণ) কার্বোনারি একটি গুপ্ত সমিতির নাম। [ ]

(ত) নিহিলিজম্ একটি ধ্বংসের দর্শন। [ ]

(থ) সোস্যাল কনট্রাক্ট গ্রন্থটির রচয়িতা লুই ব্লঁ। [ ]

(দ) মার্ক্স সারা জীবন জার্মানিতে বসবাস করেন। [ ]

(ধ) ট্রট্স্কি বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। [ ]

(ন) লেনিন বাকুনিনের মতকে প্রতিষ্ঠা করেন। [ ]

৩। দশটি বাক্যে উত্তর দিন।

(ক) কার্ল মার্ক্সের অর্থনৈতিক সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করুন।

(খ) কল্পান্তিক সমাজতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

(গ) জার্মানিতে সমাজতন্ত্রের বিকাশের বিসমার্কীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) ইংল্যান্ডের সমাজতন্ত্রবাদের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা কে? তাঁর চিন্তা ও কার্যকলাপ বর্ণনা করুন।

(ঙ) দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূল সূত্রগুলি আলোচনা করুন।

(চ) সমাজতন্ত্রের ইতিহাসে লাসাল ও ব্লাঁকির স্থান কোথায়?

(ছ) নৈরাজ্যবাদ কী?

(জ) দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের সময়ে ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রের অবস্থা কী ছিল?

(ঝ) মার্ক্সবাদের অন্তর্গত শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বটি আলোচনা করুন।

(ঞ) লুই ব্লঁ, অগুস্ত ব্লাঁকি ও বাবউফের তত্ত্ব ও কর্মসূচি তুলনামূলক আলোচনা করুন।

(ট) সমাজতন্ত্রের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই-এর নাম লিখুন এবং তাদের সম্বন্ধ আলোচনা করুন।

(ড) ভাববাদ ও বস্তুবাদের তফাত কী?

(ঢ) দার্শনিক হেগেল সম্বন্ধে একটি আলোচনা করুন।

(ণ) কল্পান্তিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে বিজ্ঞান সম্মত সমাজতন্ত্রের তফাত কী?

২.১৫ গ্রন্থপঞ্জী

1. H. B. Acton — *The Illusion of the Epoch* (1955) : ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও রুশবিপ্লব ও লেনিনের দর্শন জানার জন্য প্রয়োজনীয় বই।

2. Zeredei Barbu — *Democracy and Dictatorship* (1956) : কমিউনিজমের মনস্তাত্ত্বিক দিক বোঝার জন্য উৎকৃষ্ট বই। এতে ফ্যাসিবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা আছে।

3.	Max Beer	*Fifty year of International Socialism* (1935) : এর মধ্যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক, বিশেষ করে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ইতিহাস আছে।
4.	Nicolas, Berdysev	*The Origin of Russian Communism* (1937) — *The Russian Idea* (1947) রুশবিপ্লব ও বলশেভিক চিন্তাধারায় সমাজতন্ত্রের প্রতিফলন বোঝার জন্য পঠিতব্য বই। দ্বিতীয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
5.	Isaiah Berlin	*Karl Marx* (1939, পুনর্মুদ্রিত ১৯৪৮) : সংক্ষেপে কার্ল মার্ক্সের একটি প্রামাণ্য জীবনী।
6.	Martin Buber	*Paths in Utopia* (1949) : বলা হয়ে থাকে উনিশ শতকে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার দুটি মত প্রচলিত ছিল। একটি মত—যার ধারক ও প্রবর্তক ছিলেন প্রুধঁ—একথা বলত যে সমাজকে বিকেন্দ্রিত করতে হবে। আরেকটি মত—যার প্রবর্তক ও প্রচারক ছিলেন মার্ক্স ও লেনিন—বলত যে সমাজ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রায়িত হবে। এই দুই মতের ব্যাখ্যা এই বইয়ে আছে।
7.	G. D. H. Cole	*A History of Socialist Thought,* Vols, I-V (1954-60) : সমাজতন্ত্রের ইতিহাস জানার জন্য অপরিহার্য গ্রন্থরাজি।
8.	Benedetto Croce	*Histirical Materialism and the Economics of Karl Marx* (1914) : ইটালীয় ভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত ১৯৯০ সালে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অসাধারণ বিশ্লেষণ।
9.	Alexander Gray	*The Socialist Tradition from Moses to Lenin* (1949) : সমাজতন্ত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এতে পাওয়া যাবে। প্রাক্-মার্ক্স সমাজতন্ত্র জানার জন্য অপরিহার্য।
10.	Hans Kelsen	*The Political Theory of Bolshevism* (1949) রুশ সমাজতন্ত্রের সুন্দর ছোট আলোচনা।
11.	John Plamenatz	What is Communism? (1947) *German Marxism and Russian Communism* (1954) এই দুটি গ্রন্থ অবশ্য পঠিতব্য। কমিউনিজম কী, জার্মান মার্ক্সবাদ ও রুশ কমিউনিজমের মধ্যে যোগাযোগ কী তার তথ্যনিষ্ঠ, বিশ্লেষণ ধর্মী আলোচনা।

12. Howard Selsam — *Socialism and Ethics* (1943)। সমাজতন্ত্র বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা।

13. David Thomson — *The Conspiracy of Babeuf* (1947) সমাজতন্ত্রের বৈপ্লবিক দিকের আলোচনা আছে এই বইয়ে।

উপরে উল্লিখিত এই বইগুলি ছাড়া মূল পাঠ্যবিষয়ে (Text) মাঝে মাঝে যে সব বই-এর উল্লেখ আছে তার সবকটিই পড়তে হবে। প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীর ***য়োরোপের ইতিহাস ১৭৮৯-১৯১৯*** (দ্বিতীয় সংস্করণ) অত্যন্ত সুলিখিত পঠিতব্য পুস্তক। এই বইয়ের নবক অধ্যায়ে সমাজতন্ত্রের বর্ণনা আছে। এছাড়া সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তীর ***ইয়োরোপের ইতিহাস (১৭৬৩-১৮৪৮)*** গ্রন্থের দশম অধ্যায় পড়া যেতে পারে। এটিও একটি সুলিখিত গ্রন্থ।

একক ৩ □ রাশিয়াতে সংস্কারকার্য

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ প্রারম্ভিক কথা

৩.৪ মৌল সমস্যা রাষ্ট্রের কাঠামো সংক্রান্ত সমস্যা

৩.৪.১ সমাজ ব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্যা

৩.৫ সংস্কারের কারণ

৩.৬ প্রথম পর্বের রাজনৈতিক সংগঠন

৩.৭ ডিসেম্ব্রিষ্ট আন্দোলন (১৮২৫)

৩.৮ প্রথম নিকোলাস

৩.৯ ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের শিক্ষা ঃ সংস্কারের প্রত্যক্ষ কারণ

৩.১০ দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ঃ সংস্কারের সূচনা

৩.১১ ভূমিদাসদের মুক্তি

৩.১২ ভূমিদাসত্ব বিলোপ হল কেন

৩.১৩ ভূমিদাসত্ব বিলোপের ফলাফল

৩.১৪ অন্যান্য সংস্কার

৩.১৫ সারাংশ

৩.১৬ অনুশীলনী

৩.১৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

সভ্যতার চলার পথে কখনো কখনো এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে অনেক দিনের একটি চলমান ব্যবস্থা দিনের পর দিন অপরিবর্তিত থেকে প্রগতির পথকে রুদ্ধ করে। কালের নিয়মে যুগের সঙ্গে তাল রেখে সমাজকে তাই বদলাতে হয়। এই বদলানোর কাজকেই ঐতিহাসিকরা বলেন সংস্কারের কাজ। রাশিয়াতেও উনিশ শতকে সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছিল। বিশ শতকের পরপারে এসেও এ কাজ থামেনি। অপরিণত সংস্কারে দীর্ঘসূত্রিতা শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের পথকে প্রশস্ত করেছিল। ১৯১৭ সালে বিপ্লব এসে উল্টেপাল্টে দিয়েছিল রুশ সমাজকে। রাশিয়া নতুন

করে জেগে উঠেছিল। রুশ সংস্কারের কথা রাশিয়ার এই জেগে ওঠার প্রথম পর্বের কথা। আমরা তা-ই এখানে পাঠ করব। এই পাঠের উদ্দেশ্য হল ইতিহাসের একটি অধ্যায়ে একটি জাতির জেগে ওঠার ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রথম মুহূর্তগুলিকে বোঝা, আহরণ করা সেই আখ্যানকে অনেক দূর থেকেও স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়া যায়। অনেক সময়ে আপাতভাবে অনেক সমাজের অনেক প্রতিষ্ঠানকে অপরিবর্তনীয় বলে মনে হয়। কিন্তু আড়ালে হয়তো তার পরিবর্তনের আকুলতা ঘনীভূত হয়। কখনো হয়তো হয় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণে, কখনো বা হয় সামাজিক মানবিক কারণে। কখনো রাষ্ট্র তা বুঝতে পেরে নিজেই এগিয়ে আসে সংস্কারের কাজে, কখনো রাষ্ট্রের অন্ধত্ব সমাজকে বাধ্য করে নিজের মুক্তির অনিরুদ্ধ পথে তার সঙ্কল্পবদ্ধ উচ্ছ্বাসকে পরিচালিত করতে। রাশিয়াতে রাষ্ট্র সংস্কার কাজে হাত দিয়েছিল উনিশ শতকে। কিন্তু সে কাজ অপরিণত থাকায় বিপ্লব সেখানে আসন্ন হয়ে উঠেছিল বিশ শতকে। সংস্কারের নিয়মতান্ত্রিক শৃঙ্খলা যে কার্য কারণ সম্পর্কের দ্বারা আবদ্ধ তার সীমা কোথায় তা বোঝা যায় রাশিয়ার এই সংস্কার পর্বের ইতিহাস পড়লে। অতএব বর্তমান পাঠের উদ্দেশ্য হল ইতিহাসের অন্তর্লীন শক্তিকে তার নিজস্ব যুক্তি শৃঙ্খলার সীমার মধ্যে বোঝা—একথা বোঝা যে ইতিহাস কোন পর্বেই নিথর নয়, যুক্তি অযুক্তির দ্বন্দ্বময় ভারসাম্যকে নিজের ভেতরে বহন করে সে নিঃসীম প্রগতির এক লক্ষ্য থেকে অন্য লক্ষ্যে সতত চলমান। সমাজ সংস্কার এই চলমানতারই বহিঃপ্রকাশ।

৩.২ প্রস্তাবনা

সমাজ সংস্কারের কাজ যে কোন রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা আইনগত নানা সংস্কার কার্য রাষ্ট্র করে থাকে যার ফলে সমাজ বদলায়। সার্বিকভাবে তাই আমরা মানুষের পরিকল্পিত পরিবর্তনের কর্মসূচিকে সংস্কারকার্য বলে থাকি। ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লবের সময়ে এবং তার পরে নেপোলিয়নের শাসনকালে রাষ্ট্রের অভিভাবকত্বে সুদূরপ্রসারী সংস্কার হয়েছিল। ইংল্যান্ডে টিউডর যুগের এবং আরও পরে উনিশ শতকের বিভিন্ন সংস্কার তো বিখ্যাত। জার্মানিতে বিসমার্কের সময়ে নানা সংস্কারের কাজে রাষ্ট্র হাত দিয়েছিল সমাজের নানা বিস্ফোরণের সম্ভাবনাকে রোধ করার জন্য। উনিশ শতকে জাপানের **'মেইজি সংস্কার'** এবং ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে চিনের **'শতদিনের সংস্কার'** ইতিহাস-বিখ্যাত। ভারতবর্ষে উনিশ শতকে বিশেষ করে উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ও লর্ড ডালহৌসির রাজত্বকাল পর্যন্ত সময়ে নানা ধরনের সমাজ সংস্কার হয়েছিল। ইংল্যান্ডে ক্রীতদাস প্রথা বন্ধ হয়েছিল ১৮৩৩ সালে, আমেরিকায় ১৮৬৩ সালে। এগুলি সবই সমাজ সংস্কার। এরকম সমাজসংস্কার রাশিয়াতে হয়েছিল উনিশ ও বিশ শতকে। সমাজসংস্কারের লক্ষ্য হয় বন্ধন থেকে মুক্তি, মানুষের সঙ্গে মানুষের সমতা আনয়ন এবং উন্নয়ন। এই লক্ষ্যে উদ্যোক্তা হতে পারে রাষ্ট্র বা সমাজ, ব্যক্তি মানুষ বা যূথবদ্ধ মানবগোষ্ঠী। সচরাচর রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কোন সমাজসংস্কারের কাজকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া যায় না। রাষ্ট্রশক্তি সমাজ ব্যবস্থার অভিভাবক হিসাবে কাজ করে বলে রাষ্ট্রশক্তি যদি সহায়ক না হয় তা হলে সমাজসংস্কারের কাজে বিঘ্ন ঘটে। তবে ইতিহাসে প্রকৃত শক্তির অধিকারী হল আম-জনতা। সমস্ত সাধারণ মানুষ যাদের সম্মিলিত সাধারণ ইচ্ছা শক্তিকে ফরাসী, দার্শনিক রুশো **'জেনারেল উইল'** (General Will) বলে উল্লেখ করেছেন, তাকে ইতিহাসের পরিচালিকা শক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। যখন সংস্কারকার্য এই 'জেনারেল ইউল' বা সব মানুষের সার্বিক ইচ্ছার থেকে উদ্ভূত

হয় তখন সংস্কার কার্য হয় সার্থক ও সুদূরপ্রসারী। টিউডর যুগে ইংল্যান্ডে রাজা অষ্টম হেনরি জনপ্রতিনিধিমণ্ডলী পার্লামেন্টের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে রাষ্ট্রিক সংস্কারকার্যে হাত দিয়েছিলেন। অতএব তার প্রভাব রাষ্ট্রজীবনে গভীর হয়ে দেখা দিয়েছিল। উনিশ শতকে রাশিয়ার জারতন্ত্র থেকে যে সংস্কারকার্য শুরু হয়েছিল তা স্বৈরাচারের পরিকাঠামোর ভেতর থেকে ঘোষিত সংস্কার। তাই তার প্রভাব সমস্ত অর্থেই মঙ্গলজনক ছিল না। শেষপর্যন্ত রাশিয়াতে **নিহিলিজম্** (Nihilism) নামে এক সংহার-দর্শনের উদ্ভব হয়েছিল যার লক্ষ্য ছিল প্রচলিত ব্যবস্থার ধ্বংস। অটোম্যান সাম্রাজ্যে উনিশ শতকে **যখন তানজিমৎ** (Tanzimat) নামে একগুচ্ছ সংস্কার চালু করা হয়েছিল তখন তা তুরস্কের সুলতানের পরম্পরাগত ক্ষমতা কাঠামোর বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাই শেষপর্যন্ত তা সম্পূর্ণ হতে পারেনি। তাকে সম্পূর্ণ করার জন্য দরকার হয়েছিল একটি বিপ্লব—১৯০৮ সালের **তরুণ তুর্কী-বিপ্লব** (*Young Turk Revolution of 1908*)।

৩.৩ প্রারম্ভিক কথা

উনিশ শতকের শুরুতে রাশিয়া ছিল একটি অনগ্রসর দেশ। কোনভাবেই পাশ্চাত্য শক্তিগুলির সমকক্ষ সে ছিল না। বহুকাল ধরে বারবার তাতার আক্রমণ (Tartar invasions) রাশিয়ার সমাজে নানা বর্বরতার আধিক্য ঘটিয়েছে। রাশিয়ার প্রগতি তাতে ব্যাহত হয়েছে। মধ্যযুগীয় অন্ধকার রাশিয়ার মধ্যে আধুনিকতার আলো প্রবেশ করতে দেয়নি। **পিটার দ্য গ্রেট-ই** (*Peter the Great*) ছিলেন রাশিয়ার প্রথম **জার** (Czar) যিনি রাশিয়াকে পাশ্চাত্যের অভিমুখী করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল ১৬৮২ থেকে ১৭২৫ পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল রাশিয়াকে পশ্চিমী সংস্কৃতির সমকক্ষতা দান করা, তাকে আধুনিক করে তোলা। মধ্যযুগীয় রাশিয়াতে পশ্চিমের বাতায়ন খুলে দেওয়াটা সহজ ছিল না। সেই দুরূহ কাজটি তিনি করেছিলেন। সেই জন্যে অনেক পুরানো দিনের এক ঐতিহাসিক **ডি. এম. কেটেলবি** (*D. M. Ketelbey A History of Modern Times : From 1789 to the Present Day*) বলেছিলেন যে ''পাশ্চাত্য শক্তি হিসাবে রাশিয়া হচ্ছে সেই উদ্যমি বর্বর মহান পিটারের সৃষ্টি'' (''Russia, the creation, as a Western Power, of that enterprising barbarian, Peter the Great....'') দুর্ভাগ্যবশত তাঁর কোন যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিল না। তাঁর মৃত্যুর ৩৮ বছর পরে রাশিয়াতে এসেছিলেন একজন মহিলা শাসক। একজন জারিনা (Czarina)—**ক্যাথারিন দ্য গ্রেট** (*Catharine the Great*)। তাঁর রাজত্বকাল ১৭৬২ থেকে ১৭৯৬। ইউরোপে তখন **প্রজ্ঞানের যুগ** (Age of Enlightenment)। অস্ট্রিয়াতে **মারিয়া টেরেসা** (*Maria Thersa*), **দ্বিতীয় যোসেফ** (Joseph II), প্রাশিয়াতে **ফ্রেডারিক দ্য গ্রেট** (Frederick the Great) ইত্যাদি জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকরা প্রজামঙ্গলের নানা পরিকল্পনা ও সংস্কারকার্য করছিলেন। সেই ধারার অনুসরী হয়ে ক্যাথারিন দ্য গ্রেট ইউরোপের দার্শনিকদের সাথে যোগাযোগ রেখে কিছু প্রজা কল্যাণের কাজে হাত দিয়েছিলেন। তিনি একটি বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে রাশিয়ার মহিমা গরিমা অর্জন করেছিলেন তাকে পাশ্চাত্য শক্তির মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং বৈদেশিক রাজনীতিতে রাশিয়ার শক্তিকে কায়েম করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃত অর্থে অন্তর্দেশীয় সমস্যার মূলকে স্পর্শ গঠনতন্ত্রকে সংস্কার করতে পারেননি। এটি ঐতিহাসিক লিপসনের মত, তাকে এখানে উদ্ধৃত করা হল— 'Catharine the Great (1762-1796), enhanced the European status of her kingdom and made it a factor of the greatest weight in foreign politics, but she did

not attempt to grapple with the really vital problems of internal reconstructions" (E. Lipson-Europe in the 19th & 20th Centuries)

ঐতিহাসিক লিপসন যাকে ''অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের প্রকৃত মৌল সমস্যা" বলেছেন তার দিকে দীর্ঘকাল কোন শাসকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। উনিশ শতকে যখন জার **দ্বিতীয় আলেকজান্ডার** (*Alexander II*) **ভূমিদাস প্রথা** (Serfdom) বিলোপ করলেন তখন এই অভ্যন্তরীণ মৌল সমস্যার কিঞ্চিৎ নিরসন হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে হয়নি। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে প্রকৃত পরিবর্তনের সম্ভাবনা রাশিয়াতে কখনো অনুপস্থিত ছিল না। পিটার দ্য গ্রেট পশ্চিমের জানালা খুলে দেওয়ার পর থেকে পাশ্চাত্যের সাংবিধানিকতার হাওয়া রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করছিল। উদারনীতির প্রজ্ঞা সমাজের নানা স্তরের মানুষের মানসলোকে নতুন আলোর সঞ্চার করেছিল উন্মীলিত হচ্ছিল তাদের চোখ, উদ্বেলিত হচ্ছিল তাদের মন। পরিবর্তন-বিমুখ রাষ্ট্র পরিবর্তনকামী সমাজের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। একেই ঐতিহাসিক লিপসন (Lipson) বলেছেন—"...gradual awakening of all the best elements in Russian society to the overwhelming need for the social and political regeneration of this century"—''দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক নবসৃজনের দুর্বার চাহিদার প্রতি রুশ সমাজের সর্বোত্তম উপাদানগুলির ক্রমান্বয়ে জেগে ওঠা।" এই জাগরণের ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। মনের চৈতন্যে যখন পরিবর্তনের আবেগ সৃষ্টি হয় তখন সম্ভাবনা দেখা দেয় বিস্ফোরণের। সারা উনিশ শতক ধরে রুশ সমাজে এইরকম বিস্ফোরণের সম্ভাবনাকে দমনের চেষ্টা করেছে স্বৈরাচারী জারতন্ত্র। তাই সেখানে প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে প্রগতির লড়াই চলেছিল অবিরাম। রাশিয়াতে সংস্কারকার্য এই লড়াইয়ের অন্তর্লীন ধারার সঙ্গে যুক্ত নিরন্তর প্রাসঙ্গিক ঘটনা যাকে প্রগতির পক্ষে জয় ও স্বৈরাচার ও প্রতিক্রিয়ার পক্ষে বেদনার্ত আত্মসমর্পণের নির্দশন বলে ঐতিহাসিকরা ধরে নিয়ে থাকেন।

৩.৪ মৌল সমস্যা

১. রাষ্ট্রের কাঠামো সংক্রান্ত সমস্যা ঃ

রাশিয়াতে দু ধরনের সমস্যা মৌল সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল—এক, রাষ্ট্রের পরিকাঠামো সংক্রান্ত সমস্যা যার অন্তর্ভুক্ত ছিল জনমিশ্রণের (Population-mix) সমস্যা এবং দুই, সমাজব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্যা যার অন্তর্ভুক্ত ছিল ভূমিদাসপ্রথা সংক্রান্ত সমস্যা।

রাষ্ট্র হিসাবে রাশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে একটা বৈপরীত্য ছিল। রাশিয়া ছিল একদিকে ইউরোপের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র। কিন্তু এক এশিয় শক্তি হিসাবে সে ছিল আরও বড়। নেপোলিয়নের পতনের সময় থেকে রাশিয়ার ছিল এই ভৌগোলিক অবস্থা। মহান পিটারের সময় থেকে রাশিয়া প্রতীচ্যের ভাবধারার দিকে ঝুঁকেছিল। একটি পাশ্চাত্য শক্তিরূপে নিজেকে গড়ে তোলার অনন্ত সম্ভাবনাকে সে নিজের মধ্যে সংহত করেছিল একটু একটু করে। অথচ এশিয় সাম্রাজ্য হিসাবে তার দ্বিধাদ্বন্দ্ব তার অগ্রগতিকে ব্যহত করছিল। জার্মান সংযুক্ত রাজ্য থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভিয়েনা কংগ্রেসের সময়ে (১৮১৫) রাশিয়ার জনসংখ্যা ছিল ৪৫,০০০,০০০। শুধু ইউরোপে বিস্তৃত ছিল রাশিয়ার ২,০০০,০০০ বর্গমাইল ভূ-খণ্ড। নানা

জাতির মানুষ এখানে বসবাস করত। তাদের মধ্যে প্রধান ছিল স্ল্যাভ জাতির মানুষ (Slavs)। নানাজাতির মানুষ এখানে নানা ধর্ম পালন করত। কিন্তু জার ও তার রাজসভার ধর্ম ছিল **গ্রীক সনাতন খ্রিস্টধর্ম** (*Greek Orthodox Christianity*)। দেশের সমস্ত অধিবাসীদের দুই তৃতীয়াংশ এই ধর্মই পালন করত। এত বিচিত্র জাতি, এত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষদের মুখের ভাষাও ছিল নানা ধরনের। তবে রুশ ভাষাই ছিল দেশের প্রধান ভাষা। রুশরা বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ছোট বড় রাজ্য দখল করে বিভিন্ন ধরনের মানুষদের পদানত করেছিল। ইউরোপের অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্য এবং পূর্ব-ইউরোপ ও এশিয়া আফ্রিকা জুড়ে তুর্কীদের অটোম্যান সাম্রাজ্যও ছিল এইরকম। আঠারো শতকে তিনবার পোল্যান্ডকে ভাগ করে অস্ট্রিয়া, এশিয়া ও রাশিয়া তাকে গ্রাস করেছিল তাতে রাশিয়ার সমস্যাই বেড়েছিল। এখানে মানুষ অন্য ভাষায় কথা বলত যে ভাষার নাম পোলিশ ভাষা। তারা অন্য ধর্মপালন করত যা হল রোম্যান ক্যাথেলিক খ্রিস্টধর্ম। বাল্টিক প্রদেশগুলিতে (Baltic provinces) এসথোনিয়া (Esthonia) লিভেনিয়া (livonia) এবং কুরল্যান্ড (Courland) ইত্যাদি অঞ্চলে উচ্চশ্রেণীর মানুষরা ছিল জার্মান-সম্ভূত এবং তারা জার্মান ভাষায় কথা বলত। অথচ সেখানকার কৃষক ও সাধারণ মানুষেরা **ফিন** (*Finns*) এবং **লিথুয়ানিও** (*Lithunians*)। তারা তাদের ভাষায় কথা বলত, জার্মান ভাষায় নয়। এসব অঞ্চলের মানুষ ছিল লুথারপন্থী (Lutherans)—ধর্মবিশ্বাসেও ভিন্ন। ১৮০৯ সালে, অর্থাৎ প্রায় সাম্প্রতিক কালে, সুইডেনের কাছ থেকে ফিন্‌ল্যান্ডকে (Finland) কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। সেখানে মানুষ **সুইডিস** (Swedish) **এবং ফিন** (Finnish) এই দুইভাষায় কথা বলত। তাদের ধর্মও ছিল লুথেরান। এদিকে দক্ষিণে ও পূর্বে রাশিয়ার অসংখ্য মানুষ ছিল এশিয়ার মানুষ, একেবারেই প্রাচ্য জাতি সম্ভূত। তাদের এই এশিয় উদ্ভব (Asiatic origin) তাদের প্রতীচ্য-সম্ভূত (Western Origin) মানুষদের থেকে পৃথক করে রেখেছিল। তাছাড়া তাদের ধর্ম ছিল ইসলাম। নিজেদের মুসলমান বলে তারা ভিন্ন ধরনের শ্লাঘা অনুভব করত। এই সমস্ত মানুষদের পাশাপাশি বসবাস করত বিপুল সংখ্যক ইহুদিরা যাদের মধ্যেও নানা শাখা ছিল, যারা নিজেদের সত্তাকে কোনদিন বিসর্জন দেয়নি।

প্রান্তলিপি

জার্মান সংযুক্তরাজ্য : নেপোলিয়নের আগে জার্মানিতে ছোট বড় প্রায় ৩০০ টি পৃথক অঙ্গরাজ্য ছিল। এদের ছিল পরস্পর বিরোধী বিচিত্র সার্বভৌমত্ব। নেপোলিয়ন এই সব ছোট ছোট রাজ্যের সংখ্যা কমিয়ে এনে পঞ্চাশ করিয়েছিলেন। নেপোলিয়নের পর ভিয়েনা সম্মেলন এদের সংখ্যা আরও কমিয়ে করেছিল ৩৮টি। অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের জার্মান অংশকেও একই সময়ে কেটে আলাদা করা হল। এই তিনটি জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে গঠিত হল জার্মান সংযুক্তরাজ্য। সংযুক্ত রাজ্যের একটি কেন্দ্রীয় সংসদ ছিল। তাকে বলা হত ডায়েট। প্রত্যেক রাজ্যের মনোনীত প্রতিনিধিদে নিয়ে এই সাংসদ গঠিত হয়। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে সংসদের ক্ষমতাকে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়নি। এর ফলে সংসদের অবাধ সার্বভৌমত্ব কখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সংযুক্ত রাজ্যের অন্তর্গত অঙ্গ রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য কখনো সম্পূর্ণভাবে মুছে লুপ্ত হয়নি।

এই সমস্ত বিচিত্র ধর্মীয়, ভাষাভাষী মানব গোষ্ঠীকে একত্রে থাকতে বাধ্য করেছিল রুশ সাম্রাজ্য, রুশ স্বৈরাচারী শাসক জার (czar) যিনি চরম, পরম ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। এ অবস্থায় সাম্রাজ্যের ভেতরে এক জাতি গোষ্ঠীর সাথে অন্যজাতি গোষ্ঠীর ধর্ম, ভাষা, আচার অনুষ্ঠান, ঐতিহ্য সবকিছু নিয়েই দ্বন্দ্ব চলছিল। স্বৈরাচারের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসা ছিল প্রায় সকলেরই লক্ষ্য। ফলে সাম্রাজ্যের আপাত স্থৈর্যের নেপথ্যে চাঞ্চল্য ও পরিবর্তন সবসময়েই বিরাজ করত। এই বিক্ষোভকে স্তব্ধ করার জন্য সংস্কারের প্রয়োজন ছিল।

৩.৪.১ সমাজব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্যা

১৮১৫ সালে যখন ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছিল তখন রাশিয়ার সমাজব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল রুশ কৃষকদের ভূমিসংক্রান্ত দাসত্বের বন্ধন (bondage)। ১৮৬১ সালে যখন ভৌম দাসত্বের বন্ধন থেকে কৃষকদের মুক্তি দেওয়া হল তখন সমস্ত রাশিয়াতে সার্ফ (Serf) বা ভূমিদাসদের সংখ্যা ছিল চার কোটি পঁচানব্বুই লক্ষ [পাশ্চাত্য হিসাবে ৪৯$\frac{১}{২}$ মিলিয়ন। ১০০০ হাজারে এক মিলিয়ন]। এর মধ্যে দুই কোটি তিরিশ লক্ষ ছিল একান্ত ভাবে জার নিয়ন্ত্রিত খাস ভূমিদাস। অবশিষ্ট সংখ্যার অর্ধেক ছিল চার্চের ভূমিদাস এবং আর অর্ধেক ছিল অসংখ্য সামন্ত-প্রভুদের ভূমিদাস। জারের জমিতে যে ভূমিদাসরা ছিল তাদের অবস্থা ব্যক্তি মালিকানার অধীনস্থ ভূমিদাসদের থেকে অনেক বেশি সহনীয় ছিল। জারের ভূমিদাসের সংঘবদ্ধ গ্রাম সমাজে (Vilage Communities) রাখা হত। তাকে বলা হত **মির** (Mir)। এইভাবে যূথবদ্ধ কৃষক-দাসেরা কিছু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করত। সেখানে বর্ষীয়ান মানুষদের একটি সভা ছিল, আর ছিল নির্বাচিত প্রতিনিধি পরিষদ (Elected council)। নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ তাদের পঙ্গু করে রেখেছিল। তাদের চলাফেরার স্বাধীনতা ছিল না, সম্পত্তি ক্রয় এবং নিজেদের সামগ্রী বিক্রয় করার উপরও ছিল ছোটবড় নানা নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে তিনটি জিনিস—অবৈধ করের বোঝা (illegal taxes), বাধ্যতামূলক ঘুষ (extortion of bribes) এবং বাধ্যতামূলক বেগার (extortion of bribes), এবং বাধ্যতামূলক বেগার (exaction of forced labour) । অনেকরকম শোষণ ও শাসনের সাথে এই তিন অবৈধ করের বোঝা ক্রমশ দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল এবং ভূমিদাসদের রোষ দেশব্যাপী পুঞ্জীভূত অগ্ন্যুৎপাতের রূপ নিচ্ছিল। রাজতন্ত্রের অধীনস্থ ভূমিদাসদের অবস্থা যদি এতটা শোচনীয় হয় তবে ব্যক্তি মালিকানার পদতলে পিষ্ট ভূমিদাসদের অবস্থা কতটা করুণ ছিল সহজেই বোঝা যায়। ১৮২৬ সালে রাশিয়ার এক দেশব্রতী মানুষ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন যে রাশিয়ার ব্যক্তি মালিকদের অধীনে ভূমিদাসদের থেকে মার্কিন বাগিচার নিগ্রোরা অনেক সুখে আছে ('The negraes on the American plantations were happier than the Russian private serfs')। বেসরকারি ভূমিদাস মালিকরা সাধারণভাবে দরিদ্র, হতমান মানুষ ছিল। তাদের অতীত বৈভব নিঃশেষিত হয়েছিল, আর নিজেদের স্বেচ্ছাচার ও ব্যভিচারের অভ্যস্ত জীবন থেকে বেরিয়ে না আসতে পারার জন্য তাদের দারিদ্র্য ক্রমশ বাড়ছিল। সারা দেশব্যাপী এই দেউলিয়া অভিজাতরা নিজেদের ক্ষীয়মাণ আয় বাড়ানোর জন্য নানা পথ অবলম্বন করত, আর সব পথই ছিল ভূমিদাসদের স্বার্থবিরোধী। তাদের নিজেদের সম্পত্তি ধরে নিয়ে ভূস্বামীরা যখন তখন তাদের পণ্যসামগ্রীর মতো ক্রয়-বিক্রয় করত, কখনো একই ভূমিদাস পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তিকে আলাদা আলাদাভাবে ভিন্ন মালিকদের কাছে বিক্রয় করা হত। এইভাবে এক ভূমিদাস পরিবারের কর্মক্ষম মানুষ কমে গেলেও অবশিষ্ট মানুষদের চাবুক মেরে, জুলুম করে, জবরদস্ত ভাবে বেগার খাটিয়ে ভূস্বামীরা সমস্ত কাজ আদায় করে নিত। তারা ভূমিদাস সংক্রান্ত রাশিয়ায় প্রচলিত একটি আইনের সুযোগ নিত। সেই আইনে বলা হয়েছিল ''মালিকরা ভূমিদাসদের উপর যে কোন রকম শ্রমের দায়িত্ব চাপাতে পারবে, তাদের কাছ থেকে তাদের দেয় যে কোন অর্থ নিতে পারবে এবং তাদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত সেবা আদায় করতে পারবে" (The Russian Law of Serfage : "the proprietor may impose on his serfs every kind of labour, may take from them money dues, and demand from them personal service")। প্রয়োজন হলে ভূস্বামীরা ভূমিদাসদের উপরে অঙ্গচ্ছেদের শাস্তি আরোপ

করতে পারত এবং আরও নির্মম হয়ে তাদের মৃত্যুদণ্ড দিলেও ক্ষেত্রবিশেষে তাদের বাধা দেবার কেউ ছিল না। আর ভূস্বামীদের নির্মম হতে সময় লাগত না। যখন কোনভাবে কোন বলিষ্ঠ, ভূমিদাসকে তারা শাসন করতে পারত না তখন তাদের সেনাবৃত্তি গ্রহণের জন্য সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হত, অথবা সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হত। এইরকম কষ্ট সহ্য করে রাশিয়ার ভূমিদাসরা তাদের রুগ্ন জীবন ও শীর্ণ অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছিল যুগযুগ ধরে। এর থেকে পরিত্রাণের আশা তাদের ছিল না।

রাশিয়ায় সমাজব্যবস্থায় সবথেকে বড় অসঙ্গতি হল সেখানে কোন মধ্যবিত্ত শ্রেণী (middle class) ছিল না। মধ্যবিত্ত শ্রেণী থাকলে তারা হয়তো প্রভু ও ভূমিদাসদের মধ্যে একটি বাফার বা সংঘাত প্রশাসক হিসাবে কাজ করতে পারত। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব সফল হয়েছিল তার একটি বড় কারণ ফ্রান্সে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছিল যারা ফরাসী দার্শনিকদের চিন্তাধারাকে সমাজে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল। ফ্রান্সে অর্থনৈতিক দুর্দশা ছিল কিন্তু অন্য দেশেও দুর্দশা ছিল তার থেকে বেশি। কিন্তু সে সব দেশে বিপ্লব দেখা দেয়নি, দেখা দিয়েছিল ফ্রান্সে—কারণ সম্ভবত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপস্থিতি। রাশিয়াতে এরকম কোন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব কখনো হয়নি যারা উদারনৈতিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে। আবার কৃষকরা এতই অজ্ঞ ও নিপীড়িত ছিল যে তাদের মধ্য থেকে কোন নেতৃত্বের জন্ম হওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাশিয়াতে বিপ্লবের সম্ভাবনা কম ছিল। সমাজ নানাভাবে ভেঙে যাচ্ছিল, সেখানে সমাজের নানা স্তরের মানুষের মধ্যে ক্ষোভ জমছিল এবং সেই ক্ষোভের বারুদে আগুন লাগার আগেই জারতন্ত্র সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছিল।

৩.৫ সংস্কারের কারণ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের রাশিয়ার ইতিহাস পড়লে সংস্কারের কর্মসূচি গ্রহণের কোন কারণ পাওয়া যাবে না। ১৮৫০ এবং ১৮৭০-এর মাঝে পূর্ব ইউরোপের দুটি বড় বংশভিত্তিক সাম্রাজ্য (dynastic empires)—রুশ সাম্রাজ্য ও অটোম্যান তুর্কী সাম্রাজ্য—আপাতভাবে সুস্থিত ছিল। এই দুই সাম্রাজ্যে কোথাও শিল্প-বিপ্লবের পদধ্বনি শোনা যায়নি। অবশ্য দুটি দেশেই রেলব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং দু দেশেই বহির্বাণিজ্য পাশ্চাত্যমুখী ও সমৃদ্ধ হয়েছিল। তার ফলে দেশে নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির উন্মেষ হয়েছিল। এই দুই দেশেই এই সময়ের মধ্যে তাদের পূর্বের রাজ্যকে ধরে রাখতে পেরেছিল। তাদের নিজস্ব অংশ তারা যেমন হারায়নি সেই রকম কোন নতুন ভূখণ্ডও তারা এই সময়ে অধিকার করতে পারেনি। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের (১৮৫৪-৫৬) পর এই দুই দেশ বেশ কিছুদিন ইউরোপীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ডেভিড টমসন (David Thompson) লিখেছেন, দেশের ভেতরে এক বিরাট সমাজ পরিবর্তন হয়েছিল যার সাথে তাল রেখে রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক পরিবর্তন হয়নি। রাশিয়ার সাথে পাশ্চাত্য দেশগুলির তফাত ছিল এই যে পশ্চিম ইউরোপে সমাজ পরিবর্তন হয়েছিল অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে, কিন্তু রাশিয়াতে সে পরিবর্তন হয়েছিল উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া, আইনের ফলে। পশ্চিমে সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের নবরূপায়ণ হয়েছিল, রাশিয়াতে তা হয়নি ["They differed from the western nations in that the greatest social changes were effected not by economic processes but by legislative action, and from the central European nations in that no overhaul of this

governmental systems accompanied such changes"—David Themson]। এর ফল যা হবার তাই হয়েছিল—রাজনীতি সমাজ পরিবর্তনের মূল সুরের সাথে একাত্ম হতে পারেনি আর এর থেকেই বিপ্লবের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ("Politics well, in consequence, harshly out of tune with social life. This created, as always a revolutionary situation"—David Thompson)।

পরিবর্তনশীল সমাজবোধের সাথে রক্ষণশীল সমাজকাঠামোর সঙ্গতি ছিল না। এই পরিস্থিতিতেই রাজনীতিও রূপান্তরিত হয়েছিল অসার বিধানে। সমাজের অভিজাত শ্রেণী (Nobility) ক্রমশ সরকারের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে শুরু করেছিল কারণ সমসাময়িক প্রাশিয়ার অনুরূপ রাশিয়াতেও কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্র সমস্ত ক্ষমতা ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা আত্মসাৎ করেছিল। নেপেলিয়ানের পতনের সময় থেকে দেশের ভেতরে অভিজাত আর আমলাতন্ত্রে পারস্পরিক শত্রুতা সমাজে ও রাজনীতিতে চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। একেই তো দেশের আমলাতন্ত্র সমস্ত প্রশাসনিক পদগুলি দখল করে বসেছিল যার ফলে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে অভিজাত শ্রেণী হটে যাচ্ছিল আবার তার উপর জার্মান বংশজাত মানুষদেরই একচেটিয়া প্রশাসনিক পদ দেওয়া হচ্ছিল যার ফলে সামন্তপ্রভুরা শাসনক্ষমতায় থাকার প্রতিযোগিতায় হেরে যেতে শুরু করেছিল। এর পরিণাম হয়েছিল ভয়াবহ—কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্র (Centralized bureaucracy) ও অভিজাত শ্রেণীর (nobility) মধ্যে একটি আপসহীন দ্বন্দ্বে সমস্ত রুশ সমাজের মেরুকরণ ঘটেছিল। অভিজাতশ্রেণী বাহ্যিকভাবে রাজতন্ত্রের কাছে আনুগত্য জানালেও ভেতরে ভেতরে তারা সরকারের পরিবর্তন চাইছিল। এইরকম যখন পরিস্থিতি তখন দেশের সাময়িক কর্মচারীরা ধীরে ধীরে দেশে ফিরতে লাগলেন। তারা অনেকদিন দেশের বাইরে নানা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। তারা বাইরে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র (Constitutional monarchy) দেশে এসেছে। এদের মধ্যে অনেকে ফ্রান্সে থেকে ফ্রান্স ও পশ্চিম ইউরোপের উদারনৈতিকতাকে প্রত্যক্ষ করেছে। যেমন করে মার্কিন বিপ্লবের (American Revolution) অভিজ্ঞতা নিয়ে ফ্রান্সের সেনাবাহিনী ফরাসী বিপ্লবের প্রাথমিক খনন ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। সেই ভাবে ফ্রান্সের উদার ভাবধারার পাশে রাশিয়ার অর্ধদাস শ্রেণীর সংস্কার কর্মে অনীহা, স্বয়ম্ভর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের (no free instution) অভাব এবং কেন্দ্রীভূত আমলাদের (Centralized bureacracy) ক্ষমতা দখল ইত্যাদি উদারনৈতিক কর্মসূচির পাতায় বাধা বিপত্তিকে তুলে ধরেছিল। বিদেশ প্রত্যাগত সাময়িক কর্মচারীদের অধিকাংশ ছিল রাশিয়ার অভিজাত শ্রেণীভুক্ত। ফলে তাদের ক্ষোভ এইবার গোপনে বিদ্রোহের আকার নিতে শুরু করল। কর্ণেল পল পেস্টেল (Colonel Paul Pestel) নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন : ''তখন সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ও বিপ্লবের আদর্শ আমার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। তখন অবশ্য দ্বিতীয়টি দুর্বল ও অস্বচ্ছ ছিল, কিন্তু ক্রমেই তা শক্তিশালী ও স্পষ্ট হল—সাংবিধানিক রাজতন্ত্র থেকে প্রজাতান্ত্রিক চিন্তাধারায় আমার উত্তরণ ঘটল" (''The ideas of constitutional monarchy and ideas of revolution then began to spring up in me, as yet the latter were still weak and absure, but gradually they became stronger and more distinct ... From ideas of constitutional monarchy I passed to republication ideas.")। অভিজাতশ্রেণীর এই ক্ষোভকে শাণিত করার জন্য দরকার ছিল হাতিয়ার, তাদের ক্ষোভকে প্রকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল কিছু মাধ্যম। তাদের চোখের সামনে আদর্শ ছিল দক্ষিণ ইউরোপের দুই গুপ্ত রাজনৈতিক সংগঠন—ইটালির **কার্বোনারি** (*Carbonari*) এবং গ্রীসের **হিটেইরিয়া** (*Hetairia*)। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ ও পূর্ব ইউরোপে এই দুটি ছাড়া আর কোন গুপ্ত বৈপ্লবিক সংগঠন ছিল না। অতএব এই ভাবনাধারায় রাশিয়ার রাজনৈতিক চিন্তাধারা দানা বাঁধতে লাগল।

৩.৬ প্রথম পর্বের রাজনৈতিক সংগঠন

রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা রাশিয়াতে দীর্ঘদিন ধরে চলছে। অবশেষে১৮১৮ সালে তা সফল হল। একটি সংগঠন তৈরি হল যার নাম **জনকল্যাণ সম্মিলন** বা Union of Public Good। তিন বছর বাদে এই সংগঠন ভেঙে দুটি স্বতন্ত্র সংগঠন হল—**উত্তরের সমাজ** বা *Society of the North* এবং **দক্ষিণের সমাজ** বা *Society of the South* প্রথমটির সদস্যরা আসত উত্তরে পেট্রোগ্রাডে (Petrograd) অবস্থিত সৈন্যবাহিনী থেকে। তার কর্মসূচি ছিল সাংবিধানিক রাজতন্ত্র। দ্বিতীয়টির সদস্যরা আসত দক্ষিণের সেনাবাহিনী থেকে। তাদের লক্ষ্য ছিল প্রজাতন্ত্র। কিছু দিনের মধ্যে একটি তৃতীয় সংগঠনের আবির্ভাব ঘটল যার নাম **সংযুক্ত স্লাভ** বা *United Slav*। এই সংগঠনটি অবশ্য অল্পদিনের মধ্যে দক্ষিণের সমাজের সাথে মিশে যায়। সংযুক্ত স্লাভ সংগঠনটির উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত স্লাভ মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করা। কিন্তু এই সংগঠনগুলির কোন পূর্বসূরি ছিল না এবং তাদের কোন উত্তরাধিকারীও গড়ে ওঠেনি। তাই একজন সমকালীন লেখক এই সংগঠনগুলিকে 'পিতাহীন পুত্রহীন প্রজন্ম' ("a generation without fathers and sons") বলে বর্ণনা করেছেন। পৃথিবীতে সমস্ত পুরোগামী (Pioneers) সংগঠনের যা অবস্থা হয় এদেরও তাই হয়েছিল—এরা যুগের আগে হাঁটছিল। তারা প্রেরণা পেয়েছিল পাশ্চাত্যের স্বাধীন ও মুক্ত সমাজ থেকে যা তাদের দেশের লোক পায়নি। কায়মনোবাক্যে তারা চাইছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তি যার সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ তখনো জেগে ওঠেনি। তারা চাইছিল দেশের শাসন যন্ত্রের আমূল পরিবর্তন যার সম্বন্ধে মানুষের বোধ তখনও জন্মায়নি। এক কথায় মুষ্টিমেয় দেশব্রতী (Patriot) মানুষ যুগচেতনার পূর্ণ উন্মীলনের আগেই অন্ধকারের পরপার থেকে প্রত্যুষের স্বপ্নকে বয়ে আনার চেষ্টা করছিল। ফলে পরিণতিতে তাদের ব্যর্থতা সুনিশ্চিত ছিল। তারা রেখে গিয়েছিল স্মৃতি, আত্মত্যাগের স্মৃতি, অমর দেশপ্রেমের স্মৃতি আর রেখে গিয়েছিল পরিবর্তনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও তার অসমাপ্ত কর্মসূচি যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উদ্বেল করেছিল।

৩.৭ ডিসেম্ব্রিষ্ট আন্দোলন (১৮২৫)

১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে জার প্রথম আলেকজান্ডার (Alexander) পরলোক গমন করেন। তারপর জার (Czar) হওয়ার কথা ছিল তাঁর পরের ভাই কনস্ট্যানটাইন-এর। কিন্তু তাঁকে প্রয়াত জার নিজের উত্তরাধিকারী না করে দুজনেরই অনুজ নিকোলাসকে (Nicholas I) জারতন্ত্রের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী স্থির করে গিয়েছিলেন। কনস্ট্যানটাইনকে বুঝিয়ে দূরে সরিয়ে রাখতে কিছুটা সময় ব্যয়িত হয়েছিল। এই সময়ে বিপ্লবীরা নিজেদের অনেকটা সংহত করে নেয়। উত্তরাধিকারে অনিশ্চয়তা থাকার ফলে সমাজে ও জারতন্ত্রের চারপাশে যে সব বিক্ষুব্ধ মানুষ ছিল তারা সরব হওয়ার সময় পেল। গোপন সংগঠনগুলি এই সুযোগ নিয়ে ১৮২৫-এর ২৬ ডিসেম্বর পেট্রোগ্রাডে (Petrograd) একটি অভ্যুত্থান ঘটাল। সেখানে মস্কো-বাহিনী (Moscow regiment) তাদের অফিসারদের প্ররোচনায় নতুন সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে অস্বীকার করল। এই অভ্যুত্থান আর কোন স্থানে বিস্তারলাভ করল না। এটি হয়ে দাঁড়াল সম্পূর্ণভাবে একটি সামরিক বিদ্রোহ যা মাত্র একটি রেজিমেন্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অসামরিক জনগণ তাতে অংশ গ্রহণ করেনি এবং শেষ পর্যন্ত অফিসাররাও এর থেকে সরে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজধানীর

প্রশাসন এর দ্বারা বিচলিত হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা এই অভ্যুত্থানে সংগঠন ছিল দুর্বল এবং এর নেতারা জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার যোগ্য লোক ছিল না। দক্ষিণের সমাজের (Society of the South) দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে দক্ষিণে হঠাৎ একটি ছোট সামরিক অভ্যুত্থান ইতিমধ্যে ঘটে গেল। তাকেও তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। এরপরেই সরকার থেকে একটা তদন্ত কমিশন বসানো হল। কমিশনের কাজ হল ষড়যন্ত্রের শিকড় খুঁজে বার করা। ধরে ধরে অসংখ্য মানুষকে সাইবেরিয়ায় প্রেরণ করা হল। জ্ঞানী গুণী বিশিষ্ট ব্যক্তি, সম্ভ্রান্ত মানুষ—এককথায় রাশিয়ার শিক্ষিত ও প্রগতিশীল মানুষদের, অসংখ্য সৈনিক সক্ষম ব্যক্তিদের সাইবেরিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কত দক্ষ ব্যক্তির যে মৃত্যু হল তার শেষ নেই। এদের মধ্যে একজন ছিলেন যাঁর লেখা আত্মজীবনী রাশিয়ার বহুমানুষকে উজ্জীবিত করেছিল। তিনি হলেন পল পেস্টেল (Paul Pestel)। তিনি লিখেছেন যে ''আমার ভুল হয়েছিল এই যে আমি বীজবপনের আগেই ফসল তুলতে গিয়েছিলাম ("My error has been that I tried to gather the harvest before sowed the seed.")। আরেকজন দেশব্রতী মানুষ লিখেছিলেন ''আমি আগে থেকেই জানতাম যে আমাদের উদ্যোগের সাফল্যের কোন সম্ভাবনা নেই। আমি আরও জানতাম যে আমাকে জীবন উৎসর্গ করতে হবে ... ফসল তোলার সময় আসবে পরে" ("I knew beforehand that our enterprise had no chance of success. I knew also that I must make a sacrifice of my life ... the harvest had will came later."]।

এইভাবেই ডিসেম্ব্রিষ্ট আন্দোলন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল। এই আন্দোলনের নেতা, লিপসন লিখেছেন একটি অসংগঠিত অভ্যুত্থানের মধ্যে বহুবছরের প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে আহৃত সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিল এবং যে আদর্শের জন্য তারা এত বছর চেষ্টা করেছিল সে আদর্শকে তারা বিপজ্জনক বিপর্যয়ের মধ্যে তলিয়ে দিল ("The political inexperience of its authors threw away in one rash unorganized outburst the work of many years of preparation, and involved in fatal disaster the cause for which they had so long laboured") ডিসেম্ব্রিষ্টরা যে কর্মসূচি নিয়েছিলেন—আইনের চোখে সমানাধিকার, ভূমিদাসদের মুক্তি এবং একটি সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা ["Equality before law, emancipaion of serfs and a constitutional regime]—তা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল বিপ্লবী আদর্শ। সে আদর্শ ব্যর্থ হওয়ার নয়, যেমন ব্যর্থ হয়নি বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ। শহীদের রক্ত মুক্তির বীজে জল সিঞ্চন করে —"The blood of martyrs waters the seeds of liberty"—বলেছেন এক ঐতিহাসিক। ডিসেম্ব্রিষ্টদের প্রেরণা ও তাদের আত্মত্যাগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আদর্শ হয়ে রইল, উদ্বুদ্ধ করল তাদের যারা ভবিষ্যতের বিপ্লবের স্বপ্ন দেখত আর সেই স্বপ্নকে সার্থক করার তপস্যায় নিমগ্ন হত। ডিসেম্ব্রিষ্টরা বর্তমানের সাধনাকে ভবিষ্যতের প্রেরণায় রূপান্তরিত করেছিল। প্রত্যক্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে ডিসেম্ব্রিষ্টরা ব্যর্থ হলেও সুদূরের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের অসার্থক বলা যাবে না।

৩.৮ প্রথম নিকোলাস

প্রথম নিকোলাসের (*Nicholas I*) রাজত্বকাল তিরিশ বছর, ১৮২৫ থেকে ১৮৫৫। তাঁর রাজত্বকাল স্বৈরাচারের বিপজ্জনক উত্থানের সময়। তাঁকে **'চরম স্বৈরাচারের বিগ্রহ'** (*the incarnation of absolutism*)

বলা হয়। যে বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজত্বকাল শুরু হয়েছিল তাই তাঁর শাসনকালের চরিত্র তৈরি করে দিয়েছিল। তিরিশ বছর তিনি রাশিয়াকে নির্মম এক রুক্ষ স্বৈরাচারের চাবুকের নীচে রেখেছিলেন তিনি ছিলেন একজন সৈনিক এবং সৈনিকের কঠোর শৃঙ্খলা, সহানুভূতিশীল নির্মমতা এবং নির্দয় জীবনচর্যাকেই তিনি রাজ্যশাসনের নীতি করেছিলেন। একজন ঐতিহাসিক বলেছেন যে প্রথম নিকোলাসের কাছে তত্ত্ব বা আদর্শের কোন মূল্যই ছিল না ("Nicholas I was not troubled by theories")। সে সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উদারনীতি ও প্রগতিশীলতার সাথে ট্রাডিশন ও রক্ষণশীলতার তীব্র লড়াই চলছে সে যুগে রাশিয়াই একমাত্র দেশ যে অনড় অস্তিত্বের প্রতিক্রিয়াশীল ছবিটিকে সযত্নে টিকিয়ে রেখেছিল। ১৮৩০ সালে প্যারিসের জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে যখন পোল্যান্ডে অভ্যুত্থান দেখা দিল তখন তিনি কালক্ষেপ না করে এক লক্ষ সৈন্যকে ওয়ারসতে (Warshow) পাঠিয়ে দিয়ে নির্মমভাবে সে বিদ্রোহ দমন করেন। সেখানে তিনি পোল্যান্ডের সংবিধান বাতিল করে দিলেন, সরকারি কাজকর্মে পোলিশ ভাষাকে নিষিদ্ধ করলেন, পোলিশ সেনাবাহিনী ভেঙে দিলেন এবং পোলিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বন্ধ করে দিলেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাশিয়া অভ্রভেদী স্বৈরাচারের অটল প্রহরী হয়ে দাঁড়াল। এই নীতিকে বজায় রেখে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সময়ে তিনি অস্ট্রিয়ার সম্রাটকে সাহায্য করেন। হাঙ্গেরীর বিপ্লব তার ফলে ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

এরকম যিনি স্বৈরাচারী তিনি স্বদেশে যে নিপীড়নকেই তাঁর শাসনের হাতিয়ার করবেন আর কোন সন্দেহ নেই। তাঁর অভ্যন্তরীণ নীতিকে বলা হয়েছে ''দৃঢ়বদ্ধ নিপীড়নের নীতি' ('a policy of resolute repression')। তাঁর আদর্শ ছিল অনমনীয় রক্ষণশীলতা ('rigid conservatism')। আর তার প্রয়োগ পদ্ধতি ছিল একটাই—লৌহমুষ্টিতে গণচেতনার প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ করা ('controlling with iron rigour all popular manifestations')। ১৮২৬ সালে গুপ্ত পুলিশকে (Secret Police) আবার ফিরিয়ে আনা হল। প্রথম আলেকজান্ডার প্রথম নিকোলাসের থেকে অনেক বেশি মানবিক ছিলেন। তিনি গুপ্ত পুলিশ তুলে দিয়েছিলেন। এবার আরও শক্তিশালী করে তাকে ফিরিয়ে আনা হল। এই পুলিশকে বলা হত 'জারের ব্যক্তিগত পরামর্শদাতাদের তৃতীয় শাখা' (Third Section of theTsar's Private Chacellory')। এই পুলিশের ক্ষমতা আর কার্যকলাপের উপর জার কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেননি। ফলে তাদের কোন দায়বদ্ধতা ছিল না। যে কোন মানুষকে সন্দেহ করে তাকে আটক করা, বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা, দেশান্তরে পাঠানো (deporting) এই সমস্ত ঘৃণ্য কাজ এই পুলিশের নিয়মমাফিক কর্মসূচি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এমন অত্যাচারী শাসনের নিদর্শন রেখেছিলেন স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ (Philip II of Spain)। প্রথম নিকোলাসের কাজ ফিলিপকেও প্রায় ম্লান করে দিয়েছিল। তিনি রাশিয়ার মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিলেন। ঘোষণা করেছিলেন যে নিষিদ্ধ পাঠ করা হচ্ছে অপরাধ (crime) যার শাস্তি হল দেশ থেকে বহিষ্কৃত হওয়া। রুশ জনগণকে দেশের বাইরে যেতে নিষেধ করা হল। রাশিয়ার সাথে বহির্জগতের সম্পর্ক ছিন্ন করা হল। পিটার দ্য গ্রেট রাশিয়াকে পাশ্চাত্যের অভিমুখী করেছিলেন। সে ধারা এবার বন্ধ হল। প্রথম নিকোলাসের স্বৈরাচার কত গভীর ও ব্যাপক ছিল তা বোঝা গেল ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সময়। রাশিয়া ছিল একমাত্র বড় দেশ যেখানে বিপ্লবের কোন স্পন্দন অনুভূত হয়নি।

প্রায় তিরিশ বছর নিকোলাসের স্বৈরাচারের রথ দুর্বার গতিতে ছুটেছে—কেউ বাধা দেয়নি ১৮৫৪ সালে নেমে এল ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের বিপর্যয়। ত্রস্ত মানুষ জেগে উঠল। এইখানেই স্বৈরাচারী শাসনের মৃত্যুঘণ্টা বাজতে লাগল।

স্পেনে এবং রাশিয়াতে যে স্বৈরাচার এত দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিস্তার করেছিল তার কারণ উভয় দেশের মানুষ ছিল রাজভক্ত এবং অত্যাচারী শাসন ব্যবস্থার অন্যায় আর অবিচারের প্রতি উদাসীন। মোহাচ্ছন্ন রাজভক্তি ও উদাসীনতায় নিদ্রিত জাতির ঘুম ভাঙল যুদ্ধ-বিপর্যয়ের আঘাতে। নিদ্রিত জাতি ছিল জারতন্ত্রের বুনিয়াদ—প্রজ্ঞার আলোকে সে হয়ে উঠল জারতন্ত্রের শত্রু। ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ প্রমাণ করল যে জারতন্ত্রের চণ্ডশাসন কত দুর্নীতিগ্রস্ত, কত অন্তঃসারশূন্য, তার নেতারা জাতীয় বিপর্যয়কে কঠিন হাতে মোকাবিলা করতে কতটা অক্ষম। এমনকী যে সৈন্যবাহিনীর উপর সরকার নির্ভর করত, যাকে রাজতন্ত্রের সবচেয়ে গর্বের সংগঠন বলে মনে করত সে সৈন্যবাহিনীও কী নিদারুণ ভাবে দুর্বল, বৃহৎ শক্তিবর্গের নিকট অসহায়। এই প্রথম জনগণ জানতে পারল যে সেনা সংগঠন বড়ই প্রাচীন, আধুনিকীকরণের কোন শক্তি তার মধ্যে নেই। সেনাপ্রধানরা সব অদক্ষ, কোন কোন সৈনিকের মধ্যে সাহস ও শৌর্য থাকলেও সংগঠনের সামগ্রিক দুর্বলতা সমস্ত রণকৌশলকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছিলেন যে ''যদি আর একবছর যুদ্ধ চলত তবে সমস্ত দক্ষিণ রাশিয়া ধ্বংস হয়ে যেত'' (''Another year of war and the whole of southern Russia will be ruined'')। এটি ১৮৫৫ সালের অভিজ্ঞতা। এ অভিজ্ঞতার ফল আরও ভয়াবহ। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এ রকম : ''চারদিকে জনগণের বাহিনী তৈরি করা হয়েছে। অনেক ভূস্বামী বিপুল অর্থ খরচ করে স্বেচ্ছাসেবীদের হাতে অস্ত্র জুগিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের উদ্দীপনায় ভাটা পড়ল যখন তারা দেখলেন যে তাঁদের দেশসেবার কাজ শুধু ঠিকাদার বা সুযোগ সন্ধানীদের সঞ্চয়কেই বাড়িয়েছে, শত্রুর উপর কোন আঘাত হানা হয়নি'' (''Militia regiments were everywhere raised throughout the country, and many proprietors spent large sums in equipping volunteer corps, but very soon this enthusiasm cooled when it was found that the patriotic efforts enriched the jobbers without inflicting any serious injury on the enemy.'') । সরকার সামরিক বিপর্যয় ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার খবর গোপন করার চেষ্টা করেও সফল হতে পারল না। রাশিয়াতে অবস্থানকারী সমসাময়িক একজন ইংরাজ পর্যটক লিখেছেন যে জারের নিরঙ্কুশ চাপে পড়ে সৈন্যবাহিনীর সমস্ত শক্তি, ব্যক্তিত্ব ও নৈতিকতা নিঃশেষিত হয়েছিল। (''The Emperor ... had drilled out of the officers all energy, individuality and moral force'') স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের আধাসামরিক প্রশাসন নিঃসীম ব্যর্থতা ও অসহনীয় হতাশার মধ্যে তলিয়ে গেল। হতমান জার প্রথম নিকোলাস ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ চলাকালীন ১৮৫৫ সালের মার্চ মাসে মারা যান।

প্রান্তলিপি

ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ ১৮৫৪-৫৬ : ইউরোপীয় রাশিয়ার দক্ষিণদিকে থেকে কৃষ্ণসাগরের উপর ঝুঁকে পড়া প্রায় চারদিকে জলবেষ্টিত একটি উপদ্বীপ ['four sided peninsula']। মহাদেশের মূল ভূখণ্ডের সাথে পেরেকপ এর সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ড [isthmus of perekop) দ্বারা যুক্ত। কিন্তু এই ভূখণ্ডের মাঝখান দিয়ে খাল কাটা হয়েছে বলে ক্রাইমিয়া (Crimea—ইংরাজি উচ্চারণ ক্রাইমিয়া) একটি কৃত্রিম দ্বীপ হয়ে উঠেছে। রাশিয়া অটোম্যান তুর্কীশাসনের অধীনে গ্রীক অর্থোডক্স (Greek Orthodox Faith) খ্রিস্টান মতাবলম্বীদের সমর্থনে অগ্রসর হলে এখানে যুদ্ধ বাধে। রুশরাও চিল অর্থোডক্স চার্চের অন্তর্ভূক্ত। এই যুদ্ধে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও সার্ডিনিয়া (Serdinia) তুরস্ককে সাহায্য করেছিল। তাদের ভয় ছিল কনস্ট্যানটিনোপল (Constantinople) রাশিয়ার হাতে পড়ে যাবে। এটি চিল উদ্দেশ্যহীন যুদ্ধ যার জন্য কোন পক্ষই প্রস্তুত ছিল না। এই যুদ্দে আহত সৈনিকরা খুব কষ্ট পেয়েছিল। তাদের সেবা করে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল মানবসেবার অসাধারণ নজির স্থাপন করেছিলেন। এই যুদ্ধ রাশিয়ার পক্ষে বিপর্যয়ের কারণ হয়েছিল। এই যুদ্ধকে অবলমন করেই ইংরাজ কবি টেনসিন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'Change of the Light Brigade' লিখেছিলেন।

৩.৯ ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের শিক্ষা ঃ সংস্কারের প্রত্যক্ষ কারণ

ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন (David Thompson) লিখেছেন যে ক্রাইমিয়ার যুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক রাশিয়ার পরাজয়ের ঘটনা এই মর্মে সতর্ক করে দিয়েছিল যে রাশিয়াতে পরিবর্তন দরকার। ("The defeat of Russia by Britain and France in the Crimean war served as a warning that some change was needed")। অনেক দূর থেকে কাজ করে এবং তাদের রসদের একটি অংশ ব্যবহার করে এই পাশ্চাত্য শক্তিগুলি যে অত্যন্ত সংকীর্ণ অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়েছিল রুশ সাম্রাজ্য তার আয়তনের বিশালতা এবং নিশ্চিত স্ট্র্যাটেজিক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তা প্রতিরোধ করতে পারেনি। ("Operating from a great distance and using only part of this resources, these advanced western powers had mounted highly localized offensive which the Russian empire had failed to repel, despite its vast size and its obvious strategic advantages"—David Thompson)। ক্রাইমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার ব্যর্থতা তার সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিজাত শ্রেণীর নিদ্রাভঙ্গ ঘটিয়েছিল। ঐতিহাসিক লিপসন লিখেছেন যে একটা বিরাট জাতীয় অপমানের জ্বালা নিয়ে সমাজের উপরতলার মানুষেরা তাদের এতদিনের নিশ্চিন্ত আত্মসমর্পণ থেকে জেগে উঠল। ("Under the sting of the great national humiliation, the upper classes awoke from their optimistic resignation.") এতদিন তারা আধা-সামরিক শাসনের নির্যাতন সহ্য করেছিল দেশের দিকে তাকিয়ে—চেয়েছিল দেশ শক্তিশালী হোক। এবার তারা জানল সবই অলীক, বিরাট ধাপ্পাবাজি (hoase)। সংস্কারহীন নিশ্ছিদ্র পুলিশি শাসন, নীতি বিহীন সামরিক শাসন, কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্র সবই ব্যর্থ। ঐতিহাসিক ওয়ালেস (Wallace) তাঁর রাশিয়া (Russia) নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে এই পুলিশি শাসন এই আধা সামরিক প্রশাসন এবং শেষপর্যন্ত এই ড্রিল মাস্টারের জারিজুরি একটি বাহ্যিক শান্তি এনে ছিল, ''কিন্তু এই শান্তি স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়া নয়, তা ছিল মৃত্যুর শান্তি যা গভীরে গোপনে গড়ে উঠছিল দুর্নীতি ("this tranquility was not that of healthy normal action, but of death–and underneath the surface by secret and rapidly spreading corruption")। দেশের সমস্ত মানুষ বুঝতে পারল যে এক দুরারোগ্য ব্যাধি দেশকে পঙ্গু ও অচল করে দিয়েছে। তারা এই প্রথম উপলব্ধি করল যে রাষ্ট্র সংগঠনের মধ্যে একটা মৌল ত্রুটি রয়েছে। এই মৌল ত্রুটির (radical defects) বোধ থেকে জন্ম নিল ত্রুটি সংশোধনের বাসনা। প্রশ্ন জাগল যে সে ব্যবস্থা এতদিন এমন অনমনীয় ধৈর্য সহকারে পরিশীলিত হয়েছে তার মধ্যে মৌল ত্রুটি না থাকলে এমনটি হবে কেন? ("How could this be explained except by the radical defects of that system which had been long practised with such inflexible Perseverance?")। এ প্রশ্নের জবাব খুঁজেছিল একটি হতমান জাতি, বুঝেছিল সমাজ-সংস্কার এবং রাষ্ট্রিক সংস্কার ছাড়া আর কোন গতি নেই। এই সংস্কারের তাগিদ নিয়েই পরবর্তী শাসক দ্বিতীয় আলেকজান্ডার (Alexander II) ক্ষমতায় এসেছিলেন।

৩.১০ দ্বিতীয় আলেকজান্ডার : সংস্কারের সূচনা

দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের (Alexander II) রাজত্বকাল ১৮৫৫ থেকে ১৮৮১। ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ চলাকালীন

তিনি তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথম থেকেই তিনি স্থির করেছিলেন যে পিতার মতো 'মুকুট পড়া ড্রিল সার্জেন্ট' ('a crowned drill-sergeant') হবেন না। যদিও তাঁর পিতার রাজনীতি ও আদর্শের অনুসরণ করেই তিনি বড় হয়েছিলেন, কিন্তু পিতার আদর্শ তাঁকে কখনো স্পর্শ করেনি। পিতার চরিত্রিক অনমনীয়তা ও পরিবেশের মধ্যে যে স্বৈরাচারী রূঢ়তা ছিল তাকে রাজত্বকালের প্রথম পর্বে অন্তত তিনি দূরে সরিয়ে রেখে ছিলেন। এটি তাঁর বড় কৃতিত্ব। দ্বিতীয় আলেকজান্ডার সৈনিক ছিলেন না বলেই বোধহয় তাঁর মধ্যে সহজাত নম্রতা ছিল, তিনি তাঁর চারপাশের মানুষজন সম্বন্ধে সদয় হতে পারতেন। কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁকে একজন 'নিষ্ঠাবান রুশ' ('a stauch Russian') বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল একটাই—যে করেই হোক দেশের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে তাঁর হাতে কোন সংস্কারের কর্মসূচি তৈরি ছিল। একসঙ্গে বড় কর্মসূচি নিয়ে তিনি অগ্রসর হতে চাইতেন না। একটি সংস্কার, একটি কাজ, একটি উদ্যোগ হাতে নিয়ে তিনি তার সাফল্য অসাফল্য বিবেচনা করে তবে পরের কাজে হাত দিতেন। পরিস্থিতি যে সংস্কারের দাবি নিয়ে আসত সেই সংস্কার তিনি আগে করতেন এবং তার মাধ্যমে পরিস্থিতিকে সামলানোর চেষ্টা করতেন। তাঁর পিতা প্রথম নিকোলাস তাঁর অনমনীয়তা ও কঠোরতার দ্বারা পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলতেন, কিন্তু পুত্র দ্বিতীয় আলেকজান্ডার সেনাসুলভ অনমনীয়তা থেকে মুক্ত ছিলেন বলে অনায়াসেই পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করতে পারতেন। তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে এই রকম মানসিকতা নিয়েই তিনি সংস্কার কার্যে হাত দিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে যে দ্বিতীয় আলেকজান্ডার যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁর বয়স ৩৭ বছর। যুবকোচিত প্রসারতা ও উদ্দীপনা তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি উচ্চশিক্ষা পেয়েছিলেন এবং রাজকার্য পরিচালনায় ব্যবহারিক শিক্ষালাভও করেছিলেন। এগুলিকেই তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন। কোনমতেই তাঁকে প্রতিভাবান বলা যাবে না। তিনি একটি অভিজ্ঞতার পর আরেকটি অভিজ্ঞতা লাভ করে অগ্রসর হতেন, পরিবেশের দ্বারা চালিত হয়েই মৌলিক সংস্কারে হাত দিতেন এবং এইভাবেই তিনি যে সংস্কারের রূপায়ণ করেছিলেন তা রাশিয়ার ইতিহাসকে নতুন পথে চালিত করেছিল। তাঁর সংস্কার পুরানো সমস্যার সমাধান করেছিল কিন্তু জন্ম দিয়েছিল নতুন সমস্যার, নতুন অস্থিরতার যার নিরসন ঘটানো জারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পরিণতিতে জার নিজেই নিহত হন। মুক্তিদাতা জার শেষপর্যন্ত সমস্যা থেকে মুক্তি পেলেন নিজের আত্মহুতিতে।

৩.১১ ভূমিদাসদের মুক্তি

দ্বিতীয় আলেকজান্ডার রাজ্যাভিষেকের সময়ে সামন্তপ্রভুদের উদ্দেশে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। সে ভাষণে তিনি বলেন : ''নীচের তলা থেকে ভূমিদাসপ্রথার বিলুপ্তির জন্য অপেক্ষা না করে উপর তলা থেকে এর বিলোপই ভাল।'' এই নীতির সাথে সঙ্গতি রেখেই তিনি ১৮৬১ সালের ৯ই মার্চ (পুরানো ক্যালেন্ডারের ১৯ ফেব্রুয়ারি) ভূমিদাসপ্রথার বিলোপের ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর করেন।

ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের সমাপ্তিমূলক প্যারিসের সন্ধি (১৮৫৬) স্বাক্ষরিত হওয়ার সাথে সাথেই দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ভূমিদাস প্রথা বিলোপের কাজে হাত দিলেন। এই প্রথাকে আদ্যন্ত বোঝার জন্য নানা কমিটি স্থাপন করা হল। ভূমিদাসত্ব বিলোপের প্রশ্নটি নানাদিক থেকে আলোচিত হওয়ার পর জার মুক্তির ঘোষণাপত্রে (Edict of

Emancipation) স্বাক্ষর করেন। বহুদিনের আকাঙ্খিত অথচ অনারব্ধ একটি কর্ম জারের উদ্যোগে উপরতলার দান হিসাবে রূপায়িত হল। যে ব্যবস্থার কোন সমর্থক ছিল না সে কথা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে লুপ্ত হল না। রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে তার অবসান হল।

৩.১২ ভূমিদাসত্ব বিলোপ হল কেন?

ভূমিদাসত্ব বিলোপের পেছনে অনেক কারণ ছিল। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার হয়তো দেশের অসংখ্য দুর্গত ও বিপন্ন মানুষকে মুক্তি দেওয়ার বাসনায় আন্তরিকভাবেই কাতর হচ্ছিলেন। তার সাথে তিনি এটাও বিশ্বাস করতেন যে এ ব্যবস্থা এতই অর্থহীন ও জীর্ণ হয়ে পড়েছে যে তাঁর উচ্ছেদ শুধুই সময়ের ব্যাপার। এটি যদি স্বয়ংক্রিয় লুপ্তি হয় তবে হয়তো একদিন এক বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে তার অবসান ঘটবে। সেই আগত সমাজবিপ্লবকে রোধ করাই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বলে তিনি মনে করতেন এছাড়া বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে ভূমিদাসত্ব সম্বন্ধে জনগণের মানসিকতা পাল্টে গিয়েছিল। এমনকী এ ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত যৌক্তিকতার পরিবর্তন হচ্ছিল। ভূমিদাসত্বের অর্থনিহিত যৌক্তিকতার পরিবর্তন হচ্ছিল। ভূমিদাসত্বের অর্থনৈতিক গুরুত্ব হ্রাস পায়। মুদ্রার অর্থনীতি বেশ জোরদারভাবে তখন চালু হয়েছে। বাজারের জন্য প্রতিযোগিতাও প্রকট হয়ে উঠেছে। এই সময়ে দরকার ছিল মুক্ত শ্রমিক এবং বাজারে শ্রমের অবাধ যোগান। কিন্তু ভূমিদাসত্ব ব্যবস্থা এই মুক্ত শ্রমের বিনিয়োগের পথ আটকে রেখেছিল ভূমিদাসব্যবস্থা এমনিতেই অচল হয়ে যাচ্ছিল কারণ ভূমিদাসদের শ্রমের মান ক্রমশ নিম্নমুখী হয়ে পড়ছিল। এদিকে ভূস্বামীরাও বেশ কিছুকাল যাবৎ নিঃস্ব ও অকিঞ্চন হয়ে পড়ছিল। তাদের আর্থিক সঙ্গতি এতটা কমে যাচ্ছিল যে কোন কোন সমস্ত প্রভুদের পক্ষে ভূমিদাসদের রাখা, তাদের ভরণ পোষণ দেওয়া আর সম্ভব হচ্ছিল না। ভূমিদাসদের সংখ্যাও ক্রমশ কমে আসছিল। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৮১১ সলের সমগ্র রুশ জনসংখ্যার ৫৮ শতাংশ ছিল ভূমিদাস। মুক্তির প্রাক্কালে তা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৪৪.৫ শতাংশে। নতুন যুগে সমাজ সম্পর্কে দাসত্ব বা পিতৃতান্ত্রিকতা (paternalism) কোনটিই আর অর্থবহ ছিল না। উনিশ শতকে ধীরে ধীরে স্বাধীন শ্রমিক নিয়োগের প্রথাটি বাড়তে থাকে। এর জন্য দরকার ছিল শ্রমের স্থিতিস্থাপকতা (flexibility)। ভূমিদাস ব্যবস্থার পরিকাঠামোর মধ্যে এ স্থিতিস্থাপকতা থাকা সম্ভব ছিল না। ভূস্বামীরা লক্ষ করছিলেন যে বেতনভূক শ্রমিকরা স্বাধীন হওয়ার ফলে অনেক সতেজ, মানসিকতায় অনেক শক্তিশালী ও দৈহিকভাবে কর্মঠ। তাই তারা নিজেরাই এর পরিবর্তন চাইছিলেন। দক্ষিণে অনেক ভূস্বামীই ছিলেন যারা আমদানি রপ্তানির ব্যবসা করে আধুনিক অর্থনীতির আস্বাদ লাভ করেছিলেন। তাদের কাছে স্বাধীন শ্রমিক অনেক বেশি কাম্য ছিল। সবচেয়ে বড় কথা রুশ গ্রামাঞ্চলে ভূমিদাসদের অস্থিরতা, তাদের অভ্যুত্থান, তাদের বিদ্রোহ প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুক্তির আগের মুহূর্ত পর্যন্ত শুধু উনিশ শতকেই যত ভূমিদাস অভ্যুত্থান হয়েছিল তারা সংখ্যা অনেক—কারও মতে ৫৫০, কারও মতে ১,৪৬৭। বিশিষ্ট গবেষক ইগনা টৌত্রিভচ বলেছেন যে ভূমিদাসের অভ্যুত্থানের ফলে সম্পত্তি ও মানবসম্পদের অপচয় বেড়ে যাচ্ছিল। সমাজ-সম্পর্কে তিক্ততা আসছিল এবং শান্তিশৃঙ্খলার অবনতি ঘটছিল। এই শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকারকে পুলিশি তৎপরতা বাড়াতে হচ্ছিল এবং তাতে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সাম্প্রতিক কালের গবেষকরা মনে করেন যে

ভূমিদাস প্রথা বিলোপের বিষয়ে ভূমিলগ্ন কৃষকদেরই ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। অবশ্য এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে নৈতিক দিক থেকেও ভূমিদাসপ্রথার বিলোপ সাধন অপরিহার্য হয়ে পড়ছিল। রুশ চিন্তানায়করা, পাশ্চাত্য উদারনীতিতে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীরা স্লাভ সম্প্রসারণবাদীরা এবং ডিসেম্ব্রিষ্টরা সকলেই ভূমিদাসত্বের বিলোপ চাইছিল। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার একটি সংস্কারের দ্বারা সকলেরই মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করেছিলেন।

৩.১৩ ভূমিদাসপ্রথা বিলোপের ফলাফল

১৮৬১ সালের ঘোষণাপত্রের দ্বারা ভূমিদাসরা আইনের বন্ধন থেকে মুক্তি পেল (freedom from legal bondage)। সরকার এক পিতৃসুলভ (paternalistic) ভূমিকা গ্রহণ করে দেশ থেকে মানবিক দাসত্ব দূর করল, রাষ্ট্রের একটি নৈতিক দায়িত্ব পালন করল। ভূমিদাসরা স্বাধীন হয়ে একখণ্ড করে জমি পেল, কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের চাষ করা জমির যা আগে ভূস্বামীদের মালিকানায় ছিল তার অর্ধেকটা তারা পেল। এইভাবে একদিকে তারা জমির মালিক হল এবং অন্যদিকে সরকারের প্রজা হল কিন্তু নিজের চাষ করা জমির অর্ধেকটা রয়ে গেল ভূস্বামী মালিকের স্বত্ত্বাধীনে। আর যেটুকু তারা পেলে তার জন্য ভূস্বামীদের তারা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য রইল। যেহেতু ভূস্বামীদের তারা আর কোন খাজনা, বেগার শ্রমও কোন কর দেবে না তার জন্য তাদের তারা দেবে একটি ক্ষতি পূরণের অর্থ (redemption money)। ভূমিদাসরা যে জমি পেল তার উপর তাদের ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হল না যে ধরনের মালিকানা ফরাসী কৃষকরা উপভোগ করত। স্থির হল যে ভূমিদাসদের জমি হবে গ্রাম সমাজ বা মির (Mir)-এর যৌথ সম্পত্তি (collective property)। আগে ভূস্বামীরা জমি নিয়ন্ত্রণ করত আর মির যৌথভাবে তাদের অর্থপ্রদান করত। এবার ভূস্বামীরা সরে গেল, তাদের স্থলাভিষিক্ত হল মির এবং মিরই ভূস্বামীদের ক্ষতিপূরণের অর্থ দেবে বলে স্থির হল। অর্থাৎ কৃষকদের মাথায় এক কর্তৃত্বের বদলে অন্য কর্তৃত্ব এল। এই কারণেই বলা হয়ে থাকে যে সম্রাটের মুক্তি ঘোষণা রুশ কৃষকদের আইনের স্বাধীনতা দিয়েছিল, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেয়নি ("The imperial decree of emancipation gave the Russian peasants legal freedom without economic freedom"—David Thompson)। ব্যক্তিদাসত্ব (Personal servitude) উঠে গেল, এল সমাজভিত্তিক দায়িত্ব (communal responsibilities)।

রাশিয়াতে ভূমিদাসমুক্তি ভূমিহীন কৃষকের জন্ম দেয়নি যেমনটি ঘটেছিল প্রশিয়ায় বা ইউরোপের অন্য দেশে। সেখানে ভূমিদাসরা মুক্তির পর ভূমিহীন হয়ে ছিন্নমূল শ্রমিকে পরিণত হল এবং গ্রাম ছেড়ে শহরে জীবিকার সন্ধানে চলে গেল। রাশিয়ার কৃষি জীবনে মুক্তিপ্রাপ্ত কৃষকদের দায় (stake) স্থির করা হয়েছিল এবং তারা ব্যাবসা করার নামে বা ভিন্নতর জীবিকার বাসনায় গ্রাম ছেড়ে যেতে পারত না। তার জন্য তাদের অনুমতি দরকার হত। ১৯০৫ সালের আগে মির (Mir) তার গ্রামের খাজনা ও করের ব্যাপারে যৌথ দায়িত্ব পালনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পায়নি। ততদিন কৃষকরা স্বাধীন হতে পারেনি। ভূমিদাসদের মুক্তি রাশিয়ার কৃষি পদ্ধতি (methods) ও উৎপাদনে কোন পরিবর্তন আনেনি। সরকার যাজক ও ভূস্বামীদের মির এর বাইরে রেখেছিল। ফলে যারা ব্যবস্থার তদারকি শ্রেণী হিসাবে এতকাল গড়ে উঠেছিল তারা সমস্ত কর্তৃত্ব ও তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থার বাইরে থেকে ক্রমশ নিষ্ক্রিয় হয়ে

পড়ল এরপর প্রায় অর্ধশতাব্দী রুশ কৃষিতে আধুনিকীকরণের কোন প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। এ সমস্ত কারণে ভূমিদাসপ্রথা রুশ সমাজের মৌল গলদগুলিকে ঢাকতে পারেনি। দুর্ভাগ্যবশত জার আলেকজান্ডার কারও কৃতজ্ঞতা লাভ করেননি। ১৮৮১ (1881) সালে বোমা বিস্ফোরণ তার মৃত্যু হয়।

৩.১৪ অন্যান্য সংস্কার

দ্বিতীয় আলেকজান্ডার জার হওয়ার সাথে সাথে অনেক রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিলেন। দেশ থেকে বহিষ্কৃত (exiles) বহু মানুষকে ফিরে আসার অধিকার দিলেন। তিরিশ বছর জেলে বন্দি থাকার পর ডিসেম্ব্রিষ্টরা মুক্তি পেল। মুদ্রাযন্ত্রের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে দিলেন এবং নতুন করে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের সূচনা করেন। ভূমিদাসদের মুক্তির ফলে দেশের অগ্রগতির সবচেয়ে বড় বাধা কেটে গিয়েছিল। এইবার নানা ধরনের মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল। এই পরিবর্তনের নানা দিক ছিল। এই প্রথম রাশিয়ায় জনমত গঠন করার পরিবেশ এবং গণস্বার্থ বিষয়ে জনমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হল। শিক্ষা ও মুদ্রাযন্ত্রের মুক্তির পাশাপাশি সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীকেও নানাভাবে সংস্কার করা হয়। এই সময় থেকেই রুশ সরকারি বাজেটে প্রকাশ করা শুরু হয়। দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের দুটি বড় সংস্কার হল বিচার বিভাগীয় সংস্কার ও প্রশাসনিক সংস্কার। বিচার বিভাগের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি ছিল। অনেক সময় মামলা মোকদ্দমার ফয়সালা গোপনে হত। ঘুষ, উপঢৌকন, মিথ্যাচার সত্যকে আড়াল করা এগুলি ছিল বিচার বিভাগের প্রাত্যহিক ঘটনা। এই ধরণের ব্যাভিচার দূর করার জন্য ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের বিচারব্যবস্থার ধাঁচে নতুন করে বিচার বিভাগ চালু করা হল। বিচার বিভাগ ও প্রশাসনের কাজ ও দায়িত্ব বিভাজন করা হয়, ম্যাজিস্ট্রেটদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হল, মৌখিক শুনানি চালু হল এবং জুরি (Jury System) ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল। নতুন ফৌজদারি বিধি (Penal Code) প্রণয়ন করা হল, ফৌজদারির বিচার ও দেওয়ানি বিচার (Criminal and civil cases) পৃথক করা হল। ছোট ছোট বিচারের জন্য জাস্টিস অফ পিস (Justice of Peace) নিযুক্ত হল। তারা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হত। বড় বড় বিচার ও মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তির কাজ সম্পন্ন করত নিয়মিত অধিবেশন যুক্ত ট্রাইবুনাল (Tribunals)। এই ট্রাইবুনালে থাকতেন বিচারপতি যারা সম্রাটের দ্বারা মনোনীত হতেন। এই রকম বিচার ব্যবস্থার নবরূপায়ণের জন্য দরকার ছিল নতুন মানুষের দ্বারা শিক্ষিত, এবং নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ। এরকম মানুষের অভাব ছিল। কিন্তু তা বলে নতুন ব্যবস্থা একেবারে ব্যর্থ হয়েছিল একথা বলা যাবে না। আস্তে আস্তে বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতি কমে এসেছিল। বিচারের প্রতি জনগণের আস্থা অল্প অল্প করে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অভিজ্ঞতা যতই বাড়ছিল ততই জাতীয় জীবনে বিচার ব্যবস্থার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ প্রমাণ করেছিল যে দেশের প্রশাসন (administration) একেবারে গলিত শবে পরিণত হয়েছে। অতএব প্রয়োজন ছিল প্রশাসনের নতুন প্রাণ সঞ্চার করা। এই উদ্দেশ্য নিয়েই মস্কোর দেশগুলিতে নতুন পরিবর্তনের সূচনা করা হয়। বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বায়ত্তশাসন এই দুই দিকে প্রশাসনকে সংস্কার করা হয়। প্রতিষ্ঠা করা হয় **জেমস্ট্ভো** (zemstvo) নামে নতুন সভা (Council)। এই সভাগুলিতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষেরা,

অভিজাত (nobles), কৃষক (peasants) এবং মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া (bourgeois) মানুষদের প্রতিনিধিরা থাকত। জেমস্‌ট্‌ভো সভার দুটি স্তর ছিল। প্রথম স্থর হল জেলা পরিষদ (district council)। এর সদস্যরা নির্বাচিত হত গণভোটের দ্বারা। দ্বিতীয় এবং উচ্চতর স্তর হল প্রাদেশিক সভা (Provincial Council)। যার সদস্যরা নির্বাচিত হত জেলা পরিষদের সদস্যদের দ্বারা। এই আঞ্চলিক প্রশাসনের এককগুলি একদিকে স্বাযত্ত শাসন ও অন্যদিকে বিকেন্দ্রিকৃত প্রশাসন এই দুই নতুন দিগন্তকে তুলে ধরেছিল। এই দুইটি আঞ্চলিক সভার কাজ ছিল জাস্টিস অফ পিস-দের নির্বাচিত করা, জেলার রাস্তাঘাট, ব্রিজ বা সেতুর নির্মাণ, মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থা, পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা, ও তার উপর নজর রাখা, বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা করা ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করা। এই সব করার জন্য যে পরিমাণ অর্থের দরকার ছিল তা এদের ছিল না। তাছাড়া প্রদেশের প্রধান শাসকের (governor) একটা ভেটো ক্ষমতা (veto) ছিল যার দ্বারা এদের সিদ্ধান্তের উপর সংযম আরোপ করা যেত। এসব সত্ত্বেও আঞ্চলিক প্রশাসনে এই সংস্থাদুটির অভিনবত্ব ছিল। তারা প্রশাসনের রুগ্ন কাঠামোকে সবল করতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিল। রাশিয়া আধুনিকীকরণের দিকে পা বাড়িয়েছিল।

ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে এই সমস্ত সংস্কারের দ্বারা দ্বিতীয় আলেকজান্ডার রাশিয়ার নিশ্চল পরিবর্তনহীনতায় একটা পরিবর্তনের ঝড় তুলে দিয়েছিলেন। সম্ভবত মহামতি পিটারের রাজত্বকালের পর আর কোনও জার একটি বদ্ধ জাতির মুক্তির দরজা এতখানি খুলে দিতে পারেননি যতখানি দিয়েছিলেন দ্বিতীয় আলেকজান্ডার। এজন্য তাঁকে **মুক্তিদাতা জার** (*Czar Liberater*) বলা হয়ে থাকে। তাঁর সংস্কারের ফলে রাশিয়াতে নতুন হওয়া বইতে থাকে। নতুন অর্থনীতি, নতুন দর্শন সাহিত্য ও রাজনীতির গ্রন্থ রচিত হতে লাগল। শিক্ষায় (education) ও মুদ্রণে (press), পুস্তকে আর পত্রিকায় নতুন এক কল্পান্ত বিভোরতা (Utopia) দেখা যেতে লাগল। মানুষ ভাবতে শুরু করল যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন শুধুমাত্র একটি প্রথম পদক্ষেপ, একটি ভূমিকা যার পরের অধ্যায়ে আসবে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্ব-শাসন (Political self government)। পাশ্চাত্যের উন্নয়নশীল দেশগুলিকে ধরে ফেলার লক্ষ্যে রাশিয়া এবার নতুন দৌড় শুরু করল। ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণ রচিত হয়েছিল যখন হঠাৎ করে জনসত্তায় নবজাগরণের শিহরণ দেখা দিল। একজন ঐতিহাসিক লিখলেন রাশিয়া এবার সত্যিই পশ্চিমের অনুসরণ করতে পারত ("Russia was to initiate the nations of the west" [Ketelbey])। একটি এশিয় শক্তি হিসাবে নিজের দীনতা ঘোচানোর লগ্ন রাশিয়ার এতাবৎকালের অনালোকিত গার্হস্থ্য জীবনে আত্মপ্রকাশ করল। কিন্তু জনগণ তখনও পূর্ণভাবে উজ্জীবিত হয়নি। আশার পেছনে ছিল হতাশা, তাই চরম লগ্নেও জাতিসত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটল না। হতাশ জাতির প্রতিক্রিয়া তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। ১৮৬৬, ১৮৭৩ ও ১৮৮০ সালে স্বয়ং জারকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার এবার ঘুরে দাঁড়ালেন, ফিরে গেলেন পিতার দুর্দমনীয় স্বৈরতন্ত্রে। ১৮৬৬ সাল থেকে তাঁর আভ্যন্তরীণ নীতি বদলাতে শুরু করে । হয়তো পরে সরকার ও সেনাবাহিনীর সংস্কারে কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কিন্তু মোটের উপর সংস্কারের প্রেরণা দুর্বল হয়েছিল। একজন ঐতিহাসিক লিখলেন '... the spirit of reform had withered'। জার নিজেই নিজের সংস্কারের আশানুরূপ ফল না পেয়ে দুঃখিত হয়েছিলেন। কৃষকরা তখনও মনে করছিল তারা নির্যাতিত, আইন-আদালত আশানুরূপভাবে সচল হয়নি আর প্রশাসন থেকে দুর্নীতিকে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। ১৮৬৩ সালে পোলদের বিদ্রোহ

(এটি দ্বিতীয় বিদ্রোহ, প্রথম বিদ্রোহ হয়েছিল জার প্রথম নিকোলাসের সময়ে) দেশে নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি করল। এ উত্তেজনার অনেকটাই ছিল পোল্যান্ডকে ঘিরে। জারের রাজত্বের প্রথম পর্বের সংস্কার পোল্যান্ডবাসীর মনেও উৎসাহ জাগিয়েছিল। এ উৎসাহে মদত দিয়েছিল অনেক রুশ। এবার যখন পোল্যান্ডের অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল তখন রাশিয়ার উদারপন্থীরা দুঃখ পেলেন, ক্ষিপ্ত হলেন। অন্যদিকে যারা প্রতিক্রিয়াশীল যাদের নীতি ছিল, 'পবিত্র রাশিয়া, সনাতন চর্চা ও সম্রাটের একক স্বৈরাচার'—'Holy Russia, the Orthodox Church, and the imperieal autocracy'—তারা বলতে লাগলেন যে সংস্কারের কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হয়েছে, অনর্থক বেশি দূর এগিয়ে গেছেন রাশিয়ার জার, থেমে যাও উচিত ছিল অনেক আগে। এরকম মত ও মন্তব্যকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিত নিহিলিষ্টরা। তারা ছিল পরিবর্তনকামী—ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সৃজনের তত্ত্বে বিশ্বাসী—সমস্ত রকমভাবে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী—ঈশ্বর থেকে সম্রাট, রাষ্ট্র থেকে সমাজ, পরিবার থেকে সম্পত্তি, ধর্ম থেকে নৈতিকতা সমস্ত কিছুকে তারা নতুন ধাঁচে তৈরি করতে চাইত। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক **তুর্গেনিয়েভ** (Turgeniev) তাঁর **'পিতারা ও পুত্ররা'** (*Fathers and Sons*) নামক গ্রন্থে নিহিলিষ্ট দর্শনের ব্যাখ্যা করেছেন। নিহিলিষ্ট (Nihilist) মতবাদের তিনটি পর্যায় ছিল। প্রথম পর্যায়ে ১৮৬০-এর দশকে নিহিলিজম অন্ধ সংস্কার ও কর্তৃত্বের প্রতি অন্ধভক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে তা অনেক বাস্তবমুখী হল—রুশ কৃষকদের তাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার বিরুদ্ধে সজাগ করে তুলল। তৃতীয় পর্যায়ে তা সন্ত্রাসবাদে পরিণত হল। এই পর্যায়ে তা জনসমর্থন হারিয়েছিল। নিহিলিষ্টদের জন্মই প্রমাণ করেছিল যে রাশিয়ার সংস্কার আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে সার্থক হয়নি। লিপসন বলেছেন যে, উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন যে সার্থক হয়নি তার কারণ এই আন্দোলনের অনেক নেতা ছিল, অনুগামী ছিল না— জনগণের মনের গভীরে তা শিকড় গাঁথতে পারেনি (In short, the reform movement failed in the nineteenth century because it had only leaders and no followers, it had failed altogether to strike root among the masses'—Lipson)। বিশ শতকের শুরুতে একটি ব্যর্থ বিপ্লবের (Revolution of 1905) পর পুনরায় সংস্কারের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। কোনও সংস্কারই রাশিয়ার সমাজ ও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের মূল গলদের সংশোধন করতে পারেনি। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে রাশিয়ার রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন না ঘটাতে পারলে প্রচলিত ব্যবস্থার মৌল ত্রুটি সংশোধন করা যাবে না। পাশ্চাত্য থেকে বয়ে আসছিল মার্ক্সবাদ ও নৈরাজ্যবাদের হাওয়া। এর মধ্যে চলে এল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধের অভিঘাতে ভেঙে পড়ল রুশ প্রশাসন, রুশ সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ বন্ধন—ভেঙে গেল স্বৈরাচারী রাষ্ট্রশক্তির সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক বুনিয়াদ। এইবার পরিবর্তন—উপর থেকে নয়, নীচ থেকে, বিপ্লবের মাধ্যমে। এই বিপ্লবই ১৯২৭ সালের বিখ্যাত বলশেভিক বিপ্লব, শ্রমিক ও শোষিত মানুষের রাষ্ট্রশক্তি দখলের যুগান্তকারী ঘটনা। আমাদের পরবর্তী পাঠই হবে সেই ঘটনার ইতিহাস, সেই ইতিবৃত্ত যেখানে মানুষের স্বপ্ন আর তপস্যা রাত্রির বুক থেকে ছিঁড়ে এনেছিল মুক্তির প্রস্ফুটিত সকাল।

৩.১৫ সারাংশ

মহামতি পিটারের রাজত্বকালের (১৬৮২-১৭২৫) পর দীর্ঘদিন রাশিয়াতে কোন জার কোন বড় মাপের সংস্কারের কথা ভাবেননি। দ্বিতীয় ক্যাথরিন (Catherine II) [তাঁর রাজত্বকাল ১৭৬২-১৭৯৬] ছিলেন একজন শক্তিশালী জারিনা (Czarina)। কিন্তু তিনি রাশিয়াকে যতখানি বহির্বিশ্বে উপস্থাপিত করেছিলেন ততখানি দেশের ভেতরের পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে পারেননি। তিনি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মানস কন্যা ছিলেন, **ভলটেয়ার** (Voltaire), **দিদেরো** (Diderot) প্রভৃতি দার্শনিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং হয়তো সে কারণেই ঐতিহাসিকরা তাঁকে প্রজ্ঞাদীপ্ত স্বৈরাচারীদের (Enlightened despots) একজন বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু তাঁর আমলেও রাঁশিয়ার অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন কিছু হয়নি। এরপর ৬০ বছর ধরে রাশিয়াতে অভ্যন্তরীণ সংস্কারের কোন উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি। রাশিয়ার কৃষিযোগ্য সমস্ত জমির দেশের নয়ভাগ রাজতন্ত্র ও ১৪০ হাজার সম্ভ্রান্ত পরিবারের দখলে ছিল। অর্থাৎ বিরাট বিরাট ভূসম্পত্তি (landed estates) মুষ্টিমেয় মানুষের হাত ছিল। এই জমি চাষ করত বিপুল সংখ্যক ভূমিদাস। গবাদি পশুর (Cattle) মতই ছিল তাদের ভাগ্য—জমির সাথে তারা বিক্রি হয়ে যেত। সপ্তাহে অন্তত তিনদিন এই ভূমিদাসরা ভূস্বামীদের জমিতে বিনা পরিশ্রমিক বা মজুরিতে কাজ করত। তার উপরছিল নানা করের বোঝা। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৃষকরা—যারা ভূমিদাসরূপে আইনের বন্ধনে বাঁধা ছিল—তারা প্রায় বিদ্রোহ করত, গ্রামজীবনে শান্তি ব্যাহত হত আর সরকারকে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নিয়ে ক্রমাগত ভূমিদাসদের বিদ্রোহ দমন করতে হত। এদিকে ভূস্বামীদের আর্থিক অবস্থারও অবনতি হচ্ছিল। তারা আর ভূমিদাস-পোষণের দায়িত্ব নিতে চাইছিল না। তাছাড়া বিপুল সংখ্যক মানুষকে দাসত্বে বেঁধে রাখার মধ্যে নৈতিক সমর্থন ছিল না। ফলে ১৮৬২ সালে আইন করে এ ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হল। এই প্রথম কৃষকরা আইনগতভাবে দাসত্ব থেকে মুক্ত হল। এই আইন কৃষকদের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বাইরে নিয়ে এল। কৃষকরা সামন্ত প্রভুদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার অর্থই হল সামন্ততন্ত্রের কাঠামো নাড়া খেয়ে গেল। কৃষকরা আইনগতভাবে স্বাধীন হলেও অর্থনৈতিকভাবে হয়নি। এরপর থেকে কৃষকদের নিয়ন্ত্রণের অধিকার রইল গ্রামসমাজের হাতে। জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায় রইল কৃষকদের। তারা বলতে লাগল যে তাদের অর্থনৈতিক বোঝা অনেক বেড়ে গেছে তারা জমির স্বাধীন মালিকানা পাচ্ছে না। রাশিয়ায় নিয়ম ছিল যে এক পরিবারের প্রত্যেক পুরুষ সন্তান জমি পাবে। তার অর্থ হল প্রতিটি প্রজন্মে জমি খণ্ডিত হয়েছে প্রত্যেকের স্বত্ত্ব দানের জন্য। ফলে যতদিন যেতে লাগল ততই 'মির' বা গ্রামসমাজের অন্তর্ভুক্ত কৃষকের জমি ও আয় কমতে লাগল। কৃষকরা অসন্তুষ্ট হল। এইরকম অবস্থা আর দ্বিতীয় আলেকজান্ডার বা তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলীর একেবারেই কাম্য ছিল না। আবার অন্যদিকে বিচার-ব্যবস্থ ও প্রশাসনের যে সংস্কার তিনি করেছিলেন তার তাৎক্ষণিক ফল পাওয়া যায়নি। সংস্কারপ্রাপ্ত ব্যবস্থার মধ্যে গড়ে ওঠা নতুন সংগঠনগুলি চালানোর জন্য প্রশিক্ষিত মানুষের উদ্ভব তখনো হয়নি। ফলে সমাজব্যবস্থায় অভ্যস্ত দুর্নীতিকে মুছে ফেলে নতুন উজ্জীবনের মন্ত্রে দীক্ষিত মানুষের অভাবে পরিবর্তনের কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়নি। এদিকে শিক্ষা ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদানের ফলে জনমত গড়ার কাজ ত্বরান্বিত হল। রাশিয়ার অধীনস্থ পোল্যাণ্ডের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা জেগে উঠলে তারা বিদ্রোহ করল। সে বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমন করা হল। ফলে উদারনৈতিক

রুশদের মধ্যে হতাশা দেখা দিল। দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় হতাশার মধ্য থেকে জন্ম নিচ্ছিল এক ভয়ানক পরিবর্তনকামী বিরোধীদল রাশিয়ার ইতিহাসে যারা নিহিলিষ্ট (Nihilist) বলে খ্যাত। তারা সমস্ত প্রতিষ্ঠান ভেঙে নতুন করে সৃজনের স্বপ্ন দেখত। তারা সন্ত্রাসবাদের পথ নিল। যে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার জীবনের শুরুতে মানুষের নানাবিধ মুক্তির পথ খুলে দিয়ে 'মুক্তিদাতা জার' বলে বিখ্যাত হয়ে আছেন তিনি রাজত্বের প্রথম দশ বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই রুদ্রমূর্তি ধারণ করে পিতার স্বৈরাচারী পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। কিন্তু যুগশক্তির সাথে আপস করতে না জানলে বাঁচা যায় না। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারও বাঁচেননি। বোমার আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রগতিপরিপন্থী স্বৈরাচারের প্রতিকূলতাকে বিদীর্ণ করে প্রগতির রথে ইতিহাসের অমোঘ শক্তি দুর্বারভাবে অগ্রসর হল—আর কোন নতুন সংস্কার পর্বের দিকে নয়, ভিন্নতর পর্বে—বিপ্লবের দিকে—সেই বিপ্লবের দিকে যেখানে ১৯১৭ সালে রাষ্ট্রশক্তি দখল করল সেই মানুষ যাদের রাষ্ট্রশক্তি ছাড়া হারাবার কিছুই ছিল না।

৩.১৬ অনুশীলনী

১. সংক্ষেপে উত্তর দিন (৫টি বাক্যে)

(ক) উনিশ শতকে রাশিয়ার সংস্কার কার্য পাঠ করলে আপনি কী শিক্ষা লাভ করেন?

(খ) সমাজ সংস্কারের কাজ কেন অপরিহার্য?

(গ) সংস্কার কার্য উনিশ শতকে কি পৃথিবীর অনেক দেশে হয়েছিল?

(ঘ) ক্যাথরিন দ্য গ্রেট সম্বন্ধে কী জানেন?

(ঙ) মহামতি পিটারের কৃতিত্ব কী?

(চ) রাশিয়ায় কোন খ্রিষ্টধর্ম পালিত হত?

(ছ) রাশিয়ার বিভিন্ন ভাষাভাষী মানব উপাদান কী ছিল?

(জ) মির (Mir) কী?

(ঝ) ভূমিদাসদের উপর যে সব বোঝা চাপানো ছিল সেগুলি কী?

(ঞ) রাশিয়ার সমাজব্যবস্থায় মধ্যশ্রেণী না থাকায় কী ক্ষতি হয়েছিল?

(ট) সংস্কার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন (David Thompson) বা লিপসনের (Lipson) যে কোন একটি মত আলোচনা করুন।

(ঠ) উত্তরের সমাজ ও দক্ষিণের সমাজ সম্বন্ধে লিখুন।

(ড) 'পিতাহীন পুত্রহীন প্রজন্ম' কী?

(ঢ) ডিসেম্ব্রিষ্ট কারা? তাদের গুরুত্ব কী?

(ণ) পল পেস্টেল কে ছিলেন? তাঁর যে কোনও একটি উক্তি লিখুন।

(ত) প্রথম নিকোলাসের রাষ্ট্রমত কী ছিল?

(থ) রাশিয়ার ইতিহাসে ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ বিখ্যাত কেন?

(দ) ঐতিহাসিক ওয়ালেস-এর যে কোনও একটি মত ব্যাখ্যা করুন।

(ধ) দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের রাজত্বের প্রথম পর্বের আদর্শ কী ছিল?

(ন) ভূমিদাসত্বকে আইন করে বন্ধ করার যে কোনও একটি কারণ বুঝিয়ে লিখুন।

(প) জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের বিচার বিভাগীয় সংস্কার আলোচনা করুন।

(ফ) জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের প্রশাসনিক সংস্কার কী ছিল?

(ব) রাশিয়ার ভূমিদাস মুক্তি ও প্রাশিয়ার ভূমিদাস মুক্তির মধ্যে পার্থক্য কী?

(ভ) ভূমিদাসত্বের অবলোপ কি রাশিয়ার অর্থনীতিকে কোনভাবে সাহায্য করেছিল?

(ম) জেমস্টভো (Zemstvo) কী?

২। **১০ টি বাক্যে উত্তর দিন—**

(ক) রাশিয়ার সমাজকে কেন বদলানোর প্রয়োজন হয়েছিল?

(খ) উনিশ শতকে সংস্কার কার্য কোন দেশে কী হয়েছিল?

(গ) 'অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের প্রকৃত মৌল সমস্যা' কী?

(ঘ) পিটার দ্য গ্রেট ও ক্যাথরিন দ্য গ্রেট-এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব কী?

(ঙ) ডিসেম্ব্রিষ্ট আন্দোলন ব্যর্থ হল কেন? তা কী শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল?

(চ) রাশিয়ার রাষ্ট্রের কাঠামো সংক্রান্ত সমস্যার একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করুন।

(ছ) ভূমিদাসত্ব বিলোপের প্রধান পাঁচটি ফল আলোচনা করুন।

(জ) ভূমিদাসত্ব বিলোপে ভূমিদাসদের কী ভূমিকা ছিল?

(ঝ) দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে কী প্রকৃত অর্থে মুক্তিদাতা জার বলা যায়?

(ঞ) জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের রাজত্বকালের দুই পর্বে তাঁর রাষ্ট্রদর্শ কী ছিল?

(ট) রাশিয়ার প্রথম পর্বের রাজনৈতিক সংগঠনগুলি আলোচনা করুন।

(ঠ) রাশিয়ার সমাজব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্যা কী ছিল?

(ড) ক্রাইমিয়া কোথায় ও কীজন্য বিখ্যাত?

(ঢ) দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের সংস্কার কার্য শেষ পর্যন্ত সফল হল না কেন?

(ণ) নিহিলিষ্টদের রাষ্ট্রদর্শন আলোচনা করুন।

৩। **একটি বাক্যে উত্তর দিন**

(ক) ১৯ শতকে রাশিয়ার সংস্কারকার্যের ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য কী?

(খ) জাপানের সংস্কার কার্যের নাম কী?

(গ) তুরস্কের সংস্কার কার্যকে কী বলা হত?

(ঘ) নিহিলিজম্ কী?

(ঙ) তরুণ-তুর্কী বিপ্লব কবে হয়েছিল?

(চ) পিটার দ্য গ্রেট কে ছিলেন?

(ছ) ক্যাথরিন দ্য গ্রেটের রাজত্বকাল কবে?

(জ) যে কোন সংস্কার কাজের উদ্দেশ্য কী?

(ঝ) রাশিয়াতে একজন জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকের নাম লিখুন।

(ঞ) রাশিয়ার মৌল সমস্যা কত রকমের ছিল?

(ট) 'মুক্তিদাতা জার' কে?

(ঠ) তুর্গেনিয়েভ কে ছিলেন?

(ড) প্রথম নিকোলাসের রাজত্বকাল কত বছরের ছিল?

(ঢ) দ্বিতীয় আলেকজান্ডার কত বছর রাজত্ব করেন?

(ণ) কোন জারকে হত্যা করা হয়।

(ত) ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের সময়ে কোন জার রাশিয়ায় রাজত্ব করতেন?

(থ) কোন জারকে 'চরম স্বৈরাচারের অবতার' বলা হয়েছে?

(দ) 'মুকুট পরা ড্রিল সার্জেন্ট' কে ছিলেন?

(ধ) কোন জারকে 'নিবিষ্ট দেশব্রতী রুশ' বলা হয়েছে?

(ন) ভূমিদাসদের মুক্তির ঘোষণাপত্র কবে স্বাক্ষরিত হয়?

(প) ১৮৮২ সালে কী হয়েছিল?

(ফ) ভলটেয়ার ও দিদেরো কে ছিলেন?

(ব) রাশিয়াতে জুরি দ্বারা বিচার কে চালু করেছিলেন?

(ভ) ভূমিস্বত্ত্ব-বিলোপের পর কৃষকরা কী অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছিল?

(ম) ঐতিহাসিক ওয়ালেস-এর গ্রন্থের নাম কী?

৪। শূন্যস্থান পূর্ণ করুন

(ক) রাশিয়াতে রাষ্ট্র সংস্কার কাজে হাত দিয়েছিল _____।

(খ) উনিশ শতকে জাপানের _____ _____ বিখ্যাত।

(গ) ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে চীনের _____ _____ বিখাত।

(ঘ) আমেরিকাতে দাস ব্যবস্থা বন্ধ হয়েছিল _____ সালে।

(ঙ) রাশিয়াতে ভূমিদাস প্রথা বন্ধ হয়েছিল _____ সালে।

(চ) জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে _____ জার বলা হয়।

(ছ) ১৮৮১ সালে বোমা বিস্ফোরণে জার _____ _____ মৃত্যু হয়।

(জ) ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের সমাপ্তি সূচক প্যারিসের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল _____ সালে।

(ঝ) ঔপন্যাসিক তুর্গেনিয়েভের গ্রন্থের নাম _____ _____।

(ঞ) ভূমিদাসদের মুক্তি রাশিয়ার কৃষিকাজে কোন _____ আনেনি।

(ট) প্রথম নিকোলাসের কাছে _____ বা _____ কোন মূল্য ছিল না।

(ঠ) ইউরোপের দুটি বড় বংশভিত্তিক সাম্রাজ্য হল রুশ সাম্রাজ্য ও _____ _____ _____।

(ড) রাশিয়াতে ১৯১৭ সালে যে বিপ্লব হয়েছিল তার নাম _____ বিপ্লব।

(ঢ) ইংল্যান্ডে ক্রীতদাসপ্রথা বন্ধ হয়েছিল _____ সালে।

(ণ) ১৮৯ খ্রিস্টাব্দে চীনের _____ _____ ইতিহাস-বিখ্যাত।

৩.১৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. E. Lipson *Europe in the 19th and 20th Century.*
2. David Thompson *Europe since Napoleon.*
3. S. Reed Breett *Modern Europe 1789-1939.*
4. C. D. Hazen *Modern Europe upto 1945.*
5. *Cambridge Modern History,* Vol X, Chapt VIII.
6. Professor W. Alison Phillips, *Poland.*
7. Donald Mackenzie Wallace. *Russia.*
8. D. M. Ketelbey *A History of Modern Times* from *1789 to the Present Day.*
9. H. Seton-Watson *The Decline of Imperial Russia. 1855-1914.*
10. Jaques Droz *Europe between Revolutions* 1815-1848.
11. L. C. B Seaman *From Vienna to Verrasilles,* Ch. V "The Crimean War-Causes and Consequences".
12. M. V. Neckina *History of the USSR. Vol II, Russia in the Nineteenth Century.*
13. M. T. Florinstay Russia, A History and Interpretation.
14. B. Pases *A History of Russia.*
15. B. H. Summer *Survery of Russian History.*
16. P. L. Lyaschenko *History of the National Economy of Russia to the 1917 Revolution.*

একক ৪ □ রাশিয়াতে ১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের বিপ্লব

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ প্রারম্ভিক কথা

৪.৩ তৃতীয় আলেকজান্ডার : স্বৈরাচার ও শিল্পায়ন : ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পরোক্ষ কারণ

৪.৪ অঙ্কুরিত শিল্পায়ন : পরিবর্তনের নতুন বীজ

৪.৫ দ্বিতীয় নিকোলাস : স্বৈরাচারী স্থিতিশীলতা ও শিল্পায়িত পরিবর্তনের দ্বন্দ্ব : ১৮৯৪-১৯১৭

৪.৬ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের উত্থান

৪.৭ ১৯০৪-০৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধ : বিপর্যয়ের ঘনীভবন

৪.৮ ১৯০৫ সালের বিপ্লব

৪.৯ সাংবিধানিক সংকট

৪.১০ ১৯১৭ সালের বিপ্লব

৪.১১ লেনিন ও বলশেভিক দলের উত্থান

৪.১২ ১৯১৭ সালের মার্চ বিপ্লব : জারতন্ত্রের পতন

৪.১৩ ১৯১৭ : মার্চ থেকে নভেম্বর : বলশেভিক বিপ্লবের প্রস্তুতি পর্ব

৪.১৪ লেনিনের আগমন ও নভেম্বর বিপ্লব

৪.১৫ নভেম্বর বিপ্লবে লেনিনের ভূমিকা

৪.১৬ সারাংশ

৪.১৭ অনুশীলনী

৪.১৮ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য অতীতকে জানা, অতীতকে জেনে বর্তমানকে বোঝা আর বর্তমানকে বুঝে ভবিষ্যতের গতিকে একটি সুপরিকল্পিত কর্মসূচির মধ্যে আনা। এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা বিংশ শতাব্দীর রাশিয়ার দুটি বিপ্লবের ইতিহাস পড়ব—একটি বিপ্লব হয়েছিল ১৯০৫ সালে। এটি আপাতভাবে একটি ব্যর্থ বিপ্লব। অন্য বিপ্লবটি হয়েছিল ১৯১৭ সালে—এটি পূর্ণাঙ্গভাবে একটি সার্থক বিপ্লব। বিপ্লব ইতিহাসে নতুন নয়। যখনই কোন রাষ্ট্র বা সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারে না, অস্তিত্বের আত্মগ্লানিতে জর্জর হয়, তখনই তার ভেতরের পরিবর্তনকামী রুদ্ধ প্রাণশক্তি বিপুল উন্মাদনায় ফেটে পড়ে—পরিবর্তন আনে সমাজে ও রাষ্ট্রে। রাষ্ট্র বিপ্লব আসে মূলত সহিংস পথে কারণ রাষ্ট্রক্ষমতার হস্তান্তর সচরাচর সরল প্রক্রিয়ায় হতে চায় না। অবশ্য বিনা রক্তপাতে রাষ্ট্র বিপ্লবের নজির ইতিহাসে একেবারে অনুপস্থিত নয়। ১৬৮৮ সালে ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব এইভাবে বিনা রক্তপাতে অত্যাচারী শাসককে ক্ষমতার থেকে হটিয়ে দেবার একটি বড় নজির। ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে বা ১৮৪৮ সালে ইউরোপীয় মহাদেশে কিংবা ১৯৩৭ সালে রাশিয়াতে যে বিপ্লব হয়েছিল তা বিনা রক্তপাতে ঘটেনি। নিশ্চল সমাজের বুকে 'পুরানো শাসন' বা 'আঁসাঁ রেজিমকে' (Ancien Regime) চাপিয়ে দিয়ে যখন অপরিবর্তনীয় রক্ষণশীলতার অন্ধ্র প্রকোষ্ঠে মানুষকে বন্দি করে রাখা হচ্ছিল তখন—কী ফ্রান্সে, কী ইউরোপীয় মহাদেশে, কী রাশিয়ায়—মানুষ স্বৈরাচারের রক্ষণশীল শাসনকে ভেঙে নিজের বিপন্ন অস্তিত্বকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিল। সে চেষ্টা অহিংস হতে পাারে না—এক্ষেত্রে হয়ওনি। সংগ্রামের মধ্যদিয়ে ইতিহাসের ভারসাম্য এইভাবে মুক্তির অভিলাষী হয়েছিল—এইভাবেই তা হয়ে থাকে। আমরা বর্তমান পাঠের মধ্য দিয়ে মুক্তির ইতিহাসের চিরন্তন চালিকা শক্তি। ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সের কিংবা ১৯১৭ সালে রাশিয়ার বিপ্লব প্রমাণ করেছিল যে স্বৈরাচার যত অভ্রভেদীই হোক না কেন, তার আস্ফালন যতই প্রকট হোক না, কেন শেষপর্যন্ত তা ব্যর্থ কারণ মানুষের সমষ্টিগত অস্তিত্বের উপর দাঁড়িয়ে থাকে রাষ্ট্র। তাই সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিতন্ত্রের স্বৈরাচারী শাসন রাষ্ট্রকে তার আত্মবিকাশের পরম লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারে না। তাই রাষ্ট্র খোঁজে ভিন্ন আধার—লোকতন্ত্রের আধার যে আধারে সমষ্টির স্বপ্ন সমগ্রের সাধনা হয়ে ইতিহাসকে পরিচালিত করে নিয়ে যায় তাকে মুক্তির চিরায়ত লক্ষ্যে। এই মুক্তির বোধ গড়ে উঠবে আমাদের রাশিয়ার দুই বিপ্লবের ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে। আমাদের সরল চেতনায় বিরল ঘটনার জ্যোতির্ময় প্রসাদ আমাদের সাহায্য করবে স্বদেশ ও সমকালকে বুঝতে। সেই বোঝার উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা পাঠ করব বর্তমান এককের বিষয়রাশি।

৪.১ প্রস্তাবনা

একজন ঐতিহাসিক বলেছেন যে যখন ইউরোপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল তখন রাশিয়াই ছিল একমাত্র দেশ যা ছিল অনড়—যেখানে 'পুরানো শাসন' (ancien regime) কায়েম হয়ে বসেছিল। (" In a Europe which was in the process of changing, Russia remained the most stable element, the state in which the Ancien Regime had been most fully maintained"—Joques Droz, *Europe*

between Revolutions : 1815-1848)। এইরকম অপরিবর্তনীয় একটি দেশ ও একটি সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তনের চাকাকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার (Alexander II) যিনি সার্ফ বা ভূমিদাসদের আইনানুগ দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে 'মুক্তিদাতা জার' (Czar Liberator) বলে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর সংস্কার-কার্য যতখানি পুরানো সমস্যাকে মিটতে সাহায্য করেছিল ঠিক ততখানিই জন্ম দিয়েছিল নতুন সমস্যার। যার পরিণতিতে তাঁকে অকালে আততায়ীর বোমায় নিহত হতে হল। আসলে রাশিয়াতে যাবতীয় সংস্কার কার্য রাজনীতির অভিমুখী ছিল না। সামন্তব্যবস্থা ভেঙে যাবার ফলে দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল কিন্তু রাজনৈতিক কাঠামোটিই অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছিল। রাশিয়ার গঠনতন্ত্রে ও তার রাষ্ট্রিক আদর্শে তিনটি ধারা ছিল যার একটিও বদলায়নি। প্রথম ধারাটি হল একটি জাতীয় বিকাশের ধারা ছিল (এক) স্ল্যাভ (Slav) আদর্শ। দেশের ও বিদেশের সমস্ত স্ল্যাভদের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত প্রতিরক্ষা রাশিয়ার হাতে থাকতে হবে। জারিনা (Czarina) দ্বিতীয় ক্যাথারিনের (Catherine II) সময় থেকে এই 'মিশন' আদৌ কার্যকারী কিনা ভেবে দেখা হয়নি। দ্বিতীয় ধারাটি হল একটি ধর্মীয় ধারা। এই ধারার মূল কথা ছিল জারই (Tsar) হচ্ছেন বাইজানটিয়াম-এর সাম্রাজ্যের (empire of Byzantium) প্রকৃত উত্তরাধিকারী এবং সেই কারণে গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের (Greek Orthodox church) সবচেয়ে প্রধান ধারক। বাইজানটিয়াম-এর স্মৃতি, রোমান ক্যাথলিক চার্চের মুখোমুখি খ্রিস্টধর্মের একটি প্রাচ্যশাখা হিসাবে গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের গুরুত্ব ও ভূমিকা ইত্যাদি কখনো বিশ্লেষণ করে বা যাচাই করে দেখা হয়নি। অথচ প্রথাগতভাবে তারই ধ্যানে রাশিয়া নিমজ্জিত ছিল। তৃতীয় ধারাটি হল রাজনৈতিক শাসনের ধারা, জারের স্বৈরাচারী শাসনের ধারা। এই ধারায় আবহমান কাল ধরে স্থির হয়েছিল একটি কথা যে জারের 'ইউকাস' (ukase) বা আইনই (edict of the Czar) হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ আইন, কারণ সে আইন বিধাতা-নির্দিষ্ট আইন। স্বৈরাচারের এই রকম চরম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ যে শিল্পবিপ্লবের যুগে অচল, তা যে পাশ্চাত্যের বহমান উদারনৈতিক (Liberalism) ও সমাজতন্ত্রের (Socialism) চিন্তাধারার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং তা যে নবাগত লোকতন্ত্রের আদর্শের পরিপন্থী একথা ভেবে দেখা হয়নি। এইভাবে রক্ষণশীল, প্রগতি পরিপন্থী সনাতন আদর্শের ত্রিধারা যখন জনজীবনের বিকাশের পথ রুদ্ধ করছিল তখনই তার বিরুদ্ধে জন্ম নিল সংহারের সমাজদর্শন—নিহিলিজম (*Nihilism*)। সমস্ত সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে ফেলে সভ্যতার নতুন ভোরে এক নতুন সৃষ্টির আনন্দে মেতেছিল রাশিয়ার যুবশক্তি। এই রাষ্ট্রকে ভেঙে ফেলার আকাঙ্ক্ষা, সমাজকে বদলে দেওয়ার স্বপ্ন, আর প্রমত্ত যুব-উন্মাদনা—এই সমস্ত কিছুই ১৯০৫ সালের অকাল বিপ্লবের (absortive revolution) প্রেক্ষিত রচনা করেছিল।

৪.২ প্রারম্ভিক কথা

দীর্ঘদিন রাশিয়ার জনগণের প্রতি রাশিয়ার প্রায় সব জারের সম্ভাষণই ছিল এই রকম : ''ঈশ্বর আমাকে রাশিয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অতএব তোমরা আমার কাছে নত হও, কারণ আমার সিংহাসন হচ্ছে তাঁর বেদি'' (''God has placed me over Russia and you must bow down before me, for my throne is his altar'')। স্যার ডোনাল্ড ম্যাকেঞ্জি ওয়ালেস (Sir Donald Mackenzie Wallace) তাঁর রাশিয়ার ইতিহাসে এই তথ্য পরিবেশন করে জানিয়েছেন যে এইভাবে ঐশী শক্তির অবতার করে জার ঘোষণা করতেন।

''আমার (কারও) পরামর্শের প্রয়োজন নেই, কারণ ঈশ্বর আমার প্রজ্ঞা দিয়ে অনুপ্রাণিত করেন। সুতরাং তোমরা সকলে আমার দাস হয়ে গর্বিত বোধ কর, হে রুশবাদী, আমার ইচ্ছাকেই তোমাদের আইন বলে জেনো'' (''... I have no need of counsel, for God inspires me with wisdom Be proud, therefore, of being my slaves, O Russians, and regard my will as your law'')। রাষ্ট্রের এরকম আকাশচুম্বী ভনিতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল নিহিলিষ্টরা। তারা মানুষের কাছে আবেদন রেখেছিল : ''ও রাশিয়া জাগো, বিদেশী শত্রুদের দ্বারা ভুক্ত দাসত্বের দ্বারা জর্জরিত, নির্বোধ কর্তৃপক্ষ আর গুপ্তচরের দ্বারা নিগৃহীত তোমরা তোমাদের দীর্ঘ অজ্ঞতার নিদ্রা আর উদাসীনতা থেকে জাগো।'' (''Awake, O Russia! Devoured by foreign enemies, crushed by slavery, shamefully oppressed by stupid authorities and spies, awaken from your long sleep of ignorance and apathy'')। নিহিলিষ্টরা যে জনগণের মনে সাড়া জাগাতে পেরেছিল তার অন্যতম কারণ হল সরকার বেশ কিছুদিন ধরে জনগণের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠছিল। জনগণের থেকে সরকার চিরকালই বিচ্ছিন্ন ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক কালে যখন সরকার জনগণের কথা বলার স্বাধীনতা (freedom of speech), মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা (liberty of the press), এবং জনগণের প্রতিনিধি প্রেরণের স্বাধীনতা (national representation), কেড়ে নিল, যখন বেআইনি ও স্বৈরাচারী পদ্ধতিতে ধরপাকড় (arbitrary arrest) শুরু করল এবং যখন জনগণকে বিনাবিচারে কারাদণ্ড দিতে এবং দেশের বাইরে চালান (deportation) করে দিত লাগল তখন জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। তাদের মধ্য থেকে জেগে উঠল নিহিলিষ্টদের প্রতি সমর্থন। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার নির্মম নিপীড়নের নীতিকে গ্রহণ করেও তাদের দমন করতে পারলেন না। তখন তিনি **লোরিস-মেলিকফ** (Loris melikoff) নামক এক ব্যক্তিকে যাবতীয় স্বৈরাচারী ক্ষমতা দিয়ে তাদের প্রাথমিক কিছু কাজের দ্বারা জনগণের মধ্যে এই ধরাণার সৃষ্টি করতে চাইছিলেন যে তিনি দীর্ঘস্থায়ী সংস্কারের কাজে হাত দেবেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই জনগণের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল যে এসবই হচ্ছে এক মস্ত প্রবঞ্চনা। সম্ভাব্য জনরোষের কথা ভেবে লোরিস-মেলিকফ জেনারেল কমিশন (General Commission) নামে এক প্রতিনিধি সভা নিয়োগের সিদ্ধান্ত করেন এবং সম্রাটের কাছ থেকে তার সম্মতিও আদায় করে ফেলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জেনারেল কমিশনকে মেনে নেওয়ার অব্যবহিত পরেই-সেই দিনেই—জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার নিহত হলেন। জেনারেল কমিশন আর বলবৎ হল না। সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীরা দাবি করল সভার আয়োজন (''A national assembly elected on the basis of manhood suffrage'') এবং বাক্-স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এবং জন-জমায়েতের অধিকার দিতে হবে। বোঝাই যাচ্ছিল জনমত বিপ্লবমুখী হয়ে পড়ছে।

৪.৩ তৃতীয় আলেকজান্ডার : স্বৈরাচার ও শিল্পায়ন : ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পরোক্ষ কারণ

জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার সংস্কার-কার্যের সূচনা করে মানুষের মনে মুক্তি ও স্বাধিকার, স্বায়ত্তশাসন ও প্রতিনিধিত্বের (representation) ধারণাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। আবার তার পাশেই নির্মম স্বৈরাচারী নিপীড়ন দিয়ে মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে দমিয়ে দিতে চাইছিলেন। এই দুই বিপরীত আদর্শের সংঘাতে রাষ্ট্র দিশাহারা হয়ে

পড়ছিল। সমাজ হয়ে উঠছিল বিদ্রোহী। এই রকম এক সংকট মুহূর্তে ১৮৮১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র তৃতীয় আলেকজান্ডার (Alexander III, 1881-94) জার হলেন। তিনি ছিলেন স্বৈরাচারী ও সৈনিক। সিংহাসনে আরোহন করেই তিনি ঘোষণা করলেন যে ''ঈশ্বরের বাণী আমাদের নির্দেশ দিয়েছে সরকারের হাল শক্ত করে ধরতে, বিশ্বাস রাখতে স্বৈরাচারী ক্ষমতার শক্তি ও সত্যের উপর যাতে জনগণের মঙ্গলের জন্য বাইরের যে কোন আক্রমণ থেকে তাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারি।" ("The voice of Gc. orders us to stand firm at the helm of government ...with faith in the strength and truth of the automatic power, which we are called to strength and preserve, for the good of the people, from every kind of encroachment")। সৈনিক হিসাবে জার দাবি করতেন শৃঙ্খলা, স্বৈরাচারী হিসাবে দাবি করতেন আত্মসমর্পণ। তিনি বিশ্বাস করতেন বিপ্লবী সন্ত্রাসকে সংস্কার কার্যদ্বারা প্রশমিত করা যাবে না। তাকে স্তব্ধ করতে হবে বলপ্রয়োগে। অতএব রাশিয়াকে তিনি ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন নিঃসীম স্বৈরতন্ত্রে। এই সময় থেকে রাজপরিবারে ও জারের পরামর্শদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন চার্চের বিশিষ্ট পাদ্রী (Procurator of the Holy synod) **পোবেডেনোস্টেভ** (Pobedonostev) যাঁকে লিপসন (Lipson) বলেছেন 'রাশিয়ার অশুভ শক্তি' ('the evil genius of Russia')। ইনি ছিলেন সাংবিধানিক সরকারের শত্রু। পাশ্চাত্যের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে তিনি ঘৃণা করতেন। সাংবিধানিক সরকার তাঁর কাছে ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় 'রাজনৈতিক মিথ্যাচার', গণতন্ত্রকে বলতেন 'ইতিহাসের বিভ্রম'। এইরকম ব্যক্তি যখন রাষ্ট্রশাসকের পরামর্শদাতা হলেন তখন দেশের দুর্যোগ যে ঘনিয়ে আসবে তাতে আর বিস্ময়ের কিছু নেই।

পোবেডনোস্টেভের পরামর্শে তৃতীয় আলেকজান্ডার পিতার সংস্কারকার্যকে বাতিল করার চেষ্টা করলেন। ভূমিদাসদের আঞ্চলিক ভূস্বামীদের অধীনে ফিরিয়ে আনা হল। ভূস্বামীদের হাতে কৃষকদের শাসন করার আইন দেওয়া হল। এই ভূস্বামীদের বলা হতে লাগল ভূমিনিয়ন্তা (Land captains) যারা তাদের জমিতে কর্মরত ভাড়াটে কৃষক-শ্রমিক ও আশেপাশের কৃষকদের উপর পুলিশি ব্যবস্থা কায়েম করল। এইভাবে যে কৃষকরা বিপুল পরিমাণ ঋণ ও করের বোঝা মাথায় নিয়ে চলছিল তারা এবার তাদের স্বাধীনতা হারাল। এর সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচিত ম্যাজিস্ট্রেট বা জাস্টিস অফ পিসদের (Justice of Peace) সরিয়ে সেখানে মনোনীত ল্যান্ড ক্যাপ্টেন বা ভূমিনিয়ন্তাদের বসানো হতে লাগল। চেষ্টা হল সামন্ততন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার। **জেমস্টভো** (Zemstvo) বা নির্বাচিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সংস্থাগুলিকে সঙ্কুচিত করা হল। স্থানীয় উন্নয়নে এদের অনন্য সাধারণ ভূমিকাকে এইভাবে মুছে ফেলার চেষ্টা হল। মফস্বলে ও গ্রামাঞ্চলে ল্যান্ড ক্যাপ্টেনদের স্বৈরাচার নেমে এল। এর সঙ্গে সঙ্গে দেশে গোপন পুলিশের সংখ্যা ও তৎপরতা বাড়িয়ে দেওয়া হল। বিপ্লবীদের উপর নামানো হল নির্মম নিষ্পেষণ। তাদের কার্যকলাপ প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। তারা ভাবতে লাগল হয়তো আর তাদের পক্ষে মাথা তুলে দাঁড়ানো সম্ভব নয়, হয়তো তাদের অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী জারের আগমন পর্যন্ত। এই সমস্ত কিছুর ফল হয়েছিল বিপজ্জনক। মানুষ আশঙ্কিত হল এইভেবে যে দাসত্ব থেকে মুক্তির যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল কিছু কাল ধরে—যা সমস্ত দেশের মানুষদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য, তাকে বিপরীতমুখী প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল কিছু কাল ধরে—যা সমস্ত দেশের মানুষদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য, তাকে বিপরীতমুখী করে দেওয়া হচ্ছে। জেমস্ট্ভোগুলির মধ্যে যে অসাধারণ সাধারণতন্ত্র লুকিয়েছিল তার স্থলে ল্যান্ডে ক্যাপ্টেনদের (Land Captain) একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। কৃষকরা বলতে লাগল, ''আমাদের আর কোন বিচারক নেই, আছে শুধু হুকুম দেবার অফিসার" ("We have no more judges, we have commanding officers")। দুর্ভিক্ষের সময়ে ল্যান্ডক্যাপ্টেন বা ভূমিনিয়ন্তারা জবরদস্তভাবে

ত্রাণের কাজ ও খাদ্য সরবরাহ কুক্ষিগত করে রাখত যাতে দুঃস্থ কৃষকরা কম মজুরিতে কাজ করে। জেম্‌স্‌ট্‌ভোগুলির অবনমন মানুষ কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি, কারণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পরিবেশ, পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন (sanitation) সমস্ত ব্যাপারে এই স্থানীয় প্রতিনিধি-সংস্থাগুলি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। রাষ্ট্রের মাথায় সবাইকে ছাপিয়ে ছিল জারের স্বৈরাচার। গ্রামাঞ্চলে সবাইকে ছাপিয়ে দেখা দিল ভূমি নিয়ন্ত্রণ বা লান্ড ক্যাপ্টেনদের স্বৈরাচার। নীরব, সহিষ্ণু মানুদের মধ্যেও এবার দেখা দিল হাহাকার।

৪.৪ অঙ্কুরিত শিল্পায়ন : পরিবর্তনের নতুন বীজ

নিপীড়ন দিয়ে যে পরিবর্তনকে তৃতীয় আলেকজান্ডার স্তব্ধ করতে চেয়েছিলেন সেই পরিবর্তনের দ্বার তিনি নিজেই খুলে দিলেন ভিন্ন পথে। বহু শতাব্দী ধরে রাশিয়া শিল্পের দিক দিয়ে অনগ্রসর ছিল। কৃষি ছাড়া অন্য কোন বড় শিল্প রাশিয়াতে গড়ে উঠতে পারেনি। যে দু-চারটি ছোট ছোট হস্ত ও কুটির শিল্প অপরিবর্তনীয় কৃষির আশেপাশে দেখা দিয়েছিল সেগুলির সবই ছিল ক্ষুদ্রায়তন, স্থানীয় সঙ্কীর্ণ শিল্প যার মাত্রা গার্হস্থ্য প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বড় বাজার, চাহিদা, শিল্পায়িত পণ্য, আদান-প্রদান, বিনিময় (exchange) ভিত্তিক অর্থনীতি, মুদ্রার বিনিয়োগ, অর্থের বা পুঁজির সঞ্চয় স্পৃহা—এসব আধুনিক শিল্পায়িত অর্থনীতির কোন পরিকাঠামো সেখানে গড়ে ওঠেনি। দ্বিতীয় আলেকজান্ডার শিল্পের উন্নতি চেয়েছিলেন। তাই তিনি প্রোটেকটিভ ট্যারিফ (Protective tariff) বা সংরক্ষণ শুল্ক ব্যবস্থা চালু করে রুশ শিল্পকে মদত দিতে চেয়েছিলেন। পিতার এই প্রচেষ্টাকে তৃতীয় আলেকজান্ডার আরও মদত দিয়ে শিল্পায়নের একটি ধারাকে তৈরি করতে চাইলেন। দেশ যাতে স্বনির্ভর হয় সেই দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল। জারের মন্ত্রী সারগেই উইট (*Sergei Witte*) বিশেষ প্রচেষ্টার দ্বারা রেল ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে ছিলেন। রুশো-পারসিক ব্যাঙ্ক (Russo-Persian Bank) ও ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ে (Trans-Siberian Railway) জারের শাসন আমলের দুটি বড় কীর্তি। এই রেল ব্যবস্থা ইউরোপকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করল। এরপর থেকে রাশিয়ার পক্ষে আর্থিক বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ভাবে মধ্য এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যে প্রবেশ করা সম্ভব হল। দেশে বৈদেশিক অর্থ আসতে লাগল, কারণ দেশের ভেতর থেকে পুঁজি সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। এর ফলে রাশিয়াতে ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা দেখা দিল, কয়েকটি বড় বড় শহর গড়ে উঠল এবং যে শিল্প ব্যবস্থা এতদিন শুধু পাশ্চাত্যের দেশগুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল তার অঙ্কুরোদগম হল রাশিয়াতেও। এর সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মনে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ধারণাও ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। নতুন শ্রমিক শ্রেণী গড়ে উঠতে লাগল, সাম্যবাদের দর্শনে তারা আগ্রহী হতে লাগল। এই শ্রমিক শ্রেণীর উত্থান এই সময়ের রাশিয়ার ইতিহাসের বড় ঘটনা ১৮৬৫ সাল থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর বুদ্ধির হার জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং এমনকী নাগরিক জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের থেকেও বেশি ছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে রাশিয়াতে শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা ২০ থেকে ২৫ লক্ষের মধ্যে ছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল বংশানুক্রমিক (hereditary) শ্রমিক। সবচেয়ে বড় কথা হল যে কৃষকরা শ্রমিক হচ্ছে, চাষবাসের সময় গ্রামে ফিরে যাচ্ছে এমন ঘটনা বন্ধ হয়ে গেল। এবার সত্যিকারের ফ্যাক্টরি শ্রমিক—প্রলেটারিয়টের জন্ম হল ("It was no longer formed of peasants displaced from the country side and often returning to their villages for the harvest : it was a true factory proletariat"—Lionel Kochan, *The Making of modern Russia,* a Pelican Book, p. 201)।

১৮৯৪ সালে তৃতীয় আলেকজান্ডারের মৃত্যু হয়। তিনি নিপীড়নের নীতিকে বহাল রাখলেও শেষ পর্যন্ত পরিবর্তনের দরজা বন্ধ রাখতে পারেননি। বিদেশী পুঁজি, শিল্পায়িত সমাজের সূচনা বড় নগরের উত্থান, সুগঠিত শ্রমিক শ্রেণী পরিবর্তনের এক নতুন দিগন্তকে খুলে দিল। এতদিন কৃষিভিত্তিক, গার্হস্থ্য-শিল্প-সংযুক্ত অর্থনীতিতে শ্রেণী সংঘাত ভিত্তিক জনচেতনা ও গণ-আন্দোলনের কোন পরিবেশ ছিল না। এবা তা দেখা দিল। এতদিন জেমস্‌ট্‌ভোগুলির ভেতর থেকে দাবি উঠেছিল যে **জেমস্‌কি সোবোর** (Zemsky sobor) বা দেশের সাধারণ সভা (General assembly of the land) গঠন করতে হবে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের দ্বারা প্রচলিত গুপ্ত সংগঠন ও ব্যক্তি হত্যার রাজনীতি। এবার তার সাথে যুক্ত হল আশঙ্কার তৃতীয় মাত্রা—সাম্যবাদের ছোঁয়া লাগা সুগঠিত ও উদ্বুদ্ধ পুরুষ পরম্পরায় ফ্যাক্টরির কাজে নিযুক্ত শ্রমিক প্রলেটারিয়াট। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্সে যে রকম একটি আসন্ন বিপ্লবের উপস্থাপনার জন্য অপেক্ষা করছিল সেই রকম উনিশ শতকের শেষে রাশিয়াও দাঁড়িয়েছিল একটি সম্ভাব্য বিপ্লবের উদঘাটন মুহূর্তে। সেই কারণে ১৮৮৩ সালে এঙ্গেলস (Engels) লিখেছিলেন—"Russia is the France of the last century"—"রাশিয়া হচ্ছে বিগত শতাব্দীর ফ্রান্স।"

৪.৫ দ্বিতীয় নিকোলাস : স্বৈরাচারী স্থিতিশীলতা ও শিল্পায়িত পরিবর্তনের দ্বন্দ্ব : ১৮৯৪-১৯১৭

রাশিয়ার ইতিহাসে স্বৈরাচার ছিল নিরঙ্কুশ ও ধারাবাহিক। ঐতিহাসিক রোজ [J. H. Rose, The Development of European Nations] সম্পাদিত ইউরোপের জাতিসমূহের প্রগতি নামক গ্রন্থটি পাঠ করলে বোঝা যায় যে স্বৈরাচারের দিক থেকে রাশিয়ার জারতন্ত্র কত ভিন্ন ও কত কঠোর ছিল। জার তৃতীয় আলেকজান্ডার নিজেকে গোপন পুলিশ গোয়েন্দা-সেনাবাহিনীর দ্বারা ঘিরে থাকা এক নিঃসীম সুরক্ষার মধ্যে বাস করতেন এবং তেরো বছর এইভাবে এক অদৃশ্য, বেপরোয়া শত্রুর সাথে দীর্ঘ ছায়াযুদ্ধ করে ভীত হতেন—সে শত্রু হচ্ছে উত্থিত ও জাগ্রত জনশক্তি যা নিহিলিষ্ট বিপ্লবীদের সন্ত্রাস ও হত্যার কর্মসূচির মাধ্যমে প্রকট হচ্ছিল। তাঁর পরবর্তী জার দ্বিতীয় নিকোলাস এই ভয়ের থেকেই তাঁর স্বৈরাচারকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। সিংহাসনে আরোহন করেই ঘোষণা করলেন ''আমি আমার সমস্ত প্রয়াসকে জাতির সমৃদ্ধিতে নিয়োগ করতে গিয়ে ততখানি দৃঢ়তা ও নিশ্চিতভাবে স্বৈরাচারের নীতিগুলিকে সংরক্ষণ করব যেমনভাবে করেছিলেন আমার পিতা" ("Devoting all my efforts to the prosperity of the nation I will preserve the principles of Autocracy as firmly and unswavingly as my late father")। এই স্থিতিশীল স্বৈরাচারের ঘোষিত লক্ষ্যে তিনি দশ বছর নিজেকে কায়েম রেখেছিলেন কিন্তু তারপরে শিল্পায়িত পরিবর্তনের বড় ফসল জাগ্রত জনচেতনাকে মেনে নিয়ে ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্ট (Imperial Parliament) বা সর্বোচ্চ গণ-প্রতিনিধিত্ব সংগঠন তাঁকে মেনে নিতে হয়েছিল। কীভাবে তা সম্ভব হল তা পরে আলোচনা করব।

উনিশ শতকের শেষ দিকে নিহিলিজম বা বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের প্রভাব কমে যাচ্ছিল। বিপ্লবীরা বুঝতে পারছিল যে রাশিয়ার জনগণ দেশের সর্বোচ্চ ঐতিহ্যরূপে জারতন্ত্রের মহিমার কাছে আত্মনিবেদিত। তাদের জাগানো

মুষ্টিমেয় মানুষের কাজ নয়। দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ কৃষক। গুপ্ত সংগঠন, সন্ত্রাস, ব্যক্তি হত্যার রাজনীতি তারা বোঝে না। যে কথা নেপোলিয়ন বুঝেছিলেন দীর্ঘদিন আগে বিপ্লবীরা এখন বুঝল সে কথা, রাশিয়ার কৃষক রাজনৈতিক প্রচার বোঝে না ("The revolutionists learnt what Napoleon had discovered three quarters of a century earlier, that the Russian peasantry was not ripe for political propaganda"—Lipson)। শুধু তাই নয় তারা এও বুঝল যে দেশের শিল্পায়ন অর্থনীতির কাঠামো বদলে দিচ্ছে, জারতন্ত্রের হাতে রসদ ও ক্ষমতা অপরিসীম এবং বহু শতাব্দী সঞ্চিত সমস্যার মীমাংসা কিছু মানুষের কাজ নয়। জারতন্ত্রের স্থিতিশীলতাকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা ভয় দেখিয়েছিল কিন্তু নাড়িয়ে দিতে পারেনি। এই নাড়িয়ে দেয়ার কাজটা করেছিল দেশের শিল্পায়ন। ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব ক্ষমতা এনে দিয়েছিল বণিক সমাজের হাতে। রাশিয়াতে সেই রকম বণিক সমাজের জন্ম হয়নি। ফলে রাষ্ট্র ও শ্রমিকদের মধ্যে কোন মধ্যশক্তি না থাকায় লড়াইটা ক্রমশ দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল রাষ্ট্রশক্তি ও কৃষক শ্রমিক গণশক্তির মধ্যে । মুক্তিপ্রাপ্ত ভূমিদাস (serfs) অকস্মাৎ শ্রমের যোগানকে বাড়িয়ে দিল। রেলব্যবস্থা বাড়িয়ে দিল যোগাযোগ, মানবশক্তির চলাচল ও পণ্যসামগ্রীর সরবরাহ। বিদেশী পুঁজি এনে দিল শিল্পের উদ্যোগ। তুলা ও খনি শিল্প বাড়তে লাগল। ফ্যাক্টরি ব্যবস্থার প্রসার হল। শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। আর ১৯১৭ সালে রাশিয়া হয়ে দাঁড়াল পৃথিবীর পঞ্চম শিল্পায়িত দেশ। এই উন্নয়নের জন্য ১৮৯২ থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত উইটের (Witte) মন্ত্রিত্বকাল বিশেষভাবে দায়ী।

৪.৬ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের উত্থান

শিল্পায়নের সাথে সাথে দেশে রাজনৈতিক দলেরও পরিবর্তন হতে লাগল। এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় চিহ্ন হল সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলের আবির্ভাব। এই দল বুঝতে পেরেছিল যে দেশের রাজনৈতিক ভার (gravity) কৃষকদের থেকে সরে গেছে শ্রমিক ও কিছু বণিক ও শিল্পপতিদের উপর। তারা এও বুঝেছিল যে জারতন্ত্র নামক একনায়কতন্ত্রকে সরাসরি উৎখাত করা যাবে না। ধারাবাহিক ইতিহাসের যে প্রক্রিয়া মারফত সব দেশে পরিবর্তন এসেছে তার বাইরে নয়। অতএব সেখানে পার্লামেন্ট বা গণপ্রতিনিধিত্ব সভার প্রয়োজন। সমাজপরিবর্তনের স্বপ্ন কখনোই সফল হবে না যদি তার আগে রাজনৈতিক পরিবর্তন সংগঠিত না হয়। সাম্যবাদ আর তার সপক্ষে প্রচার এবং আন্দোলন (agitation) সাংবিধানিক সরকারের অধীনে যতটা সম্ভব স্বৈরাচারের অধীনে তা সম্ভব নয়, কারণ প্রথমোক্ত সরকার জনগণের বাক্ স্বাধীনতা স্বীকার করে, তাকে জমায়েতের অধিকার দেয়, স্বৈরাচার দেয় না। শুধু তাই নয় যে প্রলেটারিয়টের জন্ম হয়েছে তারা কোন-না-কোন দিন রাজনীতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে। সেই উদ্বোধনের দিকে যেতে হলে তাদের লোকতান্ত্রিক শিক্ষা প্রয়োজন। এইভাবে সাম্যবাদকে সামনে রেখে সমাজ পরিবর্তনের জন্য গণতন্ত্রী ভাবনার বিকাশ হল। স্পষ্টতই নিহিলিষ্টদের সংহারের দর্শন থেকে বিপ্লবের ভিন্নতর বুনিয়াদ তৈরি হল। দেশের মানুষের অসন্তোষের মধ্যে বিস্ফোরণের বারুদ জমা হয়েছিল। সংগঠনের কর্মসূচিও উপস্থিত। দরকার ছিল অগ্নিশলাকার। ১৯০৪-৫ সালের রুশ জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় সেই প্রয়োজনীয় আগুনকে জ্বালিয়ে দিল।

৪.৭ ১৯০৪-০৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধ : বিপর্যয়ের ঘনীভবন

১৯০৪-০৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধ রাশিয়ার ইতিহাসে একটি দিক প্রবর্তনের ঘটনা। যুদ্ধের জন্য রাশিয়া প্রস্তুত ছিল না এবং অসাধারণ শৈথিল্য এবং অসংগঠিত প্রতিরোধ নিয়ে সে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল। জারতন্ত্রের সমস্ত আস্ফালন যে কত ফাঁকা, তার আমলাতান্ত্রিক শাসন যে কত অন্তঃসার শূন্য, তার সৈন্যবাহিনী যে কত অকর্মণ্য তার নিমেষে প্রকট হয়ে পড়ল। সরকার-বিরোধী জনমত প্রবল হল এবং তার প্রতিকারের ক্ষমতা সরকারের ছিল না। অসহায় সরকার বৈদেশিক বিষয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। মানুষ ভাবল চাপ দিয়ে সরকারের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা আদায় করার সময় এসেছে। মানুষের বিক্ষোভের বারুদে অগ্নিপ্রজ্বলিত হল। ১৯০৪ সাল থেকেই এই আগুন জ্বলতে শুরু করেছিল। সেই বছর জুলাই মাসে রাশিয়ায় **স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী** (minister of the interior) **প্লেহ্ভ** (Plehve) নিহত হলেন। এই প্রতিক্রিয়াশীল অত্যাচারী মন্ত্রী নিহত হবার আগে অন্তত ৪৮৬৭ জনকে বিনা বিচারে আটক করেছিলেন বা নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। অতএব তাঁর মৃত্যু সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির কার্য-কারণ সম্পর্কের যুক্তিগ্রাহ্য (logical) পরিণতি মাত্র।

৪.৮ ১৯০৫ সালের বিপ্লব

প্লেহ্ভ (Plehve) নিহত হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হলেন রাজকুমার মিরস্কি (Prince Mirsky)। তিনি ছিলেন প্রজ্ঞাদীপ্ত উদার রাজনীতিক। তিনি সংস্কারবাদীদের কাছে সংস্কারের প্রস্তাব চেয়ে আহ্বান পাঠালেন। তৎক্ষণাৎ জেমস্ট্ভো-র প্রতিনিধিরা ''১১-দফা (Eleven Points) প্রস্তাব" দিলেন। এই প্রস্তাবে ছিল মানুষের শরীর ও আবাস সংক্রান্ত নিরাপত্তা (Inviobility of person and domicile), বাক্ ও মুদ্রণ স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসন ও পৌর স্বাধীনতা, স্বাধীনভাবে নির্বাচিত গণসভা যা আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনে অংশগ্রহণ করতে পারবে, সংবিধান রচনার জন্য সংবিধান পরিষদ (Constituent Assembly) আহ্বান ইত্যাদি। এতদিন সংস্কার দাবি করত শুধুই শিক্ষিত শ্রেণী। এবার শিল্প শ্রমিক শ্রেণীও তাদের সঙ্গে সামিল হল। ১৯০৫ সালের জানুয়ারি মাসে একটি ধর্মঘট (strike) ডাকা হল। শ্রমিকরা দাবি করল দিনে অধিক আট ঘণ্টার কাজ, অধিক মজুরি, উন্নততর জঞ্জাল সাফাই ব্যবস্থা এবং বিবাদ মেটানোর জন্য সালিসীবোর্ড (arbitration boards)। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরাও এই দাবি সমর্থন করলে হঠাৎ করে শ্রমিক আন্দোলন একটা

প্রান্তলিপি

'রক্তাক্ত রবিবার' : ১৯০৫ সালের ৫ই জানুয়ারি রাজধানীর পুলিশ এক বিরাট শ্রমিক মিছিলের উপর গুলি চালায়। এই মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জর্জ গাপন নামে এক ভাগ্যান্বেষী পুরোহিত। ১৩০ জন মানুষ নিহত হয়েছিল, আহত হয়েছিল আরও বিপুল সংখ্যক মানুষ। পুলিশের তরফে একটা বড় ভুল হয়ে গিয়েছিল। গাপন ছিলেন পুলিশের পরিচিত মানুষ কারণ তাঁর সংগঠন ছিল গোয়েন্দা পুলিশের গোপনে পরিচালিত সংগঠন। রাজতন্ত্রী মানুষ, পুলিশের ইনফর্মার এবং অনুগত শ্রমিকদের এই ইউনিয়নে রাখা হয়েছিল যাতে শ্রমিক আন্দোলনে পুলিশের প্রভাব থাকে। সরকার থেকে বারবার চেষ্টা করা হচ্ছিল শ্রমিক আন্দোলনকে তাদের কাঙ্ক্ষিত খাতে বইয়ে দেবার। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গোপন তৎপরতার প্রয়োজন—গুলি চালিয়ে শ্রমিকদের হত্যা করা নীতি ভুল। এঘটনা রবিবার হয়েছিল বলে এই দিন রাশিয়ার ইতিহাসে 'রক্তাক্ত রবিবার' বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই হত্যাকাণ্ড দেখে ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল, সরকারি কর্মচারী ও পুলিশের অযোগ্য প্রমাণ করেছিল এবং শ্রমিকদের মধ্যে রাজবিদ্বেষ প্রবল করে তুলেছিল। এই রাজবিদ্বেষই বিপ্লবকে ইন্ধন যুগিয়েছিল।

রাজনৈতিক মাত্রা গ্রহণ করল। ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে একটা সাধারণ ধর্মঘট (General Strike) ডাকা হল। শহরে শহরে শ্রমিকরা ধর্মঘট ও বিক্ষোভ করতে লাগল। গ্রামে কৃষকরাও অভুত্থানের সামিল হল। লিপসন বলেছেন যে সাম্রাজ্যের সামাজিক ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ল আর সরকারকে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকল না। ("The whole social system of the Empire came to a standstill, and no alternative remained to the Govenment but to give way"—Lipson)। ১৯০৫ সালের ৩০অক্টোবর সরকার একটি ইস্তাহার বা ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করল। এটি রাশিয়ার ইতিহাসে **অক্টোবর ম্যানিফেস্টো** নামে বিখ্যাত। এই ম্যানিফেস্টোকে রাশিয়ার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা বলে বর্ণনা করা হয়। এই ম্যানিফেস্টোতে সরকার স্বীকার করে নিল নাগরিকদের অনেক মৌলিক অধিকার—শারীরিক নিরাপত্তা (inviobility of person), বাক্ স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, সংগঠন ও সমাবেশের স্বাধীনতা ইত্যাদি। ১৯০৫ সালের ২৪ ডিসেম্বর আরেকটি বিধান (Decree of 24 December) দ্বারা শ্রমজীবী মানুষ ও বিভিন্ন পেশাভুক্ত (professional classes) মানুষকে ভোটের অধিকার দেওয়া হল। কিন্তু বিপ্লবীদের এই জয় নিরঙ্কুশ হতে পারল না। প্রতিক্রিয়াশীলরা পুলিশ ও দুর্বৃত্তদের সাথে হাতে মিলিয়ে এই পরিবর্তনকে বাধা দেবার চেষ্টা করল। এই প্রতিক্রিয়াশীল অভ্যুত্থানে সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত হয়েছিল রুশ ইহুদিরা।

প্রান্তলিপি

১৯০৫ সালের বিপ্লব কি রক্তক্ষয়ী বিপ্লব ছিল? এক অর্থে এই বিপ্লব রক্তক্ষয়ী হয়েছিল। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন সরকার সেন্ট পিটার্সবুর্গের সোভিয়েতের সদস্যদের গ্রেপ্তার করে তখন মস্কোতে শ্রমিক ও অন্যান্য চরমপন্থীরা পুলিশ ও সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। ২২ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত এই লড়াই চলে। রক্ত ঝরেছিল এই লড়াইতে যেমন রক্ত ঝরেছিল কুখ্যাত 'রক্তাক্ত রবিবারে'। ডিসেম্বরের লড়াইতে মস্কোর বিপ্লবী শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়।

৪.৯ সাংবিধানিক সংকট

১৯০৫ সালের অভ্যুত্থানে সবচেয়ে বড় দাবি একটি জাতীয় সভা (National Assembly) বা ডুমার (Duma) অধিবেশন ডাকতে হবে। জার এই ডুমা আহ্বানের দাবি মেনে নিয়েছিলেন। তদনুযায়ী রাশিয়ার প্রথম ডুমার অধিবেশন হয় ১৯০৬ সালের মে মাসে। এই ডুমায় সাংবিধানিক গণতন্ত্রীরা (Constitunal Democrats) ছিল সরকার বিরোধী, সংখ্যায় সবথেকে বড় বিরোধী দল। ডুমার ভেতরে সরকার বিরোধী বিতর্ক ক্রমশ জোরদার হতে লাগল। একদল যাদের Cadets বলা হত, তারা ইংল্যান্ডে সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রী পরিষদ বা cabinet দাবি করছিল। যে ক্যাবিনেট দায়ী থাকবে জারের কাছে নয়, ডুমার কাছে। ডুমার ক্ষমতা তার অধিবেশনের আগেই ১৯০৬ সালে ৫ মার্চের ডিক্রির দ্বারা কমিয়ে রাখা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে দেশের 'মৌলিক আইন' (fundamental laws) —সৈন্যবাহিনী ও বিদেশ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ডুমা কোন কথা বলবে না। তা জারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। ৭২ দিন অধিবেশন করার পর বিতর্ক বিধ্বস্ত ডুমাকে জার বন্ধ করে দিলেন? (dissolved)। নতুন ডুমার নির্বাচনের কথা ঘোষণা করা হল। রাজতন্ত্রীরা যাতে নির্বাচনে জিতে ডুমায় আসন গ্রহণ করতে পারে তার সব ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু সরকারের যাবতীয় তৎপরতা সত্ত্বেও বিরোধী শক্তিই আবার নির্বাচিত হল। সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষমতা রইল তাদেরই হাতে। ১৯০৭ সালে ৫ মার্চ থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত চলেছিল দ্বিতীয় ডুমার অধিবেশন। পুনরায় সরকারের

সঙ্গে নির্বাচিত ডেপুটিদের (Deputies) বিরোধ বাধল এবং কয়েকজন ডেপুটিকে অধিবেশনের মধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অতএব এই ডুমার অধিবেশন বন্ধ করে সরকার নির্বাচনের আইন বদলে দিল। স্থির হল এর পর থেকে ভূস্বামীরাই (Landowners) ভোটদান করতে পারবে। সুতরাং ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে যখন তৃতীয় ডুমার অধিবেশন বসল তখন দেখা গেল সংখ্যাগরিষ্ঠ ডেপুটি বা জনপ্রতিনিধি হচ্ছে রাজতন্ত্রের সমর্থক। এই ডুমাকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত তার পুরো সময় কাজ করতে দিতে সরকারের কোন বাধা রইল না। সেই একই বছর চতুর্থ ডুমা নির্বাচিত হল। একই রকম ভাবে রাজতন্ত্রীদের দিয়ে ঠাসা ডুমা শান্তই রইল। কিন্তু অশান্তির ঝড় এল বাইরে থেকে। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় পর্যন্ত রাশিয়াতে যে সংস্কার কার্য সম্পন্ন হয়েছিল জারের স্বৈরাচারী শাসন প্রতিনিয়ত তাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করতে পারেনি। দেশে শিল্পায়ন এসে যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত করেছিল এবং শ্রমিক শ্রেণীর ও সামাজিক গণতন্ত্রী (Social democrat) চিন্তার উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন। ১৯০৫ সালের কৃষক শ্রমিক অভুত্থান যে সাংবিধানিকতার সূচনা করেছিল তা শেষপর্যন্ত সংকটের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। বলা যেতে পারে যে ১৯০৫ সালের বিপ্লব রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করতে সফল না হলেও সংসদীয় শাসনতন্ত্রের শুভসূচনা করেছিল। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ১৯০৫ সালের বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল না। তার লক্ষ্য ছিল আইনের শাসন, মানুষের শারীরিক মানসিক স্বাধীনতা, শ্রমজীবী ও পেশাদার মানুষের ভোটদানের ও অন্যান্য মৌল অধিকার। এর অনেকটাই অর্জন করা গিয়েছিল ১৯০৫ সালে। অবশিষ্ট আয়ত্ত হয়েছিল ১৯১৭ সালের বিপ্লবে।

১.১০ ১৯১৭ সালের মার্চ ও নভেম্বর মাসের দুই বিপ্লব

রুশ-বিপ্লব প্রধানত দুটি পর্যায়ে বিভক্ত—একটি পর্যায় ১৯০৫ সালের বিপ্লব যার ইতিহাস আমরা পাঠ করেছি এবং অন্যটি ১৯১৭ সালের বিপ্লব যার ইতিহাস আমরা পাঠ করব। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের দুটি পর্যায় আছে—প্রথম পর্যায়টি ১৯১৭ সালের মাচ মাসে সংঘটিত হয়েছিল (নতুন ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মার্চ মাস)। দ্বিতীয় পর্যায়টি হয়েছিল নভেম্বর মাসে (নতুন ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। পুরানো ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এই বিপ্লব হয়েছিল ফেব্রুয়ারি এবং অক্টোবর মাসে)। বলা হয়ে থাকে যে বিপ্লবের রাজনৈতিক অধ্যায়টি সূচিত হয়েছিল মার্চ-মাসে, এর সামাজিক পর্বটি সম্পন্ন হয়েছিল নভেম্বর মাসে। এই দুটি বিপ্লব সম্মিলিত ভাবে পৃথিবীর প্রথম শ্রমিকদের প্রজাতন্ত্র (First worker's Republic) প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেছিল। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের কারণগুলি নিম্নরূপ।

১. ১৯০৫ সালের বিপ্লবের উত্তরাধিকার :

ট্রটস্কি বলেছিলেন যে ''১৯০৫ সালের বিপ্লব ১৯১৭ সালের বিপ্লবের ড্রেস-রিহার্সাল। এই বিপ্লব জারতন্ত্রের ভিত শিথিল করে দিয়েছিল। ১৯০৫ সালের বিদ্রোহ শেষ হয়েছিল রক্তাক্ত যুদ্ধে। প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণ-পন্থীরা পুলিশ ও সৈনিকদের সাথে হাত মিলিয়ে অনেক বুদ্ধিজীবী মুক্তিপন্থী মানুষ ও ইহুদিদের হত্যা করে। ফলে বিশ্বাসঘাতকদের সম্বন্ধে একটা চাপা আক্রোশ সমাজের মধ্যে গোপনে লালিত হচ্ছিল। ১৯০৫ সালে শ্রমিক-কৃষক ঐক্য গড়ে উঠেছিল, সর্বহারার উত্থান এই প্রথমবার বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ল। কৃষককে সঙ্গে রেখে সর্বহারা শ্রমিকদের

লড়াই হবে শ্রেণী সংগ্রামের শেষ লড়াই এবং সে লড়াইতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লব সম্পন্ন হবে এই তত্ত্বের একটি ছোট রাজনৈতিক প্রয়োগ ঘটেছিল ১৯০৫ সালে। এই বিপ্লবের সময়েই গড়ে ওঠে শ্রমিকদের সোভিয়েত—একটি নতুন সংগঠন যার পূর্ণরূপ পাওয়া যায় ১৯১৭ তে গড়ে ওঠা শ্রমিক-সৈনিক কৃষক সোভিয়েতে। বিপ্লবের একটা ছোট কিন্তু প্রায় নিখুঁত মডেল ছিল বলেই ১৯১৭ সালে বিপ্লবীরা অগ্রসর হতে পেরেছিল। এই কারণেই ট্রটস্কি তাঁর '১৯০৫' নামক গ্রন্থে এই বিপ্লবকে ১৯১৭ বিপ্লবের (সুসজ্জিত মহড়া) ড্রেস রিহার্স্যাল বলেছেন।

প্রান্তলিপি

নতুন ক্যালেন্ডার কী?

৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোমানসম্রাট জুলিয়াস সিজার (Julius caesar) জ্যোতির্বিদ সোসিজেনেস-এর (sosigenes) পরামর্শে স্থির করলেন যে একবছর হবে ৩৬৫ দিনে। প্রত্যেক চার বছরে একটি অতিরিক্ত দিন পাওয়া যাবে যাকে যুক্ত করা হবে ফেব্রুয়ারি মাসের সঙ্গে এবং সেই অতিরিক্ত দিন সম্বলিত বছরটিকে বলা হবে 'লিপ ইয়ার' (Leap year)। এই ক্যালেন্ডারকে বলা হয় জুলিয়ান ক্যালেন্ডার (Julian calender) । কিন্তু দেখা গেল যে সোসিজেনেস-এর গণনা একেবারে নির্ভুল নয়। প্রকৃত সৌরদিন এবং জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের সৌরদিন যদি পরস্পরের সাথে মেলানো যায় তবে ১২৮ বছরে একটি অতিরিক্ত দিন হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে দেখা গেল জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের বছর প্রকৃত সৌর বছর থেকে ১৩ দিন পিছিয়ে আছে। তখন জ্যোতির্বিদদের দিয়ে গণনা করিয়ে পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি *(Pope Gregory XIII)* জুলিয়ান ক্যালেন্ডার থেকে দশটি দিন বাদ দিয়ে দেন। ১৫৮২ সালের ৪ অক্টোবরের পরের দিন হল ১৫ অক্টোবর। তখন থেকে এই ক্যালেন্ডারই চলছে। জুলিয়ান ক্যালেন্ডার হল পুরানো (old style) ক্যালেন্ডার। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার হল নতুন (New style) ক্যালেন্ডার। রাশিয়ার অর্থডক্স গ্রীক চার্চ পুরানো ক্যালেন্ডার অনুসরণ করত। ১৭৫২ সাল ছিল সার্বিক ক্যালেন্ডার পরিবর্তনের কাল। এই পরিবর্তন নিম্নরূপ।

১৭৫২ সেপ্টেম্বর ২ = ১৭৫২, সেপ্টেম্বর ২

১৭৫২, সেপ্টেম্বর ৩ = ১৭৫২, সেপ্টেম্বর ১৪

মনে রাখতে হবে যে এই দুই ক্যালেন্ডার মতেই খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দী হল ১০১ থেকে ২০০ শতাব্দী, ১০০ থেকে ২০০ নয়, অনুরূপভাবে বিংশ শতাব্দী হল ১৯০১ থেকে ২০০০ সাল, অন্যথা নয়। আধুনিক রাশিয়ায় সারা পৃথিবীর মতো নতুন ক্যালেন্ডার ব্যবহৃত হয়।

২. ভূমি সমস্যা

রাশিয়ার কৃষক দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিল, কিন্তু শান্তি পায়নি। মুক্তিপণ হিসাবে তাদের দিতে হত বিপুল ক্ষতিপূরণ— ভূস্বামীদের জমিতে কাজ না করার ও জবরশ্রম বা বেগার না খাটার ক্ষতিপূরণ। ঐতিহাসিক ভিনোগ্রাদোফ [P. Vinogradoff, *Lectures on the History of the Nineteenth Century*] বলেছেন যে রুশ কৃষকদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল যাতে বেশি করে উপার্জন করতে পারে যা দিয়ে তারা কর দিতে পারবে। ["for the majority of the Russian peasantry the primary object in life is to earn enough to pay the taxes"] । কৃষকরা মনে করত যে আঠারো শতকে ভূস্বামীদের যেমন করে বাধ্যতামূলক সামরিক কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল সেইরকমভাবে তাদেরও ভূস্বামীদের কাছে দেয় আর্থিক জরিমানা থেকে মুক্তি দিতে হবে। তাছাড়া জনসংখ্যা যত বড় ছিল ততই কৃষকদের ব্যক্তিগত জমি ভাগ হয়ে ক্রমশ কমে আসছিল। ক্ষুদ্রায়তন জমি নিয়ে বিব্রত কৃষকরা জানতো না যে উৎকৃষ্ট উর্বর জমির থেকে পর্যায়ক্রমে বিপুল ফসল কীভাবে তুলতে হয়। এর কারণ তাদের কৃষিকাজের কৃৎ-কৌশল ছিল অত্যন্ত প্রাচীন। তাদের হাতে যথেষ্ট পুঁজিও ছিল না যার দ্বারা তারা নতুন উদ্যোগ রূপায়িত করতে পারে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেওয়া ও অনেকদিন পর্যন্ত সম্ভব ছিল না কারণ স্বত্ত্ব 'মির' বা গ্রামসমাজের (village community) উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছিল প্রত্যেক কৃষকের আয়ত্তাধীন জমির স্বল্পতা। তারা আরও জমি দাবি করছিল আর এই দাবির মধ্যে বিপ্লবীরা দেখেছিল এক 'বিনাতত্ত্বে সুপ্ত সমাজতন্ত্র' (latent socialism without a doctrine") । ''আরও জমি (more land) বিপ্লবের আগে গ্রামাঞ্চলের স্লোগান হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই জারের মন্ত্রী

স্টোলিপিন (Stolypin)*। বিক্ষুব্ধ কৃষকদের বিপ্লবী চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের রাজতন্ত্রের অনুগামী করতে চেষ্টা করেন। তিনি ভেবেছিলেন যে 'মির'-এর নিয়ন্ত্রণ থেকে জমির স্বত্ত্ব তুলে নিয়ে কৃষকদের হাতে তুলে দিলে তার জমির স্বত্ত্বের সঙ্গে ব্যক্তি মালিকানার মর্যাদালাভ করবে। জমির মালিক হয়ে তারা রক্ষণশীল বিপ্লব বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করবে। ফল হল ঠিক বিপরীত। কিছু কৃষক জমি ও মালিকানা পেয়ে ফুলে ফেঁপে উঠল, তৈরি হল এক পুঁজিবাদী কৃষক শ্রেণী (a class of capitalist farmers)। যাদের বলা হত **কুলাক** (*Kulaks*)। আর অন্যদিকে বিপুল এক কৃষকশ্রেণী যাদের জমি হস্তচ্যুত হওয়ার ফলে যারা হয়ে দাঁড়াল ভূমিহীন ভূমি-শ্রমিক (land labourers)। এইভাবে গ্রামাঞ্চলে এক বিরাট জনশক্তি সর্বহারার পর্যায়ে নেমে গিয়ে তৈরি করল বিপ্লবের অগ্নিগর্ভ চেতনা যা সমস্ত কায়েমি স্বার্থের (vested interest) প্রতিষ্ঠান জারতন্ত্র ভেঙে ফেলার সময়ে বিপ্লবের বর্শা-ফলক হিসাবে কাজ করেছিল। মনে রাখতে হবে যে বিপ্লব দেশের সমস্ত শক্তির কাছে একই অর্থ বয়ে আনে না। সৈনিকদের কাছে বিপ্লব হল শান্তি, যুদ্ধের অবসান। শহরের শ্রমিক—সর্বহারা প্রলেটারিয়টের কাছে—বিপ্লব হল পুঁজিবাদের নিয়ন্ত্রণ। কৃষকদের কাছে বিপ্লব হল ভূমিদান। জারের সরকার সৈনিক-শ্রমিক-কৃষকদের দিতে পারেনি তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। তাই তারা মরিয়া হয়ে বিপ্লবের পথে পা বাড়িয়েছিল। কৃষকরা বেপরোয়া হয়ে সন্ত্রাসের পথ বেছে নিল। ভূস্বামীদের জমি তারা কেড়ে নিল, ম্যানর হাউস (manor house) বা খামার বাড়ি পুড়িয়ে দিল এবং স্থানে স্থানে ভূস্বামী ও তাদের নিযুক্ত নজরদার (overseer) হত্যা করতে লাগল। প্রত্যক্ষদর্শী বলশেভিক নেতারা বলেছিলেন ''বৈপ্লবিক বর্বরতা নিয়ে কৃষকরা মধ্যযুগের বর্বরতাকে মুছে দিচ্ছে"। যখন এইভাবে বিদ্রোহী কৃষকরা দেশের গ্রামাঞ্চলের স্থিতিশীলতাকে তছনছ করছিল তখনই মধ্যবিত্ত শ্রেণী দখল করে ক্ষমতা (১৯১৭ সালের মার্চ বিপ্লব)। কিন্তু কৃষকদের কাঙ্ক্ষিত জমি দিতে পারেনি। সেই বুর্জোয়াদের ব্যর্থতার মুহূর্তে কৃষকরা হাত মেলাল শ্রমিকদের সঙ্গে, লক্ষ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অপসারণ। এই মিলনই সুগম করল ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের।

প্রান্তলিপি

স্টেলিপিন : সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হওয়া একজন ভূস্বামীপুত্র ছিলেন স্টোলিপিন। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি স্যারাটোভ (saratov) প্রদেশের শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯০৫ সালে তিনি ইহুদী ও বিপ্লবীদেরউপর নির্মম অত্যাচার করেন। তিনি সরকারকে বুঝিয়েছিলেন যে কৃষকদের দিয়ে বিপ্লবকে দমন করা যাবে। তার জন্য তাদের অধীনে জমিকে 'মির'-এর হাত থেকে নিয়ে তাদের ব্যক্তি সম্পত্তিকে পরিণত করতে হবে। তার ফলে সুঠামদেহী শক্তিশালী কৃষকরা ভূ-স্বামীদের মানসিকতা অর্জন করে চলতি ব্যবস্থাকেই টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করবে। আর যারা অশক্ত, ক্ষীণ তারা ঝরে গিয়ে কৃষিক শ্রমিক হয়ে কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমের যোগানকে অব্যাহত রাখবে। তিনি বলেছিলেন "The Government railed not on the feeble abd the drunk, but on the solid and strong"—''সরকার নির্ভর করেছিল কঠিন ও শক্তিশালীর উপর, ক্ষীণ ও প্রমত্তদের উপর নয়।"

৩. প্রলেটারিয়েটের জাগরণ ঃ

আমরা আগেই পড়েছি যে বিপ্লবের অনেক আগেই রাশিয়াতে এক বিরাট শিল্পায়িত প্রলেটারিয়েটের জন্ম হয়েছিল যাদের মধ্যে অনেকেই ছিল দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের শ্রমিক। অর্থাৎ hereditary workers বা পুরুষানুক্রমিক শ্রমিক বিপ্লবের আগেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু সমস্ত শ্রমিকই ধারাবাহিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শ্রমিক হয়নি। রাশিয়াতে দ্রুত শিল্পায়ন এসেছিল ফলে শ্রমিকদের চাহিদা অমোঘভাবে বেড়ে যাচ্ছিল। আর এই

চাহিদা মেটানোর জন্য ক্রমাগত গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের টেনে আনা হচ্ছিল শহরের ফ্যাক্টরি ব্যবস্থার মধ্যে। এইভাবে শহরের শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের একটা যোগ থেকে যাচ্ছিল, যোগ থেকে যাচ্ছিল শহরাঞ্চলের ফ্যাক্টরি ব্যবস্থার সঙ্গে অভ্যন্তরের মাটি আর তার সঙ্গে লেগে থাকা কৃষিজীবনের। পশ্চিম ইউরোপে, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশের শ্রমিকরা মধ্যস্থ থেকে শিক্ষানবিশি বা এপ্রেনটিসশিপের (apprenticeship) সুযোগ পেয়ে আসছিল। সেখানে গিল্ড ব্যবস্থার (guild system) শৃঙ্খলা শ্রমিকদের উপর বহুযুগের আরোপিত শৃঙ্খলা যে শৃঙ্খলার ভগ্নাংশ রাশিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে ছিল না। তাদের সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে কৃষিক্ষেত্রে থেকে অকস্মাৎ ছিন্ন করে তাদের ফ্যাক্টরির অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল ("It was thrown into the factory couldron snatched directly from the plough")। জমি থেকে ছিন্ন হওয়ার ফলে তাদের রক্ষণশীলতা কেটে গিয়েছিল আবার শিক্ষিত শ্রেণীর থেকে দূরে থাকার জন্য তাদের অমার্জিত উদ্ধত্য কমেনি। তারা চেয়েছিল শ্রমদানের সময়ের হ্রাস, অধিক মজুরি (wage), উন্নততর স্যানিটেশন (sanitation), এবং ১৯০৫ সালের পর ভোটাধিকার। এই রকম জাগ্রত শ্রমিক হাতিয়ার হিসাবে ধর্মঘট বা strike-এর গুরুত্ব বুঝে গিয়েছিল, আর চোখের উপর দেখেছিল পুলিশি শাসনের রক্তক্ষয়ী নিপীড়ন। তাদের উন্মীলনের মুহূর্তে রাশিয়ায় এসেছিল মার্ক্সবাদ, সমাজতন্ত্র ও বলশেভিক দল। শৃঙ্খল ছাড়া যে তাদের হারানোর কিছু নেই এতথ্য জানতে পেরেই তারা বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

মনে রাখতে হবে যে ১৯১৭ সালের বিপ্লবের জন্য রুশ সমাজে চারটি বিস্ফোরক উপাদানের প্রয়োজন ছিল আর চারটিই উপস্থিত ছিল সমানভাবে। তা হলো বিক্ষুব্ধ কৃষক, বিদ্রোহী শ্রমিক, রণক্লান্ত সৈনিক এবং সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল। এই চারটিকে একটি সূত্রে গেঁথে ছিল জনচেতনা ও রাজনৈতিক আদর্শ। আমরা উপরে দেখেছি কেমন করে জনচেতনা বিপ্লবীমুখী হয়েছিল এবং বিক্ষুব্ধ কৃষক ও বিদ্রোহী শ্রমিকরা শেষপর্যন্ত ১৯১৭ সালের মার্চ মাসের পর বুর্জোয়া নেতৃত্বের ব্যর্থতার পর ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল পরিবর্তিত কর্মসূচিতে। পরে আমরা দেখব সৈন্যরা রণক্লান্ত হয়ে শান্তি-সন্ধানী হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আঘাত দেশের অন্য সব মানুষের মতো সৈন্যবাহিনীও সহ্য করতে পারেনি। বিপ্লব তাদের অবসাদগ্রস্ত শান্তির প্রলেপ দিয়েছিল।

৪. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত ও রণক্লান্ত সৈন্যবাহিনীর শান্তি অন্বেষণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার ক্ষতি হয়েছিল সব থেকে বেশি। ১৯১৪-১৯১৮ এই চার বছরের যুদ্ধে রাশিয়ার যে পরিমাণ মানুষ নিহত হয়েছিল, রণসম্ভার ধ্বংস হয়েছিল, খাদ্যদ্রব্যের অপচয় হয়েছিল এবং অর্থ বিনষ্ট হয়েছিল তা কল্পনাতীত। ইউরোপের কোন রাষ্ট্রের এত ক্ষতি হয়নি। বলা হয়ে থাকে যে বেয়োনেট ও মেশিনগান রাশিয়ার যত মানুষকে হত্যা করেছিল, পঙ্গু করেছিল তার থেকে অনেক বেশি মানুষ ধ্বংস হয়েছিল রোগ, খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব, শীত ও প্রকৃষ্ট সমরায়োজনের অভাবে। একজন রুশ সেনাপতি স্বীকার করেছিলেন—''বর্তমান যুগের সামরিক কলা কৌশল আমাদের জানা নেই" ("the presentday demands of military technique are beyond us")। রাশিয়ার আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের অভাব অনেকখানি পুরিয়ে দিয়েছিল পশ্চিমের বন্ধুরাষ্ট্রগুলি। কিন্তু রাশিয়ার যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বলতার জন্য মানুষ-সৈন্য-সম্ভার-অস্ত্র কোন কিছুকেই দ্রুত রণাঙ্গনে (war

front) পাঠাতে পারত না। রাশিয়ার ছিল মানবশক্তি। (man power) এবং প্রাকৃতিক সম্পদ (natural resources)। কিন্তু তার অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা এসবের কোন কিছুকেই কাজে লাগাতে দেয়নি। হঠাৎ সৈন্যের দরকার হওয়ায় কৃষকদের সামরিক পোশাক পরানো হয়েছিল। এই অদক্ষ মানুষ সৈনিক-শৃঙ্খলার রীতিনীতিকে আয়ত্ত করতে না পারায় কার্যকালে তারা অপ্রয়োজনীয় ভার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই সৈনিকরা রণক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। রণাঙ্গন থেকে সংবাদ আসছিল ''সমস্ত ইউনিট যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছে।'' (''Whole units refused to fight'')। একজন অফিসার বলেছেন ''কেউ আর যুদ্ধ করতে চাইছিল না। সকলের চিন্তা নিবদ্ধ ছিল একটি জিনিসের উপর তা হল শান্তি'। (''Nobody wanted to fight anymore, all their thoughts were for one thing only-peace'')। ডুমার সভাপতি ঘোষণা করলেন যে ''বিপ্লবের অনেক আগেই সেনাবাহিনীর ভেঙে পড়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গেছে। (''the ground for the final disintegration of the army was prepared long before the Revolution'')। এই ভাঙনই বিপ্লবের সবথেকে বড় সহায়ক হয়েছিল। জারতন্ত্রের নিপীড়নের যন্ত্র ভেঙে গেল, তার আত্মরক্ষার বর্ম খসে গেল। এরপর স্বৈরাচার যে ধসে যাবে তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না।

৫. রাজনৈতিক দল ও বিপ্লবের আদর্শ

বিপ্লবের পরিস্থিতিকে গুছিয়ে অভ্যুত্থানের মুহূর্তটিকে সার্থক করে তোলার জন্য দরকার হয় প্রকৃত আদর্শের এবং সেই আদর্শকে একটি কর্মসূচিকে রূপায়িত করতে পারে একটি রাজনৈতিক দল। পশ্চিমের শিল্পায়িত সমাজে অনেকদিন ধরেই বিপ্লবী মার্ক্সবাদ একটি সুসংবদ্ধ, বৈজ্ঞানিক, কর্মসূচি ভিত্তিক সমাজ ও রাজনৈতিক দর্শন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। রাশিয়ার মার্ক্সবাদী দল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৩ সালে সুইজারল্যান্ডে। জর্জ প্লেখানভ (George Plekhanov) সেখানে নির্বাসনে থাকা কালীন এইদল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৮ সালে রাশিয়ার ভেতর রুশ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলের জন্ম হয়। একদিকে মার্ক্সবাদ অন্যদিকে জার্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলের গতানুগতিক আদর্শ নিয়ে এই দল চলছিল। ১৯০৩ সালে পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশন পর্যন্ত বড় মাপের বিপ্লবী সংকেত এদলের ভেতর থেকে আত্মপ্রকাশ করেনি। তা হল যখন লেনিন (Lenin) এই দলের চিন্তাধারাকে বদলে দিলেন। লেনিনের চিন্তাকেই আমরা পরে পাঠ করব।

৪.১১ লেনিন ও বলশেভিক দলের উত্থান

লেনিনের আসল নাম ভ্লাদিমির ইলিচ্ উলিয়ানভ (Vladimir Ilyitch Ulyanov) [১৮৭০-১৯২৪]। ''এন. লেনিন'' (''N. Lenin'') রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গৃহীত তাঁর ছদ্মনাম। তিনি জন্মেছিলেন ভলগা (Volga) নদীর তীরে সিমবার্স্ক (Simbirsk) নামক স্থানে (বর্তমান নাম উলিয়ানোভস্ক—(Ulyanovosk)। তাঁর পিতা সেখানে জেলা স্কুলের পরিদর্শক ছিলেন। ১৮৮৭ সালে জার তৃতীয় আলেকজান্ডারকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করে ফাঁসি দেওয়া হয়। তারপর থেকেই তিনি মার্ক্সবাদী বিপ্লবী সাহিত্যে নিমগ্ন হয়ে যান। সেই বছরই তাঁকে কাজান (Kazan) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং তিনি বহিরাগত ছাত্র হিসাবে আইন পরীক্ষা দিয়ে স্নাতক হন। ১৮৯৩ সালে তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গের (বর্তমান নাম লেনিনগ্রাড) চলে যান এবং সেখানে মার্ক্সবাদীদের নেতা হন।

এবং সেখানে মার্ক্সবাদীদলের নেতা হন। ১৮৯৬ সালে বিপ্লবী পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করে সাইবেরিয়াতে নির্বাসন দেওয়া হয়। সেখানে তিনি আরেকজন নির্বাসিতা নারী নাদেজদা কনস্ট্যান্টিনোভা ক্রুপস্কায়াকে (Nadezhda Konstaninova Krupskaya) বিবাহ করেন। ১৯০০ সালে তিনি সাইবেরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে দেশান্তরে চলে যান এবং 'ইস্ক্রা' ('Iskra' যার অর্থ স্ফুলিঙ্গ) নামে একটি বিপ্লবী পত্রিকা প্রকাশ করেন। তখন তাঁর ধ্যানজ্ঞান সবই ছিল সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত রুশ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলের কাজ করা।

১৯০৩ সালে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দলের কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় দলের গঠনতন্ত্র কী হবে তা নিয়ে আলোচনা হয়। লেনিন এবং প্লেখানভ চেয়েছিলেন যে দলের সদস্যপদ সীমাবদ্ধ থাকবে শুধু তাদের মধ্যে যারা দলের কোন সংগঠনেই একটিতে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করবে ("personally participate in one of the organizations of the party")। এঁদের বিপক্ষে থেকে মারটভ (Martov) ও লিওঁ ট্রটস্কি (Leon Trotsky) চেয়েছিলেন যে সদস্য হবেন তারাই যারা ''দলের কোন সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে ও নেতৃত্বে কাজ করবে" ("work under the control and guidance of one of the party organizations")। প্রথমটি অনুযায়ী দলের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে একটি ছোট বৃত্তের মধ্যে থাকা জঙ্গি ও সক্রিয় সংগঠকরা। দ্বিতীয়টি অনুযায়ী দল হবে একটি মুক্ত দল। যাকে পরিচালিত করবে নথিভুক্ত সদস্য ও সমর্থকদের যৌথ ভোট দানের ক্ষমতা ("... an open party, guided by the collective voting power of all its enrolled supporters and sympathizers")। লেনিন বিশ্বাস করতেন যে সংরক্ষিত সদস্য ব্যবস্থার দ্বারা দলের বৈপ্লবিক উদ্যোগ বজায় থাকবে এবং তার নিরাপত্তাও অক্ষুণ্ণ থাকবে। মুক্ত সদস্যব্যবস্থা হলে জার্মান ডেমোক্র্যাট দলের আকৃতি নেবে রুশ মার্ক্সবাদী দল। আর মুক্ত গণতন্ত্রী দল জারপন্থী (Czarist) রাশিয়ার নিষ্পেষণে কাজ করবে কীভাবে? শেষপর্যন্ত লেনিনের দল দুই ভোটে জিতে যায় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বা "Majority-men" বলে চিহ্নিত হয়। রুশ ভাষায় তাদেরই বলা হয় **'বলশেভিকি'** (Bolsheviks)। অপরপক্ষ হয়ে দাঁড়াল সংখ্যা-লঘু মানুষ (minority-man) বা **'মেনশেভিকি'** ('Mensheviki)। এইভাবে বাইরে থেকে বিপ্লবের আদর্শ ও রাজনৈতিক দল যতই সংঘবদ্ধ হচ্ছিল ভেতরে তখন জারতন্ত্র ততই দুর্বল হয়ে পড়ছিল। শেষপর্যন্ত তার অভ্যন্তরীণ পচন রোধ করা তার পক্ষে সম্ভব হল না। সে ভেঙে পড়ল।

৪.১২ : ১৯১৭ সালের মার্চ বিপ্লব : জারতন্ত্রের পতন

১৯১৭ সালের মার্চ বিপ্লবের সময় রাশিয়ার ক্ষমতাসীন জার ছিলেন দ্বিতীয় নিকোলাস (১৮৬৮-১৯১৮)। তিনি ছিলেন ইতিহাসের এক অভিশপ্ত সম্রাট। তাঁর বিবাহ হয়েছিল পিতার মৃত্যুশয্যায়। তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠানে ৩,০০০ মানুষ পিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছিল। তাঁর একমাত্র পুত্র দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিল। তিনি তাঁর নষ্টবুদ্ধি স্ত্রীর (জার্মান রাজকন্যা) নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী ও তিনি নিজে **রাশপুটিন** (Gregor Raspution **১৮৭৩-১৯১৬**) নামে এক লম্পট সন্ন্যাসীর প্রভাবে ভুল পথে চালিত হয়েছিলেন। তাঁর সময়ে রাশিয়া যুদ্ধে (রুশ-জাপান যুদ্ধ) জাপানের কাছে পরাজিত হয়েছিল। পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮)

ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সহযোগী হয়েও রাশিয়া জার্মানির কাছে নিদারুণভাবে পরাজিত হয়। তাঁর রাজত্বকালেই (১৮৯৪-১৯১৭) দুবার বিপ্লব হয়েছিল—১৯০৫ ও ১৯১৭ সালে। শেষ বিপ্লবের পর ১৯১৮ সালের ১৭ জুলাই বলশেভিকরা তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে।

প্রান্তলিপি

গ্রেগরি এফিমোভিড্ রাসপুটিন *(Gregry Efimorich Raspution)* : ১৮৭১-১৯১৬ একজন বিকটদর্শন ধর্মোন্মত ? কৃষক। ১৯০৪ সালে তিনি ধর্মীয় জীবন গ্রহণ করবেন বলে নিজের পরিবারকে ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর আচার-আচরণে এক ব্যক্তিগত আকর্ষণ ছিল আর তার ধর্ম ও দর্শন প্রচারে ছিল স্বাভাবিকত্ব-রহিত উন্মাদনা। রাশিয়ার জারিনা তাঁর অনুরক্ত উপাসিকা ও শিষ্যা ছিলেন। রাজনীতিতে তাঁর হস্তক্ষেপের জন্য অভিজাত ব্যক্তিদের দ্বারা তিনি নিহত হন।

একদিকে স্বৈরাচারী অন্যদিকে অস্থিরমতি স্ত্রীর পদানত, একদিকে শাসক হিসাবে নির্মম অন্যদিকে মানুষ হিসাবে এক দুশ্চরিত্র সন্ন্যাসীর প্রভাবাধীন এমন সম্রাট সংকট নিরসনে (Crisis management) সফল হতে পারেন না। দ্বিতীয় নিকোলাস তা হতে পারেনওনি। তাঁর রাজত্বকালের সংকট ঘনিয়ে এসেছিল ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে যখন নিদারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিল। তার আগেই ১৯১৬ সাল থেকে রাশিয়া যুদ্ধে হারছিল। রণক্লান্ত সৈন্যরা ঘরে ফিরতে চাইছিল। আর দেশের মানুষ বলতে শুরু করেছিল—প্রথাগতভাবে সংকটের সময় তারা তাই বলত—যে 'অশুভ শক্তি' ('dark forces') রাশিয়াকে গ্রাস করেছে। জার-তাঁর জার্মান স্ত্রীর প্রভাবে জার্মানির প্রতি অনুরক্ত (pro-German) রাজভক্তদের দ্বারা তাঁর রাজসভা পূর্ণ করেছেন। এখন জার্মান স্ত্রীর প্রভাবে জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ না করে গোপনে জার্মানির সঙ্গে সন্ধি করছে। এই রকম গুজবে জনমত যখন ক্ষিপ্ত হয়ে রাজবিদ্বেষী হয়ে পড়েছে তখনই খাদ্যাভাব দেখা গেল। অভ্যুত্থান আসন্ন হয়ে পড়ল একদিকে রাজতন্ত্র, অন্যদিকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে। ১৯১৭ সালে ৮ই মার্চ পেট্রোগ্রাডের বস্ত্রশিল্পের নারী কর্মীরা খাদ্যের দাবিতে পথে নামল। তার পরের দিন অন্য সব শিল্পের শ্রমিকরা তাদের সমর্থনে রাস্তায় মিছিল করতে লাগল। সকলের দাবি একটাই ''রুটি চাই''। সকলের স্লোগানও এক ''যুদ্ধ নিপাত যাক'', ''স্বৈরতন্ত্রনিপাত যাক'' (''Down with the war!'' ''Down with the autocracy'')। তৃতীয় দিনে আন্দোলন একটা সাধারণ ধর্মঘটের (General Strike) রূপ নিল। সমাজের নিপীড়িত মানুষরা এবার প্রকাশ্যে বেরিয়ে এল। একটি পুলিশ রিপোর্টে জানা যায় সৈনিকদের মানসিকতা দেখে জনগণ উৎসাহিত হয়েছিল। সৈন্যরা প্রথমে নিরপেক্ষ ও নিষ্ক্রিয় ছিল। পরে তারা আন্দোলনকারীদের সমর্থন জানায়। এই আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। পেট্রোগ্রাডে একলক্ষ এবং মস্কোতে পঁচিশ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট (strike) করে। চারিদিকে সরকারি কর্মচারীদের অকর্মণ্যতা, ব্যর্থতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন হতে থাকে। ডুমার বিশিষ্ট সদস্যরা দাবি করল যে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের অনুকরণে দায়িত্বশীল সরকার গঠন করতে হবে। জনতার আন্দোলন অনুপ্রাণিত করল সৈনিকদের। জার বিদ্রোহী জনতার উপর গুলি চালাতে হুকুম দিলেন। সৈন্যরা অস্বীকার করল। ১১ মার্চ জার ডুমা ভেঙে দিলেন। ডুমার সদস্যরা ডুমা ভেঙে দেওয়ার আদেশ অমান্য করল। বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। এইবার অভুত্থান ঘটাল ডুমার সদস্যরা। তাঁরা একটি বিকল্প সরকার—একটি সাময়িক সরকার (provisional Government) গঠন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। জারকে সিংহাসন ত্যাগ করতে বলা হল। ১৫ মার্চ তিনি সিংহাসন ত্যাগ করলেন। রাজতন্ত্র বাতিল হল। অস্থায়ী সরকার ক্ষমতা অধিগ্রহণ করল। ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবে প্যারিস যে ভূমিকা পালন করেছিল ১৯১৭ সালের বিপ্লবে পেট্রোগ্রাড সেই ভূমিকা পালন করল। রাজধানীতে যে ঘটনা ঘটে গেল সারাদেশ তা মেনে নিল। জারতন্ত্রের পতন হল। স্বৈরাচারের অবসান হল। শ্রমিকরাই ক্ষমতা

জয় করেছিল কিন্তু তাকে রাখতে না পেরে ফিরিয়ে দিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে ("The power was won by the workers but they at once resigned it to the middle class")। ক্ষমতাকে ধরে রাখার আত্মপ্রত্যয় তখনও তাদের হয়নি। যুদ্ধাঙ্গনে (was front) সৈনিকদের এই অভ্যন্তরীণ বিপ্লবে ভূমিকা কী হবে তাও নিশ্চিত হয়নি। শুধু এইটুকু স্থির ছিল যে ডুমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকার প্রতি-বিপ্লবকে ঘটতে দেবে না। যে বিপ্লবের কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না এবং যা ছিল একেবারেই স্বতঃস্ফূর্ত তা চরম ও পরম রাজনৈতিক সাফল্যের সূচনা করল। শুধু ক্ষমতা রয়ে গেল বুর্জোয়াজির হাতে—শ্রমিকদের হাতে নয়। সবচেয়ে বড় কথা হল জার দ্বিতীয় নিকোলাস ক্ষমতাচ্যুত হলেন। তিনশত বছরে অধিক সময় যে রোমানফ বংশ রাশিয়াতে রাজত্ব করত তার পতন ঘটল। স্বৈরাচারকে উৎপাটিত করে জনগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। অতএব বলা যেতে পারে যে মার্চ বিপ্লব জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বিপ্লব শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করেনি। তা করেছিল ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লব।

৪.১৩ ১৯১৭ : মার্চ থেকে নভেম্বর : বলশেভিক বিপ্লবের প্রস্তুতি পর্ব

১৯১৭ সালের মার্চ মাসে রাশিয়ার রাজধানী পেট্রোগ্রাডে দুটি পৃথক শাসকগোষ্ঠী জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছিল—এক, অস্থায়ী সরকার (Provisional Government) এবং দুই, শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সোভিয়েত। এই দুটি সংস্থাই জনগণের খণ্ডাংশের প্রতিনিধিত্ব করত। অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল উদারনৈতিক (liberal) মধ্যবিত্তদের নিয়ে। তিনটি দল এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। মন্ত্রিত্বের প্রধান ছিলেন প্রিন্স লভ্‌ফ (Lvoff)। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী ও উদারনৈতিক ভূস্বামীদের প্রতিনিধি। পররাষ্ট্র মন্ত্রী বা বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন পল মিলিউকফ (Paul Milyukoff)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে রাশিয়ার সংস্কার আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি সাংবিধানিক গণতন্ত্রী দলের (Constitutional Democratic Party) প্রতিনিধি রূপে মন্ত্রী সভায় আসন গ্রহণ করেছিলেন। আর ছিলেন কেরেনস্কি (Kerensky)—একজন বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী। শ্রমিকদের সোভিয়েত সংগঠনটির দরকার ছিল বুর্জোয়া সরকারকে অন্তরাল থেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। ১৯০৫ সালে যখন সাধারণ ধর্মঘটের নেতারা (Leaders of the general strike) কার্য পরিচালনার জন্য সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন তখনই শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত (Soveit of Workers Deputies) নামক একটি সংগঠনে গড়ে ওঠে। ১৯১৭ সালের মার্চ-মাসে যখন সৈন্যবাহিনী 'কল্যাণজনক নিরপেক্ষতা' (benevolent neutrality) জানিয়ে শ্রমিকদের উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে তখন সেনা প্রতিনিধির এই সোভিয়েতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সোভিয়েতের উপস্থিতির ফলে অস্থায়ী সরকারের ক্ষমতা হ্রাস পেল, তৈরি হল দ্বৈত কর্তৃপক্ষ, দ্বৈত আনুগত্য। একদিকে একদল মধ্যবিত্ত (office) বা পদ অধিকার করে রইল। অন্যদিকে শ্রমিক ও সৈনিকরা ক্ষমতা অধিকার করে থাকল। ১৯১৭-র নভেম্বর বিপ্লব এই দ্বৈত কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতা ও দপ্তর সবই তুলে দিল সোভিয়েতের হাতে।

মার্চ মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত যে সময় তাকে বলা হয়েছে ''যুক্তিশীল উদারনীতি, সুশৃঙ্খল সংস্কারের সময় ("The period of reasoned liberalism, of ordered reform")। অস্থায়ী মন্ত্রীসভা ফিন্‌ল্যান্ডকে তার

সংবিধান ফিরিয়ে দিয়েছিল, পোল্যান্ডকে তার ঐক্য ও স্বশাসন ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ইহুদিদের অন্য নাগরিকের সঙ্গে সমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছিল এবং একটি সার্বিক ক্ষমা (general amnesty) প্রদর্শন করে নির্বাসিত ও সাইবেরিয়াতে আবদ্ধ অসংখ্য মানুষের প্রত্যাবর্তন সহজ করে দিয়েছিল। কিন্তু এই অস্থায়ী সরকার কৃষকদের জমি দিতে পারেনি, শ্রমিকদের প্রাপ্য সুবিধার ব্যবস্থা করতে পারেনি এবং সৈনিকদের দিতে পারেনি শান্তি। সৈনিকদের মধ্যে ক্রমশ বিশৃঙ্খলা বাড়ছিল। তারা অফিসারদের কথা শুনছিল না। অফিসারদের কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অসংখ্য সৈনিক-কমিটির সঙ্গে আলোচনা করতে হচ্ছিল। রণাঙ্গনে সৈনিকরা যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকছিল। সাম্যবাদী চিন্তা সবাইকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। সেপ্টেম্বর মাসে ২ তারিখ জার্মানি রিগা (Riga) নামক অঞ্চলটি দখল করে। জাতীয় অপমান ও লজ্জা আপামর সমস্ত মানুষকে গ্রাস করল।

৪.১৪ লেনিনের আগমন ও নভেম্বর বিপ্লব

দেশ যখন ক্রমশ এই অশান্তির মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছিল তখন লেনিন দেশে ফিরলেন। ১৯১৭ সালের ১৬ এপ্রিল (নতুন ক্যালেন্ডার অনুযায়ী) জার্মানির ভেতর দিয়ে ঢাকা ট্রেনে তিনি ফিরলেন। একজন ঐতিহাসিক বলেছেন যে এটি ছিল রাশিয়ার ভাগ্য যে ব্যক্তি ও সময় একই মুহূর্তে উপস্থিত হল ("It was Russia's destiny that the man and the occasion should present themselves at the same moment" [Lipson] । লেনিনের আসার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ বিবর্তনের পথে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চিন্তা ক্ষীণ হয়ে এল। রাজধানী পরিবেশ নিরন্তর গম্ভীর হয়ে উঠছিল, শ্রমিক ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অস্থিরতা বাড়ছিল, গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা নয়া সন্ত্রাস নামিয়েছিল, আর যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনী বিমূঢ় অবস্থায় বিকল ব্যবস্থার সব ছবিকে ফুটিয়ে তুলছিল। আসন্ন ঝড়ের ঘনায়মান তিমিরে লেনিন এলেন। ট্রটস্কি লিখেছেন যে লেনিন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিপ্লবীদের অবিসংবাদিত নেতা হয়েছিলেন কারণ তাঁর চিন্তাধারা দেশ ও যুগের বিপুল বৈপ্লবিক সম্ভাবনার পদধ্বনি বুঝতে পেরেছিলেন। লেনিন এসে বললেন যে দেশ কোন সংসদীয় গণতন্ত্র চায় না। বিপ্লবের প্রথম পর্যায় মধ্য শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছে। এবার প্রস্তুত হতে হবে দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য। এ পর্যায়ের ক্ষমতা তুলে দিতে হবে শ্রমিক ও কৃষকদের হাতে। অর্থাৎ এক কথা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক (Bourgeois democratic) বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক (Socialist) বিপ্লবে পরিণত করতে হবে। এই পরিকল্পনা নিয়ে ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর বলশেভিক দল (যারা ইতিপূর্বে মেনশেভিকদের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছিল) বিপ্লবের চাকা ঘুরিয়ে দিল। একটি ছোট সশস্ত্র বাহিনী রেল স্টেশন, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, স্টেট ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস ও নানাবিধ সরকারি অফিস অধিকার করে নিল। কিছু মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হল, কেরেনস্কি পালিয়ে গেলেন, সেনাবাহিনীর সদরদপ্তর অধিকার করা হল। লেনিন হলেন প্রধানমন্ত্রী, ট্রটস্কি হলেন বিদেশমন্ত্রী। পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে পরিকল্পিতভাবে সংক্ষিপ্ত বিপ্লব প্রায় বিনা রক্তপাতে সংঘটিত হল।

৪.১৫ : নভেম্বর বিপ্লবে লেনিনের ভূমিকা

এই বিপ্লব পরিকল্পিতভাবে সংক্ষিপ্ত কেন একটু বলা দরকার। লেনিন বলেছিলেন দুটি কথা—এক, ''আমাদের কোন সংসদীয় প্রজাতন্ত্রের দরকার নেই। আমাদের কোন বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দরকার নেই'' (''We don't need any parliamentary republic. We don't need my bourgeois democracy")। পাশ্চাত্যে পুঁজিবাদের রাজনৈতিক বিবর্তনের একটা ধারা ছিল। সেই ধারায় একটি অধ্যায় হল সংসদীয় গণতন্ত্র। লেনিন জানতেন রাশিয়াতে শিল্প বিপ্লব হয়েছিল মূলত রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পঞ্চাশ বছরের মধ্যে—অর্থাৎ শিল্পায়ন শুরু হওয়ার পাঁচ দশকের মধ্যে রাশিয়াতে সেই ধরনের পুঁজিপতি (capitalist) class জন্মায়নি যা জন্মেছিল ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে। অতএব রাশিয়ার শিল্পায়িত সমাজ বিবর্তনে এই অধ্যায় পূর্ণাঙ্গভাবে গড়ে উঠবে না। পাশ্চাত্যের অনুকরণে বিকৃত পুঁজিবাদের একটি রাজনৈতিক রূপ হবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। লেনিন সেই অনুকরণ সঞ্জীত রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা তার পরিকল্পনা থেকে তুলে দিলেন। দুই, লেনিন বলেছিলেন যে, ''শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সোভিয়েত-এর সরকার ছাড়া অন্য কোন সরকার আমাদের প্রয়োজন নেই'' (''We don't need any government except the soviet of workers', soldiers' and form hands' deputies")। লেনিন বুঝতে পেরেছিলেন যে ১৯১৭ সালের বিপ্লবের প্রথম পর্যায় মধ্যবিত্তশ্রেণীকে ক্ষমতায় এনেছে যে মধ্যবিত্তশ্রেণী অসংগঠিত। তিনি মধ্যবিত্তশ্রেণীর ক্ষমতাসীন থাকার পর্বকে সংক্ষিপ্ত করে তিনি সেই ক্ষমতা উত্তরণের পর্যায়ে চলে যেতে চাইছিলেন 'যে পর্যায় ক্ষমতা তুলে দেবে শ্রমিক ও কৃষকদের দরিদ্র শ্রেণীর হাতে' (''Which must give power to the proletariat and the poor layers of the peasantry")। অর্থাৎ 'বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক' বিপ্লবের যে সূচনা মার্চ-বিপ্লবে হয়েছে তাকে চকিতে 'সমাজতান্ত্রিক' বিপ্লবে রূপান্তরিত করতে হবে, জারের একনায়কতন্ত্র থেকে শ্রমিক কৃষকদের একনায়কতন্ত্রে—dictatorship of the proletariat-এ চলে যেতে হবে। শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বাদ দিয়ে শ্রমিক শ্রেণী, গ্রামাঞ্চলে কুলাকদের বাদ দিয়ে ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকদর নিয়ে সর্বহারার অনিবার্য বিজয়ের কেতন উড়িয়ে দিতে হবে এই ছিল লেনিনের পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাা প্রথমে অনেকের কাছে অসম্ভব মনে হয়েছিল কারণ অনেকে ভেবেছিল যে একবারে হঠাৎ করে সামন্ততন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে যাওয়া যায় না। লেনিন তা করে বিবর্তনের ধারাকে সংক্ষিপ্ত করেছিলেন।

লেনিনের নেতৃত্বে নতুন সরকার তার গার্হস্থ্য ও বৈদেশিক নীতি ঘোষণা করল। যুদ্ধ থেকে সরে এসে শান্তি ঘোষণা, বিধ্বস্ত রণক্লান্ত সৈনিকদের দাবি পূরণ করা, সমস্ত ভূসম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেওয়া, শ্রমিক কৃষক সৈনিকদের নিয়ে গঠিত সোভিয়েতদের সম্মিলনে সরকার গঠন করা এবং এক কথায় প্রলেটারিয়েটের একনায়কতন্ত্র স্থাপন করা—এই সবই হল ঘোষিত নীতির অঙ্গ। লেনিন ঘোষণা করলেন ''আমরা এখনই কৃষকদের হাতে তুলে দিতে চাই (''We favour an immediate transfer of land to the peasants")। লেনিনের নেতৃত্বে শহরের শ্রমিক সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল মধ্যশ্রেণীর সরকারের বিরুদ্ধে। গ্রামাঞ্চলে কুলাকদের বাইরে গরীব চাষির এটা জানতেন যে যুদ্ধ চলতে থাকলে এই নতুন পরিকল্পনা চালু করা সম্ভব নয়। সে কথা মাথায় রেখে রাশিয়া ১৯১৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর জার্মানির সঙ্গে **ব্রেষ্ট-লিটভস্ক** (Brest-Litovsk") নামক স্থানে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে তিনমাস বাদে

সেই স্থানেই জার্মানির সঙ্গে একটি দুর্ভাগ্যনক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করল। এই চুক্তির দ্বারা রাশিয়ার উপর কঠিন শর্ত আরোপিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ বিপ্লব বেঁচে গিয়েছিল। লেনিন পৃথিবীতে যুদ্ধের বদলে শান্তির নীতিকে এইভাবেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

৪.১৬ : সারাংশ

১৯০৫ সালের বিপ্লব হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্ত, ১৯১৭ সালের মার্চ মাসের বিপ্লবও কিছুটা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল। কিন্তু নভেম্বর মাসের বলশেভিক বিপ্লব ছিল সম্পূর্ণভাবে পরিকল্পিত। সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ, বলশেভিক দলের সংগঠন ও লেনিনের নেতৃত্ব, এই তিনের সম্মিলিত শক্তি বলশেভিক বিপ্লবের গতিশক্তির জোট। পটভূমিকায় ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, যে যুদ্ধে মিত্র শক্তির (ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড) সঙ্গে যুক্ত ছিল রাশিয়া। কিন্তু তা সত্ত্বেও **ট্যানেনবার্গ**-এর (*Tannenburg*) যুদ্ধে পরাজিত হল রাশিয়া। এখানে সেখানে ব্রুসিলভ এর (Brussilov) মতো দু-একজন রুশ সেনাপতি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে দু-একটি যুদ্ধে জিতলেও জারতন্ত্রের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। রাসপুটিনের মতো ভ্রান্ত সন্ন্যাসী আর নষ্টবুদ্ধি জারিনার (যিনি ছিলেন জার্মান দুহিতা) প্রভাবে পড়ে জারসংকটের মোকাবিলা করতে পারলেন না। দেশের লোক ভাবতে লাগল জার গোপনে জার্মানির সঙ্গে স্বতন্ত্র সন্ধি করছেন যা তিনি করতে পারেন না কারণ মিত্রশক্তির কাছে তিনি চুক্তিবদ্ধ ছিলেন যে জার্মানির সঙ্গে কোন একক সিদ্ধান্ত ভিত্তিক দেয়া-নেয়ার মধ্যে তিনি যাবেন না। এদিকে রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট কৃষক, জমিহীন ক্ষেত মজুর ও প্রান্তিক চাষিরা সন্ত্রাসের পথ নিয়েছিল। সৈন্যরা রণক্লান্ত হয়ে যুদ্ধবিমুখ হল। শ্রমিকরা দাবি করল কাজের নানা সুবিধা, উন্নততর জীবনমান ও ক্ষমতায় অংশগ্রহণ। তৈরি হল শ্রমিক-কৃষক-সৈন্যবাহিনীর সম্মিলিত সোভিয়েত। মার্চের বিপ্লবের পর কেরেনস্কির সরকার এ সমস্যার মোকাবিলা করতে পারলেন না। লেনিন ফিরে এলেন রাশিয়ায়। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পথে না গিয়ে তিনি চাইলেন সরাসরি সমাজতান্ত্রিক সরকার, চাইলেন শ্রমিক-কৃষক-সৈন্যের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে। সাধিত হল ১৯১৭ নভেম্বর বিপ্লব। প্রতিষ্ঠিত হল সর্বহারা মানুষের একনায়কত্ব।

৪.১৭ : অনুশীলনী

১। **দশটি বাক্যে উত্তর দিন :**

(ক) ১৯১৭-র মার্চ-মাসের বিপ্লবের জন্য জারতন্ত্র কতখানি প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী ছিল?

(খ) ১৯০৫ সালের বিপ্লব কি ব্যর্থ হয়েছিল?

(গ) ১৯৩৭-র নভেম্বর বিপ্লবের আগে লেনিন কী মত প্রকাশ করেছিলেন?

(ঘ) রুশ বিপ্লব পাঠের উদ্দেশ্য কী?

(ঙ) ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পরোক্ষ কারণ কী?

(চ) ১৯১৭ সালের মার্চ মাসের বিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী হল না কেন?

(ছ) ১৯০৪-০৫ সালের রুশ জাপান যুদ্ধের কোন প্রভাব কি ১৯০৫ সালের বিপ্লবের উপর পড়েছিল?

(জ) ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পর সাংবিধানিক সংকট কী হয়েছিল?

(ঝ) স্টোলিপিন কে ছিলেন? তাঁর সংস্কারর ফল কী হয়েছিল?

(ঞ) ১৯১৭ সালের দুটি বিপ্লবের জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কী পটভূমিকা রচনা করেছিল?

(ট) ১৯১৭ সালের মার্চ ও নভেম্বর বিপ্লবের জন্য কৃষকরা কীভাবে পটভূমিকা তৈরি করেছিল?

(ঠ) লেনিন সম্বন্ধে ট্রটস্কি কী বলেছিলেন? তা কি যুক্তিসঙ্গত উক্তি?

(ড) ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবে বলশেভিক দলের কোন ভূমিকা ছিল কি?

(ঢ) জেমস্‌ট্‌ভোর ক্ষমতা সংকোচন কি যুক্তি সঙ্গত হয়েছিল?

(ণ) বিপ্লব পরিস্থিতি নিয়ে যে কোন একজন রুশ লেখকের বক্তব্য পর্যালোচনা কর।

২। **একটি বাক্যে উত্তর দিন :**

(ক) লেনিনের আসল নাম কী ছিল?

(খ) বলশেভিক নামের উৎপত্তি কীভাবে হল?

(গ) রাশপুটিন কে ছিলেন?

(ঘ) দ্বিতীয় নিকোলাসের রাজত্বকালের সময় কী?

(ঙ) তৃতীয় আলেকজান্ডার কবে রাজত্ব করেন?

(চ) কোন জারকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল?

(ছ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একজন রুশ সেনাপতির নাম লিখুন।

(জ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানির যে সন্ধি হয়েছিল তাকে কী বলা হয়?

(ঝ) কুলাক কী?

(ঞ) মুক্তিদাতা বীর কে ছিলেন?

(ট) 'ইউকাম' কী?

(ঠ) নিহিলিজম কীসের দর্শন?

(ড) লোরিস-মেলিকফ কে?

(ঢ) পোবেডোনাস্টেভ কে?

(ণ) জেমস্‌ফি সোবোর কী?

৩। টিকা লিখুন (পাঁচটি বাক্যে)

(ক) ডুমা

(খ) ১৯১৭ সালের মার্চ মাসের বিপ্লবের পর অস্থায়ী সরকার।

(গ) ক্ষমতার হস্তান্তর সম্বন্ধে লেনিনের মত।

(ঘ) ১৯০৫ সালের অক্টোবর ম্যানিফেস্টো।

(ঙ) সোভিয়েত

(চ) 'যুক্তিশীল উদারনীতি, সুশৃঙ্খল সংস্কারের সময়'

(ছ) ১৯১৭ সালের ১৬ এপ্রিল লেনিনের রাশিয়ায় আগমন

(জ) '..... সোভিয়েতের সরকার ছাড়া অন্য কোন সরকার আমাদের প্রয়োজন নেই'।

(ঝ) জেমস্‌ট্‌ভো

(ঞ) উইট

(ট) নতুন ক্যালেন্ডা

(ঠ) কেরেনস্কি

(ড) ট্যানেনবার্গের যুদ্ধ

(ঢ) 'বিনা তত্ত্বে নিহিত সমাজতন্ত্র'

(ণ) সামাজিক গণতন্ত্রী বা সোস্যাল ডেমোক্র্যাট।

৪.১৮ গ্রন্থপঞ্জী

১. E. Lipson *Europe in the 19th & 20th Centuries.*

২. L. Trotsky *The History of the Russian Revolution* (translated by M. Eastman).

৩. M. T. Florinsky *The End of the Russian Empire.*

৪. M. Hindus *Humanity uprovted.*

৫. J. Stalin *Leninism,* Vol. 1.

৬. S. and B. Webb *Soviet Communism.*

৭. Lionel Kochan *The Making of Modern Russia* (Pelican Book)

৮. Jacques Droz *Europe between Revolutions 1815-1848.*

৯. Chrles Downes Hazen *Modern Europe upto 1945.*

১০. S. Reed Brett *Modern Europe 1789-1939*

১১. D. M. Ketelbey *A History of Modern Times from 1789 to the Present Day.*

১২. David Thompson, *Europe since Napoleon.*

১৩. V. Alexander *A Contempory world 1917-1947* (Progressive Publishers, Moscow)

১৪. Norman Stone *EuropeTransformed (1878-1919)*

১৫. J. A. S. Grenville *Europe Reshaped 1848-1878.*

১৬. Sir B. Pares *Russia and Reform.*

১৭. E. H. Carr *History of Bolshevism* (Vol. X & XI).

ই. এইচ. আই—৭
ইতিহাসের ঐচ্ছিক পাঠক্রম
পর্যায় ঃ ২৮

একক ১ □ উপনিবেশবাদ ও উপনিবেশ বিস্তার

গঠন

১.১.০ উদ্দেশ্য

১.১.১ প্রস্তাবনা

১.১.২ উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বোঝায়

১.১.৩ উপনিবেশবাদের বৈশিষ্ট্য

১.১.৪ উপনিবেশবাদের বিভিন্ন পর্যায়

ক) প্রথম পর্যায় (খ) দ্বিতীয় পর্যায় (গ) তৃতীয় পর্যায়

১.১.৫ উপনিবেশবাদের প্রকারভেদ—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ

১.১.৬ উপনিবেশ বিস্তারের ধারা

১.১.৭ উপনিবেশ স্থাপনের নতুন প্রচেষ্টা

১.১.৮ সারাংশ

১.১.৯ অনুশীলনী

১.১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ কথা দুটি কি অর্থে প্রযোগ করা হয়।

উপনিবেশ ও ঔপনিবেশিক দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, উপনিবেশ বিস্তারের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য প্রেরণা।

আফ্রিকা, এশিয়া ও লাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে কিভাবে উপনিবেশবাদ স্থাপিত হয়।

১.২ প্রস্তাবনা

পনেরো শতকের শেষে ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে বহির্বিশ্বে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি উপনিবেশ বিস্তার করে। অগ্রণী ভূমিকা নেয় আটলান্টিক তীরবর্তী দেশ—স্পেন, পর্তুগাল, হল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স। উপনিবেশ বিস্তারের পিছনে মূল প্রেরণা ছিল ব্যাবসা-বাণিজ্য, ধর্মপ্রচার, ভূমি দখল ও সম্পদ লুণ্ঠন। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে উপনিবেশ বিস্তারের ইতিহাস পাঁচশ বছরের পুরানো।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আর একটু নির্দিষ্ট করে বলতে হলে ১৮৭০ সাল থেকে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের (১৯১৪) অন্তর্বর্তী সময়ে পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য এক তীব্র রেষারেষি লক্ষ্য করা যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার তখন পর্যন্ত অনধিকৃত স্বাধীন দেশে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের আধিপত্য স্থাপিত হয়। এ যুগের উপনিবেশ বিস্তারকে উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ আখ্যা দেওয়া হয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় এই উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ।

উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ কথা দুটি সমার্থক। একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। উপনিবেশের (প্রান্ত periphery) দিক থেকে যা উপনিবেশবাদ, ঔপনিবেশিক দেশের (মাতৃভূমি, metropolis, centre, core) দিক থেকে তাই সাম্রাজ্যবাদ। আমাদের আলোচনায় উপনিবেশবাদ কথাটিই বেশি করে ব্যবহার করা হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে সাধারণ ধারণাগুলিকে ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন চমৎকার করে ব্যাখ্যা করেছেন (দ্রষ্টব্য : David Thompson, *Europe since Nepoleon*)। তিনি বলেছেন যে ১৮১৫ সালের আগে প্রায় চারশত বছর পৃথিবী নিরবচ্ছিন্ন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদকে প্রত্যক্ষ করেছে। এই সাম্রাজ্যবাদের অর্থ হল অন্যান্য মহাদেশগুলির ওপর ইউরাপীয় শক্তিগুলির ক্রম সম্প্রসারণশীল বিস্তার। এই বাহ্যিক বিস্তারই সাম্রাজ্যবাদ। স্পেনীয়, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য একটার পর একটা চার শতাব্দী ধরে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই যে অ-ইউরোপীয় দেশের মাটিতে ইউরোপীয় শক্তিগুলির দখল ও নিয়ন্ত্রণ তার নানা রূপ ছিল—ব্যাবসা-বাণিজ্য, ধর্মপ্রচার, অ্যাডভেঞ্চার বসতিবিস্তার, লুটতরাজ, জাতীয় অহংকার জনিত তাড়না, রাজ্যজয়, যুদ্ধ ইত্যাদি (এর সঙ্গে আমরা যোগ করতে পারি দাসব্যবসা —মানুষকে দাসত্বে বাঁধবার আকাঙ্ক্ষা)। ওপরে যে দেশের তালিকা দেওয়া হল তার দ্বারা সামুদ্রিক শক্তিগুলির সম্প্রসারণশীলতার অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার বিষয়টি জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা এ বোঝায় না যে যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হতে হলে শুধু সমুদ্রই পার হতে হবে। স্থলভাগ অতিক্রম করলে চলবে না। হ্যাপসবুর্গ ও অটোম্যান তুর্কীদের বিরাট বংশভিত্তিক সাম্রাজ্য (dynastic empires), জার্মানদের বসতি ও বাণিজ্যের খোঁজে পূর্বদিকে বিস্তারের প্রথাগত অভ্যাস, নেপোলিয়নের মহাদেশীয় সাম্রাজ্য, উনিশ শতকে রাশিয়ার দ্রুত দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ায় বিস্তার। এমনকি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম দিকে বিস্তার সমুদ্র পার না হয়েও মহাদেশীয় স্থলপথে সাম্রাজ্য বিস্তারের নজির। অতএব ১৮৭০ সালে (বা তার আগে পরে সামান্য সময়ে) ইউরোপীয় শক্তিগুলির পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল দখলের প্রচেষ্টার মধ্যে কোন অভিনবত্ব ছিল না। তা সত্ত্বেও 'সাম্রাজ্যবাদ' (impenalism) কথাটা উনিশ শতকের মধ্যভাগেই অবিকৃত হয়েছিল। ১৮৭০ সালের পরবর্তী প্রজন্মের সময়কালকেই 'সাম্রাজ্যবাদের যুগ' ('Age of Imperialism') বলা হয়।

১.১.২উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বোঝায়

উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের একটি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দেন দাদাভাই নৌরজী, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ভারতীয় মনীষীগণ। তাঁরা দেখিয়েছেন ভারতীয় উপনিবেশ থেকে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ ইংলন্ডে রপ্তানি হয় অথচ পরিবর্তে ভারতবর্ষের সমানুপাতিক কোন ফললাভ হয় না। ভারত শাসনের জন্য ইংলন্ডে ব্যয়, ব্রিটিশ কর্মচারিদের ভাতা ও পেনসন, ভারতে নিয়োজিত ব্রিটিশ মূলধনের মুনাফা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ সম্পদ ভারতবর্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ইংলন্ডে সঞ্চিত হত। সামাজিক উদ্বৃত্ত উপনিবেশের উন্নয়নে বিনিয়োগ না করে মাতৃভূমিতে (metropolis) সঞ্চিত হত অথবা বিনিয়োগ করা হত। একে তাঁরা বলেছেন সম্পদের বহির্নিষ্কাষণ (Drain of wealth)। এটি সাম্রাজ্যবাদের একটি অর্থনৈতিক ফল।

মার্কস এঙ্গেলস উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সবিস্তারে ভাষ্য সম্বলিত কোন তত্ত্ব লিখে যান নি, যদিও তাঁদের লেখায় ইংলন্ডের উপনিবেশ, আয়ারল্যান্ডের শোষণের উল্লেখ আছে। মার্কস্ এর মূলধনীতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে জে. এ. হবসন, লেনিন প্রভৃতি চিন্তাবিদরা সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব খাড়া করেছেন।

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ হবসন (J. A. Hobson) তাঁর ১৯০২ সালে প্রকাশিত *Imperialism : A study* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের জন্য ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অন্যান্য যে কারণই থাক না কেন মূল প্রেরণা এসেছিল পশ্চিমের উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির উদ্বৃত্ত পুঁজির বিনিয়োগের তাগিদ থেকে। মার্কসের ব্যাখ্যা অনুসরণ করে তিনি দেখিয়েছেন পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে অতিরক্ত মুনাফার জন্য বিনিয়োগ করা। বেশী বেশী মুনাফার জন্য পুঁজিপতিদের চাহিদা ছিল সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহ, শিল্পজাত পণ্যের বাজার ও মূলধন লগ্নী করার নতুন নতুন ক্ষেত্র। উপনিবেশ বিস্তারের দ্বারাই এই সব চাহিদা মেটানো সম্ভব। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব।

হবসনের তত্ত্বকেই আরও সম্প্রসারিত করে লেনিন ১৯১৬ সালে *Imperialism : The Highest Stage of Capitalism* নামক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। হবসনের মতই তিনিও ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলির বহির্বিশ্বে মূলধন বিনিয়োগের তাগিদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পুঁজিবাদী শ্রেণী কখনই তাদের উদ্বৃত্ত মূলধন নিজের দেশের সাধারণ লোকের মান উন্নয়নের জন্য ব্যয় করে না—সেক্ষেত্রে তাদের মুনাফা কমে যাবে। অন্যদিকে সাধারণ লোকের ক্রয় ক্ষমতা যথেষ্ট না থাক (কৃষির আয়ের স্বল্পতার জন্য) নিজের দেশেও বিক্রি করতে পারে না। উনিশ শতকের শেষ পর্বে ইউরোপের অন্য দেশেও শিল্প বিপ্লবের অগ্রগতির জন্য শিল্পপণ্যের বাজার এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে এসেছিল। ফলে যথেষ্ট মুনাফা সঞ্চয়ের তাগিদে অনুন্নত দেশে পুঁজি বিনিয়োগের তাগিদ দেখা দেয়। এইভাবে উপনিবেশের বিস্তার ঘটে। লেনিন শিল্পে নিযুক্ত পুঁজির বদলে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে মূলধনী পুঁজির ওপর। তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় হল পুঁজিবাদই চূড়ান্ত রূপ পায় সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে। মূলধনীরা উদ্বৃত্ত মূল্যের বুনিয়াদ রক্ষা করতে উদ্বৃত্তমূল্যের ভগ্নাংশ খরচ করে নিজের দেশের শ্রমিকদের মধ্যে একটা অভিজাত শ্রেণী গড়ে তোলে এবং তাদের দিয়ে শ্রমিকদের বাকী অংশের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এইভাবে শ্রমিক শ্রেণীকেও উপনিবেশ বিস্তারের শরিক করে নেয়।

ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইন (Immanuel Wallerstein) ধনতান্ত্রিক বিশ্ব অর্থনীতি ব্যবস্থার নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে ধনতান্ত্রিক বিশ্ব অর্থনীতি কেন্দ্র (Centre Core) এবং প্রান্ত (periphery) দুটি অংশে বিভক্ত। কেন্দ্রে আছে মাতৃভূমি (metropolis) এবং প্রান্তে উপনিবেশ। কেন্দ্র প্রান্ত বিভাজনের কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে।

প্রথমত, কেন্দ্রে উচ্চ মূল্যের পণ্য উৎপন্ন হয় আর প্রান্তের উৎপাদন প্রযুক্তি নিম্নমানের, শ্রমিকের মজুরীও খুব কম।

দ্বিতীয়ত, অসম পণ্য বিনিময়ের ফলে প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে সব সময়ই রপ্তানি উদ্বৃত্ত হয়।

তৃতীয়ত, মাতৃভূমি দেশগুলি সবসময়ই শক্তিশালী আর প্রান্ত বা উপনিবেশগুলি দুর্বল।

চতুর্থত, প্রান্তের অর্থনীতি মাতৃভূমির অর্থনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

মূলকথা, কেন্দ্র ও প্রান্ত উভয়ে মিলেই বিশ্বধনতন্ত্র গড়ে উঠেছে।

১.১.৩. উপনিবেশবাদের বৈশিষ্ট্য

ওপরের আলোচনা পড়ে আপনি উপনিবেশবাদের যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন তাকে নিম্নলিখিত যুক্তিনির্ভর সোপানে সাজানো যায়।

প্রথম, উপনিবেশগুলি বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য বিশ্ব ধনতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হলেও উপনিবেশের অর্থনীতি ও সমাজ মাতৃভূমির (metropolis) অর্থনীতি সমাজের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল। অর্থাৎ মাতৃভূমির স্বার্থেই উপনিবেশের অর্থনীতি ও সমাজ নিয়ন্ত্রিত হত। মাতৃভূমির সামাজিক, অর্থনৈতিক

ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপবিবেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন হয়।

দ্বিতীয়, উপনিবেশিক দেশ (metropolis) এর স্বার্থেই উপনিবেশ কৃষি ও খনিজ দ্রব্য উৎপাদন করা হয়। নিজের দেশে শিল্পের সঙ্গে এই সব প্রাথমিক দ্রব্যের কোন যোগ ছিল না।

তৃতীয়, উপনিবেশ এবং ঔপনিবেশিক দেশের মধ্যে বাণিজ্য সব সময়ই অসম ছিল এবং মাতৃভূমির (metropolis) অনুকূলে ছিল। এই ভাবে প্রচুর সম্পদ উপনিবেশ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে মাতৃভূমিতে চলে আসত।

চতুর্থ, উপনিবেশগুলির ওপর উপনিবেশিক রাষ্ট্র বা মাতৃভূমির রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকত।

১.১.৪ উপনিবেশ বিস্তারের বিভিন্ন পর্যায়

উপনিবেশ বিস্তারের ইতিহাসকে সাধারণভাবে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। পর্যায়গুলি কালানুক্রমিক। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে একাধিক পর্যায়ের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। আবার কোথাও কোথাও সব পর্যায়ের অবস্থান নাও থাকতে পারে। মাতৃভূমির নিজস্ব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর ওপর পরিবর্তনের পর্যায় নির্ভর করে। উপনিবেশের নিজস্ব ঐতিহাসিক অবস্থান ও পর্যায় নির্দিষ্ট করে।

(ক) প্রথম পর্যায় ঃ

এই সময়ে উপনিবেশ থেকে পণ্য কিনে ইউরোপের বাজারে রপ্তানি করা হত। অন্য ইউরোপীয় কোম্পানীগুলিকে প্রতিযোগিতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই সময়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়। উপনিবেশের বাজারে ইউরোপীয় পণ্যের যথেষ্ট চাহিদা না থাকায় এবং সে যুগের বাণিজ্যিক তত্ত্ব অনুসারে বিদেশে সোনা রুপো রপ্তানিতে অনিচ্ছা থাকায় উপনিবেশেই রাজস্ব ও কর সংগ্রহ করে উপনিবেশের পণ্য কেনা হত। এই পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সুযোগ নিয়ে উপনিবেশে উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর প্রভাব বিস্তার করা হত।

প্রাথমিক পর্যায়ে উপনিবেশের রাষ্ট্র কাঠামো বিচারব্যবস্থা, শিক্ষা ও ধর্মে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন দেখা দেয় নি। ব্যাবসার মাধ্যমে সামাজিক উদ্বৃত্ত আহরণের জন্য এই ধরণের হস্তক্ষেপের দরকার ছিল না।

(খ) দ্বিতীয় পর্যায় :

উপনিবেশকদের দ্বিতীয় পর্যায় হল অবাধ বাণিজ্যের যুগ। উনিশ শতকের শুরুতে ব্রিটেনে বাণিজ্যিক পুঁজি শিল্পপুঁজিতে উত্তরণ ঘটে। নতুন শিল্প পুঁজিবাদীরা উপনিবেশ থেকে বেশি করে কর বা শুল্ক আদায় করে অথবা লুণ্ঠন করে বাণিজ্যিক সুবিধাভোগের বিরোধী ছিল। তারা চাইত মাতৃভূমির শিল্পজাত দ্রব্য উপনিবেশে বিক্রি করতে এবং সেখান থেকে সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহ করতে। বাণিজ্যের ওপর বাধা নিষেধ (Tariff) উঠে গেলে তাদের পক্ষে শিল্পজাত পণ্য সস্তায় উপনিবেশে বিক্রি করা সহজ হবে। কেননা উপনিবেশের কুটির শিল্পজাত দ্রব্যপণ্য কখনই তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারতো না। এইভাবেই ভারত বস্ত্র রপ্তানিকারী দেশ থেকে উনিশ শতকে বস্ত্র আমদানিকারী দেশে পরিণত হয়। ভারতে অবশিল্পায়ন (deindustrialisation) ঘটে। কারিগররা হয় জমিতে ফিরে গিয়ে কৃষি নির্ভর হয়ে পড়ে নতুবা কাজের ও খাদ্যের অভাবে মারা যায়। ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পকেন্দ্রগুলির যেমন ঢাকা, সুরাট, মুর্শিদাবাদের দ্রুত অবক্ষয় হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে উপনিবেশিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য হচ্ছে উপনিবেশে কৃষিকাজের উন্নতি করা যাতে তাদের কলকারখানায় কাঁচামালের জন্য অন্য কোন দেশের ওপর নির্ভর করতে না হয়। এই সময়ে কৃষিতে বাণিজ্যিক পণ্যে যেমন নীল, আফিম

ইত্যাদিতে এবং আরও বিশেষ করে বাগিচা শিল্পে চা, কফি, রবার, ইত্যাদি পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়। শাসনব্যবস্থা, বিচারবিভাগ, শিক্ষা, সংস্কৃতিতে পরিবর্তন ঘটানো হয়। মাতৃভূমিতে উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়াতে আধুনিকীকরণ ও পাশ্চাত্য করণের উপর জোর দেওয়া হয়। দূর দূর অঞ্চল থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করতে ও শিল্পজাত দ্রব্য পৌঁছে দিতে রেললাইনের প্রবর্তন করা হয়।

এ যুগের মূল মন্ত্র ছিল উদারনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ। পুরানো শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন করে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হতে থাকে। এমন কথাও বলা হতে থাকে যে ভবিষ্যতে উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা পাবে এবং পূর্বাতন উপনিবেশ ও উপনিবেশিক রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক লাভজনক বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

তৃতীয় পর্যায় ঃ

উনিশ শতকের শেষ পর্বে বিশ্ব ধনতন্ত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে দ্রুত শিল্পায়ন ঘটে। পৃথিবীর বাজারে ব্রিটেনের একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান হয়। ইউরোপে শিল্পজাত পণ্যের বাজারের সঙ্কোচন হয়। অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক পুঁজিপতিদের হাতে প্রচুর বিনিয়োগযোগ্য মূলধন সঞ্চিত হয়। ফলে নতুন নতুন একচেটিয়া বিনিয়োগ ক্ষেত্র ও তৎসংলগ্ন প্রভাব মণ্ডল (exclusive sphere of influence) খুঁজে বার করার চেষ্টা হয়।

উপনিবেশগুলির ওপর এই সময় রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কঠোর করা হয়। আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্ব দৃঢ় করা হয় যাতে মাতৃভূমির পুঁজি বিনিয়োগের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যায়। স্বায়ত্ত্ব শাসনের কথা আর শোনা যায় না। বরং প্রজ্ঞহিতৈষী স্বৈরাচারের কথা বলা হয়। উপনিবেশের অধিবাসীরা যেন মাতৃভূমি রাষ্ট্রের সন্তান—তাদের সুখ দুঃখ দেখার দায়িত্ব মাতৃভূমির রাষ্ট্রেরই হাতে।

উপনিবেশবাদীর ক্রয় ক্ষমতা সীমিত থাকায় সেখানে শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। কোন মৌল শিল্পে লগ্নীকরণ করা হয় নি—কেবল সেই সব শিল্পের বিকাশ হয় সেগুলির বিদেশে বাজার ছিল। ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও রাজনৈতিক দমনের মুখে উপনিবেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে।

১.১.৫ উপনিবেশবাদের প্রকারভেদ—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ

প্রত্যক্ষ উপনিবেশবাদ ঃ প্রত্যক্ষ উপনিবেশবাদ সেইসব উপনিবেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে উপনিবেশিক রাষ্ট্রের (metropolis) পুরোপুরি রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইংলন্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল-এর পুরানো উপনিবেশগুলি উনিশ শতকে স্থাপিত আফ্রিকায় উপনিবেশগুলি এবং ফ্রান্স অধিকৃত ইন্দোচীন এবং ওলন্দাজ অধিকৃত ইন্দোনেশিয়া প্রত্যক্ষ উপনিবেশের উদাহরণ। সব চাইতে ভাল উদাহরণ ভারতবর্ষ। এখানে উপনিবেশবাদের সব বৈশিষ্ট্য ও পর্যায়গুলিই উপস্থিত ছিল। প্রত্যক্ষ উপনিবেশবাদের ব্যতিক্রমী উদাহরণ মিশর। আপাত দৃষ্টিতে মিশর ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ। এখানকার শাসক ছিলেন খেদিভ। কিন্তু খেদিভের ওপর ইংল্যান্ডের পুরোপুরি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুয়েজখাল আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের জন্য খুলে দিলে (১৮৬৯) এবং উনিশ শতকে ছয়ের দশকে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ শুরু হলে মিশরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দুটি উৎস তুলো চাষ ও সুয়েজখালের রাজস্ব ইংল্যান্ডের পুঁজিপতিবাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ১৮৮২ সালে মিশরকে ইংল্যান্ডের অধীন রাজ্য (protectorate) বলে ঘোষণা করা হয়।

পরোক্ষ উপনিবেশবাদ ঃ পরোক্ষ উপনিবেশে স্থানীয় শাসকদের রাজনৈতিক অধিকার বজায় থকে, কিন্তু অর্থনৈতিক অধিকার উপনিবেশিক দেশের হাতে চলে যায়। সাম্রাজ্যবাদীরা অনেক সময় ঐসব দেশে নিজেদের

'একচেটিয়া প্রভাব এলাকা' স্থাপন করে স্বদেশের পুঁজিপতিদের পরিবহন, শিল্প, খনি, বাগিচা অথবা ব্যাঙ্কিং এ মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ করে দেয়। পরোক্ষ উপনিবেশ স্থানীয় শাসকরা যত দুর্বল ও অপদার্থই হোক না কেন তাদের শাসন টিকিয়ে রাখা হয় কারণ পরোক্ষ উপনিবেশে প্রত্যক্ষ উপনিবেশের চেয়ে ব্যয় সাশ্রয়কারী (Cost effective)। পরোক্ষ উপনিবেশবাদ প্রধানত পৃথিবীর চারটি দেশে কায়েম হতে দেখা যায়—চীন, অটোমান সাম্রাজ্য, ল্যাটিন আমেরিকা ও ইয়ানে। চীন ও অটোমান সাম্রাজ্যের কথা একটু পরে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আপনি ল্যাটিন আমেরিকা ও ইরানের কথা সংক্ষেপে জেনে নিন।

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশ নিয়ে ল্যাটিন আমেরিকা। উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকে স্পেন বা পর্তুগালের কাছ থেকে এরা স্বাধীনতা লাভ করে। তখন দেশগুলির সংখ্যা ছিল নয়। পরে সীমান্ত পরিবর্তন করে এদের সংখ্যা হয় কুড়ি। ইতিহাসের পরিহাস যে এরা যে মুহূর্তে স্বাধীনতা লাভ করেছিল সে মুহূর্ত থেকেই নতুন সাম্রাজ্যবাদ এদের ওপর জগদ্দলের মত চেপে বসে। এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সবচেয়ে কাছের শিল্পোন্নত দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই মনরো নীতির (১৮২৩) দ্বারা ঘোষণা করে যে সে আমেরিকা মহাদেশে ইউরোপীয় দেশগুলির নতুন করে সাম্রাজ্যবিস্তারে বাধা দেবে। আমেরিকা নিজেই কিছুদিন আগে (১৭৭৬) ইংলন্ডের উপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা পেয়েছিল। ফলে তার পক্ষে অল্প সময়ের ব্যবধানে অন্যদেশে প্রত্যক্ষ উপনিবেশ স্থাপন করা দৃষ্টিকটু হত। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি ছিল খনিজ (সোনা, লোহা, ফসফেট, প্লাটিনাম, তেজস্ক্রিয় radioactive ধাতু ইত্যাদি) এবং কৃষিজ (আখ, কফি ইত্যাদি) সম্পদে সমৃদ্ধ। কিছু স্থানীয় সহযোগী ব্যক্তির সাহায্যে (Compradors) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূলধনী শ্রেণী দক্ষিণ আমেরিকার খনি ও কৃষিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে এবং রেলপথ স্থাপন করে ঐ সমস্ত সম্পদ আহরণ করতে থাকে। এইভাবে ল্যাটিন আমেরিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরোক্ষ উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

ইরান—মধ্যযুগে ইরান (আগের নাম পারস্য) অটোমান সাম্রাজ্যের যতই সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত ছিল। ষোল শতকে ইউরোপীয় বণিকরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সেখানে এলে ইরানীরা তাদের অভ্যর্থনা জানায়। উনিশ শতকে রাশিয়ার সাম্রাজ্য ইরানের সীমান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত হলে ইংলন্ড তার ভারতবর্ষের উপনিবেশের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। রাশিয়া ও ইংলণ্ডের পারস্পরিক রেষারেষি কাজে লাগিয়ে ইরান তার রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা বজায় রাখতে সফল হয়। কিন্তু ইরানের অর্থনীতি এই দুই শিল্পোন্নত দেশের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এইভাবে ইরানে পরোক্ষ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ওপরের আলোচনা থেকে আপনি উপনিবেশবাদ কথাটির অর্থ, বৈশিষ্ট্য, উপনিবেশবাদের পর্যায় ও প্রকার সম্পর্কে ধারণা করতে পেরেছেন। এও জেনেছেন যে উপনিবেশবাদের কথাটি সাধারণভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্থে উপনিবেশ বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু ঐ সময় পুরানো উপনিবেশগুলিতেও উপনিবেশবাদের সব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়।

১.১.৬উপনিবেশ বিস্তারের ধারা

আপনারা হবসন ও লেনিনের দেওয়া উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে পড়েছেন। ঐসব অভিমাত গুরুত্বপূর্ণ হলেও উপনিবেশ বিস্তারের সম্পূর্ণ কারণ বলে অনেকেই মনে করেন না। শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ, শিল্পজাত পণ্যের বাজার বা উদ্বৃত্ত পুঁজির বিনিয়োগের তাগিদই যদি উপনিবেশ বিস্তারের কারণ হয় তবে, অনেক ঐতিহাসিক প্রশ্ন করেন, উনিশ শতকের ইউরোপীয় জনমত অনেক ক্ষেত্রে কেন উপনিবেশ বিরোধী মনোভাব পোষণ করত। ঐ শতকের একটু আগে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ আমেরিকার তেরোটি উপনিবেশের স্বাধীনতা ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি হল তথাকথিত সুবিধার চেয়ে উপনিবেশের বোঝা অনেক

ভারী। বেন্থাম ফ্রান্সকে তার উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দেবার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। কবডেন অবাধ বাণিজ্য ও সব বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধার অবসান চেয়েছিলেন। ১৮৬১ সালে ফ্রান্স অবাধ বাণিজ্যের জন্য তার উপনিবেশের সব দরজা খুলে দিয়েছিলেন। গ্ল্যাডস্টোন আশা করেছিলেন ইংলন্ড তার উপনিবেশগুলিকে অচিরেই স্বাধীনতা দেবে। ডিসরেলিও অনেকদিন পর্যন্ত এইমত সমর্থন করেন। হবসন লেনিন ধনতান্ত্রিক উদ্বৃত্ত মূলধনের যে যুক্তি দেখিয়েছেন, ডেভিড টমসন যাকে খণ্ডন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ফ্রান্স, ইংলন্ড তাদের উদ্বৃত্ত পুঁজি উপনিবেশে বিনিয়োগ না করে সিংহভাগই ইউরোপে বা আমেরিকায় বিনিয়োগ করেছে। ফ্রান্স রাশিয়াতে যে অর্থ বিনিয়োগ করেছিল তার পরিমাণ ছিল অন্যান্য সমস্ত উপনিবেশে বিনিয়োগের তুলনায় দ্বিগুণ। ডেভিড টমসন তাই বলেছেন উপনিবেশ বিস্তারের পিছনে অর্থনৈতিক কারণের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণের সহাবস্থান ছিল।

উনিশ শতকে সাতের দশক থেকে ইউরোপের অনেক দেশে বুদ্ধিজীবী, অর্থনীতিবিদ, দেশপ্রেমিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদরা ছোট ছোট গোষ্ঠী করে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করার জন্য কোনো দেশ সাম্রাজ্যবাদী হবে কি না হবে অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করত ঐসব গোষ্ঠীর তৎপরতার ওপর। ঐসব ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক ছিল না। বেলজিয়মে উদ্যোগ নিয়েছিলেন স্বয়ং সেখানকার রাজা দ্বিতীয় লিয়পোল্ড। ইংলন্ড ও জার্মানিতে রক্ষণশীল দল সাম্রাজ্য বিস্তারে আগ্রহী ছিল। ইংলন্ডে চরমপন্থী মতাদর্শী যোশেফ চেম্বারলেন ও উদারপন্থী লর্ড রোজবেরী রক্ষণশীলদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। ফ্রান্সের জুল ফেরী (Jules Fery) এবং লিয়ঁ গামবেটার (Leon Gambetta) মত চরমপন্থী প্রজাতন্ত্রীরা সাম্রাজ্য বিস্তারে সক্রিয় ভুমিকা নিয়েছিলেন। ইটালিতে এসেছিলেন উদারপন্থী নেতা ডেপ্রেটিস (Depretis) এবং ফ্রান্সসেসকো ক্রিসপি (Francesco Crispi)। রাশিয়ার ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব নিয়েছিল সামরিক নেতা ও আমলা শ্রেণী।

উপনিবেশ বিস্তারে খ্রীস্টান মিশনারিদের বিশেষ ভুমিকা ছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন স্কটল্যান্ডের অধিবাসী ডেভিড লিভিংস্টোন। লন্ডন মিশনারি সোসাইটি তাঁকে আফ্রিকা পাঠিয়েছিল। কিন্তু ধর্মপ্রচারের চেয়েও তাঁর বেশি আগ্রহ ছিল বাণিজ্য বিস্তারে ও দুঃসাহসিক অভিযানে। নীল নদের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে তিনি কিছুদিনের জন্য পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। তখন তাঁকে খুঁজে বার করতে পাঠানো হয়েছিল স্ট্যানলিকে। স্ট্যানলি তাঁকে ট্যাঙ্গানাইকা হ্রদের উপকূলে খুঁজে পান। ধর্মপ্রচারে ইংলন্ডের চেয়েও এগিয়ে ছিল ফ্রান্স। তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের সময় প্রায় চল্লিশ হাজার ফরাসি মিশনারি আফ্রিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশ বিস্তারেও সাহায্য করে। ফরাসী মিশনারী কার্ডিনাল লাভেজারী (Cardinal Lavegeri) আলজেরিয়ায় Society of African Mission গঠন করেন এবং আলজেরিয়া থেকে টিউনিসিয়ায় তার কর্মক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করেন। টিউনিসিয়ার ফরাসী আধিপত্য স্থাপনে তাঁর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চীনে দুজন জার্মান জেসুইট ধর্মপ্রচারক নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে জার্মানি ১৮৯৭ সালে কিয়াওচাও বন্দর দখল করে নেয়।

ইউরোপে উনিশ শতকের শেষ অর্ধে সামরিক সংঘাতের প্রবল সম্ভাবনা ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নৌঘাঁটি স্থাপন করে সামরিক সুবিধা লাভের জন্যও উপনিবেশ বিস্তার প্রয়োজনীয় ছিল। তা ছাড়া উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার চাপ এড়াতে (জার্মানি ও ইটালির ক্ষেত্রে) অথবা জনসংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য (ফ্রান্সের ক্ষেত্রে) বিভিন্ন দেশ উপনিবেশ বিস্তারে সক্রিয় হয়।

সব শেষে উপনিবেশ বিস্তারে দক্ষ প্রশাসন ও সৈনিকদের ভূমিকার উল্লেখ করতে হয়। তাঁরা আফ্রিকার বহুদেশে জটপাকানো প্রশাসনিক অবস্থা থেকে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এগিয়ে এসেছিলেন। এদের মধ্যে মিশরে

লর্ড ক্রোমার, দক্ষিণ আফ্রিকার লর্ড মিলনার এবং জার্মান পূর্ব আফ্রিকায় লর্ড পিটার্সের নাম উল্লেখযোগ্য। এই ধরনের মানুষ ছাড়া আফ্রিকায় ইউরোপীয় উপনিবেশগুলি সংহত করা অসম্ভব ছিল।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে উনিশ শতকের শেষ অর্ধে উপনিবেশ বিস্তারের প্রেরণার উৎস ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্তমান ছিল। অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বা অন্য কোন একটি কারণে উপনিবেশ স্থাপিত হয়নি।

১.১.৭উপনিবেশ স্থাপনের নতুন প্রচেষ্টা

আপনার জানেন পনেরো শতকের শেষে ভৌগোলিক আবিষ্কারের পর (কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার, ১৪৯২, ভাস্কো-দা-গামার জলপথে ভারত আগমন, ১৪৯৮) বহির্বিশ্বে ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনের সূচনা হয়। স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইংলন্ড, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশ উপনিবেশ বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। এই সব উপনিবেশ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে প্রায় তিনশ বছর ধরে বিরোধ চলে। আঠারো শতকের শেষভাগে ইংলন্ড আমেরিকায় তার তেরোটি উপনিবেশ হারায়, ১৮১৫ সালে পর্তুগাল ব্রাজিল হারায়। এই সব ঘটনাকে ইউরোপীয় চিন্তাবিদরা অনেক ক্ষেত্রেই স্বাগত জানিয়েছিলেন। আপনারা ইতিমধ্যেই অ্যাডাম স্মিথ বা বেন্থামের মতামত জেনেছেন। আপনারা এও পড়েছেন যে উনিশ শতকের শেষ পর্বে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে উপনিবেশ বিস্তারের এক বিশেষ তাড়না দেখা যায়। ইতিহাসে এই সময়ের উপনিবেশ বিস্তারই উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ নামে চিহ্নিত হয়েছে। এই সময় প্রধানত দুটি মহাদেশে এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন নিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়। নীচে এই দুই অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

১৮৭০ সালে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্স আলসেস লোরেন হারালে বিসমার্ক ফ্রান্সকে আলসেস লোরেন হারানোর ব্যথা ভুলানোর জন্য আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনে উপস্থাপিত করেন। ফ্রান্স আলজিরিয়া দখল করে এবং বিসমার্কের প্ররোচনায় টিউনিসিয়ার দিকে এগিয়ে যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ কমাতে এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদা বাড়াতে ইটালিও আফ্রিকার উত্তর উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করতে চেয়েছিল। সিসিলি থেকে টিউনিসিয়ার দূরত্ব ১০০ মাইলেরও কম। টিউনিসিয়ার ফ্রান্সের উপনিবেশ সম্প্রসারিত হলে ফ্রান্স ও ইটালির মধ্যে বিরোধ বাধে।

বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে অভ্যন্তর অন্বেষণের জন্য একটি সমিতি গঠন করেন (International African Association) এবং স্ট্যানলিকে (H. M. Stanley) কঙ্গো অঞ্চল অনুসন্ধানের জন্য পাঠান। কয়েক বছর অভিযান চালিয়ে স্ট্যানলি কঙ্গোর স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে চুক্তি করে ঐ অঞ্চলের বিরাট এলাকায় বেলজিয়ামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। পনের শতক থেকেই কঙ্গো নদীর মোহনার কাছে আঙ্গোলায় পর্তুগালের একটা উপনিবেশ ছিল। পর্তুগাল ইংলন্ডের সহয়তায় বেলজিয়ামের উপনিবেশ বিস্তারের বিরোধিতা করে। ফ্রান্স কঙ্গো নদীর উত্তরে ক্রান্তীয় অঞ্চলে উপনিবেশ বিস্তারে আগ্রহী ছিল। জার্মানি চাইছিল আর একটু উত্তরে ক্যামেরুনে উপনিবেশ গড়তে। এই অবস্থায় লিওপোল্ড কঙ্গো সমস্যার সমাধানের জন্য জার্মানি ও ফ্রান্সের সহায়তা প্রার্থনা করেন। বিসমার্ক ও জুলেফেরীর (ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী) চেষ্টায় ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে বার্লিনে ইউরোপের সবকটি প্রধান প্রধান দেশ এক আন্তর্জাতিক সমাবেশে মিলিত হয়। ১৮৮৫ সালে স্বাক্ষরিত বার্লিন চুক্তিতে লিওপোল্ডকে কঙ্গোয় সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়। বার্লিন চুক্তি কেবল কঙ্গো সমস্যার সমাধানই নয়, ভবিষ্যতে আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনের জন্য কয়েকটি নীতি ঘোষণা করে। স্থির হয় ভবিষ্যতে ইউরোপের একটি রাষ্ট্র আফ্রিকার কোন অঞ্চল

দখল করলে তা যথাযথভাবে অন্য রাষ্ট্রকে জানিয়ে দিতে হবে এবং সেই অঞ্চলটি তার প্রভাবাধীন এলাকা বলে স্বীকৃত হবে। বার্লিন সমাবেশে যে নীতি গৃহীত হয় তাতে আফ্রিকাকে শান্তিপূর্ণভাবে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বণ্টন করে নেওয়ার সুযোগ এনে দেয়।

১৮৮৫ সালের পরের দশকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি আফ্রিকার অভ্যন্তর অনুসন্ধানের জন্য এবং সেখানকার সম্পদ আহরণের জন্য বেলজিয়ামের অনুকরণে চার্টার্ড কোম্পানি গঠন করে। কোম্পানিগুলি আফ্রিকার উপনিবেশ বিস্তারে পথিকৃৎ ছিল। জার্মানি দ্রুত টোগোল্যান্ড, ক্যামেরুণ, জার্মান দক্ষিণ আফ্রিকা ও জার্মান পূর্ব আফ্রিকা দখল করে দৃঢ়ভাবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ফ্রান্স ইতিপূর্বেই আলজিরিয়া ও টিউনিসিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এখন ডাহোমি দখল করে এবং আলজিরিয়া থেকে অগ্রসর হয়ে সেনেগাল, সিনি, আইভরিকোষ্ট প্রভৃতি স্থান দখল করে পশ্চিম আফ্রিকায় এক বিরাট অখণ্ড সাম্রাজ্য গঠন করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া কঙ্গোর উত্তরদিকে ফ্রান্স ফরাসী ক্রান্তীয় আফ্রিকা নামে উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৮৮৬ সালে পূর্ব উপকূলে মাদাগাস্কার তার অধিকারে আসে এবং সোমালিল্যান্ডের এক অংশেও তার দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮১৫ সালে ভিয়েনা চুক্তিতে ব্রিটেন হল্যান্ডের কাছ থেকে আফ্রিকার কেপ অঞ্চল অধিকার করেছিল। এখন কেপ থেকে ধীরে ধীরে উত্তরের দিকে এগিয়ে গিয়ে বেচুয়ানাল্যান্ড (১৮৮৫), রোডেসিয়া (১৮৮৯) এবং নিয়াদাল্যান্ড-এ (১৮৯৩) উপনিবেশ স্থাপন করে। এই ভাবে ভবিষ্যতে জার্মান পশ্চিম আফ্রিকা ও জার্মান পূর্ব-আফ্রিকার মিলনে বাধা সৃষ্টি করে। কেপ থেকে সিলি রোডসের ব্যক্তিগত চেষ্টায় ব্রিটেনের এই প্রসার সম্ভব হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় তখন ওলন্দাজ (ডাচ) উপনিবেশকারীদের বংশধর 'বুয়ান'রা অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট এবং ট্রান্সভ্যাল এ দুটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলেছিল। ১৮৯৯ সালের বুয়ার্স যুদ্ধে ব্রিটেন বুয়ার্সদের হারিয়ে দিয়ে এই রাজ্য দুটি দখল করে। এছাড়া ব্রিটেন পশ্চিম উপকূলে নাইজেরিয়া এবং ব্রিটিশ পূর্ব আফ্রিকা ও উগান্ডা নামে দুটি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।

ইটালির উপনিবেশ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষার কথা আপনারা আগেই জেনেছেন। টিউনিসিয়া দখল করে নিয়ে ফ্রান্স ইটালির আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করেছিল। এখন ইটালি ইরিট্রিয়া দখল করে এবং এর সঙ্গে আনমারা যুক্ত করে ইটালীয় পূর্ব আফ্রিকা নামে এক বিশাল উপনিবেশ স্থাপন করে। তাছাড়া পূর্ব উপকূলে সোমালিল্যান্ডের এক অংশে তার দখলে এসেছিল। স্বাধীন আবিসিনিয়ার ওপরও ইটালি রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৮৯৬ সালে আবিসিনিয়া ইটালিকে পরাজিত করলে ইটালি এই কর্তৃত্ব ত্যাগ করে।

১৮৭৫ সালে আফ্রিকার এক দশমাংশ অঞ্চলে ইউরোপীয় দেশগুলি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। দুই দশক পরে ১৮৯৫ সালে আফ্রিকার কেবল এক দশমাংশ উপনিবেশ এলাকার বাইরে থাকে। আফ্রিকার বণ্টন এত দ্রুত সম্পন্ন হয়েছিলযে উনিশ শতকের শেষে আফ্রিকায় মাত্র দুটি দেশ—আবিসিনিয়া ও লাইবেরিয়া স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছিল। আর তিনটি দেশ মরক্কো, লিবিয়া ও মিশর সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার শিকার হয়ে কোনভাবে নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষা করে চলছিল।

চীনে উপনিবেশ বিস্তারের ইতিহাস আপনারা Paper IV. Module XIII-XVI এ পড়েছেন। এখানে সেই কাহিনীই সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করা হল।

ইউরোপের সঙ্গে চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় ষোল শতকে। চীন পর্তুগীজ বণিকদের ম্যাকাও দ্বীপে বাণিজ্য করে অনুমতি দেয়। কিন্তু চীনের মাঞ্চুরাজারা বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য একেবারে পছন্দ করতেন না। তাঁরা বলতেন বিশাল চীনদেশে পাওয়া যায় না এমন কিছুই নেই। চীনাদের বাইরের কোন দ্রব্যের প্রয়োজন নেই। মাঞ্চুরাজারা বৈদেশিক বাণিজ্যের পথে নানা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতেন। বিদেশের বাজারে চীনের সিল্ক, চা, কাগজ, তামা, পারদ ইত্যাদি দ্রব্যর বিরাট কদর ছিল। আঠারো শতক থেকে চীনা সরকার ইউরোপীয়দের কান্টন শহরে সীমিত-বাণিজ্যের অধিকার দিয়েছিল। কিন্তু এই বাণিজ্য চীনা বণিকদের সঙ্গে স্থলপথে হত। শুল্ক ফাঁকি দেবে ভয়ে

জলপথে নয়। চীনা রাজকর্মচারীরাও সরাসরি যুক্ত হতে পারতেন না। সম্রাটের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে বিদেশীদের চৈনিক কায়দায় হাঁটু গেড়ে, মাটিতে কপাল স্পর্শ করে আবেদন জানাতে হত।

চীনের বিশালায়াতন বাজারের দিকে শিল্প বিপ্লবোত্তর ইংলন্ডের স্বভাবতই লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। বাণিজ্যিক পুঁজিপতি ও শিল্প পুঁজিপতি উভয় ধরনের লোকের কাছেই চীনের রপ্তানী দ্রব্যের চাহিদা ছিল। কিন্তু চীনের কাছে বিদেশী দ্রব্যের কদর না থাকায় বিদেশী বণিকদের চীনা দ্রব্যের সোনা-রুপো দিয়ে দাম মেটাতে হত। ইংল্যান্ডের পক্ষে এত সোনা রুপো পাঠানো সম্ভব ছিল না। তাই ইংলন্ড ভারতে আফিম উৎপন্ন করে গোপনে চীনের বাজারে বিক্রি শুরু করে। ধীরে ধীরে চীনারা আফিম খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং প্রচুর আফিম চোরা পথে চীনে প্রবেশ করে। এবারে বিনিময়ে চীন থেকে প্রচুর রুপো ক্রমাগত বিদেশে চলে যেতে থাকে। চীনের আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয়। চীনা সম্রাট রাজকর্মচারী লিনকে বে-আইনি ব্যাবসা বন্ধ করার জন্য কান্টনে পাঠান (১৮৩৯)। লিন বন্দরের জাহাজের সব আফিম ধ্বংস করে ইংলন্ডের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করে দেন ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির সব কর্মচারীকে চীন থেকে তাড়িয়ে দেন। এই সময় ইংলন্ডের সরকার তাদের দেশের ব্যবসায়ীদের স্বার্থ দেখতে এগিয়ে আসে এবং চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইতিহাসে এই যুদ্ধ প্রথম আফিম যুদ্ধ নামে পরিচিত। যুদ্ধে চীন পরাজিত হলে নানকিং-এর সন্ধি (১৮৪২) স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধির শর্ত অনুসারে চীন ইংরেজদের পাঁচটি বন্দরে ব্যাবসা করার অধিকার দেয় এবং হংকং ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়। উপরন্তু মোটা অঙ্কের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। ইংরেজদের দেখাদেখি ফ্রান্স ও আমেরিকা বাণিজ্যের সুবিধা দাবি করে। চীন ভয় পেয়ে নতুন করে বিরোধ এড়াতে ফ্রান্স ও আমেরিকাকে ইংলন্ডের অনুরূপ বাণিজ্যিক সুবিধা দেয়। চুক্তিতে বলা হয়েছিল শুল্কের হার পাঁচ শতাংশ হারে হবে এবং ভবিষ্যতে বাড়ানো যাবে না। চুক্তিগুলি অসম চুক্তি (unequal treaties) নামে পরিচিত। কেননা বিদেশীরা বাণিজ্য ছাড়াও অনেক বাড়তি সুবিধা পেয়েছিল। চীনের মাটিতে অপরাধ করলে বিদেশীদের চীনের আইন অনুসারে বা চীনের আদালতে বিচার হবে না। বিচার হবে অপরাধকারীর দেশের আইন অনুসারে। এগুলি অতিরাষ্ট্রিক অধিকার (extra-territorial rights)। চীনের সার্বভৌম ক্ষমতা খর্বিত হল। আফিম ব্যবসা বে আইনি ঘোষিত হলেও আফিম পাচার বন্ধ হয় নি। শুল্কহার নির্দিষ্ট হওয়ায় চীনের বাজার বিদেশী শিল্পপণ্যে ছেয়ে গেল। চীনের কুটির শিল্প ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকল এবং চীন আধা উপনিবেশে পরিণত হতে চলল।

চীনে আফিম আমদানি বে-আইনি ঘোষিত হলেও অস্ত্রসজ্জিত জাহাজে আফিম আমদানি হতেই থাকে। চীন ইংলন্ড ও ফ্রান্সের বাণিজ্যতরীকে বিশেষ নদীপথ ব্যবহার করতে বাধ্য করতে চাইলে দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ শুরু হয় (১৮৫৮)। এক ফরাসী ক্যাথলিক পাদরী চীন বিরোধী কাজ করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ফ্রান্স এর প্রতিবাদ করে এবং ইংলন্ডের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করে। তিয়েনমিনের সন্ধিতে (১৮৬০) যুদ্ধ শেষ হলে চীন বিদেশীদের আরও এগারোটি বন্দর বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করে, আমদানি করা বিদেশী দ্রব্যের ওপর শতকরা আড়াই (২½%) ভাগের বেশি শুল্ক বসবে না প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বিদেশীরা চীনে অবাধ চলাফেরার অধিকার পায়। তাছাড়া চীনের ওপর ক্ষতিপূরণের বিরাট বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়।

মাঞ্চুরাজারা বুঝতে পেরেছিল রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে হলে সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ এবং পশ্চিমী শিক্ষা ও প্রযুক্তি কৌশল আয়ত্তের প্রয়োজন আছে। তারা প্রশাসনিক সংস্কারে হাত দিল এবং পশ্চিমী শিক্ষার বিস্তার এবং আধুনিক শিল্প স্থাপন শুরু করল। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদেশীরাই শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করে। পুঁজিবাদী দেশগুলো বুঝতে পেরেছিল যে চীনের মত বিরাট দেশে প্রত্যক্ষ উপনিবেশ স্থাপনের চেয়ে দুর্বল রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখাই বেশী লাভজনক। ইংলন্ড, ফ্রান্সের পর রাশিয়া জার্মানি জাপান চীনে নিজেদের একচেটিয়া আধিপত্যের এলাকা (sphere of influence) দখল করল। এইভাবে উনিশ শতকের শেষ দশকগুলিতে চীনা তরমুজ ভাগ করে নেওয়ার সময় এল। চীন পুঁজিবাদী দেশের পরোক্ষ উপনিবেশে পরিণত হল।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় কারণেই রাশিয়া সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ বেছে নেয়। বহির্বিশ্বে পৌঁছানোর জন্য রাশিয়ার চিরাচরিত নীতি ছিল দুর্বল তুরস্ক সাম্রাজ্যের কৃষ্ণসাগর তীরবর্তী রাজ্যগ্রাস করা। কিন্তু এই নীতি বাধাপ্রাপ্ত হয় ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ে (১৮৫৬)। এরপর থেকে রাশিয়া মধ্য এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যে রাজ্য বিস্তারে মন দেয়।

মধ্য এশিয়ার তুর্কীস্তান নামেমাত্র চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তুর্কীস্তান থেকে যাযাবর দস্যুরা প্রায়ই রাশিয়ার সীমান্তবর্তী প্রদেশে লুটপাট করতে আসত। এদের শায়েস্তা করার জন্য রাশিয়া ১৮৬৪ সালে তাসখন্দ দখল করে। এর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সমরখন্দ ও খিভা দখল করে। এইভাবে সমস্ত তুর্কীস্তান রাশিয়ার অধিকারে চলে আসে (১৮৭৩)। মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার সাম্রাজ্য পারস্য ও আফগানিস্তানের সীমান্তে পৌঁছে যায়। ফলে ইংলন্ড ভারতের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে।

আফিম যুদ্ধের পর পশ্চিমী দেশগুলি যখন পুব দিক থেকে চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছিল তখন রাশিয়া উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে চীনকে গ্রাস করতে এগিয়ে যায়। আমুর নদী বরাবর অগ্রসর হয়ে ১৮৬০ সালে রাশিয়া জাপান সাগর উপকূলে ভ্লাডিভস্টক দখল করে। নয়ের দশকে ট্রান্সসাইবেরিয়ান রেলপথের নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে ঐ রেলপথ ভ্লাডিভস্টক পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়। ভ্লাডিভস্টক দূর প্রাচ্যে রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বন্দরে পরিণত হয়।

চীন-জাপান যুদ্ধে (১৮৯৪-৯৫) চীনকে পরাজিত করে জাপান একতরফাভাবে চীনের রাজ্য গ্রাস করতে থাকলে রাশিয়া ও ইংলন্ড যৌথভাবে প্রতিবাদ জানায় এবং রাশিয়া জাপানকে বঞ্চিত করে লিয়াওটাঙ উপদ্বীপ দখল করে। এখানকার বন্দর পেটি আর্থার নৌ-ঘাঁটি হিসাবে গড়ে ওঠে। লিয়াওটাঙ ছিনিয়ে নেওয়ায় এবং কোরিয়ায় রাশিয়ার প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় শঙ্কিত হয়ে জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। রুশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৫) রাশিয়া পরাজিত হয় এবং লিয়াও টাঙ উপদ্বীপ জাপানকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। রাশিয়ার এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার এখানেই থেমে যায়। এশিয়ার বাইরে রাশিয়ার সাম্রাজ্য ছিল না। এশিয়ায় অধিকৃত অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাজার রাশিয়ার শিল্প বিকাশের সহায়ক হয়েছিল।

১.১.৮ সারাংশ

উনিশ শতকের শেষে পশ্চিমের শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশ কর্তৃক আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপনিবেশ বিস্তার এক বিশ্ব ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এই ব্যবস্থায় উপনিবেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঔপনিবেশিক দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। উপনিবেশ বিস্তার অনেকক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণভাবে বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে হলেও শেষ পর্যন্ত শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করে এবং বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে।

১.১.৯ অনুশীলনী

১। উপনিবেশবাদ-এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২। উপনিবেশ বিস্তারের পর্যায়গুলি বিশ্লেষণ করুন।

৩। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি কিভাবে আফ্রিকাকে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিল।

৪। ল্যাটিন আমেরিকার উপনিবেশবাদ অন্যান্য উপনিবেশবাদ থেকে কি অর্থে পৃথক?

৫। রাশিয়ার উপনিবেশ বিস্তারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করুন।

৬। সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গে লেলিনের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।

১.১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। David Thomson—Europe since Nepoleon (1965)

২। V. I. Lenin—Imperialism, The Highest Stage of Capitalism (1916-ne wed. 1936).

৩। R. Palme Dutt—India Today (1970)

৪। সমরকুমার মল্লিক—নবরূপে ইউরোপ, ১৮৪৮-১৯১৯ (২০০২)।

৫। প্রফুল্ল চক্রবর্তী—ইউরোপের ইতিহাস (১৯৮৩)।

একক ২ □ বলকান জাতীয়তাবাদ

গঠন

২.২.০ উদ্দেশ্য

২.২.১ প্রস্তাবনা

২.২.২ বলকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

২.২.৩ বলকান জাতি-রাষ্ট্র গঠনের পর্যায়

(ক) সার্বিয়ার অভ্যুত্থান

(খ) গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম

(গ) ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী অধ্যায়

(ঘ) রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ ও বার্লিন চুক্তির পরবর্তী অধ্যায়

(ঙ) বলকান যুদ্ধের পটভূমিকা

(চ) প্রথম বলকান যুদ্ধ

(ছ) দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ

২.২.৪ বলকান জাতীয় জাগরণ ও জাতি-রাষ্ট্র গঠন।

(ক) সার্বিয়া

(খ) গ্রীস

(গ) রুমানিয়া

(ঘ) বুলগেরিয়া

২.২.৫ সারাংশ

২.২.৬ অনুশীলনী

২.২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

২.২.০ উদ্দেশ্য

বলকান উপদ্বীপ (Balkan Peninsula)—দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার একটি শিলাময় অঞ্চল। উত্তরে সাভা (Sava) ও ড্যানিউব (Danube) নদী থেকে দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। বলকান নামটি এসেছে বলকান পাহাড়ের নাম থেকে। এটি বড় পাহাড় নয়, শিলাশ্রেণী মাত্র। উত্তরে ড্যানিউব থেকে শুরু হয়ে পূর্বদিকে বুলগেরিয়া অঞ্চল ঘুরে চলে গেছে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত। এই শিলাশ্রেণীর সর্বোচ্চ শিখর হল ইউম্‌রুকচল (Yumrukchal—৭, ৭৮৬ ফুট। এই উপদ্বীপকে কখনো কখনো ঈলিরিয়ান উপদ্বীপ (Illyrian Pennisula) বলা হয়। এর পূর্বদিকে আছে

কৃষ্ণসাগর, মারমারা (Marmara Sea) সাগর এবং ইজিয়ান সাগর (Aegian Sea)। এর পশ্চিমে আছে অড্রিয়াটিক সাগর (Adriatic) ও আইওনীয় সাগর। এর আয়তন ২,০০,০০০ বর্গমাইল। এর জনসংখ্যা ৩২,০০০,০০০। প্রাচীনকালে এই অঞ্চল রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ৪০০ বছর এই অঞ্চল তুর্কী সাম্রাজ্যের অংশ ছিল।

২.২.১ প্রস্তাবনা

দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের যে অংশটি ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করে উপদ্বীপ সৃষ্টি করেছে ঐ অঞ্চলকে বলকান উপদ্বীপ বলে। (ম্যাপ দেখুন) উনিশ শতকের শুরুতে বলকান উপদ্বীপের অধিকাংশ দেশ যথা—গ্রীস, সার্বিয়া, হারজেগোভিনা, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, রুমেনিয়া, তুরস্ক ও অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সতেরো শতকে হাঙ্গেরীর বুডাপেষ্ট থেকে শুরু করে সমর বলকান উপদ্বীপ, আনাটোলিয়া (আধুনিক তুরস্ক), ককেশাস অঞ্চল, আর্মেনিয়া, সিরিয়া, আরবদেশ এবং উত্তর আফ্রিকায় মরোক্কো, টিউনিসিয়া, লিবিয়া ও মিশর পর্যন্ত তুরস্ক সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সতেরো শতকের শেষ বছর থেকেই (১৬৯৯) তুরস্ক সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হতে থাকে। অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবুর্গ সম্রাটরা হাঙ্গেরীর বুডাপেষ্ট, ট্রানসিলভ্যানিয়া প্রভৃতি স্থান পুনর্দখল করে। পরের শতকে রাশিয়া রুমানিয়ার বেসারাবিয়া কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম উপকূলের কিছু অংশ এবং ককেশাস ও আর্মেনিয়ার অংশ বিশেষ দখল করে। মিশর স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায়। মরোক্কো, টিউনিসিয়া, লিবিয়া করদ রাজ্যের (tributary state) মর্যাদা পেলেও নিজেদের স্বাধীন মনে করে। অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও দুর্ধর্ষ পার্বত্যজাতি অধ্যুষিত আলবেনিয়া থেকে সুলতানরা কখনো কর আদায় করতে পারেনি। তুরস্ক কর্তৃক শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেও আলবেনিয়া প্রায় স্বাধীন ছিল।

ফরাসী বিপ্লবের পরোক্ষ ফল এবং নেপোলিয়নের শাসনসংস্কারের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে উনিশ শতকে ইউরোপে জাতিরাষ্ট্র গঠনের প্রবণতা দেখা দেয়। জাতিরাষ্ট্র বলতে বোঝাত পৃথক পৃথক ভাষা ও জাতির ভিত্তিতে (ethnicity) পৃথক রাষ্ট্রগঠন। জাতিরাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে প্রবল আকার ধারণ করে এবং ১৮৭০ সালে জার্মানি ও ইটালির ঐক্যবদ্ধ জাতি-রাষ্ট্র গঠন সম্পূর্ণ হয়। বলকান অঞ্চলের দেশগুলিতেও জাতিরাষ্ট্র গঠনের ঢেউ পৌঁছায়। এই পটভূমিতেই বলকান জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত।

অবশ্য বলকান জাতীয়তাবাদের একটি অন্যদিকও ছিল। দীর্ঘদিন তুর্কীশাসনে থেকে বলকান অঞ্চলের খ্রীষ্টান মানুষরা একটা বৈষম্যের মধ্যে দিন কাটাছিল। অটোমান সাম্রাজ্যে মুসলমান প্রজারা যে সুযোগ সুবিধা পেত তা খ্রীষ্টান প্রজারা অনেক সময়েই পেত না। তাছাড়া সেখানকার অমুসলমান প্রজারা কোথাও কোথাও মুসলমান প্রজাদের থেকে অনেক বেশি কর প্রদান করত। ফলে তারা দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের খ্রীষ্টান ধর্ম ও পৃথক ঐতিহ্যের ভিত্তিতে মূলতঃ স্ল্যাভ জাতিসত্তার উপকরণগুলিকে নিয়ে পৃথক পৃথক জাতীয় অস্তিত্ব গড়ে তুলতে চাইছিল। মনে রাখতে হবে যে ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের শাসনসংস্কার যেভাবে জার্মানি ও ইটালির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে প্রেরণা জুগিয়েছিল সেভাবে বলকান রাষ্ট্রগুলিকে করেনি। সেখানে তাদের জাতীয়তাবাদের উৎস ছিল নিজেদের স্ল্যাভ ঐতিহ্য ও বিশিষ্টতা। অটোমান সাম্রাজ্য যতই দুর্বল হয়েছে ততই তারা সেই সাম্রাজ্য থেকে পৃথক হয়ে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গড়ে তোলার দিকে মন দিয়েছে।

২.২.২বলকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

আয়তনে বিশাল হলেও উনিশ শতকে অটোমান সাম্রাজ্য রাজনৈতিক দিক থেকে ছিল খুবই দুর্বল। সুলতানরা ছিলেন অপদার্থ, দুর্নীতিগ্রস্ত ও সংস্কার বিমুখ। ইসলামীয় ধর্মীয় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত (theocratic) অটোমান সাম্রাজ্যে নানা জাতি, ভাষা ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষের বাস। বিভিন্ন ভাষাভাষি ও ধর্মীয় অধিবাসীদের মধ্যে মোটেই ঐক্য ছিল না।

শাসনশ্রেণী মুসলমান। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা (পাশা) কেন্দ্রের নির্দেশ না মেনে প্রায় স্বাধীনভাবে তুরস্কের বাছাই করা সৈন্যদের দ্বারা গঠিত **জানিসারি** (Janissery) দের সাহায্যে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তুরস্কের সেনাবাহিনীতে না ছিল শৃঙ্খলা, না ছিল আধুনিক অস্ত্রের যোগান।

তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগে ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করার চেষ্টা করে যায়। রাশিয়ায় কোন বন্দরই সারা বছর বরফমুক্ত ছিল না। রাশিয়া চাইছিল কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম উপকূল দখল করে নিয়ে বসফরাস ও ডার্ডানেলস প্রণালীর মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করতে। বলকান উপদ্বীপের অধিকাংশ লোক ছিল স্লাভ জাতি গোষ্ঠীভুক্ত ও গোঁড়া খ্রিষ্টান (Orthodox Christian or Greek Christian) ধর্মাবলম্বী। রাশিয়ানরাও ছিল স্লাভ জাতিভুক্ত ও গোঁড়া খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী। উনিশ শতকে রাশিয়া বলকান অঞ্চলে স্লাভ জাতীয়তাবাদের (Pan-slavism) পৃষ্ঠপোষকতা করে। উদ্দেশ্য ছিল নিজের প্রভাব বৃদ্ধি করা এবং তাঁবেদার রাষ্ট্র গঠন করে ঐসব দেশের মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরের তীরে পৌঁছানো।

হ্যাপসবুর্গ সাম্রাজ্যে নানা জাতি, ধর্ম ও ভাষাভাষি লোকের বাস। বলকান অঞ্চলে জাতিরাষ্ট্র গঠিত হলে হ্যাপসবুর্গ সাম্রাজ্যেও জাতিরাষ্ট্র গঠনের দাবি প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। তাই অস্ট্রিয়ার নীতি ছিল অটোমান সাম্রাজ্য অটুট রাখা, অবশ্য সুযোগ পেলে বসনিয়া, হারজেগোভিনা প্রভৃতি রাজ্যগুলি দখল করে নেওয়া, যাতে ভবিষ্যতে ঐক্যবদ্ধ সার্বরাষ্ট্র গঠিত হতে না পারে।

মিশর, সিরিয়া ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের সঙ্গে ইংলন্ড ও ফ্রান্স বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। ইংলন্ড ও ফ্রান্স উভয়েরই নীতি ছিল ভবিষ্যৎ আরব অঞ্চল গ্রাস করা। তা সত্ত্বেও উভয় দেশই অটোমান সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা বজায় রাখতে চাইত। ঐ অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করতে পারে। ১৮৬৯ সালে আন্তর্জাতিক নৌ-চলাচলের জন্য সুয়েজ খাল খুলে দিলে ইংলন্ডের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য ফ্রান্স ও ইংলন্ড বলকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত থাকতে পারে নি।

উনিশ শতকের প্রথম পর্বে প্রাশিয়া তুরস্কের ঘটনাবলী সম্পর্কে উদাসীন ছিল। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর এবং জার্মানির দ্রুত শিল্পবিকাশ হলে, বিশেষভাবে ১৮৭৮ সালে বার্লিন চুক্তির পর, অস্ট্রিয়ার মিত্র হিসাবে জার্মানি তুরস্ক সম্পর্কিত প্রশ্নে জড়িয়ে পড়ে। জার্মানির বাড়তি জনসংখ্যার বসবাস ও উদ্বৃত্ত পুঁজি বিনিয়োগের পক্ষে তুরস্ক সাম্রাজ্য ছিল প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। ১৯০৮ সালে জার্মানির সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম কনস্টানটিনপল ভ্রমণ করেন ও তুরস্কের সুলতানকে জার্মানির মিত্র হিসাবে ঘোষণা করেন।

বাড়তি জনসংখ্যার বসবাসের জন্য এবং পুঁজি বিনিয়োগের জন্য উনিশ শতকের অন্তিম লগ্নে ইতালি ও তুরস্কের রাজ্যগ্রাসের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে থাকে।

রাশিয়া মনে করত তুরস্ক দুর্বল, তার শাসক হলেন ইউরোপের রোগগ্রস্ত মানুষ (Sickman of Europe)। যে কোন সময়ে এই সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য। ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির উচিত তুরস্কের পতনের আগেই এর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা। তুরস্কের বিশেষ বিশেষ রাজ্যের প্রতি লোভ থাকলেও রাশিয়া ছাড়া অন্য বৃহৎরাষ্ট্র কেউই তুরস্কের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি চাইত না। তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এতই রেষারেষি ও বৈষম্য যে পশ্চিম ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি মনে করত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেয়ে দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার অধিকতর সহজ। তারা বলকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ইন্ধন যোগাত, কিন্তু কেউ চাইত না তুরস্ক-সাম্রাজ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়ুক। এই বৃহত্তর পটভূমি মনে রেখেই বলকান জাতীয়তাবাদের ইতিহাস পড়তে হবে।

বলকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। আমরা পর্যায়গুলি জেনে নিয়ে পৃথক জাতিরাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস পরে আলোচনা করব।

২.২.৩ বলকান জাতি-রাষ্ট্র গঠনের পর্যায়

(ক) প্রথম পর্যায় ঃ সার্বিয়ার বিদ্রোহ, ১৮০৪

বলকান জাতিগুলির মধ্যে সার্বিয়াই প্রথম তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তুরস্কের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা এবং রাশিয়ার আগ্রাসী নীতিতে উৎসাহিত হয়ে সার্বিয়া ১৮০৪ সালে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। **কারাজর্জ** নামে স্থানীয় মেষপালক এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। তুর্কী সৈন্য, **জানিসারি** (Janissery), বিদ্রোহ দমন করতে ব্যর্থ হয়। সার্বিয়ানরা সব তুর্কীদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। ১৮১৩ সালে তুরস্ক সার্বিয়া পুনর্দখল করে। কারাজর্জ হাঙ্গেরীতে পালিয়ে যান। ১৮১৫ সালে আর এক সার্বিয়ান নেতা **মিলোস ও ব্রোনোভিক** কারাজর্জের হত্যা ঘটিয়ে নিজে সার্বিয়ানদের নেতা হন এবং আবার তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। রাশিয়ার চাপে পড়ে তুরস্কের সুলতান সার্বিয়ানের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেয়, ওব্রোনোভিককে শাসন কর্তা বা পাশারূপে ঘোষণা করে। বেলগ্রেডে রাজধানী স্থাপিত হয়। সার্বিয়াই প্রথম বলকান রাজ্য যে তুরস্কের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পায়।

(খ) দ্বিতীয় পর্যায় ঃ গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম

বলকান জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ১৮২১ সালে গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা থেকে।

তুরস্কের শাসনাধীনে থাকলেও গ্রীকগণ নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। গ্রীসের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তুরস্ক অযথা হস্তক্ষেপ করত না। গ্রীকরা দাবি করত তারা প্রাচীন গ্রীকজাতির বংশধর। নিজেদের ধর্ম (গ্রীক খ্রিষ্টান বা গোঁড়া খ্রিষ্টান) ভাষা ও ঐতিহ্য নিয়ে গ্রীকদের গর্ব ছিল। উনিশ শতকে গ্রীক স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত হয় গ্রীক ভাষায় পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়ে। ভাষা আন্দোলনে দুজন গ্রীক কবি ও সাহিত্যিক অগ্রণী ভূমিকা নেন। তাঁরা হলেন **আডামানটিওস কোরেস** (Adamantios Koraes) **ও রীগাস ফেরাইওস** (Rhigas Pheraiios) তাঁরা উভয়েই ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন। ইটালি বা স্পেনের ধাঁচে রাজনৈতিক আন্দোলন করার জন্য রীগাস অনেক গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন।

গ্রীসের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করে **''হেটাইরিয়র ফিলিকে)''** (Hetairia Philike) নামে অন্য একটি গুপ্ত সমিতি। ক্রিমিয়া দ্বীপে গ্রীক বণিকরা আলেকজান্ডার ইম্পিলান্টি (Alexander Ipsilanti) নেতৃত্বে হেটাইরিয়া ফিলিকে (অর্থ Association of Friends বা সুহৃদ সমিতি) গঠন করে। তুরস্ক সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা গ্রীক বণিক ও উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ফিলিকের পৃষ্ঠপোষকতা করে। তুরস্কের কঠোর নীতির ফলে ফিলিকের আন্দোলন ব্যর্থ হয়। কিন্তু এই আন্দোলনের সূত্র ধরেই মোরিয়া দ্বীপে তুর্কী রাজকর্মচারী ও সৈন্যদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। প্রত্যুত্তরে, তুরস্ক বহু খ্রিস্টানকে নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং কনস্ট্যানটিনোপলের গ্রীক চার্চের প্রধান পুরোহিতকে কেটে জলে ভাসিয়ে দেয়।

ইউরোপে তখন রোমান্টিক ভাবধারার যুগ। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী গ্রীসের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তারা গভীর সহানুভূতিশীল। ফ্রান্স, ইংলন্ড প্রভৃতি দেশে প্রবল জনমত সরকারের ওপর এই মর্মে চাপ সৃষ্টি করল যে তারা যেন তুরস্কের প্রতি তাদের চিরাচরিত নীতি ত্যাগ করে এবং গ্রীকদের সাহায্যে এগিয়ে যায়। গ্রীক বণিকরা ইংলন্ডের ব্যাঙ্ক থেকে প্রচুর অর্থ ধার নিয়েছিল। তাই ইংলন্ডের স্বার্থ ছিল গ্রীকদের রক্ষা করা। নতুন বিদেশমন্ত্রী ক্যানিং গ্রীসে হস্তক্ষেপ করতে এগিয়ে গেলেন।

আসলে গ্রীকদের অভ্যুত্থান নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রজাগোষ্ঠীর মানুষের (Subject people) বিদ্রোহ অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর মেটারনিক সমর্থন করতেন না। কারণ তাতে

জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহকে সমর্থন করা হয়। বহুজাতিক রাষ্ট্র হিসাবে অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি তা করতে পারে না। তাছাড়া ইংল্যান্ড ও অস্ট্রিয়া উভয়ই রাশিয়ার সম্প্রসারণশীলতার ব্যাপারে সন্দিগ্ধ ও ঈর্ষাকাতর ছিল। ১৮২২ সালে যখন রাশিয়ার জার আলেকজান্ডার গ্রীকদের সমর্থনে অগ্রসর হলেন তখন অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর মেটারনিক ও ইংলন্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাসেলরির (Castlereagh) সম্মিলিত কূটনৈতিক কৌশলে তাঁর সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইউরোপের শক্তিগুলি নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। ইংলন্ডে হেলেনিজ্‌ম (Hellenism) বা গ্রীক সংস্কৃতি সম্বন্ধে স্পর্শকাতরতা ছিল। ইংরাজ কবি বায়রন (Byron) নিজে গিয়েছিলেন গ্রীকদের হয়ে যুদ্ধ করতে। রাশিয়াতে জার আলেকজান্ডারের উত্তরাধিকারী শাসক নিকোলাস গ্রীকদের সমর্থনে এগিয়ে আসতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। আর ১৮২২ সালের পর ইংল্যান্ডে ক্যাসেলরির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন উদারনৈতিক নেতা ক্যানিং। রাশিয়া চাইত না গ্রীকদের পরাজয় ঘটুক, ইংল্যান্ডও শেষ পর্যন্ত চাইত না গ্রীক সংস্কৃতির বিনাশ ঘটুক। ফ্রান্সেও আসতে আসতে গ্রীকদের সম্বন্ধে সহমর্মিতা গড়ে উঠেছিল। শুধু মেটারনিক মনে করতেন যে গ্রীকরা বিদ্রোহী—তাদের ভাগ্য তারাই রক্ষা করবে, অন্য কেউ নয়। প্রাশিয়াও এই মত পোষণ করত। কিন্তু ইউরোপীয় কোন শক্তির ওপর তুরস্ক একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করুক এটি কেউই চাইত না। এই অবস্থায় গ্রীক পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে।

১৮২৫ থেকে গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধের দ্রুত পটপরিবর্তন হতে থাকে। তুরস্কের সুলতানের অনুরোধে মিশরের প্রায় স্বাধীন শাসনকর্তা মেহমেত পাশা তুরস্কের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। মেহমেত আলির পুত্র ইব্রাহিম আলি মোরিয়া আক্রমণ করেন ও গ্রীকদের নৃশংসভাবে হত্যা করেন। এ অবস্থায় ইংলন্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া সম্মিলিতভাবে গ্রীসের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। তারা সুলতানকে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব দেন, কিন্তু মেহমেৎ আলির সাহায্য পেয়ে সুলতান এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তখন ইঙ্গ ফরাসী নৌ-বাহিনী তুর্কী নৌ-বাহিনীকে নাভারিনো (Navarino) এর যুদ্ধে বিধ্বস্ত করে (১৮২৭)। তুর্কী নৌ-বাহিনীর ধ্বংস ইংলন্ড ও ফ্রান্সের অভিপ্রেত ছিল না। ইংলন্ড ঐ ঘটনার জন্য তুরস্কের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে। ইংলন্ড, ফ্রান্স থমকে গেলে রাশিয়া এককভাবে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া দখল করে গ্রীসে প্রবেশ করে ও যুদ্ধ করতে করতে এড্রিয়ানোপল পর্যন্ত অগ্রসর হয়। তুরস্ক বাধ্য হয়ে **এড্রিয়ানোপল-এর সন্ধি (১৮২৯)** স্বাক্ষর করেন। সন্ধির শর্ত অনুসারে তুরস্ক গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। ব্যাভেরিয়ার রাজকুমার প্রিন্স অটো গ্রীসের রাজা হলেন। রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে মোলডাভিয়াও ওয়ালাচিয়া, প্রদেশ দুটি স্বায়ত্তশাসন লাভ করল। রাশিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যে অবাধ বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করল। ১৮৩০ সালের লন্ডন চুক্তিতে ইংলন্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া মিলিতভাবে গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকার করে ও স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ করে দেয়।

গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধ সর্বত্র বলকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করে।

(গ) ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী অধ্যায়

তুরস্ক সাম্রাজ্যের ক্রমিক অবক্ষয় এবং ঐ অঞ্চলে রাশিয়ার আগ্রাসী নীতি ক্রিমিয়ার যুদ্ধের মূল কারণ। যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল কিছুটা তুচ্ছ কারণে—জেরুজালেমে খ্রিস্টানদের পবিত্র স্থানগুলির উপর কর্তৃত্ব নিয়ে রোমান ক্যাথলিক ও গোঁড়া খ্রিস্টান (Orthodox Christian বা Greek Christian) যাজকদের মধ্যে বিরোধ থেকে। ১৭৪০ সালের এক চুক্তিতে তুরস্ক ফ্রান্সকে রোমান ক্যাথলিকদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়, অন্যদিকে ১৭৭৪ সালের কুচুক-কাইনার্ডজি চুক্তিতে রাশিয়া গোঁড়া খ্রিস্টানদের অভিভাবকত্বের অধিকার পায়। জেরুজালেমের পবিত্র স্থানগুলি নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজের দেশের লোকেদের মন জয় করার জন্য ক্যাথলিকদের সাহায্যে এগিয়ে যান। অন্যদিকে রাশিয়া গোঁড়া খ্রিস্টানদের পক্ষ অবলম্বন করে। সুলতান উভয়পক্ষকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিছুটা চাতুরীর আশ্রয় নেন—কিন্তু কোন পক্ষকেই শেষ পর্যন্ত খুশী করতে পারেন নি।

রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস মনে করতেন তুরস্ক ইউরোপের 'রুগ্ন ব্যাক্তি' (Sickman of Europe)। তিনি বার বার ইংলন্ডকে বোঝাতে চাইছিলেন যে তুরস্কের পতন অনিবার্য ও আসন্ন। এই অবস্থায় ইংলন্ড ও রাশিয়ার উচিত তুরস্কের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার আসা। নিকোলাস ইংলন্ড পরিভ্রমণে যান ইংলন্ডের মনোভাব জানার জন্য। কিন্তু ইংলন্ড তার মনোভাব স্পষ্ট করে জানায় নি। এই সময়ে আরও যে কূটনৈতিক আলোচনা হয়েছিল তাতেও ইংলন্ড তার নীতি পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করে নি। জেরুজালেমে খ্রিষ্টান যাজকদের বিরোধ, তৃতীয় নেপোলিয়নের স্বার্থচিন্তা, ইংলন্ড ও রাশিয়ার ভুল বোঝাবুঝি ক্রিমিয়ার যুদ্ধের জন্য দায়ী।

রাশিয়া মোলডাভিয়া ওয়ালাচিয়া দখল করলে অস্ট্রিয়ার উদ্যোগে ইংলন্ড, ফ্রান্স ও প্রাশিয়া ভিয়েনায় মিলিত হয়ে তুরস্ককে সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু প্রস্তাব পাঠায় (Viena Note)। তুরস্ক ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে যুদ্ধ ঘোষণা করে (১৮৫৩)। যুদ্ধ প্রধানত ক্রিমিয়া দ্বীপে সীমাবদ্ধ থাকে। ইংলন্ড, ফ্রান্স তুরস্কের পক্ষে যোগদান করে। পরে সার্ডিনিয়া -পীডমন্টও মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। সেবাস্তপোল-এ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও দীর্ঘ অবরোধের পর রাশিয়া সেবাস্তপোল ছেড়ে চলে যায়। যুদ্ধ, কলেরা, টাইফাস প্রভৃতি মহামারী এবং রাশিয়ার প্রচণ্ড শীতে আট লক্ষাধিক সৈন্য নিহত হয়েছিল। প্যারিসের শান্তি চুক্তিতে (১৮৫৬) ক্রিমিয়া যুদ্ধের অবসান হয়।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফল হয়েছিল সুদূর প্রসারী। আমরা এখানে প্যারিস চুক্তি বলকান জাতীয় আন্দোলনের ওপর যে প্রভাব ফেলেছিল সেই দিকটি নিয়েই আলোচনা করব।

প্যারিস চুক্তির শর্ত অনুসারে তুরস্ক মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া ফিরে পেল। প্রদেশ দুটি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করে। রাশিয়া বেসারাবিয়ার অংশবিশেষ তুরস্ককে ছেড়ে দিল এবং সার্বিয়ার ওপর অভিভাবকত্বের দাবী ত্যাগ করল। সার্বিয়ার স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আবার স্বীকার করে নেওয়া হল। তুরস্ক তার খ্রিস্টান প্রজাদের প্রতি সুবিচার ও জাতিধর্ম নির্বিশেষে অবস্থার উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিল। অন্যদিকে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি (ফ্রান্স, ইংলন্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া) তুরস্কের খ্রিস্টান প্রজাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়। একটি পৃথক চুক্তির দ্বারা ইংলন্ড, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়।

(ঘ) রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ ও বার্লিন চুক্তির পরবর্তী অধ্যায়

প্যারিসের শান্তিচুক্তির পর বলকান অঞ্চলে স্বাধীন গ্রীস এবং স্ব-শাসিত সার্বিয়া ও মোলডাভিয়া ওয়ালাচিয়ার অবস্থান স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু তখনও সার্ব জাতি অধ্যুষিত বসনিয়া, হারজেগোভিনা ও মন্টিনিগ্রো এবং বুলগার জাতি অধ্যুষিত বুলগেরিয়া তুরস্কের প্রত্যক্ষ শাসন অধিকারে ছিল। এড্রিয়াটিক উপসাগরের কূলে আলবেনিয়ায় ছিল দুর্ধর্ষ উপজাতিদের বাস। সেখানকার শাসনকর্তা তুরস্ক কর্তৃক নিযুক্ত হলেও আলবেনিয়া ছিল প্রায় স্বাধীন। পশ্চিম ইউরোপে তখন জাতি-রাষ্ট্র গঠনের প্রবল জোয়ার। আন্দোলনের ঢেউ বলকান অঞ্চলেও পৌঁছায়। সার্বিয়া চাইছিল বসনিয়া, হারজেগোভিনা, মন্টিনিগ্রো, অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী অন্তর্ভুক্ত সার্ব অধ্যুষিত এলাকা এবং ম্যাসিডোনিয়ার সার্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে বৃহত্তর সার্ব রাষ্ট্রগঠন করতে। বুলগেরিয়াতেও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে।

প্যারিসের শান্তি চুক্তির পর তুরস্ক সংস্কারে হাত দেয়। মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদী ধর্মযাজকদের বিশেষ শাসনক্ষমতা বাতিল করা হয়, আইনের চোখে সবাইকে সমান অধিকার দেওয়া হয়, দক্ষতা অনুসারে সব জাতি ও ধর্মের প্রজাকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ ও অমুসলমানদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং নির্মম করব্যবস্থা ও বর্বর শাস্তিদান প্রথার সংস্কার করা হয়। কিন্তু মুসলমান ধর্মীয় নেতা ও প্রাদেশিক শাসনকর্তারা এইসব সংস্কার মানতে অস্বীকার করে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার অসহায় বোধ করে এবং শাসনসংস্কার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। এই পটভূমিতেই বলকান অঞ্চলে নতুন করে সঙ্কট সৃষ্টি হয়।

সঙ্কটের সূত্রপাত হরজেগোভিনায়। তুর্কী রাজকর্মচারী সেখানে নির্মমভাবে কর আদায় করত। হারজেগোভিনার উৎপীড়িত কৃষকরা শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং বহু রাজকর্মচারীকে হত্যা করে। প্রত্যুত্তরে তুর্কী সেনারা নির্বিচারে খ্রিস্টান প্রজাদের হত্যা করে। এবারে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে বুলগেরিয়াতে। বুলগেরিয়রা কিছু তুর্কীকে হত্যা করলে তুর্কী সেনারা বুলগেরিয়ায় বীভৎস হত্যাকাণ্ড শুরু করে দেয়। কেবল একটি এলাকায় আশিটি গ্রামের মধ্যে পনেরোটি বাদে সব গ্রাম ধ্বংস করা হয়। বাটক শহরে আচমেত পাশা নামে এক রাজকর্মচারী প্রথমে শহরে অধিবাসীদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে অস্ত্র সমর্পণ করতে বলে। অস্ত্র সমর্পণ করলে তাদের টাকাকড়ি দিয়ে দিতে বলা হয়। অর্থ সমর্পণ করা হলে নিরীহ শহরবাসীদের নির্বিচারে হত্যা শুরু হয়। হাজার খানেক খ্রিষ্টান এক সুরক্ষিত গীর্জায় আশ্রয় নিয়েছিল। তুর্কী সেনারা গীর্জার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পেরে গীর্জার ছাদের টালি উপড়ে ফেলে পেট্রল ভেজানো ন্যাকড়ায় আগুন জ্বালিয়ে আশ্রিতদের গায়ে ছুঁড়ে মারে। গীর্জার আশ্রিত স্ত্রী-পুরুষ শিশু সকলেই মারা যায়।

বুলগেরিয়ার হত্যাকাণ্ডের সংবাদ ইউরোপে ছড়িয়ে পড়লে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ইংলন্ডের উদারনৈতিক নেতা গ্লাডস্টোন দাবি করলেন এবার তুরস্ককে তল্পিতল্পাসহ ইউরোপ থেকে সম্পূর্ণ তাড়িয়ে দিতে হবে। কিছুদিন বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তৎপরতা দেখা গেলেও কোন সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এ অবস্থায় সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রো বুলগেরিয়ার সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে রুশ তুরস্ক যুদ্ধের (১৮৭৬-৭৭) সূত্রপাত। প্লেভনা নামক স্থানে তুর্কী সেনাপতি ওসমান পাশা অসামান্য বীরত্বের সঙ্গে রুশ বাহিনীকে রুখে দেয়। শেষ পর্যন্ত প্লেভনার পতন হলে রুশ সৈন্য দ্রুত এগিয়ে গিয়ে এড্রিয়ানোপল দখল করে এবং কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। বাধ্য হয়ে সুলতান শান্তির প্রস্তাব দেন। সানস্টিফানোর সন্ধিতে রুশ তুরস্ক যুদ্ধের অবসান হয় (১৮৭৮)।

সানস্টিফানোর চুক্তিতে তুরস্ক রুমানিয়া, সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোর স্বাধীনতা মেনে নেয়। উত্তরে রুমানিয়া, দক্ষিণে গ্রীস এবং পশ্চিমে সার্বিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে বুলগেরিয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়। অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বুলগেরিয়া স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী হবে বলে স্থির হয়। রাশিয়া ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে কারস্ বার্টুম প্রভৃতি স্থান দখল করেছিল। তাছাড়া সে ডব্রুপার বিনিময়ে রুমানিয়ার কাছ থেকে সেই সব অংশ ফিরে পাবার প্রস্তাব করেছিল, যা সে ১৮৫৬ সালে প্যারিসের চুক্তিতে হারিয়েছিল। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার ওপর রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যৌথ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সানস্টিফানোর চুক্তিতে বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার অধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তুরস্কের পতন অনিবার্য মনে হয়। এই অবস্থায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি প্রতিবাদের ঝড় তোলে। তারা দাবি করে প্রাচ্য সমস্যা একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা আন্তর্জাতিক বৈঠকেই মতৈক্যের ভিত্তিতে ঐ সমস্যার সমাধান করতে হবে। শেষ পর্যন্ত বিসমার্কের নেতৃত্বে বার্লিন বৈঠকে ঐ সমস্যার পুনর্বিবেচনা শুরু করে।

বার্লিন চুক্তিতে (১৮৭৮) সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো ও রুমানিয়াকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে ঘোষণা করা হয়। তবে বসনিয়া ও হারজেগোভিনার শাসন অধিকার অস্ট্রিয়ার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এবং সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোর সংযোগস্থল নোভিবাজারের সঞ্জাকে সৈন্য মোতায়েনের অধিকারও অস্ট্রিয়া পায়। বৃহৎ বুলগেরিয়াকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করে দক্ষিণের ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশ তুরস্ককে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, ম্যাসিডনের উত্তরে পূর্ব রুমেলিয়াকে তুরস্কের অধীনে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল রূপে ঘোষণা করা হয় এবং বাকি অংশে স্বাধীন বুলগেরিয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়। রুমানিয়া রাশিয়াকে ডব্রুজার বিনিময়ে বেসারাবিয়া ছেড়ে দেয়। তুরস্ক ভবিষ্যতে গ্রীসকে থেসালি এবং ফ্রান্সকে টিউনিসিয়া অধিকারের প্রতিশ্রুতি দেয়। ইংলন্ড সাইপ্রাস দ্বীপ লাভ করে। কনস্ট্যান্টিনোপল ও আড্রিয়ানোপল সংলগ্ন ভূভাগ এবং ম্যাসিডোনিয়া ফিরে পাওয়ায় তুরস্ক ইউরোপে নবজীবন লাভ করল।

বার্লিন চুক্তি বলকান জাতিগুলির কাউকে খুশি করতে পারেনি। অস্ট্রিয়া কর্তৃক বসনিয়া ও হারজেগোভিনা দখল এবং নেভিবাজারে সৈন্য মোতায়েন ঐক্যবদ্ধ বৃহৎ সার্বিয়া জাতিরাষ্ট্র গঠনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। রুমানিয়া রাশিয়াকে অনুর্বর ডব্রুজার পরিবর্তে বেসারাবিয়া ছেড়ে দেওয়া মেনে নিতে পারেনি। সবচেয়ে ক্ষুদ্র হয়েছিল বুলগেরিয়া সানস্টিফানোর সন্ধিতে গঠিত বৃহৎ বুলগেরিয়াকে তিনভাগে বিভক্ত করে মাত্র একভাগকে স্বাধীনতা দেওয়ায়। গ্রীস, সার্বিয়া, বুলগেরিয়া সকলেই নিজ নিজ রাজ্য সংলগ্ন ম্যাসিডোনিয়ার অংশ বিশেষ লাভ করতে চেয়েছিল। এখন ম্যাসিডোনিয়ায় তুরস্ক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সকলেই বিক্ষুব্ধ হল। এইভাবে বার্লিন চুক্তি বলকান সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন বলেছেন যে বার্লিন কংগ্রেসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফল হল এই যে তা প্রত্যেক দেশকে অসন্তুষ্ট রাখল এবং প্রত্যেক দেশই আগের থেকে অনেক বেশি উত্তেজনার মধ্যে রইল। ১৮৭৮ সালে ব্রিটেন ডার্ডানেলসে একটি নৌবহর প্রেরণ করেছিল একথা বোঝানোর জন্য যে তুরস্কে বা তার চারপাশে তার স্বার্থ জড়িয়ে আছে। একথা বুঝেও তুরস্কের কিছু করার ছিল না। তুরস্ক সাম্রাজ্যের ভাঙনের ফল হয়েছিল এই যে রাশিয়া আর ইংল্যান্ড তাদের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা নিয়ে পূর্ব ইউরোপে এবং এশিয়াতে প্রায় মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী কখনোই চায়নি যে অটোম্যান সাম্রাজ্য ভেঙে যাক। কিন্তু অটোম্যান সাম্রাজ্যকে অটুট রাখার লক্ষ্যেও সে ব্যর্থ হল। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী 'সন্মানের সঙ্গে শান্তি'র যে লক্ষ্যের কথা আগে ঘোষণা করেছিলেন তা পুরোপুরি রক্ষিত হয়নি। রাশিয়া বেসারাবিয়া এবং অস্ট্রিয়া বসনিয়া ও হারজেগোভিনা লাভ করেও সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। বরং এইভাবে বলকান অঞ্চলকে ভাগ করার ফলে বৃহত্তর স্ল্যাভ রাষ্ট্রের কথা যারা ভাবত তাদের মধ্যে আঘাত দেওয়া হয়েছিল। ডেভিড টমসন স্পষ্ট করেই বলেছেন যে ভবিষ্যতে বুলগেরিয়া বলকান অঞ্চলের ঝটিকা কেন্দ্র হয়ে রইল। সার্বিকভাবে বলকান জাতীয়তাবাদের সমস্ত বিপজ্জনক ধারার একটিও প্রশমিত হল না। এখন ইউরোপের শক্তিসাম্যের ধারক হয়ে দাঁড়াল ব্রিটেনও নয়, রাশিয়াও নয়—জার্মানি—অর্থাৎ এমন দেশ যার নিজের ভেতর অস্থিরতা কম ছিল না। এরপর এক প্রজন্মকাল ইউরোপে একটা আপাত শান্তির বাতাবরণ ছিল কিন্তু সে শান্তি ছিল অনিশ্চিত। মাঝে মাঝেই ইউরোপ যুদ্ধ ও সংকটের মধ্য দিয়ে প্যারিসের শান্তি দিয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত যখন একটা বড় যুদ্ধের ভেতর দিয়ে গিয়ে প্রায় চল্লিশ বছর বাদে ইউরোপে আবার একটা কংগ্রেসের অধিবেশন বসল তখন সে অধিবেশন বার্লিনে বসেনি, বসেছিল প্যারিসে। ততদিনে বলকান জাতীয়তাবাদের সমস্যা তার ভিন্নতর সমাধান খুঁজে পেয়েছিল।

(ঙ) বলকান যুদ্ধের পটভূমিকা

বার্লিন চুক্তি (১৮৭৮) বলকান সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হওয়ায় চুক্তির পরের দশকগুলিতে সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করে। সমস্যা জটিলতর হওয়ার প্রধান কারণ বলকান জাতিগুলির অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ ও ক্রম বর্ধমান জাতীয় আন্দোলন।

বুলগেরিয়া, সার্বিয়া ও গ্রীস সকলেরই দাবি ছিল ম্যাসিডনের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ওপর। তুরস্কের কাছ থেকে ম্যাসিডন পুনরুদ্ধার করে জাতীয় স্বার্থ কিছুটা চরিতার্থ করা সম্ভব ছিল। ফলে তুরস্কের সঙ্গে আবার সংঘাতের সম্ভাবনা বেড়েই চলে।

রুশ-তুরস্ক যুদ্ধে রাশিয়ার ভূমিকায় বুলগেরিয়ায় রাশিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাশিয়ার রাণীর সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে ঘনিষ্ঠ আলেকজান্ডার ব্যাটেনবার্গ বুলগেরিয়ার রাজা নির্বাচিত হন। বুলগেরিয়া শাসনে সহায়তা করার জন্য বহু রাশিয়ান কর্মচারি নিযুক্ত হয়। কিন্তু আলেকজান্ডার নিজে ছিলেন রুশ বিদ্বেষী। রুশ কর্মচারীদের দুর্ব্যবহারেও বুলগেরিয়রা রুশ বিরোধী হয়ে ওঠে। ১৮৮৫ সালে পূর্ব রুমেলিয়া আলেকজান্ডারকে তাদের রাজ্য নির্বাচিত করে এবং পূর্ব-রুমেলিয়া ও বুলগেরিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়। এই অবস্থায় রাশিয়া আলেকজান্ডারকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

কিছুদিন পর আলেকজান্ডার মুক্তি পেলেও এবং রাজপদে পুনর্বহাল হলেও পদত্যাগ করেন। তাঁর স্থলে জার্মানির স্যাক্স-কোবুর্গ-গোথা রাজ পরিবারের সদস্য প্রিন্স ফার্ডিনান্ডকে রাজা নির্বাচিত করা হয়। ধীরে ধীরে বুলগেরিয়া রাশিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন নীতি গ্রহণ করে।

বার্লিন চুক্তিতে সার্বিয়া সার্ব অধ্যুষিত ম্যাসিডনের রাজ্যাংশ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। অস্ট্রিয়া কর্তৃক বসনিয়া হারজেগোভিনা অধিগ্রহণ এবং সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোর সংযোগস্থল নোভিবাজারে অস্ট্রিয়ার সৈন্য মোতায়েন বৃহৎ ঐক্যবদ্ধ সার্বরাষ্ট্র গঠনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া আলবেনিয়া তুরস্কের অধীনে থাকায় সার্বিয়ার জলপথে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের পথ রুদ্ধ হয়েছিল। ফলে সার্বিয়া অস্ট্রিয়া ও তুরস্কের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ পোষণ করতে হবে। বুলগেরিয়া ও রুমেলিয়া ঐক্যবদ্ধ হলে বুলগেরিয়ার প্রতিও সার্বিয়া ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়ে।

গ্রীস অনেক আগে স্বাধীনতা পেলেও (১৮৩০) তার সীমানা সঙ্কুচিত করে রাখা হয়েছিল। গ্রীস মনে করত আয়োনীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ক্রীট, থেসালি, এপিরাস ও ম্যাসিডোনিয়ার অংশবিশেষ গ্রীক সংখ্যা গরিষ্ঠ অঞ্চল বলে তার প্রাপ্য। ১৮৮১ সালে তুরস্ক গ্রীসকে থেসালি ও এপিরাসের একাংশ প্রদান করে। কিন্তু গ্রীসের জাতীয় আকাঙ্ক্ষা এতে তৃপ্ত হয়নি।

রুমানিয়া রাশিয়ার কাছ থেকে বেসারাবিয়া ফিরে পাবার জন্য এবং অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্যভুক্ত ট্রানসিলভানিয়া ও বুকোভিনা এবং বুলগেরিয়ার উত্তর অঞ্চলে রুমেনিয় অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে বৃহত্তর রুমানিয়া জাতি রাষ্ট্র গঠনের জন্য আন্দোলন শুরু করে। এইভাবে বিক্ষুব্ধ জাতীয়তাবাদ ১৯১২ সালের বলকান যুদ্ধের পটভূমি রচনা করেছিল।

বলকান সমস্যা জটিলতর হওয়ার আর একটি কারণ তুরস্কে তরুণ-তুর্কী আন্দোলন। তুরস্ক সুলতানের অত্যাচার থেকে রেহাই পাবার জন্য উদারনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী বহু তুর্কী দেশ ছেড়ে বিদেশে, বিশেষ করে ফ্রান্সে পালিয়ে গিয়েছিল। প্রবাসী তুর্কীরা বিদেশে বসেই বিপ্লবের ছক কষে। তারা দেশে ফিরে গিয়ে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও সংবিধান রচনার জন্য সুলতানের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। সেনাবাহিনী তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। ফলে সুলতানের দাবি মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তুরস্ক সাম্রাজ্য পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীলরা আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে। এদিকে তুরস্কে বিশৃঙ্খলার সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী-বসনিয়া-হারজেগোভিনা পুরোপুরি দখল করে নেয়। বুলগেরিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ক্রীটের অধিবাসীরা গ্রীসের সঙ্গে তাদের সংযুক্তি ঘোষণা করে। ঘটনাগুলি সবই বার্লিন চুক্তির বিরুদ্ধে ছিল, কিন্তু ইউরোপের কোন বৃহৎ শক্তিই হস্তক্ষেপ করতে এগিয়ে আসে নি। বরং জার্মানি ও ইটালি অস্ট্রিয়ার বসনিয়া হারজেগোভিনা দখলকে পূর্ণ সমর্থন জানায়। সার্বিয়া প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়, ভবিষ্যতে বৃহৎ সার্বিয়া গঠনের স্বপ্ন ভেঙে পড়ে। সব মিলিয়ে বলকান অঞ্চলে আবার সঙ্কট ঘনীভূত হয়ে আসে।

বলকান যুদ্ধের পটভূমি হিসাবে আর যে ঘটনার উল্লেখ করতে হয় সেটি হচ্ছে বৃহৎ শক্তিগুলির পরিবর্তিত নীতি। বার্লিন চুক্তির পর বিশেষভাবে বুলগেরিয়ায় তার প্রভাবের অবসান হলে রাশিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের পরিবর্তে এশিয়ার সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করে। জার্মানি তার উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার বসবাসের জন্য এবং পুঁজি বিনিয়োগের জন্য 'পুবের দিকে এগিয়ে চলো' (Drang nach Osten) নীতি নিয়ে দ্রুত তুরস্ক সাম্রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করে। ১৯০৮ সালে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম নিজে কন্সটান্টিনোপল পরিভ্রমণ করে সুলতানের সঙ্গে মৈত্রী দৃঢ় করেন। এই অবস্থায় ইংলন্ডের রাশিয়া ভীতি দূর হয় এবং রাশিয়ার সঙ্গে সব বিরোধ মিটিয়ে ফেলে মিত্রতা স্থাপন করে (১৯০৭)। একই সঙ্গে ইংলন্ড বুলগেরিয়ার জাতীয় আন্দোলনের প্রতিও সহানুভূতিশীল হয়।

(চ) প্রথম বলকান যুদ্ধ

তুরস্কে তরুণ তুর্কী আন্দোলন ব্যর্থ হলে (১৯০৮) এবং তুরস্কের সরকার প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে চলে গেলে অমুসলমান প্রজাদের ওপর আগের মতই উৎপীড়ন শুরু হল। এই অবস্থায় সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, বুলগেরিয়া ও গ্রীস একতাবদ্ধ হয়ে বলকান লীগ গঠন করে। ম্যাসিডোনিয়ায় তুরস্কের কঠোর নীতির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বলকান লীগের সদস্যগণ তুরস্কের বিরুদ্ধে সামরিকভাবে অগ্রসর হয়ে প্রথম বলকান যুদ্ধের সূচনা করে (১৯১২)। যুদ্ধে তুরস্ক প্রতিটি বলকান রাষ্ট্রের হাতে পরাজিত হয়। মন্টিনিগ্রো যুদ্ধ শুরু করে। গ্রীস ম্যাসিডোনিয়া প্রবেশ করে সালোনিকা (Salonica) দখল করে। সার্বিয়া তুরস্ককে পরাজিত করে আলবেনিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সবচেয়ে চমকপ্রদ সাফল্য পায় বুলগেরিয়া। সে তুরস্ককে পরাজিত করে কন্সন্টিট্যানোপলে-এর কাছাকাছি পৌঁছে যায়। তুরস্কের যুদ্ধের থেকে অব্যাহতি ও শান্তি কামনা করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় ছিল না। অবশেষে লন্ডন চুক্তি দ্বারা প্রথম বলকান যুদ্ধের অবসান হয় (১৯১৩)। এই চুক্তিতে তুরস্ক ইউরোপ থেকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হয়। কেবলমাত্র থ্রেস (Thrace)-এর কিছু অংশে তার অস্তিত্ব বজায় থাকে। গ্রীস ক্রীট লাভ করে। আলবেনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।

(ছ) দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ

প্রথম বলকান যুদ্ধে বলকান লীগের সদস্যরা তাদের সাধারণ শত্রু তুরস্কের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। তুরস্কের সহজ পরাজয় তাদের ঐক্যকে বিনষ্ট করে এবং তারা বিজিত রাজ্যের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে বিবাদ শুরু করে।

চারিদিকে স্থলভাগ বেষ্টিত সার্বিয়া চেয়েছিল আলবেনিয়ার মধ্য দিয়ে এড্রিয়াটিক উপসাগরে প্রবেশ করতে। কিন্তু আলবেনিয়াকে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করায় সার্বিয়া হতাশ হয়। সে এখন ম্যাসিডোনিয়ায় আরও বেশি এলাকা দাবি করে। তুরস্কের বিরুদ্ধে সহজ জয়ে বুলগেরিয়া তার ক্ষমতা সম্পর্কে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল। সে সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো ও গ্রীসের দাবিকে অগ্রাহ্য করে সমগ্র ম্যাসিডোনিয়া গ্রাস করে এবং সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ শুরু হয়। রুমানিয়া, গ্রীস ও মন্টিনিগ্রো বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়। সুযোগ বুঝে তুরস্ক হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের আশায় বুলগেরিয়াকে আক্রমণ করে। এইভাবে যুগপৎ পাঁচটি রাজ্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বুলগেরিয়া সহজেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। অবশেষে রুমানিয়ার চেষ্টায় বুখারেষ্টের সন্ধির দ্বারা (১৯১৩) দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। বুখারেষ্টের সন্ধিতে ম্যাসিডোনিয়ার বৃহত্তর অংশ বণ্টিত হল গ্রীস ও সার্বিয়ার মধ্যে। তাছাড়া গ্রীস পায় ঈজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি দ্বীপ, রুমানিয়া পায় দক্ষিণ ডব্রুজার অংশ বিশেষ। নোভিবাজার সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রোর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

বুখারেষ্টের সন্ধি বলকান সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে পারেনি। সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার দূরত্ব বেড়ে চলে। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী বসনিয়া-হারজেগোভিনা দখল করায় ঐক্যবদ্ধ সার্ব জাতি-রাষ্ট্র গঠনের পথে বড় বাধা সৃষ্টি হয়েছিল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও সার্বিয়ার সংঘাত ইউরোপে সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানাতে জার্মানি এগিয়ে আসে, অন্যদিকে সার্বিয়াকে উস্কানি দেয় রাশিয়া। পরাজিত, অপমানিত ও ক্ষুব্ধ বুলগেরিয়া প্রতিশোধের বাসনায় ধীরে ধীরে জার্মানি ও তুরস্কের ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। এইভাবে ইউরোপে বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বলকান জাতির পারস্পরিক বিরোধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে।

২.২.৪ বলকান জাতীয় জাগরণ ও জাতিরাষ্ট্র গঠন

অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন ও সে ভাঙ্গন নিয়ে ইউরোপীয় শক্তিগুলির আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও চক্রান্ত বলকান জাতীয়তাবাদের অন্তরালে প্ররোচনা ও প্রেরণা দুই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তুরস্ক সমেত সমস্ত বলকান রাজ্যগুলির নিজস্ব গঠন ও বিকাশ। উনিশ শতকে তুরস্ক রাজনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হলেও

অর্থনৈতিক দিক থেকে ততটা দুর্বল ছিল না। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ কৃষি, বাণিজ্য এবং শিল্পেও এগিয়ে চলেছিল। আবার বলকান জাতিরাষ্ট্র গঠনের পিছনেও একটা বড় প্রেরণা ছিল সমৃদ্ধতর ভবিষ্যৎ রচনার আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা কিভাবে চরিতার্থ হয়েছিল তা বোঝানোর জন্য নীচে বলকান অঞ্চলে জাতিরাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা হল।

(ক) সার্বিয়া

বলকান জাতিগুলির মধ্যে সার্বিয়াই তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহী হয়। কিন্তু এই বিদ্রোহের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। শূকর পালক কারা জর্জের সফল আন্দোলন (১৮০৪ থেকে ১৮১৩) প্রধানত অত্যাচারী স্থানীয় জানিসারির (তুরস্কের বাছাই সৈন্য) বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। ১৮১৩ সালে তুরস্ক সার্বিয়া পুনর্দখল করে। কারা জর্জ হাঙ্গেরীতে পালিয়ে যান। সেখানে সহকর্মী মিলোশ ওব্রোনেভিকের ষড়যন্ত্রে কারা জর্জ নিহত হন। ওব্রোনোভিক সার্বিয়ায় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। রাশিয়ার চাপে সুলতান ওব্রোনোভিক সার্বিয়ায় পাশা বলে মেনে নেয়। সার্বিয়া স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার পায়।

সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়ে সার্বিয়ার জাতীয় জাগরণ শুরু হয় ১৮২০ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে। সার্বিয়ানরা অতীত গৌরবের দিকে দৃষ্টি ফেরায়। প্রাচীন ইতিহাস, লোকগাথা সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কারাদজিক (Vuk Karadzic) নামক একজন লেখক সার্বিয়ায় ভাষা ও ব্যাকরণের সংস্কার করেন এবং ঐ ভাষার অভিধান রচনা করেন। সার্বিয়ানরা সার্ব অধ্যুষিত বসনিয়া, হারজেগোভিনা, মন্টিনিগ্রো ও সার্বিয়াকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ জাতিরাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখে।

কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সার্বিয়া ছিল অনগ্রসর। সমুদ্রে প্রবেশপথ না থাকায় বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। যাতায়াতের জন্য অস্ট্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ডানিয়ুব নদীর ওপর তাকে নির্ভর করতে হত। ১৮৭৭ -৭৮ সালে রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের পর সার্বিয়া স্বাধীনতা পেলেও তাকে পার্শ্ববর্তী সার্ব রাজ্যগুলির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া বা সমুদ্র উপকূলে পৌঁছানোর সুযোগ দেওয়া হয়নি। ফলে উনিশ শতকের শেষে সার্ব জাতীয়তাবাদ বলকান জাতিগুলির মধ্যে প্রবল আকার ধারণ করে। তাদের অসন্তোষ এবং অস্ট্রিয়ার সঙ্গে বিরোধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বড় কারণ।

(খ) গ্রীস

সার্বিয়া প্রথম স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পেলেও গ্রীসই প্রথম স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। গ্রীসে জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত হয় আঠারো শতকের শেষে ভাষা ও সাহিত্যের পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়ে।

গ্রীসের প্রাচীন ধ্রুপদী ভাষা তখন কেবলমাত্র যাজক ও বিদগ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাচীন ভাষার বিকৃতরূপ ও নানা ভাষা থেকে গৃহীত শব্দযোগে সাধারণের ভাষা তৈরি হয়েছিল। আঠারো শতকের শেষে বিখ্যাত সাহিত্যিক আডামানটিওস কোরেস (Adamantios Koraes) ও রীগাস ফেরাইওস (Rhigas Pheraios) প্রাচীন গ্রীক ভাষার সঙ্গে আধুনিক ভাষার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে গ্রীক ভাষার পুনর্জাগরণ ঘটান। ভাষা সংস্কারের ফলে গ্রীকরা তাদের ধ্রুপদী সাহিত্যের গ্রন্থরাজি পাঠ করতে সক্ষম হয়। প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনার মাধ্যমে গ্রীকদের মধ্যে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে। প্রাচীন সংস্কৃতি সম্পর্কে তারা এমনি গর্ব বোধ করতে থাকে যে এখন থেকে তারা নিজেদের আর রোমান (Romans) না বলে হেলেনীজ (Hellenes) বলা শুরু করে।

সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের সঙ্গে যুক্ত হয় ফরাসী বিপ্লবের জাতীয়তাবাদী প্রভাব। কোরেস ও রীগাস ফরাসী জাতীয়তাবাদ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। রীগাস স্পেন জার্মানি বা ইটালির গুপ্ত সমিতির অনুকরণে অনেক গুপ্ত সমিতি গড়ে

তোলেন। এদের উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীকদের জাতীয় বিদ্বেষ সৃষ্টি করা। ১৭৯৮ সালে রীগাস তুর্কী শাসকদের হাতে শহীদ হন।

গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করে ফিলিকে হেটাইরিয়া (Philike Hetairia —অর্থ Association of Friends) নামে অন্য একটি গুপ্ত সমিতি। আলেকজান্ডার ইপ্সিলান্টির নেতৃত্বে ক্রিমিয়া দ্বীপে গ্রীক বণিকদের দ্বারা ফিলিকে হেটাইরিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮১৪)। ১৮১৪-২০ সালের মধ্যে ফিলিকে দ্রুত অটোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্র শিক্ষিত ও পদস্থ গ্রীকদের মধ্যে বিস্তারলাভ করে। ১৮২০ সালে এর সদস্য সংখ্যা ছিল আশি হাজার । গ্রীকদের সঙ্গে ধর্মীয় মিল থাকায় রুশরা বিপুলভাবে হেটাইরিয়া ফিলিকেকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। চারদিক থেকে অর্থ আসে এবং ঐ অর্থ দিয়ে অস্ত্র কিনে গোপনে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি চলে।

গ্রীক স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করে ১৮২১ সালে। এই স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম ছয় বছরে গ্রীকরা এককভাবে সংগ্রাম করে। উভয়পক্ষই এই পর্যায়ে নৃশংস বর্বরতার পরিচয় দেয়। মিশরের শাসনকর্তা মেহমেত আলি তুরস্কের পক্ষে হস্তক্ষেপ করলে স্বাধীনতা সংগ্রামের পট পরিবর্তন হয়। মিশরীয় সেনারা মোরিয়া দ্বীপের মিসলঙ্খির (Missoonglu) সব গ্রীকদের হত্যা করলে ইউরোপে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান গ্রীসের প্রতি ইউরোপীয়রা গভীর সহানুভূতি দেখাতে এগিয়ে আসে। ইতিমধ্যেই ফ্রান্স, ইংলন্ড, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে সংগ্রামী গ্রীকদের সমর্থনে সমিতি (Phihellenic Society) গঠিত হয়েছিল। নানা দেশ থেকে অর্থ, অস্ত্র এবং যুদ্ধ করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী আসতে শুরু করে। ইংরেজ কবি বাইরন নিজে যুদ্ধে যোগ দিতে এসে প্রাণত্যাগ করেন। ফ্রান্সে লাফায়েৎ, স্যাটোব্রিয়াঁ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ গ্রীকদের সমর্থনে অর্থ, অস্ত্র সরবরাহ করে পাঠাতে থাকেন। ইংলন্ডের ব্যাঙ্ক মালিকরা গ্রীক বণিকদের অনেক অর্থ ধার দিয়েছিল। ইংলণ্ডের স্বার্থ ছিল গ্রীকদের রক্ষা করা। এই অবস্থায় ইংলন্ড, ফ্রান্স রাশিয়ার মধ্যে লন্ডন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং তুরস্ককে গ্রীসের স্বাধীনতা মেনে নিতে বলা হয়। তুরস্ক ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে ফ্রান্স ও ইংলন্ডের নৌবহর তুর্কী-মিশরীয় নৌবহরকে নাভারিনোর (Navarino) নৌযুদ্ধে ধ্বংস করে। এই যুদ্ধ ফ্রান্স ও ইংলন্ডের অনভিপ্রেত ছিল, তারা তুরস্কের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে এবং থমকে যায়। রাশিয়া এককভাবে হস্তক্ষেপ করে। রাশিয়া যুদ্ধে ক্রমাগত জয়লাভ করতে থাকে ও অ্যাড্রিয়ানোপল পর্যন্ত এগিয়ে যায়। তুরস্ক বাধ্য হয়ে শান্তির প্রস্তাব দেয়। লন্ডন চুক্তিতে (১৮২৯) ইংলন্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও তুরস্ক মিলিতভাবে গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয় ও গ্রীসের সঙ্কুচিত সীমানা নির্ধারিত করে দেয়। গ্রীকরা স্বভাবতই তাদের সঙ্কুচিত সীমানায় সন্তুষ্ট হতে পারে নি।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির ব্যাভেরিয়া রাজকুমার গ্রীসের রাজা মনোনীত হন। তিনি ১৮৩৩ থেকে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে গ্রীসকে নিরপেক্ষ রাখার জন্য তিনি অপ্রিয় হয়ে ওঠেন এবং প্রজা বিদ্রোহে সিংহাসন হারান। তাঁর স্থলে নতুন রাজা নির্বাচিত হন একজন দিনেমার (Danish) রাজকুমার। তিনি সংবিধানের শাসন প্রবর্তন করেন। ইংলন্ড ১৮৬৪ সালে গ্রীসকে আইওনীয় দ্বীপপুঞ্জ (Ionian Islands) ফিরিয়ে দেয়। ১৮১৫ সাল থেকে ঐ দ্বীপপুঞ্জ ইংলন্ডের অধীনে ছিল। বার্লিন চুক্তিতে (১৮৭৮) গ্রীসের সীমানা পুনর্নির্ধারণের জন্য তুরস্কের ওপর চাপ দেওয়া হয়। তুরস্ক অনিচ্ছা সত্ত্বে ১৮৮১ সালে গ্রীসকে থেসালি ফিরিয়ে দেয়। তরুণ তুর্কী বিদ্রোহের বিশৃঙ্খলার সুযোগে গ্রীস ক্রীট জয় করে (১৯০৮)। গ্রীসের উত্তরে ম্যাসিডোনিয়ায় বহু গ্রীক বাস করত। ঐ অংশের ওপর গ্রীসের দাবি ছিল। প্রথম বলকান যুদ্ধে (১৯১২) গ্রীসের দাবি না মানা হলে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে (১৯১৩) গ্রীস বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং যুদ্ধশেষে বুখারেস্টের সন্ধিতে (১৯১৩) ম্যাসিডনের অংশ বিশেষ এবং ঈজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি দ্বীপ লাভ করে। এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে গ্রীসে প্রায় সত্তর লক্ষ অধিবাসীর সংযোজন হয়।

(খ) রুমানিয়া

দানিয়ুব অঞ্চলের দুটি প্রদেশ মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া (এদের Danibian Principaliities বলা হত) নিয়ে গঠিত রুমানিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। প্রদেশ দুটির ওপর বরাবর অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার লোলুপ দৃষ্টি ছিল। রাশিয়া সুযোগ পেলেই প্রদেশ দুটি-আংশিক বা সম্পূর্ণ দখল করে নিত। পরে ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রের চাপে ছেড়ে দিতে বাধ্য হত। এখানে তুরস্কের নিয়ন্ত্রণ ছিল সামান্যই।

এখানেও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে রুমানিয়ার জাতীয় ইতিহাস রচিত হয়। রোমান্টিক সাহিত্য রচনা করেন গ্রিগোর আলেকজান্দ্রেস্কু (Gregore Alexandrescu) রুমানিয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ শুরু হয়েছিল সতেরো শতকে। উনিশ শতকে তা সম্পূর্ণ হয়। এখানকার অধিবাসীরা ছিল রোমান ক্যাথলিক, গ্রীক ক্যাথলিক অথবা ইহুদী ধর্মাবলম্বী। রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে রুমানিয় জাতীয় আন্দোলনে সাহায্য করত। কিন্তু অচিরেই এই আন্দোলন রাশিয়ার বিরুদ্ধে চলে যায়। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন রুমানিয় জাতীয় আন্দোলনের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা রুমানিয়ার স্বাধীনতার পথে বড় বাধা ছিল। গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রাশিয়া প্রদেশ দুটি দখল করে নেয়। কিন্তু পরে বৃহৎ রাষ্ট্রের চাপে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ডানিয়ুবের মোহনায় বেসারাবিয়ার ওপর রাশিয়ার লোভ ছিল। প্যারিসের সন্ধিতে (১৮৫৬) মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া প্রদেশ দুটি তুরস্কের সাম্রাজ্যের অধীনে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায়। ১৮৫৯ সালে দুটি প্রদেশের অধিবাসীই নির্বাচনের মাধ্যমে প্রদেশ দুটির সংযুক্তি ঘটিয়ে অখণ্ড রুমানিয়া রাজ্য গঠন করে। আলেকজান্ডার কুজা (Alexander Cuza) নামে একজন সেনানায়ককে সম্মিলিত রাজ্যের রাজা নির্বাচিত করা হয়। বুখারেষ্টে রাজধানী স্থাপিত হয়। ১৮৬৬ সালে গণ আন্দোলনের ফলে কুজা পদচ্যুত হত। তাঁর স্থলে রাজা হিসাবে নির্বাচিত হন জার্মানির হোহেনজোলার্ন রাজবংশের ক্যারল নামে জনৈক ব্যক্তি। বার্লিন চুক্তিতে (১৮৭৮) রুমানিয়াকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। কিন্তু রাশিয়া উর্বর বেসারাবিয়া দখল করে এবং বিনিময়ে রুমানিয়াকে অনুর্বর ডব্রুজা অঞ্চল ছেড়ে দেয়। রুমানিয়া দুই বলকান যুদ্ধে যোগদান করে ডব্রুজা অঞ্চলের সীমানা সামান্য বাড়াতে পেরেছিল।

রাজা ক্যারল চার্লস উপাধি নিয়ে রুমানিয়ায় সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের প্রবর্তন করেন। তিনি প্রাশিয়ার অনুকরণে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন। রুমানিয়ার রেলপথ স্থাপিত হয়, রাস্তাঘাটের উন্নতি করা হয় এবং ভূমি সংস্কারে হাত দেওয়া হয়। অন্য বলকান রাজ্যগুলির তুলনায় রুমানিয়া ব্যাবসা বাণিজ্যে দ্রুত উন্নতি করে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে পনেরো লক্ষ) জমির ওপর চাপ পড়তে থাকে। ফলে প্রজারা মাঝে মাঝেই বিদ্রোহী হয়ে উঠত। ১৯০৭ সালে এই রকম একটি বিদ্রোহ দমন করতে লক্ষাধিক সৈন্য নিয়োগ করতে হয়েছিল। বিদ্রোহের পর কৃষকদের দুর্দশা লাঘব করা জন্য নানা পদক্ষেপও নেওয়া হয়।

(ঘ) বুলগেরিয়া

বলকান জাতিগুলির মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ প্রথম বুলগেরিয়াতে হলেও বুলগেরিয়া সবশেষে স্বাধীনতা লাভ করে। জাতীয় জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় যাজক সম্প্রদায়। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রী ফাদার পেইজি (Father Paisy) বুলগেরিয়ার ইতিহাস (Slavo Bulgarian History) রচনা করেন। এই বইএ বুলগেরিয়দের বিদেশী দ্রব্য ত্যাগ করতে বলা হয়েছিল। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে বুলগেরিয়ায় প্রথম আধুনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কয়েক দশকের মধ্যে সারাদেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় দু হাজার। বুলগেরিয় ভাষায় অভিধান প্রকাশ করেন গেরভ (N. Gerov) । প্রাচীন ইতিহাস, কবিতা, লোকগাথার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ প্রচারিত হতে থাকে। এ ব্যাপারে বিদ্যালয়গুলি সক্রিয় ভূমিকা নেয়। ১৮৭০ সালে বুলগেরিয়ার গ্রীক চার্চ ইস্তানবুলের গ্রীক চার্চ থেকে পৃথক হয়ে যায়। বুলগেরিয় চার্চের পৃথক অস্তিত্ব গ্রীসের গোঁড়া খ্রিস্টানদের ক্ষুব্ধ করে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বুলগেরিয়দের লক্ষ্য ছিল ওব্রেনোভিকের নেতৃত্বে সার্বিয়া যেমন স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পেয়েছিল ঐরূপ অধিকার অর্জন করা। তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ভাবেনি। স্বাধীনতার দাবী দানা বাঁধে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর। রাশিয়া এই আন্দোলনের সমর্থন জানায়। তুরস্ক ভেবেছিল বুলগেরিয়ার পৃথক চার্চ বলকান অঞ্চলে বুলগেরিয় ও অন্য জাতিগুলির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করবে। তাই পরোক্ষে তুরস্ক ও বুলগেরিয় স্বাধীনতা যুদ্ধে ইন্ধন যোগায়।

১৮৭৬-১৮৭৭ সালে বুলগেরিয় হত্যাকাণ্ডের সময় রাশিয়া ছাড়া অন্য কোন বৃহৎ রাষ্ট্র বুলগেরিয়ার সাহায্যে এগিয়ে আসে নি। রাশিয়াই এককভাবে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং তুরস্ককে পরাজিত করে সানস্টিফানোর সন্ধিতে স্বাধীন বৃহৎ বুলগেরিয়া গঠন করে। বার্লিন চুক্তিতে (১৮৭৮) বুলগেরিয়াকে তিনভাগে বিভক্ত করে মাত্র এক ভাগকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। বাকী দুভাগের মধ্যে পূর্ব রুমেলিয়া স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায় আর ম্যাসিডন তুরস্ককে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই কৃত্রিম বিভাগ বুলগেরিয়া মেনে নিতে পারেনি।

রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের (১৮৭৭-৭৮) পর থেকেই বুলগেরিয়ায় রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। রুশ কর্মচারীরা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে বুলগেরিয়া শাসনে সাহায্য করে। রুশ-সাম্রাজ্ঞীর আত্মীয় জার্মানির ব্যাটেনবার্গের রাজকুমার আলেকজান্ডার বুলগেরিয়ার রাজা নির্বাচিত হন। কিন্তু আলেকজান্ডার ছিলেন রুশ বিরোধী। রুশ কর্মচারীদের দুর্ব্যবহারেও বুলগেরিয়দের রুশ বিরোধী করে তোলে। ১৮৮৫ সালে পূর্ব রুমেলিয়া বুলগেরিয়ার সঙ্গে সংযুক্তির দাবি করলে আলেকজান্ডার সেই দাবি মেনে নেন। পূর্ব রুমেলিয়া ও বুলগেরিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়। এদিকে রুশ বিরোধী নীতির জন্য আলেকজান্ডার বুলগেরিয়ার সিংহাসন হারান। তাঁর স্থলে নির্বাচিত হন স্যাকস-কোবুর্গ-গোথার রাজকুমার ফার্ডিনান্ড। বুলগেরিয়া বলকানলীগ গঠন করে প্রথম বলকান যুদ্ধে তুরস্ককে সম্পূর্ণ পরাজিত করে এবং বলকান অঞ্চলকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে। কিন্তু যুদ্ধের পর অধিকৃত স্থানের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে বলকান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে বুলগেরিয়া অন্য বলকান রাষ্ট্রগুলির দ্বারা পরাজিত হলে সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, গ্রীস ও বুলগেরিয়ার মধ্যে ম্যাসিডন বিভাজিত হয়। পরাজিত ক্ষুব্ধ বুলগেরিয়া প্রতিশোধের জন্য ধীরে ধীরে তুরস্ক, জার্মানি ও অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর সঙ্গে মিত্রতার নীতি গ্রহণ করে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির পক্ষে যোগ দেয়।

২.২.৫ সারাংশ

ফরাসী বিপ্লবের পরোক্ষ ফল হিসাবে উনিশ শতকে পৃথক ভাষা ও জাতির ভিত্তিতে পৃথক জাতি-রাষ্ট্র গঠনের দাবি ওঠে। বলকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও এই ভাবধারায় প্রভাবিত হয়। তবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আগে সব দেশেই সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ ঘটে। ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, লোকগাথা প্রভৃতির আলোচনার মাধ্যমে লোকে অতীতের দিকে মন ফেরায়। জাতীয় গৌরব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। জাতিরাষ্ট্র গঠনের পিছনে আর একটি তাগিদ ছিল—অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা। বলকান অঞ্চলের জাতিগুলি মনে করত পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হলে তারা সমৃদ্ধতর ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারবে। ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বার্থে বলকান জাতীয়তাবাদকে কখনও ইন্ধন যুগিয়েছে, কখনও প্রতিরোধ করেছে। ইংল্যান্ডের রুশভীতি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর তুরস্ক প্রীতি বলকান সমস্যাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। অটোমান সাম্রাজ্যের ক্রয় ক্ষয়িষ্ণুতা যেমন বলকান রাজ্যগুলির সামনে অনেক সুযোগ এনে দিয়েছিল সেইরকম বলকান রাজ্যগুলির নিজেদের ঈর্ষা ও পারস্পরিক দ্বন্দ্বও তাদের নানাভাবে দুর্বল করে রেখেছিল। স্বাধীনতা অর্জনের সময় বলকান রাষ্ট্রগুলি সঙ্কুচিত সীমানা পায়। পরে বিভিন্ন সঙ্কটে তাদের ভূমিকার ওপর নির্ভর করে সীমানা হয় পুরস্কারস্বরূপ বাড়ানো হয়েছে নতুবা শাস্তিস্বরূপ কমানো হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌কালে কোন বলকান রাষ্ট্রই সন্তুষ্ট ছিল না। বিশ্বযুদ্ধের পরে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয়।

২.২.৬অনুশীলনী

১। বলকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পটভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

২। গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামের বর্ণনা দিন।

৩। রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ (১৮৭৭-৭৮) কেন ঘটেছিল?

৪। বার্লিন চুক্তি (১৮৭৮) কি বলকান জাতিগুলির আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে পেরেছিল?

৫। প্রথম বলকান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করুন।

৬। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বুলগেরিয়ার সঙ্গে অন্যান্য বলকান জাতির বিরোধের কারণ কি?

৭। বলকান জাতীয় জাগরণে রাশিয়ার ভূমিকা আলোচনা করুন।

৮। বৃহৎ সার্ব রাষ্ট্রগঠনে অস্ট্রিয়া কিভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল?

৯। রুমানিয়া রাষ্ট্রটি কি ভাবে গঠিত হয়েছিল?

১০। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বুলগেরিয়া কেন অক্ষশক্তির পক্ষে যোগ দেয়?

২.২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। J.A.R Marriot—*The Eastern Question* (1930)

২। Seton Watson—*The Rise of Nationality in the Balkans.*

৩। David Thomson—*Europe Since Napoleon* (1965)

৪। C.D.Hazen—*Europe Since 1815* (1923)

৫। W. Miler—*The Ottoman Expire And Its Successors* (1936)

৬। A. J. P. Taylor —*The Struggle For Mastery in Europe 1848-1918* (1954)

৭। E. Lipson—*Europe in the 19th & 20th Century.*

৮। সমর কুমার মল্লিক—*নবরূপে ইউরোপ, ১৮৪৮-১৯১৯* (২০০২)

৯। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী—*য়োরোপের ইতিহাস* (১৯৮৩)।

একক ৩ □ নতুন কূটনীতি

গঠন

৩.৩.০ উদ্দেশ্য

৩.৩.১ প্রস্তাবনা

৩.৩.২ প্রারম্ভিক কথা

৩.৩.৩ উনিশ শতকে কূটনীতির বৈশিষ্ট্য

৩.৩.৪ উনিশ শতকের কূটনীতিতে গোপনীয়তার সবিশেষ অভ্যুদয়

৩.৩.৫ নয়া কূটনীতির জন্ম

৩.৩.৬ খোলা কূটনীতি নিয়ে মর্গেনথোর মত

৩.৩.৭ নয়া কূটনীতি কি বিদ্রোহ?

৩.৩.৮ পুরানো কূটনীতি বনাম নয়া কূটনীতি : বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক পর্যালোচনা

৩.৩.৯ নয়া কূটনীতির মার্ক্সবাদী সমালোচনা

৩.৩.১০ সারাংশ

৩.৩.১১ অনুশীলনী

৩.৩.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৩.৩.০ উদ্দেশ্য

১৮৭০-এর দশক থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর ১৯১৮ সালে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি **উড্রো উইলসনের** (Woodrow Wilson) **চৌদ্দ** দফা শর্ত ঘোষণার সময় পর্যন্ত ইউরোপীয় মহাদেশে কূটনীতির রূপ বদলাচ্ছিল। এইরূপ বদলানোটা ছিল স্বাভাবিক। বিগত পঞ্চাশ বছরে মহাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির বিপুল পরিবর্তন হয়েছে। জার্মানি ও ইটালি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। রাজতান্ত্রিক রক্ষণশীলতা পরাভূত হয়েছে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের দ্বারা। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইংল্যান্ডে ও ফ্রান্সে শিল্পবিপ্লব এসেছে। ইংল্যান্ডে বিশেষ করে এক বিরাট শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম হয়েছে। রাশিয়াতে সার্ফরা মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু সমাজ শক্তিশালী হয়নি, রাষ্ট্র সংহত হতে পারেনি। নিহিলিজম্ (Nihilism) নামে এক সংহারের দর্শন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার উপায়হীন জারতন্ত্র ক্রমশ বিপর্যয়ের মধ্যে তলিয়ে যেতে শুরু করেছিল। এদিকে ইউরোপে অটোম্যান তুর্কী সাম্রাজ্য দুর্বল হওয়ার ফলে বলকান অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে জাতীয়তাবাদ বাড়ছিল। অখিল স্ল্যাভ (Slav) চেতনা (Pan-Slavism) ধীরে ধীরে ঘনীভূত হতে শুরু করেছিল। যেহেতু অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্য ছিল বহুজাতিক সাম্রাজ্য আর সেখানে যথেষ্ট পরিমাণ স্ল্যাভরা থাকত সেহেতু অখিল স্ল্যাভবাদ (Pan-Slavism) অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের পক্ষে ছিল বিপজ্জনক। এই সমস্ত কিছু নিয়ে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছিল। এক দেশের সঙ্গে আরেক

দেশের সম্পর্কের মধ্যে নানা টানাপোড়েন শুরু হয়েছিল। ইউরোপীয় দেশগুলির গার্হস্থ্য রাজনীতি যেমন বদলাচ্ছিল বৈদেশিক রাজনীতি, আন্তর্দেশিক বোঝাপড়া যাকে আমরা কূটনীতি বলি। আমরা দেশের সাথে দেশের এই নতুন বোঝাপড়ার ইতিহাস পড়ব। আমাদের উদ্দেশ্য হবে এটা বোঝা যে কূটনীতি ইতিহাসের একটি আঙ্গিক হিসাবে কাজ করে। ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে বলশেভিক বিপ্লবের পর সমস্ত পৃথিবীটা আস্তে আস্তে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের (East and West) বিরোধ একটা প্রতিষ্ঠানিক রূপ পাচ্ছিল। এর মধ্যে কূটনীতি নামক ইতিহাসের একটা বড় আঙ্গিক কেমন করে বদলাচ্ছিল তা না জানলে মানবসমাজের আন্তর্জাতিক দেওয়া নেওয়ার প্রেক্ষিতটা আমরা বুঝতে পারব না। সেটা বোঝাই আমাদের বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য। আরেকটি কথাও এর সঙ্গে বোঝা দরকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে কূটনীতির বেশির ভাগটাই ছিল গোপন আলাপ-আলোচনার ধারা। এই গোপনীয়তা, শিবিরে শিবিরে সন্দেহ ও সংঘাত, আড়ালে আড়ালে সমর-সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুতি বিশ্বযুদ্ধকে ডেকে নিয়ে এসেছিল। এর থেকে বের হয়ে আসার একটা ধারাও ছিল। তার মধ্যে কি নতুন কোন কূটনীতির আভাস আমরা দেখতে পাই? এ আভাস কি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই দেখা দিয়েছিল? সে আভাস কি কোনদিন পরিণতি লাভ করেছিল? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজব এই এককের পাঠশালায়? এই খোঁজার মধ্য দিয়ে জাগবে ইতিহাসের নতুন বোধ। এই বোধকে জাগানোই এই এককের উদ্দেশ্য।

৩.৩.১ প্রস্তাবনা

বিবদমান দুই দেশের মধ্যে একটি সম্পর্ক হল লড়াইয়ের সম্পর্ক যার একটি চরম ও উৎকট পরিণতি হতে পারে যুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধ একটি অভিশাপ। তা মানবসমাজের পক্ষে কোনদিন মঙ্গলের হয়নি, হতেও পারেনা। তার কারণ যুদ্ধ একটি আপৎকালীন ঘটনা, মানুষের লোভ-ঈর্ষা-দ্বেষ ও দম্ভের এক চরম পরিণতি। তাই যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখতে হয় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে, লোভ ও ঈর্ষাকে সংযত করে, দ্বেষ ও দম্ভকে প্রশমিত করে। কূটনীতি হল একটি আলাপ-আলোচনা, একটি দেশের মৌলিক স্বার্থ ও চাহিদার সাথে অন্যদেশের মৌলিক স্বার্থ ও চাহিদার সামঞ্জস্য বিধান। প্রত্যেক দেশ তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শান্তি চায়, অর্থাৎ চায় আক্রমণ থেকে অব্যাহতি (immunity)। তার জন্য তার দরকার হয় মিত্রশক্তির (ally)। শান্তি, মৈত্রী ও আক্রমণ থেকে অব্যাহতি এই তিনকে সামনে রেখে একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার রূপে কাজ করে কূটনীতি।

ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে কূটনীতির প্রথম উদ্ভব হয়েছিল 'ইতিহাসের ঊষাকালে' ('at the dawn of history') যখন নর-বানররা (anthropoid) গুহাবাসী হয়ে শিকার-সন্ধানী হতে শুরু করেছিল তখন থেকে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে এক একটি এলাকার নর-বানর গোষ্ঠীর শিকারের এলাকা ভাগ করে নেওয়া উচিত আপসের মাধ্যমে, লড়াই আর পারস্পরিক হত্যার মধ্য দিয়ে নয় ['There came a stage when the anthropoid apes inhabiting one group of caves realised that it might be profitable to reach some understanding with neighbouring groups regarding the limits of their respective hunting territories"— Harold Nicolson, *The Evoution of Diplomatic Method.*]

এইভাবে আপসের বোধ থেকে কূটনীতির সূত্রপাত। আর কূটনীতির প্রথম নীতি—প্রতিপক্ষের প্রতিনিধিকে হত্যা করা যাবে না। স্থির হল তখনই যখন নর-বানর বা আদিম মানুষ বুঝতে পারল যে আপস ও সন্ধির জন্য এগিয়ে আসা বিরোধীপক্ষের প্রতিনিধিকে হত্যা করলে কোন লাভজনক পরিস্থিতিতে উপনীত হওয়া যায় না। ["It must have been soon realised that no negotiation could reach a satisfactory conclusion of the emissaries of either party were murdered on arival —ঐ] এর থেকে জন্ম নিল সেই নীতি—দূত

অবধ্য। প্রতিপক্ষের প্রতিনিধিকে হত্যা করা যাবে না। এইভাবে যে নীতির প্রতিষ্ঠা হল তা হল কূটনৈতিক অব্যাহতির নীতি ["Thus the first principle to become finally established was that of diplomatic immunity"—ঐ] এরপর যখন ধর্মের আবির্ভাব ঘটল তখন কূটনীতিকে ধর্মের সাথে বেঁধে দেওয়া হল। ধর্মের স্বার্থরক্ষা তখন কূটনীতির লক্ষ্য হল। ধর্মের অনুশাসনও কূটনীতির মধ্যে আরোপিত হল আর একটা নৈতিকতার আবরণের মধ্যে এনে যুদ্ধের ভয়াবহ নৃশংসতাকে স্তব্ধ করার চেষ্টা হল। সে চেষ্টা আজও চলেছে, অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষ ভাবে, যেমনটি আমরা দেখি বর্তমান যুগের জেনেভা কনভেনশনে (Geneva Convention)।

কূটনীতির সবচেয়ে বড় তাত্ত্বিক ভাষ্যকার হ্যারল্ড নিকলসন (Harold Nicolson) বলেছেন যে ইউরোপে কূটনীতির বিবর্তনে তিনটি ধারা আছে—গ্রীক ও রোমান ধারা, ইটালীয় ধারা, ফরাসী ধারা। সনাতন কাল থেকে সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত কোন স্বতন্ত্র ব্রিটিশ বা জার্মান বা রুশ ধারা ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেননি। গ্রীক ও রোমানরা প্রথম আন্তর্জাতিক দেওয়া নেওয়ার কলকব্জা ("apparatus of international intercourse') তৈরি করেছিল। পরভূমে স্থায়ীদূত বা কনসাল (consul) নিয়োগের ব্যবস্থা তারাই করেছিল। তারাই এই প্রথা চালু করেছিল যে আন্তর্জাতিক আলাপ-আলোচনার থেকে যদি কোন চুক্তির (Treaty) উদ্ভব হয় তবে তা পাষাণ ফলকে খোদাই করে রাখা হবে।

রোমানরা কোনদিন পেশাদারী কূটনীতিকে (professional diplomacy) বুঝতে পারেনি, কারণ তাদের অখণ্ড ও বৃহৎ সাম্রাজ্যের বড়মাপের প্রতিপক্ষ ছিল না। ফলে আন্তর্জাতিক দেওয়া-নেওয়া লুকোচুরি কিছু ছিল না। রোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাওয়ার পর জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হল। আরম্ভ হল একদেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে অন্য দেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সামঞ্জস্যবিধান (adjusting rival claims), জাতীয় নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত করা, শত্রুকে এড়িয়ে যাওয়া বা প্রশমিত করার প্রয়াস, বন্ধু খোঁজার তৎপরতা। এইবার কূটনীতি শাণিত হল। গ্রীকদের নগররাষ্ট্র (City-state) আর মধ্যযুগের ইউরোপের জাতীয় রাষ্ট্র (national state) এক নয়। রোমানদের অখণ্ড সাম্রাজ্যের অটল সার্বভৌমত্ব গ্রীক নগররাষ্ট্রের সঙ্কীর্ণতা ও ষড়যন্ত্রপ্রিয়তাকে ঢেকে দিয়েছিল। সেই সার্বভৌমত্ব যখন তলিয়ে গেল, যখন সেই টুকরো হয়ে যাওয়া সার্বভৌমত্বের ভগ্ন অংশের আধার হয়ে রইল জাতীয় রাষ্ট্রগুলি তখন কূটনীতির রূপ বদলাতে লাগল। পোপ ঐতিহ্য ক্ষমতার জন্য লড়াইতে নামলেন, সম্রাট ধর্মীয় নেতার মহিমা কেড়ে দিতে চাইলেন; পবিত্র রোমান সম্রাট (Holy Roman Emperor) আর ঐতিহ্য ঐক্যের প্রতীক রইলেন না, খ্রীষ্টতন্ত্রের সর্বজনীন সংহতি (Universal Unity of Christendom) ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এবার জাতীয় রাষ্ট্রের সাথে জাতীয় রাষ্ট্রের দেওয়া-নেওয়ায় অনেক জটিলতা-কুটিলতা দেখা দিল। কূটনীতি এখন অনেক কৌশল, বুদ্ধি, গণনা ও আদান-প্রদানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। কূটনীতি হয়ে দাঁড়াল রাষ্ট্র পরিচালনার একটি শাখা (diplomacy became one of the branches of statesmanship)। ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি শহরগুলি উদীয়মান অটোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক ছলাকলা আয়ত্ত করে ফেলেছিল। তারাই প্রথম পররাষ্ট্র নীতির পরিচালনার জন্য সরকারের একটি বিশেষ দপ্তর খুলেছিল। তাদের কাছ থেকে কূটনীতির রীতি ও নীতি শিখেছিল ভেনিস (Venice)। আর ভেনিসের কাছ থেকে শিখেছিল সারা ইউরোপ—প্রথমে ইটালীর ছোট ছোট রাজ্যগুলি এবং পরে ইটালীর বাইরে বড় রাজ্যগুলি। আর ভেনিসের সবচেয়ে পরিপূর্ণ কূটনৈতিক শিক্ষা এসেছিল বাইজানটাইন সাম্রাজ্য থেকে ("It was the Byzantines who taught diplomacy to Venice; it was the Venetians who set the pattern for the Italian cities, for France and Spain, and eventually for all Europe"—Harold Nicolson)। বাইজানটাইনদের কাছ থেকে ইটালীয়রা শিখেছিল কূটনীতিতে প্রোটোকল ও আনুষ্ঠানিকতা (protocal and ceremonials)। আর তার সঙ্গে তারা মিশিয়েছিল তাদের কূটনীতি—ছোট ছোট নগররাষ্ট্রের ক্ষুদ্র স্বার্থের লড়াই, তার ছলাকলা। দীর্ঘস্থায়ী নীতির মূল্য ("value of long-term policies) কিংবা ধীরে ধীরে প্রতিপক্ষের

বিশ্বাসভাজন হওয়ার নীতির ("policy of the gradual creation of confidence") গুরুত্ব তারা বুঝত না। রোমানদের ছিল বিরাট সাম্রাজ্য, বিরাট প্রতিপত্তি, দুর্ধর্ষ প্রভাব। সেখানে ক্ষুদ্রস্বার্থের কূটনীতি, স্বল্পসময়ের মুনাফা (short-term gain) ভিত্তিক আদানপ্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক ছলাকলা অনুপস্থিত ছিল। তা এল যখন বিরাট এবং অখণ্ড সাম্রাজ্যের ছত্রছায়া অপসারিত হল আর তার স্থানে দেখা দিল ছোট ছোট জাতীয় রাষ্ট্র (national states) এবং আরও ছোট নগররাষ্ট্র (city-states)। জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের সময় থেকে ক্ষুদ্রস্বার্থের কূটনীতি পঞ্চদশ শতাব্দীতে এসে ইটালীয় সঙ্কীর্ণ রাজনীতির মধ্যে তার পরিণতি লাভ করে ("Yet the diplomatic method that emerged from the fifteenth century was essentially an Italian Method"—Harold Nicolson)। জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব থেকে পরিবর্তিত হয়ে ইটালীয়দের হাতে যে কূটনীতি আত্মপ্রকাশ করল তা শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিরাট ঝুঁকি নেওয়ার খেলা, স্বল্পমেয়াদী মুনাফা আর প্রত্যক্ষ সাময়িক স্বার্থের প্রতিপালনমাত্র যা পরিচালিত হত উত্তেজনার মধ্য দিয়ে আর সেখানে ধূর্ত কুটিল ও নির্দয় মনেরই সমন্বয় ঘটত ("To them the art of negotiation became a game of hazard for high immediate states, it was conducted in an atmosphere of excitement, and with the combination of cunning, recklessness and ruthlessness"—Harold Nicolson)।

৩.৩.২ প্রারম্ভিক কথা

ওপরের আলোচনা পাঠ করলেই বোঝা যাবে যে সেটি হচ্ছে মূলতঃ হ্যারল্ড নিকোলসনের (Harold Nicolson) দেওয়া কূটনীতির বিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা। হ্যারল্ড নিকোলসনের ইদানীংকালের কূটনীতির বিবর্তনের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্রতীচ্য ভাষ্যকারদের মধ্যে একজন এবং প্রাচীন কূটনীতি (Old diplomacy) এবং নয়া কূটনীতির (New diplomacy) পার্থক্যের আলোচনায় তাঁর মতটিকেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। বলা যেতে পারে যে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কূটনীতির ধারা হল প্রাচীন কূটনীতির ধারা। গ্রীক, রোমান ও ইটালীয় ধারার সাথে ফরাসী কূটনীতিক চিন্তা মিশে এই ধারাকে সৃষ্টি করেছিল। রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার অনেকদিন পরে ইউরোপে দুটি শক্তি মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল—একটি হল প্যাপাসি (Papacy) বা পোপতন্ত্র, আরেকটি হল হোলি রোমান এম্পেরর (Holy Roman Emperor) বা পবিত্র রোমান সম্রাটের শাসনতন্ত্র। ফ্রান্সের সম্রাট একাদশ লুই (Louis XI) ফ্রান্সকে একটি তৃতীয় শক্তিতে পরিণত করেন। ১৪৬১ থেকে ১৪৮৩ সালে তাঁর রাজত্বের মধ্যে তিনি ইউরোপের কূটনীতিতে বিপর্যয়কর পরিবর্তন এনেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল ''সাফল্য যাঁর আছে সম্মান তাঁরই" ("he who has success has honour")। নীতি, প্রতিশ্রুতি, চুক্তি, অঙ্গীকার এগুলির কোন গূঢ় মূল্য নেই। স্বার্থের প্রয়োজনে চুক্তি করা যায়, স্বার্থের প্রয়োজনে তা ভাঙ্গা যায়। ধূর্ত ও বিবেকহীন (cunning and unscrupulous) এই মানুষটি তাঁর রাজত্বকালে অনেক চুক্তি করেছেন এবং অনেক চুক্তি ভেঙ্গেছেন এবং তার দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে বাস্তব পরিস্থিতির যৌক্তিকতা নৈতিকতার থেকে বড় ("... the raison d'etat was above morality...")। এই বোধকেই পরে সূত্রাকারে প্রকাশ করেছিলেন ইটালীর রাষ্ট্রদার্শনিক ম্যাকিয়াভেলি (Machiavelli)। তিনি ইউরোপের রাজনীতিতে এই সূত্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে লক্ষ্যই হচ্ছে আসল, কোন পথে, কোন মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে তা গৌণ, অর্থহীন। তাঁর রচিত 'দ্য প্রিন্স' (The Prince) নামক গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন ঃ ''আমি বিশ্বাস করি যে রাষ্ট্রের জীবনে যদি আশঙ্কা নেমে আসে তবে রাজতন্ত্রই হোক বা প্রজাতন্ত্রই হোক, রাষ্ট্রের সংরক্ষণের জন্য বিশ্বাস ভঙ্গ করবে এবং অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করবে।" ("I believe that when there is fear for the life of the state, both monarchs and republics, to preserve it, will break faith and display ingratitude.")। দুটি কথা মনে রাখা দরকার। এক, মধ্য যুগ থেকে কূটনীতি বিবর্তিত হয়েছিল দুধরণের পরিবেশের মধ্য দিয়ে, নিদারুণ ধর্মীয় যুদ্ধ ও নগররাষ্ট্রের অবস্থান, আর এই দুইই সরল

এবং সবল কূটনীতির গড়ে ওঠার পক্ষে সহায়ক ছিল না। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার সাথে মিশে নগররাষ্ট্রের সঙ্কীর্ণতা, ষড়যন্ত্রপ্রবণতা, সন্দেহপ্রবণতা ও বিশ্বাসহীনতা ইত্যাদির জটিল ধারা কূটনীতিকে আড়ষ্ট, নির্দয় ও নিষ্প্রাণ করে তুলেছিল। এই পরিবেশ থেকে কূটনীতিকে বাঁড়িয়েছিলেন ওলন্দাজ আইনজ্ঞ ও পণ্ডিত *উগোগ্রোসিয়াস* (Hugo Grotius 1583-1645)। তিনি বলেছিলেন যে ধর্মীয় লড়াই—কে ক্যাথলিক কে প্রট্যোন্ট–এই নিয়ে রক্তক্ষয়ী উন্মাদনায় গিয়ে লাভ নেই, কারণ এর দ্বারা পরস্পরের ঘাতপ্রত্যাঘাত ছাড়া আর কোন ফল লাভ হয় না। তার থেকে মোহাচ্ছন্ন ভাবনা—dogma কে —বাদ দিয়ে যদি শান্ত মনে ভেবে অনুসরণীয় কর্মসূচী ঠিক করে পরস্পরের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করা যায় তবে মানবসমাজের মঙ্গল হবে। এইভাবে শান্ত পরিবেশে সুস্থিত কূটনীতির কথা বল্লেন গ্রোসিয়াস। তাঁর বই *যুদ্ধ ও শান্তি সম্বন্ধে আইনের বিষয়* [De Jure Belli ac Paeis যার ইংরাজী হল *Concerning the Laws of War and Peace*) [১৬২৫ সালে প্রকাশিত] একটি বিধিসম্মত কূটনীতির পরিকাঠামো তৈরি করেছিল। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর থেকে ধীরে ধীরে কূটনীতিতে এইসব নিয়ম ও নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গ্রোসিয়াস যে কূটনীতির কথা বলেছেন তার চারটি নীতি প্রধান—(১) যুদ্ধ করতে হবে ন্যায়সঙ্গত কারণে — 'for a just cause'— এবং একান্তভাবে আত্মরক্ষার জন্য ; (২) পরাজিতের ওপর ততটুকু ক্ষতিই চাপিয়ে দেওয়া যাবে যতটুকু শুধু প্রয়োজন; (৩) জনগণের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক নির্ধারিত হবে শুধুমাত্র বলপ্রয়োগের দ্বারা নয় কারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে যেমন একটা ন্যায়ের (justice) দিক আছে সেই রকম রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ন্যায়নীতির একটা দিক থাকে। (৪) একটা সার্বভৌম শাসকের প্রকৃত শক্তি নিহিত থাকে চুক্তিপালনের মধ্যে, চুক্তি ভঙ্গের মধ্যে নয়। অতএব একজন শাসক বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন চুক্তিকে সংরক্ষণ করে, শান্তিপূর্ণ আদান প্রদানের পথকে প্রশস্ত করে। এই নীতিগুলিকে জ্ঞানকোষের (Book of knowledge) ভাষ্যকাররা 'counsels of perfection' বলেছেন।

উগো গ্রোসিয়াসের মত আরেকজন ব্যক্তিও সনাতন কূটনীতির ধারাকে পরিশীলিত করেছিলেন। তিনি হলেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী কার্ডিনাল রিশলে (Cardinal Richelieu 1585-1642 —উচ্চারণ rēsh'lyê)। এই কঠিন, নির্দয় ও রাগী মানুষটি কুড়ি বছর ক্ষমতায় ছিলেন এবং তাঁর আমলে ফ্রান্স কূটনীতির নানা সাফল্য অর্জন করেছিল। তিনি তাঁর সমকালীন মানুষদের শিখিয়েছিলেন যে রাষ্ট্রের স্বার্থই প্রধান ও চিরন্তন এবং তা সমস্ত আবেগ, আদর্শ ও তত্ত্বগত আচ্ছন্নতার ওপরে— "... the interest of the State was primary and eternal; and that it was above sentimental, ideological and doctrinal prejudices and affections.")। তাঁর সমস্ত দূতদের (ambassadors) তিনি শিখিয়েছিলেন যে চুক্তি হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। প্রথম পর্যায়ে আলাপ আলোচনা (negotiation), দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বাক্ষর (signing of the treaty) এবং তৃতীয় পর্যায়ে অনুমোদন (ratification)—এই তিন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যে দলিল নিশ্চিত হয় তাকে মর্যাদা দেওয়া সবচেয়ে বড় কর্তব্য। এর পরের কথা আরও গুরুত্বপূর্ণ। যে সব উপাদান নিয়ে কূটনীতি গঠিত হয় তার সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণটিই হল নিশ্চিতি। রিশলে ক্ষমতায় এসেছিলেন ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে। সেই সময় থেকে ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব পর্যন্ত একশত ষাট বছর ইউরোপে কূটনীতিক ব্যবস্থা ও আদব-কায়দা যা চালু ছিল তা হল ফ্রান্সের মডেলে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা। [" ... the diplomatic method of France became the model for all Europe"—Harold Nicolson.]। ফ্রান্সের কূটনৈতিক মডেলটি সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর [জন্ম ১৬৩৮, রাজত্বকাল ১৬৪৩-১৭১৫] সময়ে পরিণতি লাভ করে। মডেলটি এই রকম ঃ

১। কূটনৈতিক কাজের বিস্তার (elaborate diplomatic service)।

২। রোম, ভেনিস, কনস্টান্টিনোপল, ভিয়েনা, হেগ, লন্ডন, মাদ্রিদ, লিসবন, মিউনিক, কোপেনহাগেন, বার্ন ও অন্যান্য বহু অঞ্চলে দূতাবাস স্থাপন—অর্থাৎ দেশে দেশে স্থায়ী দূতাবাস স্থাপন।

৩। প্রয়োজন বোধে দেশে দেশে বিশেষ দূত (Special Missions) প্রেরণ।

৪। দূতদের নিয়মিত আদেশ ও পরামর্শ প্রেরণ (Instruction to ambassadors)

৫। কূটনৈতিক স্টাইলের ওপর গুরুত্ব আরোপ (importance attached to style)

৬। কতিপয়ের দ্বারা কূটনীতি নিয়ন্ত্রণ (diplomacy to be handled by a few) [চর্তুদশ লুই মুক্ত আলোচনায় 'open negotiations'-এর বিরোধী ছিলেন]।

জাতীয় রাষ্ট্র ও নগর রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক আদান-প্রদানের যে সঙ্কীর্ণ মনোভাব, সে সন্দিগ্ধতা, যে প্রতিযোগিতা জর্জর স্বার্থান্বেষণের চেষ্টা তা এসেছিল ইটালির কাছ থেকে। ফ্রান্স দিয়েছিল কূটনীতির প্রকরণ বা পদ্ধতি। চতুর্দশ লুই-এর সময় থেকে ইউরোপীয় কূটনীতিতে ফরাসী প্রভাব প্রধান ও সর্বজনীন হয়ে দাঁড়ায় ["... it was during the reign of Loui XIV that French influence on diplomatic method became predominant and Universal." — Harold Nicolson]

৩.৩.৩ উনিশ শতকে কূটনীতির বৈশিষ্ট্য

ইউরোপের কূটনীতির প্রবহমান ধারা উনিশ শতকে এসে বিভাজিত হল। একটি ধারা হল পবিত্র মৈত্রীর (Holy Aliance) ধারা, আর অন্যটি হল কংগ্রেস ও কনফারেন্সের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার বাস্তব ভিত্তি নির্ণয়ের ধারা ("Two conflicting schemes were put forward which were often confused with each others. Thefirst was that of the Holy Allience, ..." । "The Alliance was followed by a rea attempt in congres and conference to bring about a practical international cooperation ..." —D. M.Ketelbey. *A History of Modern Times* From 1789 TO THE PRESENT DAY] পবিত্র মৈত্রী (Holy Alliance) চিরায়ত ইউরোপীয় কূটনীতির ধারার মধ্যে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারেনি, কিন্তু কিছুটা ধর্মীয় সততাকে সামনে রেখে ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে একটি নতুন বন্ধন আনতে চেয়েছিল। খ্রীষ্টধর্মের "সবচেয়ে পবিত্র অক্ষয় ত্রয়ীর নামে" ("in the name of the most Holy and Indissoluble Trinity") ইউরোপের শাসকরা "পবিত্র ধর্মের নিগূঢ় সত্যকে" ("the sublime truths of Holy Religion") তাঁদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কাজে ব্যবহার করার অঙ্গীকার করলেন। তাঁরা জানালেন যে "একটি সত্য ও অক্ষয় সৌভ্রাত্রের বন্ধনে আবদ্ধ ("united in bonds of a true and indissoluble fraternity") ভাইদের মত এবং এক মহৎ খ্রীষ্ট্রীয় জাতির সদস্যরূপে ("like members of one great Christian nations") তাঁরা তাঁদের পরস্পরের সেবায় নিযুক্ত থেকে নিজেদের প্রজাবর্গেরর কল্যাণ সাধন করবেন। শুধু তাই নয় তাঁরা স্বীকার করে নিলেন যে "পৃথিবীতে একমাত্র তিনি (ঈশ্বর) ছাড়া আর কোন সার্বভৌম শাসক নেই—তাঁর কাছেই সমস্ত ক্ষমতা নিমজ্জিত" ("the world has in realiy no other sovereign than Him to whom alone all power really belongs.")। এই ধরনের ঈশ্বর ও ধর্মভিত্তিক আদর্শবাদ ইতিপূর্বে ইউরোপের কূটনীতিতে আর কখনো এমনভাবে ঘোষিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার ছাড়া আর কোন শাসকই পবিত্র মৈত্রীকে একটা গ্রাহ্য বিষয় বলে মনে করেননি। ইংল্যান্ডের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ক্যাসেলরি (Castlereagh) এই মৈত্রীকে "একটি নিগূঢ় রহস্যবাদ ও নিরর্থকতা" ("a piece of sublime mysticism and nonsence") বলে বর্ণনা করেছিলেন। মেটারনিক (Metternich) [১৭৭৩-১৮৫৯] এই মৈত্রীকে একটি 'উচ্চ ঘোষিত শূন্যতা' ("loud-sounding nothing") বলে উল্লেখ করেছেন। পবিত্র মৈত্রীর উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় শাসকদের খ্রীষ্টীয় আদর্শে উদ্দীপিত একটি ভ্রাতৃত্বকে ("a brotherhood of sovereigns inspired by Christian ideals") গড়ে তোলা। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যা আত্মপ্রকাশ করল তা হল অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর প্রিন্স মেটারনিকের নেতৃত্বে বৃহৎ শক্তিগুলির একনায়কতন্ত্র ("dictatorship of the Great Powers') । ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের

নভেম্বর মাসে রাশিয়া, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও গ্রেট ব্রিটেন চতুঃশক্তি মৈত্রী (QuadrupleAlliance) স্বাক্ষর করল। তারপর থেকে ১৮১৮ থেকে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এইক্স-লা-স্যাপেল (Aix-la-Chapelle, ১৮১৮), ট্রোপো (Troppan, ১৮২০) লাইব্যাক (Liabach, ১৮২১) এবং ভেরোনার (Verona ১৮২২) কংগ্রেসের অধিবেশনের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদ, গণউত্থান, বিপ্লব ইত্যাদি সমস্ত সম্ভাবনার বিরুদ্ধে ইউরোপীয় বৃহৎশক্তির শাসকরা একটি জোট গড়ে তুললেন। এই জোট হল একটি মহাদেশীয় সংগঠন—ইউরোপীয় জোট (concert of Europe) যার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও শান্তির পরিবেশ রচনা করার চেষ্টা হয়েছিল। জাতীয় রাষ্ট্রগুলির দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জনিত দ্বন্দ্বের ফলে কূটনীতিতে যে আন্তর্জাতিক তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা হল শক্তি সাম্যের তত্ত্ব (theory of the balance of powers)। ইউরোপীয় জোটের মধ্য দিয়ে নতুন একটি শক্তির সমবায় গঠিত হতে পারত যা ইউরোপীয় কূটনীতিতে শক্তিসাম্যের এক সমান্তরাল ধারণার জন্ম দিতে পারত। কিন্তু ইউরোপীয় জোট ছিল ক্ষণস্থায়ী। ইংল্যান্ডের সরে আসার ফলে এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলির নিজেদের মধ্যে সন্দেহ ও দ্বন্দ্বের ফলে সেই জোট ভেঙ্গে যায়। কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে জোট গড়ার কূটনীতিকে ডেভিড টম্পসন (David Thompson) Europe Since Nepoleon) 'কংগ্রেস কূটনীতি' ('Congress Diplomacy') বলেছেন। এই কূটনীতি শেষ পর্যন্ত মেটারনিক ও ব্রিটেনের অনুসৃত শক্তি সাম্যের নীতির সঙ্গে জার আলেকজান্ডার কথিত পবিত্র মৈত্রীর নীতির মধ্য দিয়ে জোটবদ্ধ হস্তক্ষেপের নীতির পার্থক্যকে জোরের সঙ্গে স্পষ্ট করে তুলেছিল ("The only other result of the Congress was to emphasize the continued contrast between the 'balance of power' policies of Metternich and Britain, and the 'Holy Alliance' policies of concerted intervention favoured by Russia"—David Thompson)।

এ কথা মনে রাখা দরকার যে ১৮১৫ সালের ভিয়েনা সম্মেলনের সামনে চ্যালেঞ্জ ছিল বিরাট-ফরাসী সামরিকতা (French Militarism) থেকে ইউরোপকে বাঁচাতে হবে এবং উদারনৈতিকতা (liberalism) জাতীয়তাবাদ (nationalism) নামক দুই নবোদ্ভূত বিভীষিকা থেকে রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ত্রাণ করে বিপ্লবের বাতাবরণের বাইরে ভিন্নতর সুস্থিতির মধ্যে তাকে পুনর্বাসিত করতে হবে। তাই ইউরোপের কূটনীতির মধ্যে ন্যায়নীতি বা Legitimacy-র কথা জোর দিয়ে বলতে হয়েছিল এবং তার আবরণে কায়েম করতে হয়েছিল রাজতান্ত্রিক শাসনের ইস্তাহার বা কোনভাবেই জনগণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার অনুসারী ছিল না। স্যার হ্যারোল্ড নিকোলসনের (Sir Harold Nicolson) মতকে সমর্থন করে ঐতিহাসিক সিম্যান (L.C.B Seaman, *From Vienna to Versailles*) বলেছেন যে ১৮১৫ সালের ভিয়েনা সম্মেলনে সমবেত হওয়া কূটনীতিবিদদের সম্বন্ধে প্রথম মতটিকে আমরা বর্জন করতে পারি—তা হলো যে এই কুটনীতিবিদরা কূটনীতির বাজারে ছিলেন ক্ষুদ্রপণ্য বিক্রেতা ভাড়াটে ফেরিওয়ালা যারা লক্ষ লক্ষ জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে সুরভিত হাসির দ্বারা বিকিয়ে দিয়েছিলেন ("mere hucksters in the diplomatic market, batering the happiness of millions with a scented smile.)। আমরা গ্রহণ করতে পারি দ্বিতীয় মতটি যে মত অনুযায়ী ভিয়েনার ''কূটনীতিবিদরা রুখে দিয়েছিলেন এক শতাব্দী পরিমাণ সময়ে জন্য একটি বৃহৎ ইউরোপয় যুদ্ধকে' ("they did in fact present a general *European Configuration for a whole century of time."*)। একদিকে এই বৃহৎ ইউরোপীয় যুদ্ধ ঠেকানোর এবং অন্যদিকে উদারনীতি ও জাতীয়তাবাদের সংক্রামক আদর্শকে রোধ করার ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য নিয়ে উনিশ শতকের প্রারম্ভে কূটনীতি তার যাত্রা শুরু করেছিল। হাতিয়ার হিসাবে নিতে হয়েছিল খ্রীষ্টীয় ধারণাকে, নিতে হয়েছিল রাজতান্ত্রিক ঐক্যের প্রতিশ্রুতিকে, অগ্রসর হতে হয়েছিল কখনো বা জার আলেকজান্ডারের স্ফটিকস্বচ্ছ আদর্শবাদের পথে, কখনো বা কংগ্রেসের উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে ক্যাসেলরি ও মেটারনিকের প্রদর্শিত প্রতিক্রিয়াশীল পথে। কিন্তু যাই ঘটুক না কেন উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয় কূটনীতিতে এক সর্ব ইউরেপীয় মন গড়ে উঠেছিল। পবিত্র মৈত্রী (Holy Alliance) ইউরোপীয় কূটনীতির মধ্যে এক নৈতিক মনন এনে দিয়েছিল যে নৈতিক মনন পরবর্তীকালে নয়া

কূটনীতির আবির্ভাবের সহায়ক হয়েছিল। আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে নৈতিকতার উপস্থাপনা এবং একটি ইউরোপীয় বিবেকের উন্মীলন, ঐতিহাসিক লিপসনের ভাষায় শেষ পর্যন্ত পবিত্র মৈত্রীর দান ("The Holy Alliance was nominally, then, an attempt to apply the principles of morality to international diplomacy,in others words to create in Europe a political conscience"—*E. Lipson, Europe in the 19th & 20th Centuries.*)।

৩.৩.৪ উনিশ শতকের কূটনীতিতে গোপনীয়তার সবিশেষ অভ্যুদয়

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয় কুটনীতি দুটি কাজ করে উঠতে পারেনি—এবং পবিত্র মৈত্রীর স্বচ্ছ প্রাণকে একটি শরীরী অবয়বে ঢেকে দিতে ("to provide the transparent soul of the Holy Alliance with a body") পারেনি। আর, দুই উদারনৈতিকতা ও জাতীয়তাবাদকে রুখে দেওয়ার জন্য যে ইতিবাচক কূটনীতির প্রবর্তন করতে হয় তাকে ভিয়েনার কূটনীতিবিদরা জন্ম নিতে পারেনি। তাঁরা ভিয়েনাতে যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন তাতে ইউট্রেক্টের চুক্তি (Treatry of Utrectt, ১৭১৩, এই চুক্তির দ্বারা স্পেনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান হয়েছিল।) বা ভার্সাই চুক্তির মত কোন দেশের বা কোন জাতির অন্তঃকরণে কোন যন্ত্রণার উদ্রেক হয়নি। ইউট্রেক্টের চুক্তি হ্যাপসবার্গদের (Hapsburgs) মনে জ্বালা ধরিয়েছিল এবং তার বাণিজ্যিক শর্তগুলি ভবিষ্যতে ফ্রান্স ও স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহস জুগিয়েছিল। ভার্সাইচুক্তি (১৯১৯) জার্মানিকে নির্মমভাবে আঘাত করেছিল এবং নিজের জঠরে আরেকটা বড় যুদ্ধের বীজকে ধারণ করে রেখেছিল অত্যন্ত সংগোপনে। সে অর্থে ভিয়েনার কূটনীতি কোন বড় যুদ্ধের সম্ভাবনাকে উৎসাহ দেয়নি, কিন্তু সে যা করেছিল তা হল প্রগতির পথকে অবরুদ্ধ করে দিয়েছিল। বলা হয়ে থাকে যে ভিয়েনার কূটনীতিকরা সময়ের ঘড়িকে পিছিয়ে দিতে চাননি, তাঁরা পরবর্তী অর্ধশতাব্দীর জন্য তাকে ১৮১৫ তেই আটকে রাখতে চেয়েছিলেন ("The fault of the Vienna statesmen is not that they put the clock back in 1815 ... their error was that they hoped to keep teh clock stopped at 1815 for the next half a century"—L.C.B.Seaman, *From Vienna to Versailles)*। কিন্তু ঘটনার প্রবাহ এগিয়ে গিয়েছিল থেমে থাকেনি। তাই একটা পর্যায়ের পর—মূলতঃ ১৮৭০ এর পর-ইউরোপের কূটনীতিকে দ্রুত বদলাতে হয়েছিল পরিবর্তনশীল ঘটনার প্রবাহের সঙ্গে তাল রাখার জন্যে। ১৮৭০ সালে শেষ হয়েছিল ইতিহাসের একটা অধ্যায় যে অধ্যায়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গঠনশীল আন্দোলন (formative movements) পরিণতির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। আর তার থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছিল ঐক্যবদ্ধ জার্মান সাম্রাজ্য, ইটালীর ঐক্যবদ্ধ রাজা, তৃতীয় প্রজাতন্ত্র ও দ্বৈতরাজতন্ত্র (Dual Monarchy)। এর মধ্যে জার্মানিই ছিল ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি শক্তিশালী সামরিক সাম্রাজ্য। ঐক্যবদ্ধ হলেও এ সাম্রাজ্য তখন পর্যন্ত ছিল একটি ভ্রূণের মত অপরিণত। এর একটি একাগ্র রাজনৈতিক সত্তা তখনও সৃষ্টি হয়নি ("But as yet the new state existed only in an embryonic form. It lacked a corporate political existence"— Lipson)। এদিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ঘটনা থেকে এ সাম্রাজ্যে এসেছিল নতুন বিপন্নতা। ফ্রান্সকে পরাজিত করে (সেদানের যুদ্ধে ১৮৭০ সালে) তার কাছ থেকে আলসাস-লোরেন (Alsace-Loeraine) কেড়ে নিয়ে জার্মান সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছিল। সেদানের যুদ্ধের পরাজয়কে ফরাসীরা শেষ কথা, ইতিহাসের অপরিবর্তনীয় রায় বলে মেনে নেয়নি। এ কথাও মেনে নেয়নি যে আলসাস-লোরেনের হস্তচ্যুতি একটি অলঙ্ঘনীয় বিধান। এর পর থেকে ফরাসীদের অন্তরের অদম্য কথাটি হল revanche—প্রতিশোধ। আলসাস-লেরেন জার্মানির কাছে হয়ে দাঁড়াল ফরাসী বন্ধক (French Mortgage)। একজন জার্মান ঐতিহাসিক লিখেছেন যে ''শুরু থেকেই জার্মান সাম্রাজ্যের কাঠামো একটি ফরাসী বন্ধকের দ্বারা ভারাক্রান্ত ছিল কারণ যে কোন বিদেশী শত্রু এর পর থেকে নিঃশর্তভাবে ফরাসী সমর্থনের ওপর নির্ভর করতে পারত ("from the very outset the new structure of the German Empire

was burdened as it were by a French mortgage, since every foreign foe could henceforth reckon unconditionally on French support.")। ফ্রান্সে তখন প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। সেখান থেকে বিপ্লবের হাওয়া এসে জার্মানির রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাজনো বাগানকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারত। বিসমার্ক তাই বলেছিলেন, ''আমরা চাই ফ্রান্স আমাদের শান্তিতে থাকতে দিক" ("We want France to leave us in peace.")। তাঁর লক্ষ্য ছিল একটাই—যে করেই হোক ফ্রান্সকে নিঃসঙ্গ রাখতে হবে। তিনি বলেছিলেন যে যতদিন না ফ্রান্স তার মিত্রকে খুঁজে পাবে ততদিন সে জার্মানির কাছে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে না।" ("As long as France has no allies she is not dangerous to Germany.") অতএব তাঁর লক্ষ্য হল একটাই—''ফ্রান্সকে বন্ধু পাওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে" ("We have to prevent France finding an ally.")।

বিসমার্কের এই উদ্দেশ্য থেকেই জন্ম নিয়েছিল গোপন কূটনীতি। তিনি অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়া উভয়কেই এ কথা বোঝাতে পেরেছিলেন যে প্যারিস কমিউন, জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাসি এবং নিহিলিজম (রাশিয়াতে আবির্ভূত ধ্বংসের দর্শন) ইউরোপে সব রাজতান্ত্রিক দেশের পক্ষে বিপজ্জনক। এর থেকেই জন্ম নিয়েছিল ড্রেই কাইজার বান্ড বা তিন সম্রাটের লীগ (League of three Emperors, 1872), অস্ট্রো-জার্মান মৈত্রী (Austro German Alliance, 1879) এবং ত্রিশক্তির মৈত্রী (Triple Alliance, ১৮৮২)। মনে রাখতে হবে যে স্ল্যাভ রাশিয়াকে আড়াল করেই অস্ট্রো-জার্মান মৈত্রী সম্পাদিত হয়েছিল আর রাশিয়া মনে করেছিল যে এই মৈত্রী ও ১৮৭৮ সালের বার্লিন কংগ্রেসে জার্মানির ভূমিকা নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর মাত্র। কারণ, ১৮৭০ সালে ফরাসী-জার্মান লড়াইয়ের সময় রাশিয়া জার্মানিকে সমস্ত রকম সাহায্য দিয়েছিল। এবার জার্মানিও গোপনে রাশিয়ার কাছে থেকে সরে গেল। গোপন কূটনীতির ফলে জার্মান ভাষাভাষী মানুষরা নিজেদের সংহতি রচনা করল ঠিকই কিন্তু রাশিয়ার স্ল্যাভরা ঝুঁকে পড়ল ফ্রান্সের দিকে। এরপর থেকে রাশিয়ার স্লোগান হল 'আমরা শক্তিশালী ফ্রান্স চাই' ("We need a powerful France")। ট্রিপলক এ্যালায়েন্সের মুখোমুখি রাশিয়া-ফ্রান্স-ইংল্যান্ডের ট্রিপল আঁতাতের সূত্রপাত এইখানেই। গোপন কূটনীতি সারা ইউরোপকে দুটি সশস্ত্র শিবিরে (armed camp) বিভক্ত করে ফেলে আর তার থেকেই দেখা দিল বিশ্বযুদ্ধ। ১৮১৫ সালে ভিয়েনার চুক্তি যে মহাদেশব্যাপী যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রেখেছিল গোপন কূটনীতি সেই যুদ্ধের দ্বারা অবারিত করে দিল। প্রথম আলেকজান্ডার-স্ল্যাভ রাশিয়ায় জার যে রাজতান্ত্রিক ঐক্যকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন সেই একইরকম প্রতিক্রিয়াশীল ঐক্য বিসমার্কও গড়ে তুললেন তাঁর তিন সম্রাটের লীগের মধ্য দিয়ে। শুধু তফাৎ এই যে জারের পরিকল্পনায় খ্রীষ্টীয় নৈতিকতা ছিল, আর বিসমার্কের ব্যবস্থা ছিল একান্তভাবে বাস্তবতা-নির্ভর নৈতিকতা বিবর্জিত এক সংগোপন তৎপরতা মাত্র। সন্দেহ আর আক্রোশ, প্রতিশোধ স্পৃহা আর অনৈতিকতার আলিঙ্গন এই সবই ছিল গোপন কূটনীতির অন্তর্নিহিত পরিচালিকা শক্তি। এ সমস্ত কিছু থেকে জন্ম নিয়েছিল এক নির্দয় রণপ্রস্তুতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তারই পরিণাম।

৩.৩.৫ নয়া কূটনীতির জন্ম

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ও ধ্বংস থেকে মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে গোপন কূটনীতি মানুষের সভ্যতার পক্ষে কত ভয়ঙ্কর। তাই গোপন কূটনীতিকে পরিহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সময় থেকে। ১৯১৮ সালের ৮ জানুয়ারি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন যুদ্ধের পর শান্তির বনিয়াদ কি হবে তা আলোচনা করতে গিয়ে মার্কিন কংগ্রেসের সামনে একটি বক্তৃতায় চৌদ্দ দফা শর্তের কথা বলেছিলেন। পরে এইটিই ইতিহাসে *Fourteen Points* বা চৌদ্দদফা শর্ত বলে বিখ্যাত হয়। এই শর্তাবলীর প্রথম শর্তই হল 'খোলাখুলিভাবে উপনীত শান্তির খোলা ইস্তাহর' —"Open Covenants of peace, openly arrived at". এই শর্তের মধ্য দিয়ে এইভাবে মুক্ত কূটনীতির ঘোষণা করা হল। এই মুক্ত কূটনীতিই হল নয়া কূটনীতি। এর দ্বারা যে শুধু গোপন কূটনীতির মূলোচ্ছেদের চেষ্টা হল তা নয়, ইউরোপের হাজার

বছরের কূটনীতির অন্তর্নিহিত যে ভাব-রেষারেষি, সন্দেহ, প্রতিযোগিতা, গোপন তৎপরতা—তাকেও বাতিল করার চেষ্টা হল। রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson) তাঁর চতুর্থ শর্তে বলেছিলেন যে গার্হস্থ্য নিরাপত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই প্রত্যেক জাতি তার অস্ত্রশস্ত্র ও সমর সরঞ্জামকে ন্যূনতম বিন্দুতে কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেবে—'Adequate guarantees given and taken that national armaments will be reduced to the lowest point consistent with domestic safety"। গোপন কূটনীতি ও গোপন রণপ্রস্তুতি যে গাঁটছড়া বেঁধে চলে আর তার ফলে যে সন্দেহ ও হানাহানি বৃদ্ধি পায় একথা জেনেই রাষ্ট্রপতি উইলন সমরসম্ভার কমাতে চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি জানতেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পেছনে উপনিবেশ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শক্তিশালী জাতিগুলির লোভাতুর মনে কি ভীষণ আক্রোশের সঞ্চার করেছিল। তাই তাঁর পঞ্চম শর্তে তিনি ডাক দিলেন স্বাধীন ও খোলা মনে এবং চরম পক্ষপাতশূন্যতার মধ্য দিয়ে সমস্ত ঔপনিবেশিক দাবীর মীমাংসা করতে হবে—"A free, open-minedd and absolutely impartial adjustment of all colonial claims." এইভাবে যুক্তির নতুন বোধের মধ্যে পৃথিবীর কূটনীতিকে বসানোর চেষ্টা হল। এত ব্যাপকভাবে, এত প্রকাশ্যে এবং এত জোরের সাথে খোলামেলা কূটনীতির কথা এর আগে আর আলোচিত হয়নি। কূটনীতি সম্বন্ধে এই খোলামেলা ভাবনাকেই নয়া কূটনীতি বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এক কথায় নয়া কূটনীতি হল খোলা কূটনীতি —Open diplomacy।

বিখ্যাত রাষ্ট্রনীতিবিদ হার্টম্যান (Fredrick H. Hartmann, *The Relations of Nations*) বলেছেন যে ''গোপন" (secret) কূটনীতি থেকে ''খোলাঠ (open) কূটনীতিতে উত্তরণ বর্তমান কালের একটি বড় ঘটনা। 'গোপন' কূটনীতি আর 'খোলা' কূটনীতির তফাৎটা এখানে বোঝা দরকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত কোন দেশের বৈদেশিক নীতির অন্তরালে যে কূটনৈতিক তৎপরতা চলত তা সে দেশের মানুষ জানতে পারত না। বড় বড় শক্তিগুলি যে কূটনীতির চালু করেছিল তাতে গোপনে যুদ্ধের তৎপরতা চলত, অঙ্গীকার, প্রতি-অঙ্গীকার, দাবী, প্রতিবাদী সব মিলে মিশে যে পরিবেশ তৈরি করত তাতে জনগণের কোন ভূমিকা থাকত না। এইভাবে জনগণ জানতেও পারেনি ক্রমশঃ তারা দেশে-দেশান্তরে একটা বড় যুদ্ধের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। এক কথায়, হার্টম্যান লিখছেন, অভিযোগটা হল এই রকম যে জনগণের সম্মতি ছাড়াই জনগণকে যুদ্ধে লিপ্ত করা হয়েছে ("In short, the argument was that the people had been committed to war—without this consent"–Hartmann) । এই অনুভূতি এসেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। তাই হার্টম্যান লিখেছেন — "The shift from 'secret' to 'open' diplomacy followed World War I"। 'গোপন' কূটনীতি থেকে খোলা' কূটনীতিতে উত্তরণ ঘটেছিল ঠিক সেই সময়ে যখন জাতিসংঘ বা লীগ অফ নেশসন (Legue of Nations) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু লীগ অফ নেশনস্ ছাড়াই হয়ত এর আবির্ভাব ঘটত। কারণ জনগণ বুঝতে শিখেছিল যে তাদের না জানিয়ে তাদের যুদ্ধে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ("Open diplomacy had come into fashion because of widespread popular feeling that the serect intrigues of the Powers, carefully concealed from their own peoples, had led to a war over obligations, promises, and counterclaims that would not have stood the light of public scrutiny"—Hartmann গোপন কূটনীতির উদ্দেশ্য কি ছিল শুধুই নিজেদের ষড়যন্ত্রকে জনগণের কাছ থেকে আড়াল করা? হয়ত তার থেকেও কিছু বেশী—শত্রুর কাছ থেকে তথ্য গোপন করাও ছিল কূটনীতিবিদদের একটা বড় উদ্দেশ্য ("The reason the treaties and agreements were almost always 'secret' was not to keep their own people in ignorance but to prevent too much useful information on war plans from being revealed to the enemy"—Hartmann) । এ কথা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে গোপনীয়তা কূটনীতির অন্তর্নিহিত বিষয়। খোলা কূটনীতি সূচিত হওয়ার পরেও কূটনীতি যতখানি খোলা হওয়া উচিত ছিল ততখানি হতে পারেনি। হার্টম্যান (Hartmann) বলেছেন যে বস্তুতপক্ষে খোলা কূটনীতির পরবর্তী অধ্যায়েও কূটনীতি কখনোই সে অর্থে খোলা হতে পারেনি যে তার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত গোপন তথ্যই জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করে দেওয়া

হত। যা হয়েছিল তা হল এই যে কূটনীতির প্রক্রিয়া অনেক বেশী জনগণের কাছে উন্মুক্ত হয়েছিল ("As a matter of fact, even in the subsequent period of open diplomacy, diplomacy was never open in the sense that all secrets were publicy revealed, but only in that the process of negotiation itself became more public"—Hartmann) ।

খোলা কূটনীতির যে ধারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আত্মপ্রকাশ করেছিল তার সবচেয়ে বড় ইঙ্গিতবাহী অভিজ্ঞান হল লীগ অফ নেশনস বা জাতিসংঘের সনদ (League Covenant)। এই সনদের ১৮নং ধারায় বলা হয়েছিল যে, যে কোন লীগ সদস্যকৃত চুক্তি বা আন্তর্জাতিক তৎক্ষণাৎ নথিভুক্ত করতে হবে—লীগ চুক্তিপত্রের ভাষায় "Every treaty or international engagement ... by any Member of the League" was to be registered "forthwith"। তার পরে লীগ সেক্রেটারির দপ্তর (secretariat) তা ছাপবে। কোন চুক্তি এইভাবে নথিভুক্ত না হলে তা গ্রাহ্য—আইনের ভাষায় binding—হবে না।

লীগ চুক্তিপত্রের এই ১৮নং ধারার ফল হয়েছিল এই যে ১৯১৯ সালের পর থেকে প্রায় সমস্ত চুক্তি একটা সাধারণ ও সরল বয়ানে লিখিত হত। তার ভেতরের জটিলতাগুলিকে পরে কূটনৈতিক নোট চালাচালি ও নানা লিখিত কথায় আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে স্থির করা হত, আর সেগুলি প্রায় গোপনই থাকত। খোলা কূটনীতির উদযাপনে লীগ চুক্তিপত্রের ১৮নং ধারাকে যত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা শেষ পর্যন্ত ততখানি গুরুত্ব ধারণ করতে পেরেছিল কি না বলা কঠিন। এই ১৮ নং ধারা প্রতিপালিত না হলে কোন চুক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি কমে যেত এমন ভাবা সঙ্গত নয়। কারণ চুক্তি দুই বা একাধিক দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের গ্রাহ্য বিষয়, তা সর্বজনীনভাবে গ্রাহ্য নাও হতে পারে। এই শর্ত প্রতিপালিত না হলে কোন চুক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি বিনষ্ট হত না। অর্থাৎ খোলা কূটনীতিকে যতটা বাস্তব ও কার্যকরী মনে করা হত তা হয়ত শেষ পর্যন্ত তা ছিল না। তা যদি না হয়ে থাকে তবে খোলা কূটনীতিকে এত সমাদর করা হয় কেন? আসলে গোপন কূটনীতি থেকে খোলা কূটনীতিতে রূপান্তরের ফল যা হয়েছিল তা কূটনীতির অন্তর্নিহিত ভাবের মধ্যে ততটা প্রকাশ পায়নি যা পেয়েছিল কূটনীতির প্রক্রিয়ার মধ্যে। হার্টম্যান (Hartmann) বলেছেন যে খোলা পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে কূটনীতির মধ্যে যে পরিবর্তন এল তা পাওয়া যাবে আলাপ-আলোচনার প্রক্রিয়ার মধ্যে, তাকে পাওয়া যাবে উইলসনীয় চতুর্দশ শর্তের (Fourteen Points) সেই শর্ত প্রতিপালনের মধ্যে যাতে বলা হয়েছে যে কূটনীতি অগ্রসর হবে মুক্তভাবে এবং জনগণের জ্ঞাতসারে ("The real changes in diplomacy that resulted from the adoption of 'open' methods were to be found in the negotiating process itself, in the attempt to implement the Wilsonian principle of the Fourteen Points that 'diplomacy shall proceed always frankly and in the public view.")। হার্টম্যান আরও বলেছেন যে এই শর্ত কূটনীতিকে অসার করে দিয়েছিল —This principle almost wrecked diplomacy on the shoals of impotence। আক্ষরিকভাবে দেখতে গেলে এই শর্তের অর্থ হল আলাপ-আলোচনাকে জনগণের জ্ঞাতসারে করতে হবে এবং একবার জনগণের জ্ঞাতসারে করার অর্থই হল জাতীয় সম্মান তার দ্বারা জড়িত হয়ে পড়ল ("Taken literally ... negotiation must then be public, And once negotiation became public, national prestige inevitably became involved"—Hartmann)। এই দিক থেকে দেখতে গেলে খোলা কূটনীতি বাহ্যত বেশ কার্যকরী হয়েছিল। অন্তত কূটনৈতিক দেওয়া নেওয়ার পেছনে জনগণের সতর্ক নজর যে জাগ্রত প্রহরীর মত কাজ করতে পারে এবং তার দ্বারা যে পৃথিবীর শান্তি রক্ষিত হতে পারে এই বোধকে কূটনীতির উন্মুক্ত হওয়ার তত্ত্বের মধ্যে মেনে নেওয়া হয়েছিল।

৩.৩.৬ খোলা কূটনীতি নিয়ে মর্গেনথোর মত

বিশিষ্ট রাষ্ট্রনীতিবিদ হানস জে. মার্গেনথো (Hans J. Morgenthau) তাঁর *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* গ্রন্থে লিখেছেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কূটনীতির অবক্ষয় হয়েছে। এই অবক্ষয়কে তিনি 'কূটনীতির পতন' বা The Decline of Diplomacy বলেছেন। তিনি লিখেছেন যে আজকাল কূটনীতি সেই উদ্দীপিত, উজ্জ্বল এবং সারাক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না যা সে করত তিরিশ বছরের যুদ্ধের শেষ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই কূটনীতির পতন হতে শুরু করে। ("Today diplomacy no longer performs the role, often spectacular and briliant and always important, that it performed from the end of the Thirty Year's War to the beginning of the First World War. The decline of diplomacy set in with the end of the First World War"—Morgenthau) । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে কূটনীতি এমনভাবে তার শক্তি হারিয়েছিল যা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ইতিহাসে বিরল ("Since the end of the Second World War, diploacy has lost its vitality, and its functions have withered away to such an extent as is without precedent in the history of the modern state system"—Morgenthau)। এই অবক্ষয়ের পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ আছে বলে তিনি মনে করেন। একটি কারণ হল যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি যার ফলে কোন কূটনীতিবিদকে কূটনৈতিক কার্যাবলীর জন্য ছলা-কলা, নিঃসীম গোপনীয়তা এবং পরভূমে অরক্ষিত থাকার নিশ্চয়তা ইত্যাদির দ্বারা আক্রান্ত হতে হয় না। তিনি নিমেষে টেলিফোনের মাধ্যমে স্বদেশের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, প্রয়োজনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উড়ে যেতে পারেন নিজের দেশে। এই যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক উন্নতিতে কূটনীতিবিদদের মানসিকতা ও কার্যাবলীর পরিবর্তন হয়েছে। এর সঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে দেশে দেশে মানুষের মানসিকতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত কূটনৈতিক টেকনিকের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ছিল তার গোপনীয়তা। বিশ্বযুদ্ধের পর মানুষ বুঝতে পেরেছে যে এই গোপনীয়তাই বিশ্বশান্তির সবচেয়ে বড় শত্রু। মর্গেনথো (Morgenthau) বলেছেন যে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা প্রথমে এই বিশ্বাসকে জাগিয়ে তুলেছিল যে কূটনৈতিক কার্যাবলীকে বাদ দেওয়া যায়। তারপরে এই ধারণা যুক্ত হল যে কূটনৈতিক কার্যাবলীকে বাদ দেওয়া উচিত কারণ তা কখনোই শান্তির স্বার্থে প্রযুক্ত হয় না, তা শুধু শান্তিকে বিপন্ন করে তোলে মাত্র ("To the technological ability to part with because they not only contribute nothing to the cause of peace, but actually endanger it".— Morgenthau) এই বিশ্বাস সেই পরিবেশের জন্ম নিয়েছিল যে পরিবেশে আত্মপ্রকাশ করেছিল এই বোধে যে ক্ষমতার রাজনীতি ইতিহাসের দুর্ঘটনা থাকে মনোবলের দ্বারা অপসারিত করতে হবে ("This conviction grew in the same soil that nourished the conception of power politics as an accident of history to be eliminated at will"—Morgenthau)।

এই বোধই কূটনীতির অবক্ষয়ের সবচেয়ে বড় কারণ। আর এই বোধের সবচেয়ে বড় প্রকাশ হল উড্রো উইলসনের (Woodrow Wilson) চতুর্দশ শর্তের (Fourteen Points) প্রারম্ভিক ঘোষণা (Preamble) ঃ "এটাই হবে আমাদের ইচ্ছা আর উদ্দেশ্য যে শান্তির প্রক্রিয়া যখন শুরু হবে তখন তা হবে চূড়ান্তভাবে খোলা এবং এর পর থেকে এই প্রক্রিয়ায় আর কোন গোপন বোঝাপড়া স্থান পাবে না ("It will be our wish and purpose that the processes of peace, when they are began, shall be absolutely open, and that they shall involve and permit henceforth no secret understandings of any kind"—Morgenthau)। এইরকম একটি সার্বিক ঘোষণা দিয়ে শুরু হয়েছিল খোলা কূটনীতির মূক্ত অঙ্গীকার। এইভাবে সনাতন কূটনীতি, গোপনীয়তা-ভিত্তিক ধ্রুপদী কূটনীতির (Classical diplomacy) অবক্ষয়ের অতলে তলিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই নয়া কূটনীতির আবির্ভাব ঘটল এক মুক্তদ্বার রাজনীতির অভিজ্ঞান হিসাবে। তাঁর চতুর্দশ শর্তের (Fourteen Points)

প্রারম্ভিক ঘোষণায় (Preamble) রাষ্ট্রপতি উইলসন আরও বললেন ঃ ''রাজ্যবিজয় ও সম্প্রসারণের যুগ শেষ হয়ে গেছে। আর তার সাথে শেষ হয়ে গেছে; গোপন ইস্তাহারের দিন যে ইস্তাহার স্বাক্ষর করা হত নির্দিষ্ট কিছু সরকারের স্বার্থে, এমন ইস্তাহার যা কোন অভাবিত মুহূর্তে পৃথিবীর শান্তি বিনষ্ট করে নিতে পারত'' (''The day of conquest and aggrandizement it gone by; so is also the day of secret covenants entered into in the interest of particular governments, and likely at some unlooked for moment to upset the peace of the World''—Woodrow Wilson)। স্পষ্টতই উড্রো উইলসন সেই প্রারম্ভিক ঘোষণা করছেন, আর সে যুগ, মর্গেনথোর মতে সনাতন কূটনীতির যুগ। এইভাবে সনাতন কূটনীতির অবসানের মুহূর্তে নয়া কূটনীতির (New Diplomacy) জন্ম হল। রাষ্ট্রপতি উইলসন সেই প্রারম্ভিক ঘোষণায় বললেন ঃ ''এই হচ্ছে সেই আনন্দ সংবাদ যা এখন সমস্ত গণমানবের কাছে পরিষ্কার-যে মানবের চিন্তাধারা মৃত এবং অপগত যুগের প্রতি নিবদ্ধ নয় যে চিন্তাধারা বিচার ও বিশ্বশান্তির প্রতি উদ্দিষ্ট যে কোন জাতিকে এখন বা ভবিষ্যতের কোন সময় সেই প্রতিশ্রুতিতে নিবেদিত হতে শেখায়'' (''It is this happy fact, now clear to the view of every public man whose thoughts do not still linger in an age that is dead and gone, which makes it possible for every nation whose purposes are consistent with justice and the peace of the world to avow, now or at any other time, the objects it has in view''—Woodrow Wilson)। কোন প্রতিশ্রুতির লক্ষ? তাও রাষ্ট্রপতি উইলসন নির্দিষ্ট করে দিলেন ঃ ''শান্তির খোলা ইস্তাহার, মুক্ত পথে যাতে উপনীত হওয়া গেছে, যার পরে আর কোন একান্ত আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া থাকবে না, কিন্তু কূটনীতি পরিচালিত হবে খোলা মনে এবং গণদৃষ্টির সামনে'' (''Open covenants of peace, openly arrived at, after which there shall be no private international understandings of any kind, but diplomacy shall proceed always frankly and in the public view''—Woodrow Wilson)।

মর্গেনথো রাষ্ট্রপতি উইলসনের এই মতটি উল্লেখ করে দেখাতে চেয়েছেন যে একটি অপস্রিয়মাণ যুগের কূটনীতির মৃত্যুদলিলে স্বাক্ষর করেছিলেন বর্তমান যুগের এই সার্থক রাষ্ট্রশাসক, আর বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, যে খোলা কূটনীতির কথা আমরা বলি তা সনাতন কূটনীতির মৃত্যুকালীন এক নতুন উদ্ভাবনা যাকে তিনি বলেছেন ''The modern version of that depreciation of diplomacy...'' ''কূটনীতির সেই অবক্ষয়ের আধুনিক রূপায়ণ''। মনে রাখতে হবে যে হার্টম্যান কখনো নয়া কূটনীতিকে সনাতন কূটনীতির ধ্বংসের ওপর গড়ে ওঠা মিনার হিসাবে দেখেননি। তাঁর মনে হয়েছিল রূপান্তরের ধারা বেয়ে সনাতন গড়িয়ে গেছে আধুনিকতায়, গোপন ইস্তাহারের যুগ ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই বিলীন হল আধুনিকতার প্রতিশ্রুতিময় মুক্তির বেলাভূমিতে। সেখানেও তাঁর সন্দেহ ছিল। মুক্তির যে প্রতিশ্রুতি খোলা কূটনীতির মধ্যে আরোপ করা হচ্ছে তা পরিণতিতে একটি পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পেরেছিল বলে তার মনে হয়নি। মর্গেনথো (Morgenthau) মনে করেন যে পুরানো কূটনীতির মধ্যে যে গোপনীয়তা ছিল তার অন্তর্নিহিত ভাবই ছিল মিথ্যাচার। তিনি লিখেছেন যে বিখ্যাত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার হেনরি ওটন (Sir Henry Wotton) সম্বন্ধে এই ধারণা পোষণ করা হত যে তিনি ছিলেন ''একজন সৎ ব্যক্তি যাঁকে দেশের কারণে মিথ্যা কথা বলার জন্য বিদেশে পাঠানো হয়েছিল'' (''an honest man sent abroad to lie for his country'')। ভিয়েনা কংগ্রেসের সময়ে যখন মেটারনিখকে (Metternich) সংবাদ দেওয়া হল যে রুশ রাষ্ট্রদূত প্রয়াত হয়েছেন তখন তিনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ ''আঃ, তা কি সত্যি? তাঁর [অর্থাৎ সেই রাষ্ট্রদূতের] উদ্দেশ্য কি হতে পারে?'' (''Ah, is that ture? What may have been his motive?'') । কূটনীতির গোপনীয়তা ও চক্রান্ত প্রবণতা এমনি ছিল যে কোন কূটনীতিবিদের মৃত্যুর পরও প্রশ্ন ওঠে যে আলোচনা চলাকালীন তাঁর অকালমৃত্যুর পেছনে উদ্দেশ্য কি থাকতে পারে।

এইরকম চক্রান্ত আর সন্দেহে ঠাসা গোপনীয়তার যুগ শেষ হল বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। মর্গেনথো লিখলেন যে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে এবং পরে এই মতকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল যে কূটনীতিবিদদের গোপন

ষড়যন্ত্র, বৃহৎ অংশের জন্য না হলেও, অনেকখানি সেই যুদ্ধের জন্য দায়ী ("During and after the First World War, wide currency was given to the opinion that the secret machinations of diplomats shared a great deal, if not the major portion, of responsibility for that war ..." —Morgenthau)। শুধু তাই নয় কূটনৈতিক আদান-প্রদানের গোপনীয়তার মধ্যে রয়েছে —মর্গেনথো বিশ্বাস করেন—অভিজাততান্ত্রিক অতীতের পূর্বপুরুষীয় ও বিপজ্জনক তলানি ("... that the secrecy of diplomatic negotiations was an atavistic and dangerous residue from the aristocratic past..."—Morgenthau)। এর সঙ্গে এই ধারণাও চালু হয়েছিল যে, যে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া শান্তিপ্রিয় গণমতের সতর্ক চোখের সামনে দিয়ে পরিচালিত ও পরিণতিপ্রাপ্ত তা শান্তির স্বার্থকে বৃদ্ধি না করে পারে না ।" ("... that international negotiations carried on and concluded under the watchful eyes of a peace loving public opinion could not but further the cause of peace"—Morgenthau)

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, যে নয়া কূটনীতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ও পরে চালু হয়েছিল তা শান্তির স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য প্রচলিত হয়েছিল, তার উদযাপন হয়েছিল নবযুগের উদ্বোধিত গণমতের সতর্ক প্রহরায় এবং শেষ পর্যন্ত তা মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছিল সেই কূটনৈতিক অতীতের যার মধ্যে অভিজাততান্ত্রিক গোপনীয়তার পূর্বপুরুষীয় (atavistic) ধারা বহমান ছিল। অভিজাততান্ত্রিক গোপনীয়তার খোলসের বাইরে আসার পরেই নয়া কূটনীতির আবির্ভাব হয় যে কূটনীতির পশ্চাৎপ্রেক্ষায় একটি শক্তিশালী জনমতের আবির্ভাবকে লক্ষ্য করা যায়। রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে অভিজাততান্ত্রিক আদানপ্রদানের সঙ্গোপন প্রয়াস সনাতন কূটনীতির ব্যবহারিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, আর ডাক দিল এক মুক্ত দুনিয়ার যেখানে শান্তির ললিত সাধনা প্রতিষ্ঠিত হল খোলা কূটনীতির অবারিক অঙ্গনে। মর্গেনথো (Morgenthau) এই সমস্ত ব্যাপারটিকেই কূটনীতির সার্বিক অবক্ষয়ের এক অবিভাজ্য ধারা বলে মনে করেন। নয়া কূটনীতিকে, অর্থাৎ গোপন কূটনীতির স্থলে খোলা (Open) কূটনীতিকে, তিনি কূটনীতির উন্নততর রূপান্তর বলে মনে করেননি।

৩.৩.৭ নয়া কুটনীতি কি বিদ্রোহ?

হ্যারোল্ড নিকোলসনের (Harold Nicolson) গবেষণা থেকে আমরা আগেই জানতে পেরেছি যে গোপনীয়তা ভিত্তিক কূটনীতি আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার দান, অর্থাৎ তা ঘনীভূত হয়েছিল জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর থেকে। জাতীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ক্ষমতা লিপ্সা, বড় হওয়ার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বাজার ও উপনিবেশের জন্য লড়াই, স্থির সৈন্যবাহিনী (Standing army) মোতায়েন, আড়াল করা সম্পর্ক, গোপন আঁতাত, স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনৈতিক চুক্তি ইত্যাদির কারণে গুপ্ত আলোচনা, গোপন কূটনীতি ইত্যাদি দরকারা হত। যখন বিশ্বযুদ্ধে এ ধরনের কূটনীতির বীভৎস পরিণতি দেখে তাকে বর্জনের প্রশ্ন উঠল তখন শেষ পর্যন্ত তা হয়ে দাঁড়াল আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। মর্গেনথো (Morganthau) বলেছেন ''কূটনীতির বিরুদ্ধাচরণ এবং তার অবক্ষয় তাহলে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং যে ধরনের আন্তর্জাতিক রাজনীতির জন্ম সে দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে এক বৈরিতার একটি বিশেষ প্রকাশমাত্র" ("The opposition to and depreciation of diplomacy is then but a peculiar manifestation of hostility to the modern state system and the kind of international politics it has produced"—Morgenthau)। আসলে নয়া কূটনীতি অতীতের অভিজাততান্ত্রিক কূটনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক বৈরিতাকে বহন করত বলেই এর মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ঘটনা হল গণমতের উত্থান যা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার দান। এই গণমতই সনাতন কূটনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছিল। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই প্রতিবাদের ফলেই নয়া কূটনীতির আবির্ভাব বলে অনেকে এই নয়া কূটনীতিকে ''গণতান্ত্রিক

কূটনীতি" (Democratic Diplomacy) বলে অভিহিত করেছেন। বিখ্যাত দুই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নর্ম্যান ডি. পামার এবং হাওয়ার্ড সি. পারকিনস তাদের ইন্টারনশনাল রিলেশন্‌স্‌ ঃ দ্য ওর্য়াল্ড কমিউনিটি ইন ট্রান্‌জিশন (Norman D. Palmer and Howard C. Perkins : *International Relations : The World Community in Transition*) গ্রন্থে লিখেছেন যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 'গণতান্ত্রিক কূটনীতি' নামক শব্দটি সাধারণ ব্যবহারের মধ্যে চলে আসে। এটি বিশ্বব্যাপারে একটি নতুন ব্যবস্থার ইঙ্গিতবাহী ছিল—এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে বিভিন্ন সরকার দ্রুত তাদের অভিজাততান্ত্রিক ঝোঁক এবং বিচ্ছিন্নতাকে হারাচ্ছিল, যে ব্যবস্থায় এক দেশের জনগণ কথা বলছিল আরেক দেশের জনগণের সাথে আর তা বলছিল গণতান্ত্রিক প্রতিনিধি ও বেসরকারি মাধ্যমে ("By the early twentieth century the term 'democratic diplomacy' had come into common use. It seemed to symbolize a new order in world affairs—one in which governments were fast losing their aristocratic leanings and this aloofness, and peoples were speaking to peoples through democratic representatives and informal channels"—Palmer and Perkins) এখন কথা হল, গোপন কূটনীতির (Secret Diplomacy) কূটনীতির (Secret Diplomacy) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে যে 'গণতান্ত্রিক কূটনীতি'র আবির্ভাব হয়েছিল তা নয়া কূটনীতির ভাবকে প্রকাশ করলেও তা কি সার্থক হয়েছিল? পামার ও পার্কিনস-এর মতে তা হয়নি। আর এই না হওয়াটা হয়ত নয়া কূটনীতির ব্যর্থতা। এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদ্বয় বলেছেন যে বস্তুতপক্ষে বিংশ শতাব্দীর আশার পরিবেশে এই নয়া ব্যবস্থার সূচনা হলেও তা পুরানো ব্যবস্থার থেকে খুব তফাৎ ছিল না। ("Actually, the new order was not so different from the old as if seemed in the atmosphere of hope that ushered in the present century"—Palmer and Perkins.)। তঁরা স্পষ্ট করেই বলেছেন যে ''মোটের উপর 'গণতান্ত্রিক কূটনীতি' নিয়ে অভিজ্ঞতা হতাশাব্যঞ্জক" ("On the whole experience in 'democratic diplomacy' has been disappointing"—Palmer and Perkins.)। নয়া কূটনীতি জনগণতান্ত্রিক হওয়ার ফলে প্রায় সকলের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার সম্ভ্রম কমে গেছে আর সারা দেশের মানুষ কূটনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার ফলে কূটনীতির অন্তর্নিহিত গভীরতা ও গাম্ভীর্য হারিয়ে গেছে। পামার এবং পারকিনস বলেছেন যে প্রায়ই এই কূটনীতি বাজারের কূটনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েছে, এমনকি তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণের কূটনীতি—অর্থাৎ এমন সব পরিবেশ তৈরী হয়েছে যেখানে রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম আলোচনা সম্ভব হচ্ছে না ("To often it has been associated with the diplomacy of the marketplace, or even plebiscitary diplomacy—that is, with conditions under which important and delicate negotiations between states cannot possibly be conducted with success"—Palmer & Perkins)। হ্যারল্ড নিকোলসন তাঁর *Diplomacy* গ্রন্থে গণতান্ত্রিক কূটনীতি নামে নয়া কূটনীতির ব্যর্থতায় তিন ধরনের কারণ উল্লেখ করেছেন—এক, 'সার্বভৌম জনগণের দায়িত্বহীনতা' ("the irresponsibility of the sovereign people")—অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সার্বভৌমতার অধিকারী জনগণ কূটনীতি নিয়ে অসার্থক আলোচনা করে যাতে কূটনীতির ধার কমে যায়, দুই, জনগণের অজ্ঞতা—যে অজ্ঞতার কারণ তথ্যের অভাব নয় কারণ মিডিয়া (media) বা গণমাধ্যমগুলির ভেতর দিয়ে প্রচারিত তথ্যের অভাব নেই, তবুও অজ্ঞতার কারণ দেশের গার্হস্থ্য বিষয়ে জনগণ যে ধ্যান দেয় পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতির বিষয়ে সে ধ্যান তারা দেয় না, তিন, জনগণের বিশেষ ধরনের বোধ ও বিশ্বাস প্রসূত জ্ঞান যার থেকে জনগণ কোন বিষয়ে অবধা জেনে বা না জেনে মন্তব্য করে, আলাপ-আলোচনা, লেখালেখি শুরু করে দেয়। দায়িত্বপূর্ণ রাষ্ট্রশাসকরা (responsible statesmen) নীরব হয়ে যান। আধুনিক কূটনীতি অত্যন্ত বেশি খোলাখুলি হওয়ার ফলে পণ্ডিতম্মন্য মানুষের ভিড় বেড়ে গেছে। কূটনীতি নিরন্তর সমালোচনার মুখে পড়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছে। এই সব পণ্ডিতম্মন্য মানুষদের নিকোলসন "Crackerbarrel philosophers" বলেছেন। জনগণতান্ত্রিকতার জোয়ারে এদের হাতেই নয়া কূটনীতি তার মর্যাদা হারাচ্ছে বলে তিনি মনে করেন।

৩.৩.৮ পুরানো কূটনীতি বনাম নয়া কূটনীতি ঃ বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক পর্যালোচনা

হ্যারল্ড নিকোলসন (Harold Nicolson) পুরানো কূটনীতির পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন। এক, এই কূটনীতিতে মনে করা হত যে ইউরোপ হচ্ছে সমস্ত মহাদেশগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং প্রধান; দুই এতে মনে করা হত যে বৃহৎ শক্তিগুলি ক্ষুদ্রশক্তিগুলি থেকে বৃহত্তর—the Great Powers are greater than small powers; তিন, এই রকম একটি বোধ পাশ্চাত্য কূটনীতিতে সংক্রামিত হয়েছিল যে ক্ষুদ্র শক্তিগুলিকে পরিচালিত করা বৃহৎ শক্তিগুলির সাধারণ বা সম্মিলিত দায়িত্ব (common responsibility); চার ইউরোপের প্রত্যেক দেশে একই ধাঁচে কূটনৈতিক পরিষেবা (diplomatic service on a more or less identical model) গঠন; পাঁচ, এই নিয়ম (rule) যে সমস্ত আলোচনা হতে হবে নিরবচ্ছিন্ন ও গোপন। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। তবুও নয়া কূটনীতির আমদানি করতে হল। এর প্রেক্ষাপটে তিনটি জিনিষ প্রধান—এক, উপনিবেশিক বিস্তারের ইচ্ছা ও তার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা যা ইউরোপের প্রায় সব দেশের পররাষ্ট্রনীতির উপর প্রভাব ফেলেছিল ; দুই, উদগ্র বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা যার ফল হিসাবে যুক্ত হয়েছিল বাজার অধিকার করার উৎকট বাসনা, তিন, যোগাযোগ ব্যবস্থার আশাতীত উন্নতি ও গতিবৃদ্ধি। এর সমস্ত কিছুর সাথে জড়িত ছিল অন্তরালের ক্রমবর্ধমান ভিন্ন একটি শক্তি—শিল্প বিপ্লব। এই সমস্ত কিছুর ফলে পুরানো কূটনীতি বদলিয়ে নতুন কূটনীতির আবির্ভাব ঘটছিল। হ্যারল্ড নিকোলসন বলেছেন যে এই পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল ১৯১৯ সালের প্রায় একশত বছর আগে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে রাষ্ট্রপতি উইলসনের সাম্যবাদ (egalitarianism) এবং লয়েড জর্জের বৈঠকের মধ্য দিয়ে কূটনীতির ধারণাই (Diplomacy by Conference) নয়া কূটনীতির জন্য একমাত্র দায়ী ঘটনা নয়। একটা বিরাট ঐতিহাসিক ধারা অনেক দিন ধরেই কাজ করছিল। নয়া কূটনীতি এই ধারা জনিত পরিবর্তনের ফল। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে ঐতিহাসিক ধারার মধ্য থেকে উঠে আসলেও নয়া কূটনীতির মধ্যে একটি নতুন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যা সুষ্ঠু কূটনীতির গঠনের ক্ষেত্রে আশঙ্কার কারণ হয়েছে। রাষ্ট্রপতি উইলসনের সাম্যবাদের (egalitarianism) ফলেই হোক বা অন্য যে কোন প্রক্রিয়াজনিতই হোক আজকের পৃথিবীতে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে বড় বা ছোট সমস্ত দেশই সমান। হ্যারল্ড নিকোলসন বলেছেন যে যেমন সমস্ত মানুষ সমান সেইরকম সমস্ত রাষ্ট্র সমান একটি প্রবণতার জন্ম দিয়েছে, আর তা হল 'লবি' বা দল গঠনের প্রবণতা। আর এই লবিগুলির উদ্দেশ্য হল বৃহৎ শক্তিগুলির যে কোন প্রস্তাব তা যদি যুক্তিসঙ্গতও হয় তার বিরোধিতা করা ("The theory that all states are equal, even as all men are equal, had led to lobbies being formed among the smaller countries ... the sole unifying principle of which is to offer opposition even to the reasonable suggestions of the Great Powers"—Harold Nicolson)।

৩.৩.৯. নয়া কূটনীতির মার্ক্সবাদী সমালোচনা

১৯৭২ সালে মস্কো থেকে প্রকাশিত মডার্ন ডিপ্লোমেসি ঃ প্রিন্সিপালস, ডকুমেন্টস, পিওপেল গ্রন্থে কে. এ্যানাটোলিয়েভ (K. Anatoliev, *Modern Diplomac : Principles, Documents,People*) নয়া কূটনীতির সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা প্রায়ই পুরানো কূটনীতি ও নয়া কূটনীতি শব্দগুলি ব্যবহার করে থাকেন। একথা ঠিক যে [বিংশ শতাব্দীর] বিগত পঞ্চাশ বছরে কূটনীতির প্রকরণ ও হাতিয়ারের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে যা তালেরাঁ (Talleyrand) এবং বিসমার্কের (Bismarck) কূটনীতির এবং আমাদের কূটনীতির মধ্যে একটা সরল বিচ্ছেদ রেখা টেনে দিয়েছে। কিন্তু সে সংজ্ঞার ওপর এই বিভাজন টানা হয়েছে তা বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক নয়। কারণ তা বিষয়ের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকে মুছে দিয়েছে। আর তা হল কূটনীতির সামাজিক

চরিত্র (“the social nature of diplomacy”)। কে. এ্যানাটেলিয়েভ (K. Anatoliev) বলেছেন যে নয়া কূটনীতির মধ্যে একটা রাজনৈতিক বলা আছে যা হ্যারল্ড নিকোলসনের দ্য এভোলিউশন অভ ডিপ্লোমেটিক মেথড (Harold Nicolson : *The Evolution of Diplomatic Method*) গ্রন্থে স্পষ্ট হয়েছে। [“Writers on forign policy frequently use the terms Old Diplomcy and New Diplomacy. It is, of course, all too true that in the last half century or so there have been changes in the methods anddevices of diplomacy of Talleyrand and Bismarck and the diplomcy of our time. Those definitions cannot, however, claim to be scientifically accurate since they obliterate the substance of the matter : the social nature of diplomacy. Nonetheless the polemical barbs levelled against the New Diplomacy have a very obvious target. This point is easily proved on the example of Harold Nicolson’s *The Evolution of Diplomatic Method”*—K. Anatoliev]

নিকোলসন নয়া কূটনীতির জনক হিসাবে রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনকে (Woodrow Wilson) চিহ্নিত করেছেন এবং বলেছেন যে ভার্সাই সম্মেলনের সময় (১৯১৯) তিনি যে খোলা কূটনীতির কথা বলেছেন তা হল মার্কিন পদ্ধতি (“The American Method”) যাকে পুরানো কূটনীতির গ্রীক, ইটালীয় ও ফরাসী পদ্ধতির থেকে আলাদা করা যায়। এইখানেই কে. এ্যানাটোলিয়েভের আপত্তি। তিনি বলেছেন যে এটি বিস্ময়কর যে তিনি খোলা কূটনীতির (Open diplomacy) প্রথম সম্ভাষণ খুঁজে পেয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি উইলসনের চতুর্দশ শর্তের সেই শর্তে যেখানে তিনি বলেছেন যে কূটনীতি অগ্রসর হবে প্রকাশ্যে ও জনগণের দৃষ্টির সামনে — ‘diplomacy should proceed always and frankly and in the public view’। নিকোলসনের দৃষ্টি পড়েনি সোভিয়েট সরকারের প্রথম পররাষ্ট্রনীতি দলিলে, তাদের ‘শান্তির ঘোষণায়’ (Decree on Peace)। এইটিই ছিল প্রকৃতপক্ষে সেই দলিল যা ইতিহাসে সর্বপ্রথম ‘‘সমস্ত জনগণের সামনে এবং প্রকাশ্যে আলাপ আলোচনা চালানো একটি দৃঢ় ইচ্ছা” প্রকাশ করেছিল (“It may seem a bit strange that Harold Nicolson should refer to president Wilson’s Fourteen Points instead of addressing himself to the first foreign policy act of the Soviet Government, the Decree on Peace. It was precisely that document which expressed for the first time in History, ‘a firm intention to conduct all negotiations quite openly and before the entire people’—K. Anatoliev)। আর সেই ইচ্ছাকে তৎক্ষণাৎ বাস্তবায়িত করেছিল নয়া কূটনীতির পদ্ধতিকে কার্যকরী করে। এইভাবেই কার্যকরী করার পথেই তারা জার সরকারের (Tsarist Government) সমস্ত গোপন সন্ধি ও চুক্তি প্রকাশ করে দিয়েছিল এবং অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের (The Provisional Governments) গোপন কূটনৈতিক কাগজপত্রও জনসমক্ষে এনে দিয়েছিল। এ্যানাটোলিয়েভ বলেছেন যে ১৯১৭ সালের ২২ নভেম্বর সোভিয়েট পররাষ্ট্র বিষয়ক জনগণের কমিসারিয়েট (Peoples Commissariat for Foreign Affairs) যে ঘোষণা করেছিল তাই হল খোলা কূটনীতির প্রথম মুক্ত ঘোষণা, নয়া কূটনীতির নতুন ইস্তাহার। এই ইস্তাহারে বলা হয়েছিল যে ‘‘গোপন কূটনীতির নিষিদ্ধ হওয়া হল জনমুখী ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক পররাষ্ট্রনীতির অন্তর্নিহিত সততার প্রথম বনিয়াদী শর্ত। বাস্তব ক্ষেত্রে এই নীতির অনুসরণ করাকে সোভিয়েট সরকার তার পালনীয় কাজ বলে মেনে নিয়েছে (“The abolition of secret diplomacy is a primary conditions of honesty in a popular and truly democratic foreign policy. To pursue that policy in practice is the task the Soviet Government sets itself.”)।

এ্যানাটোলিয়েভ বলেছেন যে হ্যারল্ড নিকোলসন নয়া কূটনীতির সমর্থক নন। অতএব এই মার্কিন কূটনীতির জনক হিসাবে উড্রো উইলসনকে চিহ্নিত করে তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁকে সামনে খাড়া রেখে পেছনে সোভিয়েত মুক্ত কূটনীতি, খোলা দেওয়া-নেওয়ার সমালোচনা করেছেন। নয়া কূটনীতি বুর্জোয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে যথেষ্ট সমাদর পায়নি এবং এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের পুরোধা হিসাবে হ্যারল্ড নিকোলসনও তাকে সমাদর করতে পারেননি। তিনি তাঁর আক্রমণের আপাত বিষয় করেছিলেন রাষ্ট্রপতি উইলসনের নীতিকে এবং উহ্য রেখেছিলেন মুক্ত দুনিয়ার অঙ্গীকার সোভিয়েত শান্তি ইস্তাহারকে। যেহেতু এই ইস্তাহারই একটি প্রাথমিক দলিল তা ধরে নিতে হবে নিকোলসনের

প্রত্যক্ষভাবে নয়া মার্কিন কূটনীতিকে এবং পরোক্ষভাবে অলঙ্ঘ্য সোভিয়েট মুক্ত দুনিয়ার ঘোষণাপত্রকে তিরস্কার করেছেন।

৩.৩.১০ সারাংশ

সভ্যতা তার অগ্রগতির ইতিহাসে পাঁচরকম কূটনীতির জন্ম দিয়েছে—তা হল গ্রীক, রোমান, ফরাসী, ইটালীয় ও মার্কিন কূটনীতি। এর মধ্যে মার্কিন কূটনীতি একটু ভিন্ন ধরনের। আগের কূটনীতি হল পুরানো কূটনীতি যার মূল বিষয় ছিল গোপনীয়তা—জনগণের কাছ থেকে আন্তর্জাতিক দেওয়া-নেওয়া যাবতীয় তথ্যকে লুকিয়ে রাখা। এটি হল অভিজাততান্ত্রিক কূটনীতি। এই কূটনীতির ফলেই ঘটে গিয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধের বীভৎসতা দেখে মানুষ এই কূটনীতি থেকে সরে এল। আত্মপ্রকাশ করল নয়া কূটনীতি জনগণতান্ত্রিক কূটনীতি। ১৯১৮ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন তাঁর চৌদ্দ দফা শর্তের মধ্যে খোলা (open) কূটনীতির প্রতিশ্রুতিকে ঘোষণা করলেন। এর আগেই ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর সোভিয়েট সরকার তাদের শান্তির ইস্তাহারে এই ঘোষণাটিই করেছিলেন। অর্থাৎ যুদ্ধের পরে ভয়মুক্ত শান্তির ললিত আশ্বাসকে ছড়িয়ে দেওয়া হল নয়া কূটনীতির কাঠামো খোলা দেওয়া-নেওয়ার প্রতিশ্রুতির মধ্যে। এক সময়ে পৃথিবীতে জাতীয় রাষ্ট্র উদ্ভবের পর পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও হানাহানি থেকে সনাতন কূটনীতির গোপনীয়তার ভাবটি এসেছিল এখন এই খোলা কূটনীতির ধারণা হয়ে দাঁড়াল পুরাতন জাতীয় রাষ্ট্র কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই যে পুরাতন থেকে নয়া কূটনীতির পরিবর্তন তা একদিনে হয়নি। ১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তির প্রায় একশত বছর আগে থেকে ইউরোপে যে সমস্ত রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল তারই মধ্যে লুকিয়েছিল এই রূপান্তরের বীজ। ১৯১৭ সালে সোভিয়েট সরকার বা ১৯১৮ সালে রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন শুধু এই রূপান্তরের পরিণতি পর্বের মেরুবিন্দুকে তাঁদের চিন্তাধারার মধ্যে প্রকাশ করেছিলেন। মনে রাখতে হবে যে নয়া কূটনীতির প্রত্যক্ষ পদ্ধতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকেন কূটনীতিবিদরা, আড়ালে থাকে সার্বভৌম জনগণ। তাদের জনমত কূটনীতির ধারাকে প্রভাবিত করে। এই জনগণের অজ্ঞতা ও বাড়াবাড়ি, তাদের মোহ এবং উচ্ছ্বাস যা গণমাধ্যমগুলির মধ্যে প্রকট হয়ে দেখা দেয়, তা অনেক সময়ে কূটনীতির সাবলীল গতি রুদ্ধ করে। তার ফলে আধুনিক কূটনীতি বা নয়া কূটনীতি যা খোলামেলা হতে গিয়ে অনেক সময়ে অত্যন্ত বেশী খোলামেলা হয়ে পড়ে তা পরিণতিতে সার্থকভাবে কার্যকর হয় না। কূটনীতির ব্যর্থতা এইখানে।

৩.৩.১১ প্রশ্নাবলী

১. দশটি বাক্যে উত্তর দিন।

ক) সনাতন কূটনীতির পর্বগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

খ) নয়া কূটনীতি কাকে বলে ব্যাখ্যা করুন।

গ) সনাতন কূটনীতির দুর্বলতা কি?

ঘ) নয়া কূটনীতির দুর্বলতা কি?

ঙ) নয়া কূটনীতির আবির্ভাবের পেছনে সোভিয়েত রাশিয়ার অবদান কি?

চ) কূটনীতির ইতিহাসে রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

ছ) নয়া কূটনীতি কি সার্থক?

জ) সনাতন কূটনীতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

ঝ) আধুনিক কূটনীতি সম্বন্ধে মার্ক্সীয় মতটি কি?

ঞ) গণতান্ত্রিক কূটনীতি কি?

২. পাঁচটি বাক্যে উত্তর দিন

ক) আমরা কূটনীতির ইতিহাস পড়ব কেন?

খ) কুটনীতিক বিবর্তনে জাতীয় রাষ্ট্রের ভূমিকা কি?

গ) কুটনীতির ইতিহাসে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মত আলোচনা করুন।

ঘ) কুটনীতির ইতিহাসে কার্ডিনাল রিশলে গুরুত্বপূর্ণ কেন?

ঙ) নয়া কূটনীতির আবির্ভাবের কারণ কি?

চ) গোপন কূটনীতির বিপরীত কূটনীতি কি? তা বিখ্যাত কেন?

ছ) আধুনিক কূটনীতিতে সার্বভৌম জনগণের ভূমিকা কি?

জ) নয়া কূটনীতির ত্রুটি হার্টম্যান (Hartmann) কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?

ঝ) নয়া কূটনীতি নিয়ে হার্টম্যান ও মরগেনথোর (Morgenthau) মধ্যে চিন্তাধারার কি কোন বিরোধ আছে?

ঞ) 'কূটনীতির পতন' কি?

৩. পনেরোটি বাক্যে উত্তর দিন।

ক) খোলা কূটনীতি (Open Diplomacy) ও গোপন কূটনীতির (Secret Diplomacy) বৈসাদৃশ্য আলোচন করুন।

খ) নয়া কূটনীতির মার্ক্সবাদী সমালোচনা বলতে কি বোঝায়?

গ) রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনকে কি নয়া কূটনীতির জনক বলা যায়?

ঘ) চৌদ্দ দফা শর্তের কোন শর্তকে বা কোন্ কোন্ শর্তকে নয়া কূটনীতির প্রারম্ভিক সূচনা বলা যেতে পারে এবং কেন তা গ্রাহ্য বলে মনে হয়?

ঙ) পুরানো কূটনীতির বৈশিষ্ট্যভিত্তিক পর্যালোচনা করুন।

চ) হ্যারল্ড নিকোলসন (Harold Nicolson) এর মতবাদ সম্বন্ধে মার্ক্সবাদী পর্যালোচনা কি?

ছ) উনিশ শতকের কূটনীতিতে গোপনীয়তার অভ্যুদয় কিভাবে হয়েছিল?

জ) নয়া কূটনীতি কতটা নতুন?

ঝ) গোপন কূটনীতির অভ্যুদয়ে বিসমার্কের অবদান কি?

ঞ) নয়া কূটনীতি কি সার্থক কূটনীতি?

৩.৩.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১. Harold Nicolson, *The Evolution of Diplomatic Method.*

২. Harold Nicolson, *Diplomacy.*

৩. K. Anatoliev, *Modern Diplomacy : Principles, Documents, People.*

৪. Machiavelli, *The Prince.*

৫. D. M. Ketelbey, *A History of Modern Times.*

৬. David Thompson, *Europe since Nepoleon.*

৭. E. Lipson, *Europe in the 19th & 20th Centuries.*

৮. Frederick H. Hartmann, *The Relations of Nations.*

৯. Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations : The Struggle for Power and Peace.*

১০. Norman D. Palmer and Howart C. Perkins, *International Relations : The World Community in Transition.*

১১. Rene 'Albrecht Curric', *Diplomacy History of Europe.*

একক ৪ □ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

গঠন

৪.৪.০ উদ্দেশ্য

৪.৪.১ প্রস্তাবনা

৪.৪.২ প্রারম্ভিক কথা

৪.৪.৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিত

৪.৪.৪ বলকান জাতীয়তাবাদ

৪.৪.৫ আন্তর্জাতিক সংকট ঃ হেগ কনফারেন্স থেকে বলকান যুদ্ধ

৪.৪.৬ ওয়েল্টপলিটিক ও নৌবাদ

৪.৪.৭ প্রাচ্য সমস্যা ঃ সোরাজেভো হত্যাকাণ্ড ঃ প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সূচনা

৪.৪.৮ যুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্র

৪.৪.৯ জার্মানির নৌযুদ্ধ

৪.৪.১০ যুদ্ধ শেষের যুদ্ধ

৪.৪.১১ যুদ্ধের দায়িত্ব

৪.৪.১২ যুদ্ধ শেষের প্রস্তুতি ঃ উড্রো উইলসনের চৌদ্দ দফা শর্ত

৪.৪.১৩ ফলাফল

৪.৪.১৪ সারাংশ

৪.৪.১৫ অনুশীলনী

৪.৪.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

৪.৪.০ উদ্দেশ্য

যুদ্ধ, মানুষের সনাতন প্রতিষ্ঠান, তার সবচেয়ে প্রাচীনতম অভিশাপগুলির একটি। যুদ্ধ মানুষের শান্তি বিঘ্নিত করে, উন্নয়ন ব্যাহত করে, প্রগতির পথ রুদ্ধ করে দেয়। মানুষকে ধ্বংস করা, সম্পত্তির বিনাশ ঘটানো আরেক নাম যুদ্ধ আর পরিণতি হল দেশের সাথে দেশের শত্রুতা, জাতির সঙ্গে জাতির বৈরিতা, আর গার্হস্থ্য অস্তিত্বে রোগ শোক-অর্থাভাব, অন্নাভাব ও কর্মহীনতার প্রকোপ বৃদ্ধি। যুদ্ধ কোনদিন মানুষের শুভ শক্তি হতে পারে না। এই সত্য

আমরা আশৈশব জেনে আসি নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এ সত্যের যে ভুবনায়িত রূপ তার global perspective—আমরা এই এককের মধ্যে দিয়ে আলোচনা করব। এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখব কেমন করে পূর্ব ইউরোপের জাতীয়তাবাদ—যাকে আমরা বলকান জাতীয়তাবাদ বলে থাকি—সেই জাতীয়তাবাদের ধারা কি বিপজ্জনক আকার ধারণ করেছিল যাকে প্রশমন করা পশ্চিমী শক্তিগুলির পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। আর দেখব সমস্ত ইউরোপীয় মহাদেশ দুটি সশস্ত্র শিবিরে বিভক্ত হয়ে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করেছিল যার ফল আসন্ন ঝড়ের, অশনি সংকেত বিশ্বময় সভ্যতার সংকট ঘনিয়ে তুলেছিল—সাম্রাজ্যবাদের লোভ আর হানাহনি গ্রাস করতে চাইছিল মানুষের গোটা সভ্যতার দুনিয়া জোড়া রূপটিকে। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত নানা রণাঙ্গনে মিত্রশক্তি—ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া—বনাম অক্ষশক্তি—জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইটালি—এই তিন দেশের ঐক্যবদ্ধ লড়াই এমন এক বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় এনে দিয়েছিল যার প্রভাব বহুদেশের স্থিতিশীলতাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, এই বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতেই রাশিয়ার জারতন্ত্রের ভিত নড়ে গিয়েছিল, জার্মানির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছিল এবং বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য লীগ অফ নেশনস্ নামে এক অভিনব বিশ্বসংগঠনের জন্ম হয়েছিল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সাম্রাজের কাঠামো ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল হাঙ্গেরি, ইউগোশ্লভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশ। ইউরোপের পুরানো মানচিত্রের পরিবর্তন হয়েছিল—আর পরিবর্তন হয়েছিল মানুষের মনের, তার সমাজব্যবস্থার, তার ম্যূলবোধের। এত বড় পরিবর্তন এর আগেই পৃথিবীতে আর কোনদিন হয়নি। বিশ্বময় এই পরিবর্তনের প্রেক্ষিতকে বোঝার জন্য আমরা এই এককে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পড়ব।

৪.৪.১প্রস্তাবনা

বিংশ শতাব্দী ছিল বিস্ময়করভাবে যুদ্ধের শতাব্দী। এই শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এমন দুটি বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যা সারা বিশ্বকে গ্রাস করেছিল (১৯১৪-১৮১৮ এবং ১৯৩৯-১৯৪৫)। মনে রাখতে হবে যে এই যুদ্ধ দুটি ছিল মূলত ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির নিজেদের যুদ্ধ যা তারা ছড়িয়ে দিয়েছিল এশিয়া আর আফ্রিকার দেশগুলিতে। আঠারো ও উনিশ শতকে ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধের প্রবণতা বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধই হয়ে দাঁড়ায় কোন কোন দেশের পক্ষে শান্তির চেয়ে বড় ঐতিহ্য—কোন কোন মুহূর্তে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। একজন পুরানো দিনের ঐতিহাসিক এই ব্যাপারটি অনুধাবন করে একটি বক্তব্য রেখেছিলেন যার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য দেশগুলির এই যুদ্ধবাজ মানসিকতাকে বড় সুন্দর করে তিনি বুঝিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে উনিশ শতকের ইউরোপের দেশগুলি—সে স্বৈরাচারী হোক আর গণতান্ত্রিক হোক—বিশ্বাস করত যে যুদ্ধ হচ্ছে একটি রাজনৈতিক অস্ত্র। ফরাসী রাজনৈতিক স্বাধীনতার বাণীটি যুদ্ধের দ্বারাই তাড়িত হয়েছিল। নেপোলিয়নের স্বৈরাচারকে রুখে দিয়েছিল যুদ্ধ। যুদ্ধের মাধ্যমেই ইটালী ও জার্মানির ঐক্য সাধিত হয়েছিল। এই একই মাধ্যমেই যুক্তরাষ্ট্র তার ফেডারেশন গড়তে পেরেছিল। এই পথ ধরেই পাশ্চাত্য প্রবেশ করেছিল প্রাচ্যের ঐশ্বর্য ভাণ্ডারে। ["The nations of the nineteenth century, whether autocratic or democratic, believed that war was an effective political weapon. War had propagated French political freedom, war had cheeked the tyranny of a Napoleon, by that means Italy and Germany had found union, the united states justified federation, by the same path the West had entered into the wealth of the East."—D. M. Ketelbey. *A History of Modern Times From 1789 to the Present Day*] মোটের উপর একটা যুগ তৈরি হয়েছিল যে যুগ মনে করত যে যুদ্ধ হচ্ছে একটা প্রয়োজনীয় অস্ত্র। এই অস্ত্রকে এত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল ১৯১৪ সালে যে প্রায় সারা পৃথিবীই যুদ্ধের আওতায় এসে পড়েছিল। বাদ পড়েছিল শুধু নেদারল্যান্ডস্ ও তার সাম্রাজ্য, **নেদারল্যান্ডস্ :** ওলন্দাজ ভাষায় বলা হয় নেডারল্যান্ড (Nederland) বা নিম্নভূমি। ইউরোপের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত একটি ছোট

রাজ্য যার আয়তন হল ১২,৫৩০ বর্গ মাইল। এই আয়তনের এক তৃতীয়াংশ সমুদ্র সমতলের নীচে অবস্থিত। সেইজন্য তাকে বলা হয় নিম্নভূমি—Nederland—ইংরেজি ভাষায় Netherlands। এক সময়ে বেলজিয়াম রাজ্য (Kingdom of Belgium) এবং লুকসেমবুর্গের রাজ্যকেও (Grand Duchy of Luxemburg) নেদারল্যান্ডসের অন্তর্ভুক্ত ধরা হত। নেদারল্যান্ডস রাজ্যের দুটি বড় প্রদেশ হল (এর মোট প্রদেশ এগারোটি) উত্তর হল্যান্ড ও দক্ষিণ হল্যান্ড (North Holland and South Holland)। এই দুই প্রদেশের নাম থেকেই সম্পূর্ণ রাজ্যটিকে হল্যান্ড বলা হয়। স্পেন, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, কলোম্বিয়া, জেনেজুয়েলা এবং মেক্সিকো। পৃথিবীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষ যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল। শুধু তাই নয়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধই হল প্রথম যুদ্ধ যেখানে শুধু পেশাদারী সৈন্য ও নৌবাহিনীই লড়াই করেছিল তা নয়, এক দেশের ও একজাতির মানুষ সামগ্রিকভাবে লড়াই করেছিল আরেক দেশ ও আরেকজাতির মানুষের সঙ্গে। আর তার সঙ্গে সর্বপ্রথম পৃথিবীতে ব্যবহৃত হল এক সঙ্গে বহু মানুষ ধ্বংস করতে পারার অস্ত্র (weapons of mass slaughter)। এই যুদ্ধে সরাসরিভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল ইংল্যান্ড. ফ্রান্স ও রাশিয়া যারা নিজেদের মধ্যে একটি অলিখিত মৈত্রী বন্ধন (যাকে বলা হয় আঁতাত বা entente) রচনা করেছিল। তাদের সমর্থন করেছিল জাপান (১৯১৪ সালের আগস্ট মাস থেকে)। যুদ্ধের যে কোন বিষয়ে এদের মিত্র শক্তি বা Allied Powers বলে বর্ণনা করা হয়। এদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল দুই ইউরোপের কেন্দ্রগত শক্তি—জার্মানি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী এবং তুরস্ক। ১৯১৫ সালে বুলগেরিয়া তাদের সমর্থনে যুদ্ধে যোগ দেয়।

৪.৪.২ প্রারম্ভিক কথা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যে কোন প্রারম্ভিক আলোচনায় বুঝতে হবে মিত্রশক্তি (Allied Powers) ও কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের (Central Powers) সুবিধা-অসুবিধা কি ছিল যা নিয়ে তারা যুদ্ধের প্রাথমিক ঘটনাবলীর মোকাবিলা করতে চেয়েছিল। ভৌগোলিক ভাবে মিত্রশক্তি ছিল অনেক ছড়ানো ও বহুধা বিভক্ত শক্তি। তাতে মনে হতে পারে যে এর দ্বারা মিত্রশক্তির সুবিধাই হয়েছিল কারণ এতগুলি বান্ধব রাষ্ট্র পরিকল্পিত ভাবে কেন্দ্রীয় শক্তিদের বেষ্টন করে রাখতে পারত। বিপক্ষ শক্তিকে ঘিরে ফেলা যে কোন অর্থেই যুদ্ধের সাফল্য বলে চিহ্নিত হতে পারে। বাস্তবে অবশ্য তা কখনোই হয়নি। মিত্রশক্তির বিরাট ভৌগোলিক ব্যবধান তাদের পক্ষে একটি পরিকল্পনা মাফিক সাধারণ কাজ (Common action) করায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মিত্রশক্তির যেমন কোন সাধারণ লক্ষ্য ছিল না, সেরকম ছিল না একজন সর্বোচ্চ সেনাপতি। এর বিপরীতে কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গ প্রথম থেকে সুপরিকল্পিত কার্যবিন্যাসের ছবিটি তুলে ধরতে পেরেছিল—পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক আক্রমণকে আগের থেকে সাজিয়ে তোলা রেল ব্যবস্থার মাধ্যমে সফল করার সমস্ত দক্ষতাও তারা দেখিয়েছিল। আসলে প্রথমদিকে মিত্রশক্তির আয়জন ছিল শ্লথ, তাদের গতিবিধি (movements) ছিল অসংগঠিত (irregular) এবং সময়ের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয় (ill-timed)। বিশেষ করে রাশিয়া তার সৈন্য সঞ্চালনে এবং তাকে স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অসম্ভব দীর্ঘসূত্রতার পরিচয় দিয়েছিল। জার্মানি ও অস্ট্রিয়া প্রথম থেকেই অত্যন্ত দ্রুত তাদের সৈন্য পরিচালনার দক্ষতা দেখিয়ে অতি অল্প সময়ে অল্প সংখ্যক সৈন্যব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের আত্মরক্ষার যে ছবিটি তুলে ধরেছিল তা প্রথম পর্বে যুদ্ধের সাধারণ ধারার মধ্যে প্রভাব ফেলেছিল। বস্তুতপক্ষে—ঐতিহাসিকরা মনে করেন কেন্দ্রীয় শক্তিগুলির সংগঠন ও স্ট্র্যাটেজি এতই সরল ছিল যে যুদ্ধের প্রথম দিকে লড়াই করার মূল উদ্যোগ (initiative) এবং যুদ্ধের কর্মতৎপরতার প্রধান ধারা (lines of operation) তাদের হাতেই ছিল।

কেন্দ্রীয় শক্তিগুলি জানত যে তাদের এই প্রাথমিক সাফল্য মাত্র সাময়িক। তাদের বিপক্ষের শক্তিরা এত ছড়ানো, এত ক্ষমতাসম্পন্ন এবং নৌবহরে এত শক্তিশালী যে বেশীদিন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ও নিরবচ্ছিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যদি মিত্র শক্তি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে তাদের সংগঠন

ও স্ট্র্যাটেজিকে প্রতিরোধ দিতে পারত তবে তাদের মধ্যে বিরোধহীন এমন এক সাধারণ ঐক্য গড়ে উঠত। এমন এক কেন্দ্রীয় সাধারণ (common) ও সর্বোচ্চ (supreme) নেতৃত্ব গড়ে উঠত যার মোকাবিলা করা অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও জার্মানির পক্ষে সম্ভব হত না। তাই প্রথম কেন্দ্রীয় শক্তি বর্গের লক্ষ্য ছিল অতি দ্রুত কাজ যাতে মিত্রশক্তি সংগঠিত হয়ে তাদের সমস্ত রসদ ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় শক্তিদের পূর্ব পশ্চিম থেকে ঘিরে ফেলতে না পারে। কেন্দ্রীয় শক্তিগুলি—জার্মানি ও অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী— প্রথম থেকে চেষ্টা করেছিল যাতে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই বিপরীত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকতে পারে। মিত্রশক্তি যে কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গকে ঘিরে ফেলে যুগপৎভাবে তাদের পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ করতে বাধ্য করে তাদের লড়াইয়ের সামর্থ্যকে নষ্ট করে দেবার পরিকল্পনা করবে এ কথা অনুমান করেই তারা আগে থেকে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়ে নিজেদের জয়কে নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করেছিল। অতএব তাদের পরিকল্পনা ছিল সমস্ত শক্তি দিয়ে ফ্রান্সের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে নিস্তেজ করে দেওয়া এবং সম্ভব হলে যুদ্ধের থেকে হটিয়ে দেওয়া যাতে পূর্ব দিক থেকে রাশিয়া আক্রমণ করার আগেই পশ্চিম সীমান্তকে তারা তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। তাহলেই পশ্চিম সীমান্তের সফল জার্মান সৈন্যদের তারা পূর্ব সীমান্তে আনতে পারবে—সম্ভাব্য রুশ আক্রমণকে ঠেকাতে পারবে।

৪.৪.৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিত

১৯১২-১৩ সালে দুটি বলকান যুদ্ধ (Balkan Wars)— একান্তভাবেই আঞ্চলিক দুটি যুদ্ধ ছাড়া মোটামুটিভাবে ১৮৭১ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত সামান্য অধিক চার দশক সময় ছিল ইউরোপের শান্তির সময়। শুধুমাত্র ১৮৭৭ সালে তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ সামান্য উত্তেজনার সৃষ্টি করলেও বড় মাপের কোন শান্তি বিঘ্ন হওয়ার ঘটনা এই সময়ে ঘটেনি। তা সত্ত্বেও ইউরোপের ছয়টি 'বৃহৎ শক্তির' (Great Powers) মধ্যে উত্তেজনা বহাল ছিল এবং ভেতরে ভেতরে তা বাড়ছিল। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া নিজেদের মধ্যে একটা অলিখিত সমঝোতা বা আঁতাত (Entente) গঠন করে একটা মিত্র শক্তির জোট রচনা করেছিল। অন্যদিকে জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও ইটালী নিজেদের মধ্যে একটা ত্রিশক্তির জোট তৈরি করে ইউরোপীয় মহাদেশের মধ্যভাগের একটি কেন্দ্রীয় শক্তি জোট রচনা করল। এই দুই জোটই ইতিহাসে ট্রিপল আঁতাত (Triple Entente) ও ট্রিপল এলায়েন্স (Triple Alliance) নামে বিখ্যাত। এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার অনেক আগেই সমস্ত ইউরোপ দুটি সশস্ত্র শিবিরে (armed camps) বিভক্ত হয়ে পড়ে। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত এই শিবির ভাগের সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়নি। ১৮৯০ সাল বিসমার্ক (Bismarck) জার্মানির পররাষ্ট্রনীতির নির্মাতা ও নিয়ন্ত্রক ছিলেন। তিনি এই ধারণা প্রচার করেছিলেন যে জার্মানি হচ্ছে 'তৃপ্ত রাষ্ট্র' (Satiated State)। এতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ধারণা জন্মেছিল যে জার্মানি বাহুবলে আর মহাদেশীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে দেবে না। শুধুমাত্র ফ্রান্স ১৮৭০ সালের সে দানের যুদ্ধে জার্মানির হাতে পরাজিত হয়ে এবং তাকে আলসাস-লোরেন নামক অঞ্চলের ভূখণ্ড ও মানব-সম্পদকে প্রদান করে যে নিঃসীম অপমানের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল, তার থেকে মুক্তি খোঁজা, এবং সেই খোঁজার মধ্য দিয়ে প্রতিহিংসা পরায়ণ হওয়া তার পক্ষে অযৌক্তিক ছিল না। ইংল্যান্ড এই সময়ে এক স্ব-আরোপিত নিঃসঙ্গতার (isolation) মধ্যে মগ্ন ছিল। ফলে হঠাৎ করে ঝড় ওঠার কোন সম্ভাবনা তখন ইউরোপীয় রাজনীতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি।

বিসমার্ক সতর্ক কূটনীতিবিদ ছিলেন। তিনি ইংল্যান্ডকে কোনভাবে অসন্তুষ্ট করেননি বা বিচলিত হতে দেননি। ১৮৭০ সালে জার্মানির ঐক্যভবনের ফলে ইউরোপে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা নতুন করে আত্মপ্রকাশ করেছিল তাকেই চূড়ান্ত ব্যবস্থা ধরে নিয়ে তিনি মহাদেশীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ১৮৯০ সালে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর জার্মান বৈদেশিক কূটনীতির সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক হলেন *কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম* (Kaiser William II)। তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ। তাঁর স্বপ্ন ছিল জার্মানিকে ইউরোপের অন্যতম

শ্রেষ্ঠ শক্তি শুধু নয় একটি বিশ্ব শক্তিতেও রূপান্তরিত করা। বিসমার্ক জার্মানিকে একটি বৃহৎ মহাদেশীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করেই ক্ষান্ত ছিলেন, তাকে বিশ্বশক্তি করার বাসনা তাঁর ছিল না, কারণ তিনি জানতেন যে তার দ্বারা ইউরোপের সনাতন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নাড়া খাবে। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, জার্মানির জন্য তিনি বহির্বিশ্বে উপনিবেশ খুঁজছিলেন এবং বিসমার্কের 'তৃপ্ত রাষ্ট্রের' নীতিকে পরিহার করে তিনি দুর্বার অগ্রগতির—তার ভাষায় Full steam Ahead এর কথা বলতেন। উপনিবেশ দখলের স্বপ্ন দেখার অর্থ হল নিজের নৌ-শক্তিকে বৃদ্ধি করা যার অর্থই হল ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের—বিশেষ করে ইংল্যান্ডের সাথে নতুন করে সামাজিক, বাণিজ্যিক ও নৌশক্তির প্রতিযোগিতায় যাওয়া। বিসমার্ক জানতেন যে এ প্রতিযোগিতার অর্থ হল বিশ্বশক্তির পুনর্বণ্টন—একজন ঐতিহাসিকের ভাষায় 'nothing less than a readjustment of world-power'। তাই তিনি তা এড়াতে চেয়েছিলেন। ঐতিহাসিকদ্বয় ডেরি ও জার্মান [T. K. Derry and T. L. Jarman, *The European world 1870-1961,* 1965.p.150] বলছেন যে যখন বিসমার্কের সাধারণ বুদ্ধিজনিত প্রভাব (commonsense influence) যখন অপসারিত হল তখন জার্মানির 'জাতীয় চেতনা শক্তির জন্য শক্তির বোধ ('national cult of power for power's sake') উজ্জীবিত হল। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে জার্মানি তার সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কঠিন শৃঙ্খলা ও দৃঢ় কার্যপ্রণালী এবং সফল বাণিজ্যিক উদ্যোগ থেকে লব্ধ রাজনৈতিক শক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল ("For Germany in the early Twentieth Century was above all a land of economic prosperity and self-confidence, based upon a discipline and hard work in all classes of society and the skilful exploitation of political strength for commercial advantage"—Derry and German, p. 151)। জার্মানির ভেতরে আত্মপ্রকাশ করেছিল অর্থনৈতিকভাবে সফল ও আত্মপ্রত্যয়শীল দেশ। এই দেশের কর্ণধার ছিলেন কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম। তিনি এই নবোদিত শক্তির উদ্যোগকে বৈদেশিক গৌরব অর্জনের কাজে লাগাতে চাইছিলেন। ইউরোপীয় মহাদেশে সমস্ত দেশ ও জাতির মনে জার্মানির লৌহশক্তি, বিসমার্কের 'রক্ত ও লৌহ নীতি' ('Blood and Iron policy') আতঙ্ক জাগিয়েছিল। এবার কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের সাম্রাজ্যবাদী নীতি নতুন আশঙ্কার সৃষ্টি করল। একজন ঐতিহাসিক লিখলেন যে এটি সবচেয়ে জঘন্যতম আশঙ্কা—অনিশ্চিতের আশঙ্কা—It was the wors kind of fetar : fers of the unknown (Brett)। কাইজারের অস্থির শক্তি কোন দিকে ধাবিত হবে কেউ জানতনা। অনিশ্চিত আশঙ্কায় সমস্ত জাতি নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে লাগল। প্রকাশ্যে ও গোপনে অস্ত্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল। এই পরিবেশে যে কোন বিশ্ববিবাদের মীমাংসা যে আর অস্ত্র ছাড়া হবে না। তা বোঝাই যাচ্ছিল। আপাত শান্তির অন্তরালে এইভাবে যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়ে আসছিল।

৪.৪.৪ বলকান জাতীয়তাবাদ

ইউরোপের পূর্বে ও দক্ষিণ পূর্বে নানা জাতির মানুষ বাস করত। এদের মধ্যে ছিল মেজর (magyar—উচ্চারণ 'মেগিয়ার' নয়), চেক, সার্ব শ্লোভ্যাক, ক্লোট ইত্যাদি মানুষ যারা সবাই ছিল এথ্‌নিক (ethnic) বিভাজনে স্ল্যাভ (slav) জাতির অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে কোন কোন মানুষ অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কেউ ছিল তুর্কী অটোমান সাম্রাজ্যের অংশভুক্ত মানুষ। উনিশ শতাব্দীতে অটোমান সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে এই সব মানুষদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পায়। ইউরোপে নেপোলিয়নের সময় থেকেই জাতীয়তাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এইবার জাতীয়তাবাদ ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের স্ল্যাভজাতির মানুষদের গ্রাস করল। জাতীয়তাবাদ ছিল উনিশ শতকের নতুন আত্মচেতনা, আর এই আত্মচেতনাই বলকান অঞ্চলকে সামগ্রিকভাবে ইউরোপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক তৎপরতার অঞ্চল করে তুলল। বলকান অঞ্চলের মানুষরা ছিল বেশিরভাগই খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী। তাদের আনুগত্য ছিল পূর্বের অর্থোডক্স

চার্চের (Eastern Orthodox Church) প্রতি। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের বিনাশের পর এই চার্চের সবচেয়ে বড় ধারক ছিল রাশিয়া। আবার রাশিয়া ছিল সবচেয়ে বড় স্ল্যাভ রাষ্ট্র। ফলে বলকান অঞ্চলের বিভিন্ন মানুষ ও দেশগুলির প্রতি রাশিয়ার একটা প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা ছিল। রাশিয়ার সঙ্গে তুরস্কের বিরোধের অনেক কারণের মধ্যে এটাও ছিল অন্যতম। ১৮৯০ এর দশক থেকে যখন জার্মানি অটোম্যান সাম্রাজ্যকে মদত দিতে শুরু করল তখন থেকে বলকান জাতীয়তাবাদকে রাশিয়াও গোপন সমর্থন জানাতে লাগল। কাইজার দুবার তুরস্ক ভ্রমণ করার ফলে তুর্কী-জার্মান দেয়া-নেয়া বাড়ছিল। স্থির হয়েছিল যে জার্মানির সহায়তা ভিয়েনা, বুদাপেষ্ট, কনস্টান্টিনোপল হয়ে বসরা পর্যন্ত একটি রেললাইন পাতা হবে যে লাইন ইউরোপের বার্লিনকে যুক্ত করবে বাগদাদের সঙ্গে। এই রেল ব্যবস্থা সফল হলে পূর্ব দিকে জার্মানির প্রভাব বাড়ত এবং সুয়েজখালের বিকল্প রাস্তা খুলে দিয়ে পূর্ব পশ্চিম যোগাযোগের চাবিকাঠি ইংল্যান্ডের হাত থেকে জার্মানির হাতে চলে যেত। এইভাবে যখন সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতার ভয় ইংল্যান্ড গ্রাস করল তখনই ১৯০৮ সালে—তুরস্কে সংগঠিত হল তরুণতুর্কী বিপ্লব (Young Turk Revolution)। তৎক্ষণাৎ এই বিপ্লবের ফলে বেসামাল তুরস্কের সাময়িক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে বিপ্লবের তিন মাস পরে বুলগেরিয়া (Bulgaria) স্বাধীনতা ঘোষণা করল। বুলগেরিয়ার পেছনে রাশিয়ার মদত ছিল বলে তুরস্ক কিছুই করতে পারল না। তুরস্ক হয়ত অস্ট্রিয়ার সাহায্য নিতে পারত কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বুলগেরিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার দুদিন পরে অস্ট্রিয়ার বসনিয়া (Bosnia) হার্জেগোভিনা (Harzegovina) দখল করে নিল। এই কাজের দ্বারা দুটি দেশই ১৮৭৮ সালের বার্লিন চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করল। কারণ এই চুক্তিতে বলা ছিল যে শেষোক্ত দুটি দেশের প্রশাসন থাকবে অস্ট্রিয়ার অধীনে। হয়ত ১৯০৮ সালের ঘটনাবলী নিয়েই যুদ্ধ বেধে যেতে পারত। কিন্তু ১৮৭৮ সালের বার্লিন চুক্তির স্বাক্ষরকারীরা কেউই প্রস্তুত ছিল না। সাময়িকভাবে যুদ্ধ স্থগিত রইল।

অস্ট্রিয়াার বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা দখল বলকান অঞ্চলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এই দুই অঞ্চলের মানুষ জাতিগতভাবে সার্বদের (Serbs) অন্তর্ভুক্ত মানুষ ছিল। আর সার্বরা অনেকদিন ধরই এক 'বৃহত্তর সার্বিয়া' (Greates Serbea) গঠনের স্বপ্ন দেখছিল। মূল সার্বিয়া ও পরিপার্শ্বের সমস্ত সার্বদের নিয়ে এই বৃহত্তর সার্বিয়া গঠনের পরিকল্পনা অনেকদিন ধরেই চালু ছিল। অস্ট্রিয়ার বসনিয়াও হার্জেগোভিনা দখলের ফলে এই বৃহত্তর সার্ব রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে এর পর থেকে ইউরোপীয় মহাদেশের এক কেন্দ্রীয় শক্তি—অস্ট্রিয়া—যে কোন সার্বসম্প্রসারণের নীতিকে প্রতিরোধ করবে। এর ফলে বলকান অঞ্চলের মানুষদের অস্ট্রিয়ার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেল। বলকান জাতীয়তাবাদ আরও তীব্রতর হল। স্বাভাবিকভাবেই অস্ট্রিয়া ও তার শাসকবর্গ সম্বন্ধে নানা উত্তেজনাকর মত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নতুন করে ষড়যন্ত্রের বীজ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এর পর থেকে স্পষ্ট করেই বলকান জাতীয়তাবাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াল একদিকে অস্ট্রিয়া, অন্যদিকে তুরস্ক। তুরস্কের বিরুদ্ধে বলকান জাতীয়তাবাদের উত্থান আঞ্চলিক যুদ্ধ ডেকে এনেছিল— তা হল ১৯১২ ও ১৯১৩ সালের বলকান যুদ্ধ। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বলকান বৈরিতা ডেকে এনেছিল বৃহত্তর যুদ্ধ —প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

৪.৪.৫ আন্তর্জাতিক সংকটঃ হেগ কনফারেন্স থেকে বলকান যুদ্ধ

১৮৭০ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে যে অধ্যায় তা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে অনিশ্চিত অধ্যায়গুলির মধ্যে একটি। আপাতভাবে বিরাজমান শান্তির মধ্যে ছিল প্রত্যাসন্ন যুদ্ধের আশঙ্কা। যে বৈজ্ঞানিক পূর্ণতা ও সাফল্য (scientific throroughness and efficiency) নিয়ে এশিয়ার সামরিক যন্ত্র তৈরি হয়েছিল যা জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল তা ইউরোপের প্রত্যেক দেশের মধ্যে যুগপৎভাবে উৎসাহ ও আশঙ্কা জাগিয়ে তুলে আন্তর্জাতিক সংকটের বাতাবরণকে ঘনীভূত করে তুলেছিল। সবাই উৎসাহিত হয়েছিল তাদের সামরিক শক্তিকে নবকলেবরে সুসজ্জিত করতে,

বৈজ্ঞানিক পূর্ণতায় নিজেদের বাহুবলকে এমন দক্ষতা দিতে যা ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। একজন ঐতিহাসিক বলেছেন যে উনিশ শতকের শেষ সিকিভাগ সময়ে ইউরোপে আগে যা হয়নি তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল—আক্ষরিক অর্থেই হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি সশস্ত্র মহাদেশ ("Europe became in the last quarters of the nineteenth Century what she had never been before, literally an armed continent"—Charles Oman Hazen, *Modern Europe upto 1945*) । জাতির সঙ্গে জাতির বৈরিতার থেকে জন্ম নিচ্ছিল ভিন্ন এক প্রতিযোগিতা—মারণাস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা, দুর্ভেদ্য নৌবহর ও শক্তিশালী সামরিক মানবশক্তি গড়ে তোলার ব্যবস্থা। তৈরি হচ্ছিল মারণাস্ত্র ক্ষেপণাস্ত্র—টর্পেডো ও টর্পেডো-বাহী জলযান—আর তৈরি হচ্ছিল সেই সব ক্ষেপণাস্ত্রকে আড়াল থেকে অকেজো করার যন্ত্র, জলের তলে আক্রমণ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় জলযান সাবমেরিন। এর পরেই এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল অন্তরীক্ষে লড়াইয়ের যন্ত্র চালানো যায় এমন বেলুন (dirigible balloons) ও বিমান। এইভাবে যুদ্ধ নামক মানুষের প্রাচীনতম প্রবণতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নতুন সমর্থন যুক্ত হতে লাগল। এইবার যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিল তা অভূতপূর্ব। এতদিন যুদ্ধ হয়েছে মাটি বা জলের উপর। এবার যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিল আকাশে ও জলের নীচে, গভীরে, গহনে। ইউরোপে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর রাষ্ট্র ছিল রাশিয়া। সামরিক শক্তিকে আধুনিকীকরণের কাছে লিপ্ত হওয়ার ক্ষমতা রাশিয়ার ছিল ন কারণ সে কাজ ছিল ভয়ানক ব্যয়সাধ্য। অতএব রাশিয়ার মনেই এই ধারণা প্রথম এল যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার থেকে যুদ্ধকে প্রতিরোধ করা, পূর্বাহ্নেই প্রস্তুতি নিয়ে তাকে এড়িয়ে যাওয়া অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। অতএব রাশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাস প্রস্তাব করলেন যে পরস্পরের আলোচনার ভিত্তিতে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি অস্ত্রসংকোচনের নীতিগুলি নির্ধারণ করুক। সেই প্রস্তাব অনুযায়ী ১৮৯৯ ও ১৯০৭ সালে হেগ নামক স্থানে দু'বার শান্তি সম্মেলন হয়েছিল। প্রথমবারের সম্মেলনে পৃথিবীর ছাব্বিশটি সার্বভৌম সরকারের একশত জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে ২০টি দেশ হল ইউরোপের ৪টি দেশ (চীন, জাপান, পাসিয়া বা পারস্য দেশ এবং শ্যাম দেশ) এশিয়ার ও ২টি (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো) দেশ আমেরিকার। এই সম্মেলন দুটি ব্যর্থ হয়েছিল। শুধু প্রথম সম্মেলন থেকে সৃষ্টি হয়েছিল স্থায়ী সালিসী আদালত—Permanent Court of Arbitration—নামে একটি আন্তর্জাতিক বিচার সংস্থা। স্থির হল যে আন্তর্জাতিক বিবাদ সাধারণ কূটনীতির দ্বারা মীমাংসা করা সম্ভব নয় তা এই বিচার সংস্থার দ্বারা মীমাংসিত হবে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রেনে আলব্রেকাত -করিয়ে (Rene Albrecht -Carrie', *A Diplomatic History of Europe Since the Congress of Vienna*) বলেছেন যে অস্ত্র সংকোচন নিয়ে আহূত প্রথম হেগ শান্তি সম্মেলন সালিসী ব্যবস্থা নিয়ে সংক্ষিপ্ত মতৈক্য ছাড়া আর কিছুই আয়ত্ত করতে পারেনি ("This first Hague conference on the limitation of armaments yielded nothing more than a limited agreement on arbitration.") । দ্বিতীয় হেগ সম্মেলন ও অস্ত্রসংকোচনের কোন নীতি স্থির করতে পারল না। যুদ্ধ সংক্রান্ত কতগুলি নীতি শুধু স্থির হয়েছিল যেমন অরক্ষিত শহরের (unfortified towns) উপর বোমাবর্ষণ করা যাবে না। অর্থাৎ দ্বিতীয় হেগ শান্তি সম্মেলনের একমাত্র কৃতিত্ব হল যুদ্ধকে একটু মানবিক সীমার মধ্যে আটকে রাখা—একজন ঐতিহাসিকের ভাষায় "to ensure that war would be waged more humanely than hitherto"। রাশিয়ার জার দুঃখ করে বলেছিলেন যে শান্তি সংরক্ষণকেই আন্তর্জাতিক নীতির লক্ষ্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। অথচ এর নামে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে শক্তিশালী মৈত্রী রচনা করছে ("The preservation of peace has been put forwarded as the object of international policy. In its name the great States have concluded between themselves powerful alliance")। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির কাছে তখন শান্তির কথা হাস্যকর হয়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিক লিপসন বলেছেন যে মহাদেশের প্রধান প্রধান শক্তিগুলি একটা বিষাক্ত চক্রের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল। তারা সবাই শান্তির ঘোষণা করত কিন্তু ভয় পেত প্রতিবেশীকে—ভাবত অস্ত্রের পর অস্ত্র জড়ো করে

প্রতিবেশী রাষ্ট্র সবল হচ্ছে। এই আশঙ্কায় প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজের শক্তিবৃদ্ধি করার চেষ্টা করত। এই পরিস্থিতি যদি চলতে থাকে—রাশিয়ার জার দুঃখের সঙ্গে লিখলেন—তবে অনিবার্যভাবে সেই বিপর্যয় নেমে আসবে যে বিপর্যয় এড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। ("It appears evident, then that if this state of things continues, it will inevitably lead to the very cataclysm which of is desired to avert, and the horrors of which make every thinking being shudder in anticipation"— দ্রষ্টব্য Holls, *The Peace Conference at the Hague,* p. 8) । ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে পারল না তার অর্থই হল অন্তরালে যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠেছিল। এইরকম আসন্ন যুদ্ধের পূর্বাভাস দেখা দিয়েছিল দুবার—১৯৩৬ ও ১৯১১ সালে মরক্কোর সংকটে এবং ১৯১২ ও ১৯১৩ সালের বলকান যুদ্ধে। এই দুই সংকটের ইতিহাস সংক্ষেপে নীচে আলোচনা করা হল।

মরক্কোর সংকট, ১৯০৬, ১৯১১

ফরাসীরা ১৯০২ সালে ইটালীর সংগে তাদের চুক্তির দ্বারা এবং ১৯০৪ সালের ইংল্যান্ডের সঙ্গে তাদের আঁতাতের দ্বারা মরক্কোতে (Morocco) স্বাধীনভাবে হস্তক্ষেপের অধিকার পেয়েছিল। এবার তারা স্থির করল যে মরক্কোর সুলতানকে একটি সংস্কারের কর্মসূচী (scheme of reforms) গ্রহণ করতে বাধ্য করবে। তৎক্ষণাৎ কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম এই বৃহত্তর কাজে জার্মানিকে গ্রহণ না করায় ক্ষুব্ধ হয়ে মরক্কোর স্বাধীনতা রক্ষায় জার্মানির সহযোগিতা ঘোষণা করলেন। ১৯০৫ সালের মার্চ মাসে তিনি ট্যাঙ্গিয়ারে (Tangier) ভ্রমণকালে এই ঘোষণা করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দাবি করেন যে মরোক্কোর ভাগ্য নির্ধারণের জন্য ইউরোপীয় রাজ্যগুলি একটি আলোচনা সভায় মিলিত হোক। এদিকে মরক্কোর সুলতান জার্মানির সহযোগিতায় আশ্বস্ত হয়ে ফরাসী সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তখন ইউরোপীয় শক্তিগুলি ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে আলজেসিরার্স (Algeriras) নামক স্থানে একটি আলোচনা সভায় স্থির করে যে মরোক্কো হবে একটি স্বাধীন রাজ্য, কিন্তু বাণিজ্যের জন্য সমস্ত জাতির মানুষের কাছে তাকে উন্মুক্ত রাখা হবে। বারেটি রাষ্ট্র এই আলোচনা সভায় অংশ নিয়েছিল,তাদের মধ্যে শুধু অস্ট্রিয়াই ছিল জার্মানির বন্ধু। আলজেসিয়ার্স সম্মেলনে সিদ্ধান্ত কি হয়েছিল তা বড় নয়। বড় হল তার থেকে উদ্ভূত এই আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা যে জার্মানি নিঃসঙ্গ। বোঝা গেছিল যে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি জার্মানির বিরুদ্ধে একজোট হয়ে তার আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিরোধ করতে পারে। জার্মানির কাইজার এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে বুঝতে পারেনি।

মরোক্কোর ঘটনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বড় ঘটনা কারণ তা ফ্রান্স ও জার্মানির সাম্রাজ্যবাদী চেতনাকে উস্কে দিয়েছিল। আসলে মরোক্কো ছিল অটোমান সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসা প্রায় স্বাধীন একটি রাজ্য যেখানে পরিস্থিতি ছিল বেসামাল —এতই বেসামাল যে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্স ও জার্মানি তাকে গ্রাস করার কথা ভাবত। মরোক্কোয় অবস্থানরত ব্রিটিশ কনসাল জেনারেল (Consul General) আর্থার নিকোলসন (Arthur Nicloson) বলেছিলেন যে মরোক্কো হচ্ছে "উত্তাল উপজাতিদের, দুর্নীতি পরায়ণ শাসকদের এবং দারিদ্র ও দুর্দশার একটি অসম্বদ্ধ সম্মেলন" (a "loose agglomeration of tribulent tribes, corrupt governors and general poverty and distress")। এইরকম মরোক্কোতে ১৯০৮ সালে অভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য সেখানকার সুলতান সিংহাসন-চ্যুত হলেন। নতুন সুলতান দেশের ভেতরের গোলযোগ দমন করতে ব্যর্থ হয়ে ১৯১১ সালে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র আলজেরিয়াতে (Algeria) অবস্থিত তার মিত্রশক্তি ফরাসীদের আহ্বান জানালেন যে তারা যেন তাঁর রাজধানী ফেজ-এ (Fez) এসে তাঁর নিরাপত্তা বিধান করে। ফরাসিরা এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তৎক্ষণাৎ তারা ফেজ-এ তাদের সৈন্য প্রেরণ করে। এই ঘটনায় জার্মানি ক্রুদ্ধ হল। রুষ্ট কাইজার তৎক্ষণাৎ মরোক্কোর বন্দর আগাদির-এ (Agadir) প্যান্থার নামে একটি যুদ্ধ জাহাজ (Panther) প্রেরণ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কৌশলে মরোক্কোর গুরুত্বপূর্ণ বন্দরটি দখল করা। আর তা সম্ভব না হলে অন্তত ফ্রান্সকে মরোক্কোয় নিজের প্রভাব বিস্তার করা থেকে

বিরত করা। জার্মানির এই কাজে ইংল্যান্ড বিরক্ত হল এইভেবে যে জার্মানি তার নৌ-বহিনীর পরাক্রম দেখিয়ে এমন অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করছে যেখানে ইংল্যান্ডের স্বার্থ জড়িত। জার্মানির নৌ-পরাক্রমকে ইংল্যান্ড মহাসমুদ্রে জার্মানির প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলে মনে করত। অতএব আগাদির এ জার্মান রণতরীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ডের লয়েড জর্জ (Lloyd George) ঘোষণা করলেন যে বহুশতাব্দীর -দুর্লভ কৃতিত্বের দ্বারা ইংল্যান্ড যে সমস্ত সুবিধা অর্জন করেছে তাকে জলাঞ্জলি দিয়ে, বিশ্বের রাষ্ট্র সমাজে ইংল্যান্ডকে উপেক্ষিত হতে হলে ইংল্যান্ড কখনোই সেই মূল্য দিয়ে শান্তি ক্রয় করবে না ("...I say emphatically that peace at that price would be humiliation intolerable for a great country like ours to endure")। এইভাবে হঠাৎ করে একটা যুদ্ধের পরিস্থিতি দেখা দিল। ফলে সন্ত আলজেসিয়ার্স কনভেনশনভুক্ত (Algeciras Convention) দেশগুলির মধ্যে আলাপ আলোচনা শুরু হল। পরিশেষে স্থির হল যে মরোক্কোকে ফরাসী প্রটেক্টরেট (French Protectorate) বলে স্বীকার করে নেওয়া হবে কিন্তু সকল দেশের বাণিজ্যের জন্য তাকে উন্মুক্ত রাখা হবে। জার্মানিকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ফ্রান্স কঙ্গো অঞ্চলে ভূখণ্ডদান করবে। জার্মানি আগাদির সংকট তৈরি করে কূটনৈতিকভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন (David Thompson, *Europe since Napoleon*) বলেছেন যে আগাদির সংকটের প্রধান ফল হল এই যে ইঙ্গ-জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মহাসাগরে আধিপত্য বজায় রাখার প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেল, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অবিশ্বাস বাড়ল। উভয় দেশের জনমত উত্তেজিত রইল। জার্মানি কঙ্গোতে ১০০০ বর্গমাইল ভূখণ্ডলাভ করল। বেশ বোঝা গেল যে ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে শেষ হয়ে যায়নি।

২. বলকান যুদ্ধ ঃ ১৯১২, ১৯১৩

১৯১২ সালে গ্রীক রাষ্ট্রনেতা ভেনিজেলস (Venezelos) একটি রাষ্ট্র সংহতি গঠনের উদ্যোগে নেন এবং গ্রীস, সার্বিয়া (Serbia), বুলগেরিয়া (Bulguria) ও মন্টেনিগ্রোকে নিয়ে বলকান লীগ নামে একটি রাষ্ট্র জোট গঠন করেন। এই লীগের উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কের কাছ থেকে ম্যাসিডেনিয়ায় অবস্থিত খ্রীষ্টানদের জন্য অধিকতর সুবিধা এ অধিকার আদায় করা। ১৮৭৮ সালের বার্লিনচুক্তি অনুযায়ী ম্যাসিডোনিয়া তুর্কী শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতএব বলকান লীগ তুরস্কের কাছে সরাসরি এই দাবী পেশ করল।

বলকান রাষ্ট্রগুলি কেন এই সময়ে জোট বাঁধল এবং তুরস্কের সঙ্গে সরাসরি বৈরিতায় অগ্রসর হল তার একটি প্রেক্ষিত আছে। ১৯১১ সালে ইটালী ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থ অঞ্চল ট্রিপোলি (Tripoli) আক্রমণ করে এবং বহু কষ্টের মধ্য দিয়ে তাকে নিজের দখলে রাখে। দুর্বল অটোমান সাম্রাজ্য নিজের রাজ্যাংশ রক্ষা করতে না পেরে অবশেষে ১৯১২ সালের ১৫ অক্টোবরলোসনা চুক্তির (Treaty of Lausanne) বা ঔচি-চুক্তির (Treaty of Ouchi) দ্বারা ট্রিপোলিকে ইটালীর হাতে সমর্পণ করে। ইটালী টিউনিস (Tunis) দখল করতে পারেনি, তার আগেই ফ্রান্স তা দখল করে নিয়েছিল। ইতিমধ্যে ইংল্যান্ড মিশর দখলের কাজ সম্পন্ন করে ফেলছিল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা দখল করে নিয়েছিল। ১৯০৮ সালে বুলগেরিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। কোন ক্ষেত্রেই দুর্বল অটোমান সাম্রাজ্য কোন প্রতিরোধ দিতে পারেনি। এমনকি কোন বৃহৎ শক্তিও এই তুর্কী সাম্রাজ্য ধসে যাওয়া প্রতিরোধ করতে নিজেদের প্রতিরক্ষা বা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়নি। অতএব এটাই ছিল তুর্কী সাম্রাজ্যের উপর চাপ সৃষ্টি করার প্রকৃষ্ট সময়।

এই পরিস্থিতিতেই বলকান লীগ তুরস্কের কাছে ম্যাসিডোনিয়ার খ্রীষ্টানদের জন্য অধিকতর সুযোগ-দাবি করল। দীর্ঘদিন ধরে ম্যাসিডোনিয়ার খ্রীষ্টান অধিবাসীদের উপর নির্মম অত্যাচার করছিল অটোমান সাম্রাজ্যের মুসলমান শাসকরা। সময় সময় বিপুল সংখ্যক মানুষকে হত্যা করা হত। আর এই হত্যালীলায় যারা বলি প্রদত্ত হত তাদের মধ্যে গ্রীক, বুলগেরিয়া, সার্বিয়া ইত্যাদি জাতিভুক্ত মানুষরাই ছিল বেশি। অতএব এই দেশগুলির মানুষেরা চাইছিল মন্টোনিগ্রোতে

অবস্থিত তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের উদ্ধার করতে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তুরস্কের কাছে তাদের দাবি পেশ করা হয়েছিল। এই দাবি তুরস্ক সরাসরি অস্বীকার করে। ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে বলকান লীগভুক্ত রাষ্ট্র চতুষ্টয় তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। লীগের সেনাবাহিনী কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করল। ডিসেম্বর মাসে বৃহৎ শক্তিগুলি হস্তক্ষেপ করে লন্ডনে একটি সম্মেলনের আয়োজন করল। কিন্তু শান্তিচুক্তির যে শর্তাবলী বৃহৎ শক্তিগুলি তুরস্কের উপর আরোপ করছিল তা মেনে নিতে তুরস্ক অস্বীকার করল। ফলে ১৯১৩ সালে আবার যুদ্ধ শুরু হল এবং লীগের সৈন্যবাহিনী পুনরায় কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করল। ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে জোট বাহিনী কনস্ট্যান্টিনোপলের (Constantinople) পঁচিশ মাইলের মধ্যে চলে এল। কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের আশঙ্কায় তুরস্ক তার সমস্ত ইউরোপীয় রাজ্যাংশ হারাল। তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া রাজ্যাংশ বলকান রাষ্ট্রগুলিকে দান করাহল। আলবেনিয়াও এরপর থেকে একটি স্বাধীন-রাষ্ট্রে পরিণত হল। সার্বিয়ার আপত্তি সত্ত্বেও আলবেনিয়াকে স্বাধীন করা হয়েছিল। সার্বিয়া অনেকদিন ধরেই একটি উপকূল রেখা চাইছিল যাতে একটি অভ্যন্তর রাষ্ট্র (island state) হিসাবে তার বদ্ধ দশা ঘোচে। তাই তার ইচ্ছা ছিল সে এবং মন্টেনিগ্রো উভয় মিলে আলবেনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাতে বাদ সাধল অয়া কারণ 'বৃহত্তর সার্বিয়া' গঠিত হোক তা সে চাইছিল না। ক্ষুণ্ণ সার্বিয়ার জনগণ এরপর থেকে অস্ট্রিয়ার প্রতি প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে ওঠে। স্বদেশের বাইরেও সার্বদের মধ্যে ক্ষোভ ঘনীভূত হতে থাকে। এই ক্ষোভ থেকে প্রাচ্যসমস্যা নতুন রূপ নেয়। এদিকে বলকান জোটভুক্ত রাষ্ট্রগুলির নিজেদের মধ্যে বিরোধ তুঙ্গে ওঠে এবং বৃহৎ শক্তিগুলি অন্তরাল থেকে নানা ষড়যন্ত্রে মদত দিয়ে যুদ্ধের পরিবেশকে বাড়িয়ে যেতে থাকে। ১৯১৩ সালের জুন মাসে যুদ্ধ বাধে—একদিকে বুলগেরিয়া, অন্যদিকে সার্বিয়া, গ্রীস, রুমানিয়া ও মন্টেনিগ্রো। যুদ্ধ বেশি দিন চলেনি কিন্তু সেই সুযোগে তুরস্ক তার কিছু হৃত রাজ্যাংশ অধিকার করে নেয়। প্রাচ্য সমস্যা থেকে মহাদেশীয় যুদ্ধ হতে পারত। কিন্তু সাময়িকভাবে তা স্থগিত রইল।

৪.৪.৬ ওয়েল্টপলিটিক ও নৌ-বাদ

১৮৯০ সালে বিসমার্কের ক্ষমতাচ্যুতির পর থেকে জার্মান পররাষ্ট্রনীতিতে যে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমা দেখা দিয়েছিল তা ইউরোপের রাজনীতিতে যুদ্ধের পরিবেশকে ঘনিয়ে তুলেছিল। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম যে ওয়েল্টপলিটিক (Weltpolitik) ও নৌবাদের নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা ইউরোপীয় শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক হয়েছিল। ওয়েল্টপলিটিক (Weltpoltik) হল 'বিশ্বনীতি' ('World policy') আর নৌবাদ (Navalism) হল নৌবাহিনীর বিস্তার ও প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্বজলরাশির উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা। ঐতিহাসিক গর্ডন ও ক্লেইগ (Gordon a. Craig,*Germny1866-1945*) ওয়েল্টপলিটিক, নৌবাদ (Navalism) ও বিশ্বযুদ্ধের আবির্ভাবকে সম্পৃক্ত ঘটনা বলে মনে করেন। ১৮৯৭ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে এই তিন ঘটনার সমন্বিত প্রভাব আত্মপ্রকাশ করেছে। ওয়েল্টপলিটিক বা বিশ্বনীতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জনৈক জার্মান ঐতিহাসিক বলেছেন যে এর পর থেকে জার্মানি বিশ্বমুখীন হল। 'World-policy' বা 'বিশ্বনীতি'র অর্থ, তাঁর মতে, হল 'জার্মানি তার নীতি নির্ধারণে ক্রমে ক্রমে ইউরোপ মহাদেশকে ত্যাগ করল' ("Germany has by degrees ceased to regard exclusively the continent of Europe in Framing her policy")। এই ইউরোপ ত্যাগ করে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার নীতি যে বিশ্বজয়ের স্বপ্নে বিভোর সম্রাটের উচ্ছ্বসিত ব্যক্তিত্ব থেকে উৎসারিত তা নয়। কিংবা কোন রাষ্ট্রবিদের (Statesman) উচ্চাভিলাষ ও অতিরিক্ত উৎসাহ থেকে সৃষ্ট এমন কথাও বলা যাবে না। একথাও বলা যাবে না যে রাজনৈতিক প্রভাবহীন অখিল জার্মান ঐক্যচিন্তায় মগ্ন কিছু মানুষের চাপের ফলেই তার সৃষ্টি। বিশ্বনীতির আদর্শকে বুঝতে হবে বিবর্তনের শক্তিশালী ধারায় যেখানে জার্মান রাষ্ট্র তার পুরানো নীতির সীমাকে অতিক্রম করে অগ্রসর হচ্ছে। ("...

rather, if forms part of that strong tide of evolution which irresistibly bore the German State out beyond the bounds of its earlier policy" —পঠিতব্য *Cambridge Modern History XII.*— এই খণ্ডে প্রাপ্য H. Oncken এর প্রবন্ধ *The German Smpile)*। বিসমার্ক মহাদেশের মধ্যে জার্মান রাষ্ট্রকে সীমাবদ্ধ রেখে অন্তত এই বোধ তৈরি করতে পেরেছিলেন যে জার্মানি বহির্বিশ্বে ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের কোন প্রতিযোগিতায় যাবে না। তাতে সনাতন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ইত্যাদির মনে কোন আশঙ্কার সৃষ্টি হয় নি। এইবার সেই আশঙ্কা ঘনীভূত হল। সমকালীন জার্মান রাষ্ট্রের একজন কর্ণধার প্রিন্স বুলো (Prince Bulow) স্বীকার করেছেন যে যখন বিসমার্কের পরবর্তী নীতিনির্ধারকরা বিসমার্কের মহাদেশীয় নীতির স্বীকৃত পথ ছেড়ে বিশ্বনীতির অনিশ্চিত পথে পা বাড়ালেন তখন ''প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছিল" ("Voices were raised in protest") । এতে কোন সন্দেহ ছিল না যে আজ হোক কাল হোক জার্মানির সঙ্গে ইউরোপের মহাশক্তিগুলির সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠবে। এই অনিবার্য সংঘাতকে বিসমার্ক এড়িয়ে গিয়েছিলেন। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তিগুলির জোট বাঁধার ইতিহাসকে সামনে রেখে জার্মানির এই 'লৌহ চ্যান্সেলর' (Iron Chancellor) বাড়াবাড়ি করার পথ থেকে বিরত হয়েছিলেন, শুধু তৈরি করেছিলেন ভিন্নতর এক জোট যাকে বলা যেতে পারে —লিপসন প্রমুখ ঐতিহাসিকদের ভাষায়—একটি আত্মরক্ষামূলক জোট। যদি কোন দিন ইউরোপীয় মহাশক্তিগুলির রোষ জার্মানির বিরুদ্ধে একটা আক্রমণাত্মক রাষ্ট্র জোট গড়ে তোলে তবে ত্রিশক্তির মৈত্রী (Triple Alliance) হবে জার্মানির রক্ষাকবচ। ইংল্যান্ড এই ত্রিশক্তির মৈত্রীকে প্রতিরোধ করেনি কারণ জানত তা ইউরোপের শান্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখবে। দীর্ঘদিন ধরে জার্মান রাষ্ট্রচিন্তায় সামরিকতা প্রাধান্য পাচ্ছিল । বিসমার্ক তাঁর সামরিক জাতীয়তাবাদকে সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পেরেছিলেন সেহেতু মহাদেশীয় রাজনীতির কোন বিপর্যয় কোথাও দেখা যায় নি। কিন্তু এইবার ওয়েল্টপলিটিকের বা বিশ্বনীতির নতুন গতি যখন জাতীয়তাবাদের আত্মম্ভরি ভাবনাকে উস্কে দিল তখন জার্মান সামরিকতা হয়ে দাঁড়াল ''রাজনৈতিক গোলযোগের সবচেয়ে গতিশীল শক্তি" ("the most dynamic force for politicaldisturbance")।

ওয়েল্টপলিটিক (Weltpolitik) এর নীতি যে সব মাধ্যমগুলির মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের অন্যতম হল নৌবাদ (Navalism)। বিশ্বনীতি সার্থক করতে নৌবাহিনীর দরকার, আর নৌবাহিনী থাকলেই সমুদ্রে যাবার পথ দরকার হয়। ১৮৯৫ সালে কিয়েল ক্যানাল (Kiel Canal) খননের মধ্য দিয়ে উত্তর সাগরে যাওয়ার নতুন পথ তৈরি হল। এরপর থেকে বাল্টিক অঞ্চলের বন্দরগুলি থেকে যে কোন জাহাজের পক্ষে উত্তর সাগরে যাওয়া সহজ হয়ে উঠল। ১৯০০ সালেই রচিত হয়েছিল। জার্মান নৌ-আইন (German Navy Law)। এই আইন যে কোন মহাদেশীয় শক্তির নৌবহরের থেকে বড় নৌবহর তৈরি করার অধিকার ছিল জার্মানিকে । সেই সময়কার সবচেয়ে বড় নৌশক্তি ব্রিটেনের কাছে এইটি ছিল আশঙ্কার বিষয়। যে চ্যালেঞ্জ বিসমার্ক কোনদিন ইংল্যান্ডকে জানাতে সাহস করেন নি সেই চ্যালেঞ্জ অনায়াসে ইংল্যান্ডের সামনে হাজির করার দুঃসাহস দেখালেন বিসমার্কের উত্তরাধিকারীরা। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার ক্ষমতা ইংল্যান্ডের ছিল। সেই ক্ষমতার সুচারু সংগঠনের জন্য ইংল্যান্ডের প্রয়োজন ছিল আন্তর্জাতিক মিত্রের। উনিশ শতকের শেষ সিকিভাগ সময়ে ইংল্যান্ড সংরক্ষিত একাকীত্বের (isolation) মধ্যে ছিল। এই একাকীত্ব থেকে ইংল্যান্ড এইবার সরে এল। প্রথমে একটি এশিয় দেশ জাপানের সঙ্গে সে মিত্রতায় আবদ্ধ হল। পরে আঁতাত গঠন করল ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে। জার্মানির এই বিপজ্জনক বৈদেশিক নীতি ও নৌবাদের উদ্ভট চিন্তা যে শুধু কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের মস্তিষ্ক প্রসূত তা নয়। এর পেছনে বিদেশমন্ত্রী বার্নাড ভন বুলো (Bernard Von Birlow) এবং নৌ-মন্ত্রী গ্র্যান্ড এডমিরাল আলফ্রেড ফন টিরপিজ-এর (Grand Admiral Alfred Von Tirpitz) ভূমিকাও ছিল অনেক। বুলো একটি জবরদস্ত বৈদেশিকনীতিকে জার্মানির পালনীয় নীতি বলে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ''আমি বৈদেশিক নীতির উপরই সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছি — "I am putting the main emphasis on foreign policy। এ কথা তিনি

বলেছিলেন ১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। তারপর আরও জোর দিয়ে বললেন ''শুধুমাত্র একটি সফল বৈদেশিক নীতিই পারে মেলাতে, শান্ত করতে, একজোট করতে, ঐক্যবদ্ধ করতে" ("Only a successful foreign policy can help to reconcile, pacify, rally, unite— পঠিতব্য গ্রন্থ Rohl, *Germany without Bismarck*) । এইভাবে যখন বার্ণাড ফন বুলো জবরদস্ত বৈদেশিক নীতির কথা বলেছেন তখন তিরিপিজ (Tripitz) মনে মনে স্থির করছেন যে ইংল্যান্ডই হচ্ছে জার্মানির সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক শত্রু আর পৃথিবীতে ইংল্যান্ডের এই প্রভাবকে প্রতিহত করার জন্য চাই যুদ্ধ জাহাজ। নৌবাহিনীর সফল অভিসার হিসাবে তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে এই বিশ্বাসে আরূঢ় করেছিল—এ কথা বলেছেন ঐতিহাসিক ক্রেগ। ("... and the experience sums to have confirmed him in the belief, first that Great Britian was Germany's Chief enemy and second, that the necessary instrument for countering British influence in the world was the battelship"—Gordon A. Craig, *Germany 1866-1945)* । স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল যে ইউরোপে দুটি শিবির আস্তে আস্তে গড়ে উঠছে যে শিবিরের মধ্যে সমঝোতা সম্ভব নয়। ইংল্যন্ড স্থিতাবস্থা বজায় রাখার শিবিরের নেতা, অন্যদিকে স্থিতাবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে পরিবর্তনের বিপজ্জনক আকাঙ্ক্ষায় অধীর একটি সংশোধনবাদী (Revisioniest) শিবিরের নেতা জার্মানি। বিসমার্ক ই দুই শক্তিকে মুখোমুখী দাঁড় করাতে চাননি। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম তাই করলেন।

৪.৪.৭ প্রাচ্য সমস্যা ঃ সেরাজেভো হত্যা কাণ্ড ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা

১৯১৩ সালের আগস্ট মাসে বুখারেস্ট চুক্তির দ্বারা (Treaty of Bucharest) বুলগেরিয়ার সাথে অন্যান্য বলকান রাষ্ট্রগুলির যুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছিল। তুরস্ক আদ্রিয়ানোপল অধিকার করে নিয়েছিল এবং বুলগেরিয়া সেই বছর এপ্রিল মাসে লন্ডন চুক্তির দ্বারা যে সব অঞ্চলের অধিকার পেয়েছিল তা সব হারাল। সার্বিয়া আলবেনিয়া অধিকার করতে না পারায় ক্ষুব্ধ হয়েছিল ঠিকই কারণ কোন উপকূল রেখা সে লাভ করতে পারেনি। তবুও তার আয়তন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং পরিপার্শ্বের স্ল্যাভদের মধ্যে তার প্রতিপত্তি প্রায় সীমাহীন হয়ে পড়েছিল। অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী তার প্রতিবন্ধক হলেও তার আরও প্রসারিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রশমিত হয়নি। অস্ট্রিয়ার পেছনে দাঁড়িয়েছিল তার মিত্রশক্তি জার্মানি। জার্মানি চাইছিল না যে অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাক কারণ তাহলে বাগদাদ রেল ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বার্লিন থেকে মেসোপটেমিয়া ও এশিয়া মাইনর অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হবে না। আবার তুর্কী সাম্রাজ্য না ভাঙলে সার্বিয়ার প্রভাব মণ্ডল বিস্তারের সম্ভাবনা স্তিমিত হয়ে যায়। পশ্চিম দিকে অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী অনড় প্রহরীর মত সার্বিয়ার উপর নজর রাখছিল। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা দখল করে এবং আলবেনিয়ার উপর সার্বিয়ার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত না হতে দিয়ে অষ্ট্রিয়া সার্বজনগণের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বেলে দিয়েছিল। এই প্রতিহিংসাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম প্রত্যক্ষ কারণ। কিভাবে এই প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয়েছিল তা নীচে বর্ণনা করা হল।

অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর শাসক ফ্রান্সিস জোসেপ (Francis Joseph) ১৮৪৮ এর বিপ্লবের সময় থেকে রাজত্ব করছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত হয়েছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র যুবরাজ ফ্রান্সিস ফার্দিনান্দ (Archduke Francis Ferdirnad)। তিনি ছিলেন উদার-নৈতিক মানুষ। তাঁর ইচ্ছা ছিল যখন তিনি শাসক হবেন তখন তিনি তাঁর সমস্ত প্রজাদের মঙ্গলজনক একটি নতুন সংবিধান দান করবেন । তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে তাঁর প্রজাদের অবস্থা দেখছিলেন। ১৯১৪ সালের জুন মাসে তিনি বসনিয়ায় যান। ২৮ জুন রবিবার তিনি যখন বসনিয়ার রাজধানী সোরাজেভোর (Serajevo) ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করা যায়। হত্যাকারী ধরা পড়েছিল। দেখা গেল যে বসনিয়ার মানুষ, অতএব অস্ট্রিয়ার প্রজা। কিন্তু অস্ট্রিয়ার পুলিশ অনুসন্ধান করে জানল যে হত্যার ষড়যন্ত্র সংগোপনে সার্বিয়াতে করা হয়েছে

এবং সার্বিয়ার সরকার পূর্বাহ্নেই তা জানত। অস্ট্রিয়ার সমস্ত রোষ গিয়ে পড়ল সার্বিয়ার উপর। জার্মানির সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়ে এবং রাশিয়া সার্বিয়াকে সমর্থন করলে সে কতখানি জার্মান মৈত্রীর উপর নির্ভর করতে পারবে তা স্থির করে ১৯১৪ সলের ২৩ জুলাই—ঘটনার প্রায় একমাস পরে—অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী সার্বিয়াকে একটি চরম পত্র (ultimate) দান করল। অস্ট্রিয়া জানত যে ১৯১১ সাল থেকে জাতীয়তাবাদী সার্ব বিপ্লবীরা 'ঐক্য অথবা মৃত্যু' ('Unity of Death') নামে একটি চরমপন্থী দল তৈরি করেছিল। এরা 'কালো হাত' বা Black Hand নামেও পরিচিত ছিল। সৈন্যবাহিনী থেকে সাধারণ মানুষ সবার মধ্যে এদের প্রভাব ছিল। এদেরই এক সদস্য যুবরাজকে হত্যা করে। অতএব অস্ট্রিয়া দাবি করল

১. সার্বিয়াকে অস্ট্রিয়া বিরোধী প্রচার ও কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে হবে।

২. অস্ট্রিয়া যাদের নাম উল্লেখ করছে সেই সব অফিসার বা পদস্থদের চাকরির থেকে বরখাস্ত করতে হবে।

৩. সেরাজেভোর যে আদালতগুলি এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছে সেই আদালতগুলিতে অস্ট্রিয়ার প্রতিনিধি থাকবে।

সার্বিয়াকে উত্তর দেওয়ার জন্য আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছিল। সার্বিয়া জানত তার উত্তরের উপর নির্ভর করবে ইউরোপের ভবিষ্যৎ শান্তি বা যুদ্ধ। কথা বুঝেই সার্বিয়া যতখানি সম্ভব অস্ট্রিয়ার দাবিপূরণের চেষ্টা করল। প্রথম দুটি দাবি সে তৎক্ষণাৎ মেনে নিল। তৃতীয় দাবি মেনে নিলে তার সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিতে হয়। অতএব তার প্রস্তাব হল যে সে আদৌ তার তদন্ত আদালতে বৈদেশিক কোন মানুষকে গ্রহণ করতে পারে কি না তা জানার মতামত জানা হোক। স্পষ্টতই সার্বিয়া তার যথাসাধ্য করেছে। এর বেশি কিছু করতে গেলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভারসাম্য নষ্ট হবে। একথা বুঝতে পেরে জার্মানি অস্ট্রিয়াকে সংযত হতে পরামর্শ দিল। এর আগেও অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে আক্রমণ করতে চাইলে জার্মানি তাকে নিরস্ত করতে চেয়েছিল এবং অস্ট্রিয়াও জানত যে জার্মানির সাহায্য ছাড়া বলকান অঞ্চলে অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে বড় ঝুঁকি নেওয়া হবে কারণ যে কোন সার্বশক্তির পেছনে আছে রাশিয়া, সেবার জার্মানির পরামর্শমত কাজ করলেও এইবার অস্ট্রিয়া ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করল। সে জানত যে যদি কোন বড় যুদ্ধে সে জড়িয়ে পড়ে জার্মানি কিছুতেই আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। জার্মান সমর্থন সংকটকালে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে থাকবে এ কথা জানতে পেরেই গ্রাহ্য নয়। এই ঘোষণার সাথে সাথেই ১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এর আগের দিনই রাশিয়া ঘোষণা করেছিল যে সে সার্বদের সমর্থন করবে। অতএব ২৯ জুলাই রাশিয়া তার সৈন্য সঞ্চালন শুরু করল। জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল ১ আগষ্ট। ৩ আগষ্ট সে যুদ্ধ ঘোষণা করল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। ৪ আগষ্ট গ্রেট ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে সমস্ত ইউরোপ যুদ্ধের জালে জড়িয়ে পড়ল। এই সঙ্গে পৃথিবী অধিকাংশ জড়িত যুদ্ধের আয়োজন ও সংগঠনে অংশীদার হয়ে উঠল। ইটালী শুরুতে তার নিরপেক্ষতা ঘোষণা করল। বুলগেরিয়া যোগ দিল কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের সঙ্গে। ৫১ মাস নিরন্তর যুদ্ধের পর কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের প্রতিরোধ ধসে যায়। ১৯১৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মিত্রশক্তি বুলগেরিয়াকে যুদ্ধবিরতি দান করল। তুরস্ককে যুদ্ধবিরতি দেওয়া হল ৩০ অক্টোবর, অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীকে ৩ নভেম্বর এবং জার্মানিকে ১১ নভেম্বর। এইভাবে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ যুদ্ধ চলেছিল ৪ বছরের অধিক সময় ধরে। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্ব রাজনীতির ভারসাম্য নতুন করে রচিত হল। ইংল্যান্ড প্রথম থেকে চেষ্টা করছিল যুদ্ধকে সীমিত রাখতে। জার্মানি, ফ্রান্স, ইটালি, অস্ট্রিয়া সকলের কাছে ইংল্যান্ডের প্রস্তাব ছিল যে সার্বিয়ার প্রতি অতিরিক্ত রূঢ় হয়ে কেউ যেন ইউরোপীয় যুদ্ধের ঝুঁকি না নেয়। বলকান অঞ্চলের সমস্যা যেন বলকান অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে যেমনটি ছিল ১৯১২ ও ১৯১৩ সালের বলকান যুদ্ধের সময় তা নিশ্চিত করার জন্য ইংল্যান্ডের প্রস্তাব ছিল ইউরোপীয় দেশগুলির প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন হোক

যেখানে এ বিষয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারিত হবে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া জানাল যে নোরাজোভোহ ঘটনাটি অস্ট্রিয়ার নিজস্ব ব্যাপার, তা নিয়ে তারা অন্য দেশের উৎসাহকে গ্রাহ্য মনে করেন না। বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে সার্বিয়ার ব্যাপারে অস্ট্রিয়াকে স্বাধীন প্রয়াস নেওয়ার সুযোগ তারা করে দিতে চাইছিল। ইংল্যান্ডের শান্তি প্রয়াস প্রথমেই ব্যাহত হল। পরে যখন যুদ্ধ শুরু হল তখনও ইংল্যান্ড ফ্রান্স ও জার্মানির কাছে জানতে চেয়েছিল যে বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা (Neuatrility) মেনে নিয়ে তার অখণ্ডতাকে (integrity) তারা সম্মান জানাবে কিনা। এই বিষয়ে জার্মানি কোন সঠিক উত্তর না দিয়ে এ সাময়িকভাবে সমস্যাটি এড়িয়ে গেল। ২ আগস্ট জার্মানি লুকসেমবুর্গ (Luxemburg) এড়িয়ে গেল। ২ আগস্ট জার্মানি লুকসেমবুর্গ (Luxemburg) আক্রমণ করল এবং এর ঠিক পরেই জার্মানি বেলজিয়ামে তার সৈন্য প্রবেশ করাল। ব্রিটেন চিরকালই বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতাকে মর্যাদা দিয়ে এসেছে। ফলে ৪ আগস্ট মধ্যরাত থেকে অখণ্ডতাকে মর্যাদা দিয়ে এসেছে। ফলে ৪ আগস্ট মধ্যরাত থেকে জার্মানি আর ব্রিটেনের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হল। ইংল্যান্ড ঘোষণা করল যে সে যুদ্ধ করছে এই নীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে কোন ছোট রাষ্ট্র অন্য কোন ক্ষমতাশালী বড় রাষ্ট্রের দ্বারা নিষ্পেষিত না হয়— "... we are fighting to vesidicate the principle that small nationalities are not to be crushed ... by the arbitrary will if a strong and overmastering Power"। অন্যদিকে জার্মানি ঘোষণা করল যে তারা তাদের শান্তিপূর্ণ শ্রমের ফসল, তাদের মহান অতীতের ঐতিহ্য এবং তাদের ভবিষ্যতের জন্য যুদ্ধ করছে— "We are fighting for the fruit of our peaceful labour, for the inheritance bequeathed to us by a great past, and for our future. শুধু তাই নয় এই ঘোষণায় আরও বলা হয়েছিল যে জার্মান জাতীয় জীবনে এক মহালগ্ন উপস্থিত হয়েছে, তার সেনাবাহিনী ছড়িয়ে গেছে রণাঙ্গনে, তার নৌবহর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত, আর তাদের সবার পেছনে রয়েছে জার্মান নীতি — "The great hour of trial for our nation has now struck ... our army is in the field, our flect is ready for action —and behind them, the entire German nation. এইভাবে জাতীয় স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা—জার্মানি ও ইংল্যান্ডের দুই বিপরীত দৃষ্টিকোণ নিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। উগ্র জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতিভিত্তিক এই দুইয়ের লড়াই প্রথম বিশ্বযুদ্ধেই থেমে থাকেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত তা গড়িয়েছিল।

৪.৪.৮ যুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্র

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বেশীরভাগ লড়াই হয়েছিল ছয়টি প্রধান ক্ষেত্রে। এইগুলি হল পশ্চিম সীমান্ত (Westerm) — বেলজিয়াম উপকূলভাগ থেকে ফ্রান্স হয়ে সুইজারল্যান্ডের সীমানা পর্যন্ত দীর্ঘ কিন্তু অপ্রসারিত অঞ্চল; পূর্ব সীমান্ত (Eastern Front) বাল্টিক সাগর থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত অঞ্চল যা কখনো বেড়েছে, কখনো কমেছে অর্থাৎ পশ্চিম সীমান্ত থেকে অনেক স্থিতিস্থাপক অঞ্চল (a flexible line) ১৯৭৫ সালের ডারডানেলস (the Durdanelles in 1915) , স্যালোনিকা (Salonika) সমেত বলকান অঞ্চল (the Balkans, including Salonika) প্যালেস্টাইন ও বর্তমান যাকে ইরাক বলা হয় সেই অঞ্চল সমেত নিকট প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্য (the Near East, including Palestine and what is now Iraq) এবং অস্ট্রিয়া ইটলির সীমানা (theAustro-Italian border) । পশ্চিম সীমান্তের যুদ্ধ ছিল প্রায় নিশ্চল (static) কোন পক্ষই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দু-চার মাইলের বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। পূর্ব সীমান্তে জার্মান ও অস্ট্রিয়ানরা শুরুতে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। ১৯২৬ সালে রুশ সেনাপতি ব্রুশিলভ (Brussilov) অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শক্তির আক্রমণ প্রতিহত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১৯১৭ সালে জারতন্ত্রের পতন হয় এবং বিপ্লবী সরকার শান্তিস্থাপন করতে চাইলে জার্মানি রাশিয়ার উপর রেষ্ট-লিটভস্কের (Brest-Litovsk) এর নির্মম চুক্তি চাপিয়ে দেয়। পূর্বসীমান্তে শান্তি ফেরে।

ডারডানেলস অভিযান উইনস্টন চার্চিলের (winston churchill) কল্পনাপ্রসূত। চার্চিল চেয়েছিলেন যে নৌবাহিনী ও স্থলবাহিনীকে একসঙ্গে ব্যবহার করে দ্রুত কনস্টানটিনোপল অধিকার করে তুরস্ককে যুদ্ধের থেকে হটিয়ে দিতে যাতে রাশিয়ার উপর চাপ কমে যায়। কিন্তু তা করার জন্য নৌ ও স্থলবাহিনীর যে যোগাযোগ (Co-ordination) দরকার ছিল তা হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া নেতৃত্বেরও অভাব ছিল— সেই নেতৃত্ব যে দৃঢ়তা ও সাহস দেখাতে পারবে। ১৯১৬ সালে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ডার্ডনেলস্ (Durdanelles) অঞ্চল ত্যাগ করে চলে যায়। বলকান অঞ্চলে প্রথমে সার্বিয়া কিছুটা সাফল্য লাভ করেছিল কিন্তু পরে অস্ট্রিয়ান জার্মান ও বুলগেরিয়ান বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে সার্বদের প্রতিরোধ ভেঙে যেতে থাকে। ১৯১৮ সালে সার্বিয়া পরাজিত হয়।

নিকট ও মধ্য প্রাচ্যে ব্রিটিশ ও তাদের মিত্রশক্তি প্রথম থেকে জয়লাভ করতে থাকে। তারা প্যালেস্টাইন থেকে তুর্কীদের হটিয়ে দেয় এবং মেসোপটেমিয়ার উপর তুর্কীদের প্রাধান্য ভেঙে দেয়। অস্ট্রিয়া ও ইটালির সীমানায় যুদ্ধের প্রথম দুবছর বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু ১৯১৭ সালে ইটালিয়ানরা ক্যাপেরিটো (Caporetto) নামক স্থানে ভীষণভাবে পরাজিত হয়। পরের বছর ভিক্টোরিও ভেনেটো (Vittorio Veneto) নামক স্থানে অস্ট্রিয়ানদের একইরকম ভাবে পরাজিত করে। আফ্রিকাতে জার্মানি টাঙ্গানাইকা ও জার্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা সমেত তার উপনিবেশগুলিতে পরাজিত হয়।

১৯১৬ সালে ৩১শে মে ব্রিটিশ ও জার্মান নৌবাহিনী জুটল্যান্ড (Jutland) নামক স্থানে এক বিরাট জলযুদ্ধে লিপ্ত হয়, কিন্তু তার কোন বিশেষ ফলাফল হয়নি। যে কটি যুদ্ধ অনড় (Stalemate) ছিল এটি তার মধ্যে একটি। তবে এই যুদ্ধের পর জার্মান সামুদ্রিক বাহিনী (German High Seas Fleet) আর উত্তর সাগরে (North Sea) বা আটলান্টিক সাগরে (Atlantic Sea) প্রবেশ করতে সাহস করেনি। জার্মানি সামুদ্রিক যুদ্ধে ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। সে সাবমেরিন ব্যবহার করে যুদ্ধকে জলের তলায় নিয়ে গিয়েছিল। যে সব জাহাজ নানা খাদ্যসম্ভার ও রণসামগ্রী নিয়ে ইংল্যান্ডের দিকে অগ্রসর হত তাকে জলের তলা থেকে গোপনে আক্রমণ করত। ফলে ইংল্যান্ডে প্রধান প্রধান বস্তুর যোগান ও সরবরাহ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বলা হয়ে থাকে যে, ''জার্মানি ব্রিটেনকে প্রায় অনশনের মুখে ঠেলে দিয়েছিল।'' এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে ইংল্যান্ড কনভয় ব্যবস্থা (Convoy System) চালু করে আত্মরক্ষা করে। কনভয় ব্যবস্থা হল বাণিজ্যিক জাহাজ (Merchant ships) রিলে করে (in relays) যাবে আর চারপাশে তার নিরাপত্তা বিধান করবে যুদ্ধজাহাজ।

যুদ্ধের পরিণতিতে কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গ শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। ইউরোপের বাইরে থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান মিত্রশক্তির সঙ্গে যুক্ত হলে তাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়, কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গ তাদের চাপ সহ্য করতে না পেরে ভেঙে পড়ে। চীনে জার্মান উপনিবেশগুলি দখল করে নেয় জাপান। একইভাবে জার্মানির প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপনিবেশগুলি অধিকার করে নেয় অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের সেনাবাহিনী। ১৯১৬ সালের মধ্যে জার্মানির আফ্রিকা-উপনিবেশগুলি সমস্তই ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে মিত্রশক্তি বাহিনী আফ্রিকায় লড়াই করছিল তাদের নেতৃত্বে ছিলেন দুই দক্ষিণ আফ্রিকার সেনাপতি দক্ষিণ-পশ্চিমে বোথা (Botha) এবং পূর্ব দিকে স্মাটস্ (Smuts)।

৪.৪.৯ জার্মানির নৌযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে জার্মানি ইংল্যান্ডকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়েছিল তার নৌবাদের (Navalism) প্রকল্প দিয়ে। অতএব নৌবাদের ফল জার্মান নৌবাহিনী কি রকম ফললাভ করতে পেরেছিল তা একটু জানা দরকার। যুদ্ধের শুরুতে জার্মানির বাণিজ্যিক জাহাজগুলি দেশের জন্য যথেষ্ট কাজ করেছিল। তখন তার সামুদ্রিক নৌবাহিনী কিয়েল ক্যানেলে (Kiel Canal) আটকে ছিল। জার্মানির লক্ষ্যই ছিল ইংল্যান্ড ও মিত্রশক্তির বাণিজ্যিক আক্রমণ করা এবং পূর্বদিকে যাবতীয় জলাশয়ে

এ কাজ জার্মান জাহাজ ভালভাবেই করেছিল। যুদ্ধের একটি বিবরণ বলছে "A few German commerce raiders led a spectacular carees in eastern waters before being captured or destroyed." উত্তর সাগরে তিনটি ব্রিটিশ ক্রুজারকে (cruisers) জার্মান সাবমেরিন ডুবিয়ে দিয়েছিল। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে করোনেল (Coronel) নামক স্থানে একটি জার্মান স্কোয়ড্রন ব্রিটিশ বাহিনীকে পরাজিত করে। ১৯১৪ সালের ৮ ডিসেম্বর এই স্কোয়াড্রন ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের (Falkland Island) যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৯১৬ সালের ৩১ মে ড্যানিশ উপকূলের (Danish Coast) অদূরে ব্রিটিশ গৃহ নৌবাহিনীর (British home fleet) সঙ্গে জার্মান বাহিনীর লড়াই হয়। এইটিই জুটল্যান্ডের নৌযুদ্ধ নামে বিখ্যাত। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর ক্ষতি বেশি হয়েছিল, কিন্তু জার্মান বাহিনী এতই ভেঙ্গে গিয়েছিল যে আর কোন বড় যুদ্ধে অংশগ্রহণ তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। জলের তলায় যুদ্ধে অবশ্য জার্মানি পারদর্শিতা দেখিয়েছিল। জলযুদ্ধে জামানির প্রধান অস্ত্র ছিল সাবমেরিন (Submarines)। তা দিয়ে মিত্র শক্তির সরবরাহ ব্যবস্থাকে জার্মানি ভেঙ্গে দিয়েছিল। ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জার্মানি সমস্ত ব্রিটিশ ও ফরাসী উপকূল অঞ্চলের উপর ব্লকেড (blockade) ঘোষণা করে। এই ব্লকেডের ভেতর যে কোন জাহাজ—এমনকি নিরপেক্ষ জাহাজকেও সে আক্রমণ করেছে। ১৯১৬ সালে কম করে একশটি জাহাজকে সে সাবমেরিনের সাহায্যে জলের তলায় ডুবিয়ে দিয়ে (এদের বেশীরভাগটা নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ) নিজের নৌ-আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল।

৪.৪.১০ যুদ্ধ শেষের যুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে বলা হয়েছে 'যুদ্ধ শেষের যুদ্ধ'— 'the war to end war'—। কিন্তু সে যুদ্ধেই জড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপের বড় বড় রাষ্ট্রগুলি, এশিয়া ও আফ্রিকায় তাদের উপনিবেশগুলি, ভারতবর্ষ, মিশর , অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, যুদ্ধের রথ চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল নিকট প্রাচ্যে ও সুদূর প্রাচ্যে (Near and Far East), চীনে ও জাপানে, যুদ্ধ স্পর্শ করেছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রজাতন্ত্রগুলিকে যুদ্ধের অভূতপূর্ব বিস্তার হয়েছিল স্থলে-জলে-অন্তরীক্ষে—এমনকি জলের তলায়। যুদ্ধ যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা, আধুনিক প্রচার ব্যবস্থার সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম আয়োজন, যুদ্ধ আত্মসাৎ করে নিয়েছিল সমস্ত শিল্পকে, সমস্ত মানুষকে— সৈনিক, নাবিক বৈমানিককে, সাদা পোষাকের বেসরকারী মানুষকে (civilian) আর পোষাকধারী মানুষকেও (men in uniform)। যুদ্ধে তলিয়ে গিয়েছিল শ্বেত মানুষ, পীত মানুষ, তাম্রকায় (Brown) কৃষ্ণকায় (Black) মানুষ। যুদ্ধ বাড়িয়ে দিয়েছিল জয়ের আকাঙ্ক্ষা, আত্মরক্ষার প্রবণতা ও ধ্বংসের বাসনা। যুদ্ধের তাগিদে মানুষ তৈরী করেছিল নানা ধরণের নতুন অস্ত্র, ভেঙ্গে ছিল নানা আন্তর্জাতিক নীতি, তৈরি করেছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নানা নজির। যুদ্ধ ভেঙ্গে দিয়েছিল মানুষের চিরায়ত নানা বিশ্বাসকে। যুদ্ধ ধ্বংস করেছিল পৃথিবীর বিপুল মানুষকে, নষ্ট করেছিল প্রকৃতির অফুরন্ত সম্পদ, মানুষের নানা অনন্য সৃষ্টি। এই হল 'যুদ্ধ শেষের যুদ্ধ'। যুদ্ধের শুরুতে মানুষ ভেবেছিল যে যুদ্ধ বেশীদিন চলবে না কারণ আধুনিক অর্থনীতির জটিলতা আর রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের পরস্পর নির্ভর সম্পর্কে বেশিদিন আপৎকালীন পরিস্থিতির মধ্যে নিমজ্জিত রাখা যায় না। ইউরোপের মানুষ দেখেছিল যে ফ্র্যাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধ ছয় মাসের একটু বেশি সময়ে চলেছিল, অস্ট্রো প্রশিয়ান যুদ্ধ চলেছিল ছয় সপ্তাহ। তারা দেখেছিল মরোক্কোর সংকট যুদ্ধ ডাকেনি, বলকান যুদ্ধ বৃহৎ ইউরোপীয় যুদ্ধে পরিণত হয়নি। তাদের ধারণা ছিল এই যুদ্ধও বেশিদিন চলবে না। কিন্তু সে ধারণা ব্যর্থ করে যখন যুদ্ধের রথ অনির্দেশ্য পথে এগুতে লাগল তখন যন্ত্রণাবিদ্ধ মন নিয়ে তারা এবং তাদের সাথে পৃথিবীর মানুষ তাদের সিদ্ধান্তগুলিকে একের পর এক বদলাতে লাগল। নতুন যুদ্ধজাহাজ, নতুন ক্ষেপণাস্ত্র যেমন হাওউইৎজার (howitzers), নতুন জলতলের যান যেমন সাবমেরিন (Submarine), বিষাক্ত গ্যাস, পনেরো মাইল দূরের জিনিসকে ধ্বংস করতে পারে এমন একটা খোলা

নিক্ষেপকারী কামান এবং নতুন সিজ গান (siege-gun) নামে জার্মান অস্ত্র পৃথিবীময় আতঙ্ক ছড়িয়ে দিল। আতঙ্ক আর ভয়, অনুশোচনা ও হতাশা যুদ্ধ শেষের যুদ্ধের সবচেয়ে পরিণতি।

৪.৪.১১ যুদ্ধের দায়িত্ব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে পর বিজয়ী মিত্রশক্তি এই ধারণা প্রচার করেছিল যে জার্মানি ও কেন্দ্রীয় শক্তিরাই এই যুদ্ধের জন্য দায়ী। তারাই বলকানের এই সীমিত সমস্যাকে ইউরোপীয় সমস্যায় পরিণত করতে সাহায্য করেছিল এবং একটি স্থানীয় যুদ্ধের সম্ভাবনাকে একটি মহাদেশীয় পরিস্থিতির সংশোধনের (revision) সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করেছিল। এই রকম ধারণা অনেকদিন চালু থাকলেও শেষপর্যন্ত ঐতিহাসিকরা একে সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য মনে করেননি। তারা বলেন যে রাজনীতিবিদ ও সরকারের অভিসন্ধি সরকারী দলিলে প্রতিফলিত হলেও তা সম্পূর্ণভাবে সেখানে প্রকাশ পায় না। তাছাড়া যুদ্ধের পেছনে বেসরকারি সংস্থা, পুঁজিবাদীদের ভূমিকা, ও জনমতের গতি ও চাহিদাকে সঠিকভাবে নিরূপণ না করে কোন যুদ্ধের দায়িত্ব নিশ্চিতভাবে বণ্টন করা যায় না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে একটি বড় প্রামাণ্য গ্রন্থের রচয়িতা এস. বি ফে. (S.B. Fay. *The origins of the First World War*) মেনে নিতে পারেননি জার্মানির উপর একতরফা যুদ্ধাপরাধের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে ভার্সাই চুক্তিতে (Treaty of Versailles) তাকে নির্মম শাস্তি দেওয়া ঘটনা। অন্য দিকে জার্মান ঐতিহাসিক ফ্রিৎস ফিশার (Fritz Fischer) মনে করেন যে ১৯১১ সাল থেকে জার্মানি যুদ্ধ চেয়েছিল এবং তার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি গ্রহণ করে ১৯১৪ সালে পরিপূর্ণ যুদ্ধ বাধাবার ব্যবস্থা করেছে। এই মতকেও অনেকে একপেশে মনে করেন। কারও কারও মতে প্রশিয়াতে যেমন জঙ্গী ইয়াংকাররা ছিল সেই রকম ফ্রান্সে ছিল দেরুল্যাঁদের উগ্রজাতীয়তাবাদী অনুগামীরা। ইংল্যান্ডে সেইরকম ছিল দৃঢ়সঙ্কল্প সাম্রাজ্যবাদীরা, আর রাশিয়ায় ও আমেরিকায় ছিল সুনিশ্চিত যুদ্ধবাজরা। ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা মনে করেন যে আঁতাত শক্তিবর্গ জার্মানি ও কেন্দ্রীয় শক্তিগুলিকে ঘিরে ফেলতে চেয়েছিল। তাই আগের থেকেই কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গ ব্যবস্থা নেবার চেষ্টা করেছে। পক্ষান্তরে এও বলা যায় যে ইংল্যান্ড বার্লিন বাগদাদ রেল ব্যবস্থা, কিয়েল ক্যানেল, জার্মান নৌ-আইন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যে বিপজ্জনক জুজুকে (spectre) দেখতে পারছিল তার প্রভাবে তার মানসিকতার মধ্যে একটা যুদ্ধতৎপরতা এসে গিয়েছিল। যার ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের লড়াই। এ লড়াইয়ের একটা সামগ্রিক রূপ আছে। তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যাবে না।

৪.৪.১২ যুদ্ধ শেষের প্রস্তুতি ঃ উড্রো উইলসনের চৌদ্দদফা শর্ত

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যাওয়ার কফলে মানুষের মনে এসেছিল শান্তির আকাঙ্ক্ষা এবং যুদ্ধের প্রতি ঘৃণা (revulsion)। এইরকম বিশ্বজনমতকে প্রাধান্য দিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন (Woodron Wilson) পৃথিবীতে যুদ্ধ শেষের পরবর্তী শান্তি নীতিকি হবে তা স্থির করে দিয়েছিলেন তাঁর চৌদ্দ দফা শর্তে (Fourteen Points)। তিনি বলেছিলেন যে এর পর থেকে শান্তির ইস্তাহার প্রকাশ্য আলোচনার মাধ্যমে স্থির হবে— "Open covenants of peace openly arrived at"; প্রত্যেক দেশ নিজেদের গার্হস্থ্য নিরাপত্তাকে অটুট রেখে নিজেদের অস্ত্রসম্ভারকে ন্যূনতম বিন্দুতে নামিয়ে আনার অঙ্গীকার করবে — "Adequate guarantees given and taken that national armaments will be reduced to the lowest point consistent with domestic safety", সমস্ত উপনিবেশ সংক্রান্ত দাবি নিরপেক্ষ নির্ধারণ ও মীমাংসা করতে হবে— "A free, open minded and absolutely impartial adjustment of all colonial claims". তাছাড়া তিনি বলেছিলেন যে পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিকে তার নিজের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার দিতে হবে। এইটিই হল বিখ্যাত জাতীয় স্বভাগ্য নির্ধারণের নীতি (The principle of National Self determination)। তিনি বলেছিলেন

স্বাধীন পোল্যান্ড (Poland) ইউরোপের মানচিত্রে ফিরিয়ে আনতে হবে, অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর মানুষদের নিজেদের মতন করে তাদের রাষ্ট্র গড়তে দিতে হবে এবং যুদ্ধ শেষে পৃথিবীর ছোট বড় সমস্ত রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক নিরাপত্তাকে বজায় রাখার জন্য পৃথিবীর সব দেশের এক সম্মিলিত সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। ভবিষ্যতে এর থেকেই জন্ম নিয়েছিল লীগ অফ নেশনস্ (League of Nations)। এই নীতিগুলি সার্থকভাবে প্রতিপালিত হবে এই বিশ্বাসে জার্মানি তার অস্ত্র সংবরণ করেছিল। বাস্তবে অবশ্য শেষ পর্যন্ত তা হয়নি।

৪.৪.১৩. ১৯১৯ সালের শান্তি ব্যবস্থা

চার বছর ধরে যে যুদ্ধ চলেছিল তার শান্তি ফিরিয়ে আনতে চার বছরের বেশি সময় লেগেছিল। এইভাবে যে শান্তি ব্যবস্থা চার বছর ধরে তৈরী করা হয়েছিল তার সূচনা হয় ১৯১৯ সালে। এইজন্য এই ব্যবস্থাকে বলা হয় ১৯১৯ সালের শান্তি ব্যবস্থা (The Peace settlement of 1919)। উড্রো উইলসনের চৌদ্দ দফা শর্ত ও নিম্নলিখিত চুক্তিগুলিকে নিয়ে শান্তি ব্যবস্থা গঠিত হয়েছিল—

ক) জার্মানির সঙ্গে স্বাক্ষরিত ভার্সাই চুক্তি (Treaty of Verssailles)—১৯১৯ সালের জুন মাসে।

খ) অস্ট্রিয়ার সঙ্গে স্বাক্ষরিত সাঁ জারমেন-এর চুক্তি (Treaty of St. German)—১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস।

গ) হাঙ্গেরীর সঙ্গে স্বাক্ষরিত ট্রিয়াননের চুক্তি (Treaty of Trianon) —১৯২০ সালের জুন মাসে

ঘ) তুরস্কের সাথে স্বাক্ষরিত লোমানের চুক্তি (Treaty of Lausanne) —১৯২৩ সালে জুলাই মাস।

ঙ) বুলগেরিয়ার সাথে স্বাক্ষরিত নিউলির চুক্তি (Treaty of Neuilly)—১৯১৯ সালের নভেম্বর মাস।

১৯১৮ সালের শরৎকালে হাঙ্গেরী অস্ট্রিয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বলে সাঁ জারমেন ও ট্রিয়াননের চুক্তি দুটি স্বতন্ত্র চুক্তি হিসাবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর চুক্তি ছিল ভার্সাই-এর চুক্তি যার দ্বারা রাষ্ট্রকে চারিদিকে ছোট ছোট করে দেওয়া হয়েছিল, তার বিমান ও নৌবহর কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তার সৈন্য বাহিনীকে নিরঙ্কুশভাবে ছোট করা হয়েছিল এবং তার উপর বিপুল ক্ষতিপূরণ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, জার্মানি এ চুক্তিকে মেনে নিতে পারেনি—তাকে আরোপিত চুক্তি বা Dictated peace বলে বর্ণনা করেছিল। পরবর্তীকালে জার্মানি এই চুক্তি ভেঙে ফেলার চেষ্টা করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। ভার্সাই চুক্তির অঙ্গ হিসাবে গড়ে উঠেছিল বিশ্বসংগঠন—জাতিসংঘ (League of Nations) । এই সংগঠনের ইস্তাহার (covenant) ভার্সাই চুক্তিপত্রের সংযুক্ত বিষয় ছিল।

৪.৪.১৪ ফলাফল

ব্যাপক ধ্বংস ও হত্যালীলার মধ্য দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছিল। রাশিয়া হারিয়েছিল কুড়ি লক্ষ মানুষ, জার্মানির কুড়ি লক্ষ, ফ্রান্স, ও তার উপনিবেশগুলির পনেরো লক্ষ, অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর সাড়ে বারো লক্ষ এবং ইংল্যান্ড ও তার উপনিবেশগুলির দশ লক্ষ মানুষ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হারিয়েছিল একলক্ষ পনেরো হাজার মানুষ। ব্যাধি, আতঙ্ক, স্নায়ুর রোগ ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়েছিল কত মানুষ তার কোন সঠিক পরিসংখ্যান নেই। যুদ্ধের সময় থেকে খাদ্যাভাব, যুদ্ধের পরে কর্মহীনতা ও অর্থাভাব সমস্ত ইউরোপ ও পৃথিবীকে গ্রাস করেছিল। মানুষের নৈতিকতাবোধ, পরিবার সংগঠন ও সমাজকল্যাণের চিরায়ত নীতিগুলির উপর নির্মম আঘাত হেনেছিল যুদ্ধ। যুদ্ধের চাহিদা মানুষের উদ্ভাবনী শক্তিকে

বাড়িয়ে বিজ্ঞানকে প্রযুক্তিতে প্রয়োগ (application of science to technology) করে শিল্পের উন্নতি ঘটিয়েছিল ঠিকই কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা অভিনব ধবংসের উদ্ভাবনেই বেশি কাজে লেগেছিল। দেখা গেছিল যে ১৯১৪ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে প্রত্যেক এক মিনিটে একজন ফরাসীর মৃত্যু হয়েছে। ইংল্যান্ডে উনিশ শতকের শেষ সিকিভাগ সময়ে যে প্রজন্মের জন্ম হয়েছিল তার অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এই যুদ্ধে।

সামগ্রিকভাবে যুদ্ধ নারীমুক্তির সাহায্য করেছিল ("In every country, too, the war had the effect of accelerating the emanapation of women..."—David Thampson, *Europe since Napoleon*। যুদ্ধের ফলে পুরুষদের মৃত্যু হয়েছিল বেশি তাই দেখা দিয়েছিল 'পুরুষ ঘাটতির'— 'deficit of men'— সমস্যা। ফলে বাধ্য হয়ে মেয়েদের অফিস-কাছারি, কলকারখানা, শিক্ষালয় হাসপাতাল সর্বত্র পুরুষের পাশাপাশি কাজ করতে হয়েছিল। এই কারণে ইংল্যান্ডে ১৯১৮ সালের তিরিশ বছরের বয়স্ক বা তদুর্ধ বয়স্ক মহিলাদের পার্লামেন্টে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়।

যুদ্ধের প্রয়োজনে নতুন শিল্প গড়ে উঠেছিল। তুলোর বিকল্পে সেলুলস (cellulose) আবিষ্কার করা হয়েছিল। রেয়ন, প্লাসটিকপ্রভৃতি বিকল্প শিল্প (Substitute industry) গড়ে উঠতে লাগল । চিলি (Chile) থেকে নাইট্রেট আমদানি সম্ভব হচ্ছিল না বলে জার্মান ইহুদি বৈজ্ঞানিক ফ্রিৎজ হেবার (Fritz Haber) বায়ু থেকে নাইট্রোজেন আহরণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

যুদ্ধের পর থেকে দেশে শ্রমিক আন্দোলন বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়ন (Trade Union) আন্দোলন করতে থাকে। সমাজতন্ত্রের আগমন ঘটে। রাশিয়াতে জারতন্ত্রের পতন হয়ে সেখানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। যুদ্ধ ও পরবর্তীকালে আরোপিত ক্ষতিপূরণের চাপে জার্মান অর্থনীতি ভেঙে যায় এবং জার্মান মুদ্রা জয়েসমার্কের মূল্য কমতে থাকে। সেই বিপর্যস্ত অর্থনীতি থেকে জন্ম নেয় জাতীয়তাবাদী নাৎসী (Nazi) দল। যুদ্ধের ফলে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। একের পর এক সরকার বদল ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে হাঙ্গেরীর রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। একের পর এক সরকার বদল ও অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে হাঙ্গেরীর কৃষি ও শিল্প নিয়ে দ্বন্দ্ব মধ্য ইউরোপে এক বিপজ্জনক অস্থিরতা এনে দিয়েছিল। দক্ষিণপূর্ব ইউরোপে হাঙ্গেরী, ইয়াগোস্লাভিয়া, চেকোস্লাভাকিয়া নামে একগুচ্ছ নতুন দেশ আত্মপ্রকাশ করেছিল। ইউরোপের মানচিত্রে পোলান্ডের পুনরাবির্ভাব হয়েছিল। সার্বিয়া মিলিয়ে গেল ইয়োগোস্লাভিয়া নামক নতুন এক যৌগিক রাষ্ট্রের ভেতর। আর উত্তরের স্লাভরা—চেক ও স্লোভাকরা—চেকোস্লোভাকিয়া গঠন করল। রুমানিয়া রাশিয়ার কাছে বেসারাবিয়া নামক অঞ্চল লাভ করে নিজের আয়তনকে দ্বিগুণ করে ফেলল। অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবুর্গ (Hapsburg) সাম্রাজ্য ছোট হয়ে গেল। জার্মানির সঙ্গে তার মিলন নিষিদ্ধ হল। বিজিত রাষ্ট্রগুলির উপনিবেশগুলি লীনের অধীনে ম্যানডেটেড টেরিটরিস্'এ (Mandated Territories) পরিনিত হয়ে মিত্র শক্তিগুলির নিয়ন্ত্রণে চলে গেল। এর পর থেকে ব্রিটেন প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উপনিবেশগুলিতেও স্বাধীনতার আন্দোলন বাড়তে লাগল। ফলে ইউরোপের সনাতন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির যে নিয়ন্ত্রণ উপনিবেশগুলির উপর ছিল তা শিথিল হয়ে পড়ল। বাল্টিক অঞ্চলে এস্টোনিয়া (Estonia), লাটভিয়া (Latvia) এবং লিথুয়ানিয়া (Lithuania) স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হল। আলবেনিয়াকেও স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হল। তুর্কী সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গেলে পর সিরিয়া (Syria) এবং লেবানন (Lebanon) ফরাসীদের অধীনে 'ম্যানডেটেড' (mandated) অঞ্চলে পরিণত হল, ব্রিটেনের 'ম্যানডেটেড' অঞ্চল হল প্যালেস্টাইন, ইরাক ও ট্রান্স জোরডান (জোরডান নামে বর্তমান দেশ)। ১৮৭০ সালে সেদানের যুদ্ধের ফলে জার্মানি ফ্রান্সের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল আলসস্ ও লোরেন নামক অঞ্চল (Alsace & Lorraine) তা, ফ্রান্সকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। এর দ্বারা ইউরোপের মানচিত্রের পরিবর্তন হয়েছিল ঠিকই কিন্তু ভেতরে ভেতরে নানা অসন্তোষ নানাভাবে জমে উঠেছিল। এর পর দুধরণের মানসিকতা ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিকে গ্রাস করেছিল। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রগুলি যেমন জার্মানি ও অস্ট্রিয়া যাদের রাজ্যাংশ কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তারা সমস্ত ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস

ও সংশোধন (revision) চাইতে শুরু করল। অন্য দিকে ফ্রান্স প্রভৃতি যে সব দেশ কেন্দ্রীয় শক্তিগুলির দুর্বলতাই তাদের সুরক্ষার প্রধান শর্ত বলে ধরে নিয়েছিল তারা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে ছঠল। আবার বলকান অঞ্চলের সদ্য আত্মপ্রকাশ করা দেশগুলি অস্ট্রিয়া থেকে বা তুর্কী সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন হয়েছিল বলে তাদের অস্ট্রিয়া ও তুর্কী বিরোধিতা যেমন প্রকট ছিল তেমন নিজেদের মধ্যে সন্দেহ ও বিদ্বেষ প্রবল থাকায় বলকান অঞ্চলে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অর্থাৎ যুদ্ধ শেষের জন্য যে যুদ্ধ করা হয়েছিল তা কিন্তু শান্তির বনিয়াদ রচনা করতে পারেনি। আর এই অসার্থক বনিয়াদের উপর গড়ে তোলা শান্তির প্রয়াস দুদশক পরেই ভেঙে যায়। ১৯৩৯ সালেই আরম্ভ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

৪.৪.১৫ সারাংশ

১৮৭০ সালে সেদানের যুদ্ধের সময় থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত চারদশকের কিছু অধিক সময় ধরে ইউরোপে সাধারণ অর্থে একটি মহাদেশীয় শান্তি বিরাজ করছিল। কিন্তু এই শান্তি ছিল বড়ই আপাত। ইউরোপ ত্রিশক্তির মৈত্রী (Triple Alliance) এবং ত্রিশক্তির আঁতাত (Triple Entente) এই দুই সশস্ত্র শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। অর্থৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্কে যে শক্তিসাম্য আত্মপ্রকাশ করেছিল তা শুধুই যুযুধান সশস্ত্র দুই শিবিরের অপরীক্ষিত ভারসাম্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না। দুভাবে এই ভারসাম্যের পরীক্ষা হতে পারত এং দুভাবেই তা হয়েছিল। এক, বিসমার্কের ক্ষমতা থেকে পতনের পর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের নেতৃত্ব জার্মানি নৌবাদ ও বিশ্বনীতির লক্ষ্যকে তুলে ধরলে বোঝা যাচ্ছিল যে জার্মানি ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হচ্ছে—জার্মানি পৃথিবীর উপনিবেশ বণ্টনের সংশোধন চাইছে। এতে কোন সন্দেহ ছিল না যে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স প্রাণপণে এই সংশোধন প্রয়াসকে রোধ করবে এবং সেই প্রতিরোধে লড়াই অনিবার্য হয়ে উঠবে। এবং সে লড়াই হবে বিধ্বংসী কারণ ইংল্যান্ড তার শ্রেষ্ঠ নৌবাহিনী নিয়ে আর জার্মানি তার অত্যন্ত দক্ষ ও দুর্ধর্ষ সামরিক বাহিনী নিয়ে নিজের নিজের লক্ষ্যে অনড় থাকবে। দুই ইউরোপে অটোম্যান তুর্কী সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাচ্ছিল এবং অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী দ্বৈত, রাজতন্ত্রে (Dual monarchy) ভাঙ্গন দেখা যাচ্ছিল। ফলে দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের স্লাভদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল। রাশিয়া সমস্ত অর্থেই জাতীয়তাবাদী স্লাভ (Slave) মানুষদের সমর্থন জানালেও অস্ট্রিয়া ছিল তাদের স্বপ্ন পূরণের প্রতিবন্ধক। দুনিয়া জুড়ে জার্মানির উদ্বোধিত জাতীয় চেতনা ইংল্যান্ড ফ্রান্সের স্থিতিশীল অহংবোধে আঘাত হানছিল অন্যদিকে মহাদেশীয় ভূখণ্ডে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্যবাদী দর্পন ও ষড়যন্ত্র স্লাভদের জাতীয় চেতনাকে লাঞ্ছিত করছিল। জার্মানির মতন স্লাভরাও চাইছিল সংশোধন নিজেদের বিকীর্ণ অস্তিত্বকে সংহতি দানের জন্য চলতি ব্যবস্থার পরিবর্তন। এই দুই বিশেষ অর্থে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল সংশোধনবাদের সঙ্গে সংরক্ষণবাদের দ্বন্দ্ব। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধের জন্য প্রকৃত অর্থে দায়ী কে তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা যাবে না। ইংল্যান্ড ঘোষণা করেছিল যে সে ক্ষুদ্রজাতিগুলির রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে। জার্মানি ঘোষণা করেছিল যে সে তার জাতীয় বিধিলিপির মর্যাদা সংরক্ষণে যুদ্ধের পথ বেছে নিচ্ছে। কিন্তু আড়ালে উভয়ের ছিল সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের কলহ কূটনীতির দ্বারা যার নিষ্পত্তি সম্ভব ছিল না। যুদ্ধ ছিল অনিবার্য আর সেই ঐতিহাসিক অনিবার্যতাকেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনস্বীকার্য যুক্তি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

৪.৪.১৬ প্রশ্নাবলী

১। *দশটি বাক্যে উত্তর দিন :*

ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য কি জার্মানি দায়ী ?

খ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মূল রণক্ষেত্রগুলি বর্ণনা করুন ?

গ) ১৯১২ও ১৯১৩ সালে বলকান যুদ্ধ কেন হয়েছিল ?

ঘ) ওয়েল্টপলিটিক কি ?

ঙ) নৌবাদ কি ?

চ) 'যুদ্ধ শেষের যুদ্ধ' —তাৎপর্য লিখুন।

ছ) উড্রো উইলসনের চৌদ্দ দফা শর্ত কি ?

জ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির অবস্থা বর্ণনা করুন।

ঝ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে মরোক্কো নিয়ে কি সংকট হয়েছিল ?

ঞ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির নৌবাহিনীর ভূমিকা কি ছিল ?

২। *পাঁচটি বাক্যে উত্তর দিন ঃ*

ক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য ইংল্যান্ড কতখানি দায়ী ছিল ?

খ) বাগদাদ রেলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কি ?

গ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পর পূর্ব ইউরোপের কি পরিবর্তন হয়েছিল ?

ঘ) নারীমুক্তির উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব কি ছিল ?

ঙ) শিল্প ব্যবস্থার উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব কি ছিল ?

চ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নতুন অস্ত্র কি ব্যবহার করা হয়েছিল ?

ছ) জনসংখ্যার (population) উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব কি হয়েছিল ?

জ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির নৌ অবরোধ থেকে ইংল্যান্ড মুক্তি পেল কি করে ?

ঝ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় অস্ট্রিয়ার প্রত্যক্ষ ভূমিকা কি ছিল ?

৩। *একটি বাক্যে উত্তর দিন ঃ*

ক) উড্রো উইলসন কে ছিলেন ?

খ) জলযুদ্ধে কনভয় (convoy) ব্যবস্থা কি ছিল ?

গ) কিয়েল ক্যানেল কি ?

ঘ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে জার্মানির সঙ্গে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ?

ঙ) নিউলির চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ?

চ) ব্রুসিলভ কে ছিলেন ?

ছ) চৌদ্দদফা শর্তের যে কোন একটি শর্ত কি ছিল ?

জ) কোন কোন দেশ বা অঞ্চল নিয়ে ইউগোস্লাভিয়া গঠিত হয়েছিল?

ঝ) আগাদি কোথায় অবস্থিত।

ঞ) হেগ সম্মেলন কি?

ট) সার্বিয়াকে অস্ট্রিয়া যে চরমপত্র দিয়েছিল তার একটি শর্ত লিখুন।

ঠ) পূর্ব সীমান্তে জার্মানির লক্ষ্য কি ছিল?

ড) বুলগেরিয়া কোন পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল?

ঢ) যুদ্ধের শুরুতে ইটালীর ভূমিকা কি ছিল?

৪.৪.১৭ গ্রন্থপঞ্জী

১. N. Mansergh, *The Coming of the First World War 1878-1914*

২. E. Brandenberg, *From Bismarck to world war : A History of German Foreign Policy.*

৩. James Joll, *Europe since 1870 and International Relations.*

৪. A.Rosenbery, *The Birth of German Republic.*

৫. S. B. Fay, *The Origins of the World War* (2 Vols.)

৬. H.Nicolson, *Peacemaking 1919.*

৭. P. T.Moon, *Imperialism and World Politics.*

৮. E. M. Farle, *Turkey, the Great Powers, and the Baghdad Railway.*

৯. W. Miller, *The Ottoman Expire and Its successors , 1801-1927*

১০. W. L. Langer, *The diplomacy of imperialism 1890-1902.*

১১. E. L. Woodward. *Great Britain and the German Navy.*

১২. C. R. M.F. Cruttwell, *A History of the Great War,, 1914-1918.*

১৩. B. H. Liddell Hart, *A History of the World War, 1914-1918.*

Notes

Notes

Notes